রামায়ণ কথা

রামায়ণ কথা

অমলেশ ভট্টাচার্য

প্রতিভাস ◻ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাস : ৬৫৪৪-৪৮৯৮

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

অথ স ভগবান্ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু
শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্তমিতিহাসং রামায়ণং প্রাণনায়।

(ভবভূতি, উত্তররামচরিতম, ২/৬)

(প্রচেতার পুত্র ভগবান বাল্মীকি শব্দব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ এই রামায়ণ-ইতিহাস রচনা করলেন)

*

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্।।

(শ্রীস্কন্দপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৫/২০)

(গঙ্গার মতো তীর্থ নাই, মায়ের মতো গুরু নাই, বিষ্ণুর মতো দেবতা নাই, আর রামায়ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই)

*

পাপেভ্যশ্চ পুণাতি বর্ধয়তি চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।।

(ভবভূতি, উত্তররামচরিতম্, ৭/২০)

(এই রামায়ণ কথা গঙ্গার মতো সকল পাপ থেকে মুক্ত করে, জগতের মাতা লক্ষ্মীর মতো শ্রী সৌভাগ্য বর্ধন করে, মনোহরা এই রামায়ণ কথা সকল মঙ্গলের হেতু)

*

রামকথা মন্দাকিনী, চিত্রকূট চিত চারু।

—তুলসীদাস

(রামকথা স্বর্গের মন্দাকিনী, চিত্রকূট সম ভক্তের চিত্তে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলে)

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্য বই

মহাভারতের কথা

ভূমিকা

গঙ্গার মতো তীর্থ নেই, মায়ের মতো গুরু নেই, বিষ্ণুর মতো দেবতা নেই আর রামায়ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই—"নাস্তি রামায়ণাৎ পরম"—পুরাণের এই আপ্তবাক্যটি মনে পড়ল শ্রীমান অমলেশ ভট্টাচার্যের লেখা 'রামায়ণ কথা' পাঠ করে। শাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে, আধুনিকের সজাগ মন নিয়ে তিনি রামায়ণ কথা শুনিয়েছেন এবং রামায়ণের একটা সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের শ্রদ্ধা ও বিচার এক্ষেত্রে পরস্পর সহায়ক হয়ে উঠেছে। তাঁর গভীর অনুভূতি ও স্বাধ্যায়মগ্নতা আমাকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছে। শ্রীমান অমলেশ যথার্থই বলেছেন, "মহাভারত যদি হয় ভারতবর্ষের ধীশক্তি, মেধা, মস্তিষ্ক—তাহলে রামায়ণ তার হৃদয়।" তিনি রামায়ণের সেই হৃদয়কে বাঙালী পাঠকের কাছে চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। যা কিনা ভবভূতির ভাষায় বলা যায়—"মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ"।

রামায়ণের প্রতিটি চরিত্রের সুখ দুঃখ ব্যথা তাঁদের জীবনের সংগতি অসংগতি এমন চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যা অভিনব। তাঁর প্রকাশের ভাষাটিও আকর্ষণীয়। এমন নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে রামায়ণ কেউ আলোচনা করেছেন বলে জানি না। লেখার মধ্যে তথ্য যুক্তি ও পাণ্ডিত্য কখনও বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করেনি। হরিদ্বারের গঙ্গার মতোই এর গতি স্রোত ও স্বচ্ছতা। বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি অক্ষয় নাম রেখে যাবে।

শ্রীমান অমলেশকে আশীর্বাদ করি, এমনি করে শাস্ত্রানুশীলনে নিরত থেকে তাঁর পরিশ্রম সার্থক হোক।

—শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

ভূমিকা-২

'শৃন্বন্তু' পত্রিকায় 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধগুলি পর পর পড়িতে পড়িতে লেখক অমলেশ ভট্টাচার্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, সাক্ষাৎকার হয়, অন্তরঙ্গতা বাড়ে। তাঁহার লেখনীর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—মহাভারতের গহন বনে যখন অন্তঃপ্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তখন রামায়ণের মনোরম উদ্যানেও বিচরণ করিতে পারিবেন অতি সহজেই। একখানি রামায়ণ কথা লিখুন। তিনি আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন, আমি আরাধ্য দেবতার পায়ে প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

'শৃন্বন্তু' পত্রিকায় আরম্ভ হইল রামায়ণ কথা। আকুল আগ্রহ লইয়া পড়িতাম। একমাসের অপেক্ষা উৎকণ্ঠা বাড়াইত। শেষ হইল, গ্রন্থাকারে সাহিত্য সভায় দাঁড়াইল। আব্দারের আকারে অনুরোধ আসিল ভূমিকা আমাকে লিখিতে হইবে। প্রিয়জনের আবদার নিরঙ্কুশ যোগ্যতাযোগ্যতা বিচারহীন। আমি ইহাতে প্রীতির পীড়ন মনে করিয়া, কলম ধরিয়াছি।

মহাভারত—''ভারতে সর্ববেদার্থঃ'—বেদব্যাস নিখিল বেদের তাৎপর্য ভাষ্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন মহাভারতে। রামায়ণ সম্বন্ধে কবি ভবভূতি বলিয়াছেন—''ভগবতো বাল্মীকেঃ সরস্বতী নিস্যন্দঃ'', ভগবান বাল্মীকির শব্দচৈতন্যের প্রকাশমূর্তি এই রামায়ণ। রামায়ণ সত্য সত্যই পরমামৃতের প্রবহমানা নিস্যন্দিনী। শ্রীরামচন্দ্রকে বৈষ্ণবচার্যেরা বলেন ''মর্যাদাপুরুষোত্তম''। পারিবারিক নীতি, সমাজ নীতি ও রাষ্ট্রনীতির চরম মর্যাদা, পরম সীমা রামায়ণের রামলীলায় সুব্যক্ত।

লক্ষ্মণ ভরতের মতো ভ্রাতৃভক্তির আধার ভাই, সীতার মতো সহিষ্ণুতার মূর্তি সতী, হনুমানের মতো সুদৃঢ় প্রভুনিষ্ঠাযুক্ত ভৃত্য, সর্বোপরি শ্রীরামের মতো ন্যায় নিষ্ঠার মূর্তপ্রতীক পূতচরিত্র পুরুষ পৃথিবীর আর কোনো সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। অপরাধীকে দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত আছে বহু, কিন্তু কৈকেয়ীর মতো অপরাধিনীকে দণ্ডের বদলে ক্ষমা করিয়া যে গুরুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত মানবসাহিত্যে আর নাই।

রামায়ণ মহাভারত উভয় গ্রন্থেই আছে তপস্যার কথা। আর আছে জীবনের সার সত্যের কথা। মহাভারতে পাই ব্রাহ্মীস্থিতির কথা, বৈরাগ্যের কথা। আর রামায়ণে পাই প্রেমের তপস্যা, ত্যাগের তপস্যা, পাই দুঃখের তপস্যা। রামায়ণের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর। মহাভারতও সত্যকে লঙ্ঘন করেন নাই। রামায়ণের রাম লৌকিক সত্যকে মর্যাদা দিয়া ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ সত্যকে

শুধু লৌকিক ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। প্রয়োজন বোধে লৌকিক সীমা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

রামায়ণ যেন এক অনন্ত অফুরন্ত দুঃখের চলমান তরঙ্গায়িত স্রোতস্বিনী। ব্যাধের শরাঘাতে ক্রৌঞ্চের শোকে ক্রৌঞ্চীর আর্তনাদ আদি কবির রচনাশৈলীতে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রে ব্যক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেদনার ব্যক্তরূপ দশরথ, কৌশল্যা, রাম ও সীতায়, আব অব্যক্তরূপ অহল্যা, সুমিত্রা, ভরত, প্রভৃতির অম্লান চরিত্রের ফল্গু ধারায়।

যুগ যুগ ধরিয়া রামায়ণ মানবহৃদয়কে তার করুণাস্পর্শে পরিসিঞ্চিত করিয়া রাখিলেও প্রতিদিনই কতিপয় কঠোর প্রশ্ন পাঠকের চিত্তকে আলোড়িত করে। যেমন, বাল্মীকি সত্যই রত্নাকর দস্যু ছিলেন? অহল্যা কি সত্যই কলুষিতা? দশরথ কি সত্যই স্ত্রৈণ? তাড়াহুড়া করিয়া ভারতের অনুপস্থিতে রামের অভিষেকের আয়োজন কি সত্যই প্রয়োজন ছিল? পাতিব্রত্যের জীবন্ত প্রতিমা লক্ষ্মীরূপিণী সীতা কেনই-বা দুশ্চরিত্র রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইলেন? রামের বালীবধ কি সমর্থনযোগ্য? রামায়ণে বর্ণিত যক্ষ রক্ষ ঋক্ষ বানর প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান কি কবির কল্পনা, না যথার্থ? বহুগুণের অধিকারী হইয়াও রাবণ কেন এত দুরাচারী?

এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য শুধু বাল্মীকির রামায়ণ তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিলেই চলিবে না। রামায়ণ সম্পর্কিত অন্যান্য বহুগ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে। লেখক শ্রীঅমলেশ তাঁর রামায়ণ কথায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করিয়াছেন ও খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এইটি এই গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

রামায়ণ কথায় বর্ণিত বিষয়গুলি ত্রিশটির অধিক নিবন্ধে ধারাবাহিক রূপে সুন্দরভাবে সম্যক্‌প্রকারে বিচারিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধগুলি সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত এই রামায়ণ কথা গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থে লেখক বাল্মীকি রামায়ণ, তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ, আনন্দরামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, রামচরিত মানস, দেবীভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, উত্তররামচরিত, রঘু-বংশ, কূর্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মনু সংহিতা, বিভিন্ন উপনিষদ, শ্রীঅরবিন্দের *Savitri*, *The Foundations of Indian Culture*. প্রভৃতি গ্রন্থ মন্থন করিয়া রচনার উপাদান সংগ্রহ করতঃ তাঁহার অপূর্ব মনীষার নিদর্শন রাখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিজীবনীতে লিখিয়াছেন, আমাদের দেশের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। তাহাতে আমি চিরকৌতূহলী দুঃখিত নই। পাঠকেরা কবির কাব্য হইতে কবির যে জীবনচরিত রচনা করিয়া লইয়াছেন তাহাই তাঁহার জীবনচরিত। উহা প্রকৃত জীবনচরিত হইতেও সত্য। প্রচলিত ধারণানুযায়ী কবি কৃত্তিবাস, অধ্যাত্মরামায়ণ, রামচরিতমানস অনুযায়ী বাল্মীকিমুনি রত্নাকর দস্যুর রূপান্তর। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, মহাভারতের বনপর্বে, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে দেখি বাল্মীকি মুনি প্রচেতার পুত্র।

এই সকল পরস্পর বিরোধী তথ্য থাকার জন্য লেখকও রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, বাল্মীকি দস্যু না তপস্বী, ঋষি না কবি, ব্যাধ না ব্রাহ্মণ? যাই হোন শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে তিনি রামায়ণের কবি। এই তাঁর শাশ্বত পরিচয়।

অহল্যার বিচারে যদিও রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র বলেন যে, অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহার লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ড বলেন, ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরিয়া অন্যায় কার্য করিয়াছিলেন। লেখক ব্রহ্মপুরাণ ও মহাভারতের উদ্যোগপর্বের উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইয়াছেন অহল্যা নির্দোষ।

রাজা দশরথ একজন ধার্মিক নিরপরাধ মহদ্ব্যক্তি। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী কৌশল্যা, অযোধ্যার অধীন দক্ষিণ কোশলের কন্যা। সুমিত্রার পরিচয় স্পষ্ট নয়। আর কৈকেয়ী কেকয়রাজ অশ্বপতির কন্যা। অযোধ্যার সমকক্ষ। এদিকে ভরত রাম হইতে মাত্র একদিনের ছোটো। রূপে গুণে ভরত রামের অনুরূপ। সুতরাং রামের অভিষেকের ব্যাপারে অশ্বপতির সম্পর্কে রাজা দশরথের একটা ভয় ছিল। রাজা বামের অভিষেকের আয়োজন করিতেছেন অথচ রাম, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা কেউই সেকথা জানিতে পারেন নাই। অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত এই আয়োজন। রাজা কেকয়রাজকে খবর দেন নাই ভয়ে। এই একই কারণে খবর দেন নাই ভরত শত্রুঘ্নকে। আর যাহাতে কোনো কথা উঠিতে না পারে সেইজন্য রাজা দশরথ জনককেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। রাজা দশরথের নীতি কিন্তু সফল হয় নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা আসিল কৈকেয়ীর নিকট হইতে। ফলে, রাজা দশরথের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামের বনগমন প্রত্যক্ষ করিতে হইল। ভরত মাতুল আলয়ে থাকা কালেই ঘটিল দশরথেব মৃত্যু। অযোধ্যার অন্তঃপুরের এই রাজনীতি লেখক অতি নিপুণভাবেই অঙ্কন করিয়াছেন।

অনেকের ধারণা রাজা দশরথ স্ত্রৈণ ছিলেন। তাই কৈকেয়ীর কথায় রামকে বনে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা কৈকেয়ীকে নিঃশর্ত বর দিতে চাহিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু রামকে কখনও বনে পাঠাইতে সম্মত ছিলেন না। কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া দশরথের সম্মুখেই রাম যখন বনে গেলেন তখন তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। কৈকেয়ী যখন রামের বনগমন বর চাহিয়াছিলেন সেই মুহূর্তেই রাজা কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করিলেন। "তন্ত্যজামি তমেবৈদ্য তব পুত্রং তয়া সহ" ইহা স্ত্রৈণের ভাষা নহে।

অথচ যাঁহার জন্য কৈকেয়ী এতবড় অনর্থ ঘটাইলেন সেই ভরত নিষ্পাপ, নির্লোভ। কৈকেয়ী তাহাকে তত দন্ড দেন নাই যতটা দিয়াছেন রাজা দশরথ তাহাকে দূরে রাখিয়া রামের অভিষেকের আয়োজন করিয়া। শুধু কি পিতা? মাতা কৌশল্যা, ভ্রাতা লক্ষ্মণ রাম এমনকি সীতা পর্যন্ত ভরতের উপর সুবিচার

করেন নাই। কৌশল্যা বলিয়াছিলেন ভরতকে, "তুমি রাজ্য চাহিয়াছিলে, অকন্টক রাজ্য তোমার মিলিয়াছে।" লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব।"
ভরতকে বধ করিলে কোন দোষ দেখি না।

অরণ্যকাণ্ডে দেখি সীতা লক্ষ্মণকে "ভরতের গুপ্তচর" বলিয়া সন্দেহ করেন। ভরতের মতো নিরপরাধ ব্যক্তির এতবড়ো দণ্ড, বোধহয় মানবেতিহাসে আর নাই।

সীতাকে প্রকৃতপক্ষেই হরণ করা হইয়াছিল কি না বাল্মীকির পরবর্তী রামায়ণ সাহিত্যে ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। কোনো কোনো রামায়ণ কথা সাহিত্যের মতে রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণেও এই ইঙ্গিত আছে। যুদ্ধকাণ্ডে দেখি ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকেই রথে আরোহণ করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নবম পরিচ্ছেদে পাই—

পতিব্রতা শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরাম গেহিণী॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥
সীতা লইয়া রাখিলেন পার্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল।
তবে মায়া সীতা অগ্নি করি অন্তর্ধান।
সত্য সীতা আনি দিলা রামবিদ্যমান॥

ইহার সমর্থনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃ একটি কূর্মপুরাণের শ্লোক দিয়াছেন—

সীতায়া রাধিতো বহ্নিচ্ছায়াসীতা মজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষা সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥

শ্রীরামের বালিবধ অনেকের মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রচলিত ধারণা সুগ্রীবের সহায়তা লাভের জন্যই রাম বালীকে গাছের আড়াল হইতে অতর্কিতে বাণ মারিয়া হত্যা করেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আমরা দেখি, সীতাহরণের সংবাদ পাইবার পর ভরত অযোধ্যা এবং আর্যাবর্তের সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া লঙ্কা অভিযানে প্রেরণ করেন।

অক্ষৌহিণ্যোহি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ। সুতরাং সুগ্রীবের সৈন্যের জন্য রামের কোনো প্রয়োজন ছিল না। বালী যখন রামকে অভিযোগ করিল যে

তিনি দুরাত্মা, অধার্মিক, রাম তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর করেন— "তুমি ধর্ম অধর্ম জান না। তোমাকে বধ করিয়া আমার ক্রোধও হয় নাই, মনস্তাপও হয় নাই।"

দক্ষিণ ভারতীয় রাক্ষসদের সঙ্গে আর্যাবর্তের মানুষের একটা সংঘাত পূর্ব হইতেই ছিল। বৃহৎ ধর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধর্মের সংঘাত। রামের ইচ্ছা দক্ষিণ ভারতে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এই কারণেই দণ্ডকারণ্যের রাক্ষস বধ। এই কারণেই রাবণের বন্ধু বালীর বধসাধন মনে হয়। মহাভারতে বনপর্বে ও রামের বালীবধের প্রতিজ্ঞা আছে—

"প্রতিযজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সমরে বালিনো বধম্"॥

তবে তিনি কিষ্কিন্ধ্যার রীতি অতিক্রম করিয়া বালীকে বধ করিয়াছিলেন। তাই বালীর অভিযোগ, তিনি অধর্ম যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রামের ধর্মবোধ অন্য প্রকার।

রামায়ণের যুগে আমরা দেখিতে পাই মনুষ্য গৃধ্র বানর রাক্ষস যক্ষের সঙ্গে পরস্পরের আদান প্রদান, সেটা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত। রাজা দশরথের বন্ধু জটায়ু গৃধ্র। রাক্ষস রাবণ ও যক্ষ কুবের একই ঋষিসন্তান। রাক্ষস রাবণ ও বানর হনুমান দুইজনেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু সত্যই কি ইহা সম্ভব?

শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টিপ্রকরণে ও শ্রীমদ্ভগবদগীতার দৈবাসুর সম্পদ-বিভাগ যোগ অনুধাবন করিলে কিন্তু এটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সৃষ্ট জীবের কার্য তাহার প্রকৃতির অনুরূপে এবং প্রকৃতি জন্ম সময়েই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাই বিশেষভাবে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জন্মসময়ে মায়ের আসুরীভাব থাকার জন্যই রাবণ আসুর স্বভাব।

রামায়ণেব কবিত্বের দিক ও তৎসহ এইরূপ আরও অনেক সমস্যা লেখক তাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা করিয়াছেন সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করিয়া। পিপাসু পাঠকের পক্ষে এটি একটি অনাস্বাদিত গ্রন্থ।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই উপসংহার টানিব। একটি চিত্তাকর্ষী বিষয় —প্রত্যেকটি নিবন্ধের এক একটি অপূর্ব শিরোনাম (Heading) কয়েকটি সুন্দর সহজ বোধগম্য। কয়েকটি আলো-আঁধারি ভাষায় রহস্যপূর্ণ। 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকায় রামায়ণ কথা পড়ার আগে যত্ন করিয়া শিরোনামটা পড়িতাম, তারপর দুই মিনিট চিন্তা করিতাম। অনেক সময় চিন্তায় কোনো ফল আনিত না। পরে পাঠান্তে আশ্চর্যান্বিত হইতাম। যে কোনো পাঠকই হইবেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। সব লিখিলে ভূমিকা আর একখানি গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে।

একটি নিবন্ধের শিরোনাম "মবা থেকে রাম", প্রথমে মনে হইল এতদূর আসিয়া আবার রত্নাকরের কথা শুরু হইবে। পাঠ শেষ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। অরণ্যের অনন্তজীবনের বহু প্রকার বিরোধিতার মিলন প্রসঙ্গ। কবন্ধ রাক্ষস দিব্যজ্ঞানী, নরখাদক বিরাধ ভক্তশ্রেষ্ঠ, শূদ্রা শবরী সিদ্ধতপা, পরম ধর্মাত্মা।

সর্বত্রই যেন একই মন্ত্রের অক্ষরব্যত্যয়। মরা থেকেই রাম। পাঠ করিয়া লেখকের দৃষ্টির গভীরতায় স্তব্ধ হইলাম। আর একটি শিরোনাম—"একটি তৃণ যেন বজ্রের প্রাচীর" দুচার মিনিট ভাবনাতেও রহস্যের দুয়ার খুলিতে পারি নাই। সুন্দরকাণ্ডের কাহিনি। কাম-ক্রোধোন্মত্ত রাবণ। প্রবেশ করিয়াছেন অশোক বনে। শত শত প্রলোভনপূর্ণ বাক্য দ্বারা সীতাকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে। বাক্যগুলি সবই অবশীভূত ইন্দ্রিয় মহাভোগীর প্রলাপের মতো। দুষ্ট সতীর এত নিকটে যে দুর্বাসনার বশে এখনই তার অঙ্গে হাত দিতে পারে। সীতা তখন কি করিলেন?

চিন্তয়ন্তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা॥

পতিব্রতা তখন পরিদেবতার চরণ ধ্যান করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন এক গাছি তৃণ রাখিলেন নিজের সম্মুখে—দুজনের মধ্যস্থলে। হাতের আঙুলগুলি যেন বলিল, সাবধান! ভ্রষ্টচরিত্র পিশাচ, আর একবিন্দু অগ্রসর হইও না। সতীর তেজস্বিতায় ও পরুষ বাক্যে যমজয়ী বীর রাবণ হতভম্ব হইয়া গেল। বুক কাঁপিতে লাগিল। তৃণগাছি যেন একটা বজ্রের প্রাচীব। তাহা লঙ্ঘন করিবার শক্তি রহিল না। সতীর তৃণাদপি ব্যবধানটুকু মহাপাপ কখনও লঙ্ঘন করিতে পারে না।
পাঠ করিয়া চিত্তে একটা অভূতপূর্ব চমৎকৃতির উদয় হইল। সাহিত্যরসিক প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—"রসে সারশ্চমৎকারো যদ্বিনা ন রসো রসঃ"—রসসৃষ্টির প্রাণই হইল চমৎকৃতি। তাহাই যদি না হইল রস রসই নয়। এই চমৎকৃতি কেবল সাহিত্যের সার নয়, দর্শন শাস্ত্রেরও প্রাণ। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল বলিয়াছেন—দার্শনিকের জীবনের আসল কথাই হইল Feeling of Wonder—একটা বিস্ময়ের অনুভূতি। রামায়ণ কথার বহুস্থলে এই অনুভূতি লাভে পাঠকের চমৎকৃতি জাগিবে।

গ্রন্থকারের নামটি অমলেশ। ঠিক অর্থ বুঝি নাই, তাই অনেক সময় র-লয়ের অভেদ নীতি অনুসারে আমি অমরেশ পড়ি। দুইখানি মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া বাল্মীকি আর বেদব্যাস অমর হইয়া আছেন, লেখকও ওই গ্রন্থদ্বয়ের বিচার করিয়াছেন দার্শনিকের তীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি দ্বারা আর সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন "ব্রহ্মানন্দ সহোদর" কাব্যামৃত আস্বাদন দ্বারা—গলিত ফল 'মহাভারতের কথা' ও 'রামায়ণ কথা' এই দুই অভিধায় দুইখানি গ্রন্থ রসজ্ঞ বাঙালি পাঠকদের হাতে তুলিয়া দিয়া অমলেশ অমরেশ হইয়া রহিবেন। নিশ্চয়ই রহিবেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

রামায়ণ কথার কথা

রামকথা ভারতীয় সাহিত্যে অনুপম সৃষ্টি। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামচন্দ্র ভূভার হরণার্থ নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অথবা মনুষ্য রামচন্দ্র চরিত্র-গৌরবে দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন, এ প্রশ্ন আজ অবান্তর। মানুষ হইলেও তিনি ভারতবাসীর হৃদয়াধিদেবতা। আবার দেবতা হইলেও তিনি রক্তমাংসের মানুষ। উভয় আদর্শের স্রোত রামচরিত্ররূপ প্রয়াগে মিলিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি রাম কাব্যের আদিকবি। তাহার ছায়া পড়িয়াছে মহাভারত, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, সংস্কৃত সুকুমার সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য তথা নানা বৈদেশিক ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার গ্রন্থাবলীতে। এই প্রতিচ্ছবিগুলি সর্বত্র সমান উজ্জ্বল নহে; নানা দেশ ও নানা কালের পরিবেশ, প্রয়োজন এবং প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য আনিয়াছে বহুস্থলে। তথাপি মহর্ষি বাল্মীকির সৃষ্টি মূল রামোপাখ্যানের স্বকীয়তা সর্বত্র অল্পাধিক পরিস্ফুট। বিগত দুই শতকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে ভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা আর্য রামায়ণের মৌলিক মূল্য হ্রাস করিয়া উহাকে বৌদ্ধ জাতকের কোনো কোনো উপাখ্যান এবং বৈদেশিক মহাকাব্য বিশেষের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করার চেষ্টা করিল। এ দেশেও তাহার অনুসরণ এবং সম্বলন চলিতে লাগিল। ফলে যে রামচন্দ্র আপামর সাধারণ ভারতীয়ের আদর্শ ছিলেন, তিনি নানা কলঙ্কে মলিন হইয়া পড়িলেন। শোকে সান্ত্বনা, নিদ্রায় সুখস্বপ্ন, স্বস্তিতে অমৃতপ্রাশ রামায়ণ হইল স্থূল হস্তাবলেপের শিকার।

কি কুক্ষণেই না মহাকবি ভবভূতি চপল বীরবালক লবের মুখে রাম-চরিত্রের কয়েকটি আপাত ত্রুটির আশঙ্কা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, স্বয়ং বাল্মীকির অথবা তাঁহার অনুযায়ীদের দৃষ্টিতে উহা যতই অমূলক হউক না কেন, এই অভিযোগের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। উত্থাপিত অভিযোগগুলির মধ্যে শ্রীরামকর্তৃক তাড়কা বধ, খরের সহিত যুদ্ধে তিন পদ অপসরণ এবং পৃষ্ঠভাগ হইতে বালী বধ এই অভিযোগ আসিয়াছে উত্তররাম-চরিতের লবের মুখ হইতে। সীতার বনবাস পরবর্তী সমালোচকদের সংযোজন। ইদানীং এক বৈদেশিক সমালোচক শ্রীরামের একপত্নীব্রতের বিরুদ্ধেও নানা খঞ্জ যুক্তি খাড়া করিয়াছেন

আবার মূল রামায়ণের কোন অংশ মৌল, আর কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত, তাহা নির্ধারণ করিতে সমালোচকদের দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হয় না। উহারা বলেন, রামায়ণে আদিকাণ্ডের অধিকাংশ এবং উত্তরকাণ্ড পূর্ণতঃ প্রক্ষিপ্ত। কারণ তাহাতে রামচন্দ্রকে পরমেশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, রামায়ণের অবশিষ্টাংশের সহিত এ দুইটির শৈলীগত মিল নাই, একটি বিষয়সূচিতে কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই, মহাভারতের রামোপাখ্যানে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি। আমরা কিন্তু অন্য কাণ্ডগুলিতেও শ্রীরামকে পরমপুরুষ রূপে বর্ণিত দেখি। উক্ত সংক্ষিপ্ত সূচিবহির্ভূত বিষয়গুলির বর্ণনা বা উল্লেখ মহাভারত, পুরাণ এবং অবান্তর ভারতীয় সাহিত্যে সুপ্রচুর। ভারতীয় সাহিত্যে কোনোদিনই আরিস্টটল প্রদর্শিত ঐক্য ত্রিতয় অবশ্য পালনীয় ছিল না। আদিকাণ্ড রামায়ণের ভিত্তি, তাহাকে বাদ দিয়া মূল কথা বস্তুকে নিরালম্ব করা চলে না। আবার উত্তরকাণ্ডটি উড়াইয়া দিলে রামচরিত্রের মাহাত্ম্য অনেকটাই হ্রাস পায়; রামরাজ্য বলিয়া প্রথিত বস্তুটি খেলো হইয়া পড়ে। তবে ভূমিকা ও পরিশিষ্টে অদৃঢ়গ্রথিত নানা বিষয়ের সমাবেশ এ দেশের গ্রন্থকারকে করিতেই হয়। অন্যথায় পাঠকের মূলগত অতৃপ্ত অথচ সঙ্গত জিজ্ঞাসার উত্তর দিবে কে?

রামচন্দ্র এক সুসভ্য দেশের অন্যতম বিশিষ্ট রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; রাজকীয়, সামাজিক এবং সাংসারিক কোনো কর্তব্যই তিনি পরিহার করিতে পারেন না। মনুর বাঁধা পথে তাঁহাকে চলিতে হয়। বর্ণাশ্রমের কোনো বিধানে পরিবর্তন করার সাধ্য তাঁহার নাই। প্রজারঞ্জন তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। স্বীকৃত রাজ্য তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না। নিজের বা অন্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাও তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। এরূপ ছোটো বড়ো নানা বন্ধনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া তাঁহাকে চলিতে হয়। তাঁহার রাজকর্তব্য পতির কর্তব্যে বাধা দেয়। নিয়মবন্ধন তাঁহার প্রাণাধিক ভ্রাতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেয়। প্রচলিত সামাজিক সংস্কার শূদ্র-তপস্বীকে হত্যা করিতে বাধ্য করে। এই সব বাধাবন্ধের মধ্য দিয়া প্রজ্ঞাপ্রদীপের আলোকমাত্র সম্বল করিয়া রামচন্দ্র জীবন-পথ অতিক্রম করেন। এখানেই তাঁহার অয়নের সার্থকতা। আর এজন্যই তিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম।

শ্রীরাম কর্তৃক সীতা পরিত্যাগ একটু বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অসহায়া সীতাদেবী রাবণের অশোকবনে দীর্ঘদিন বাস করিতে বাধ্য হন। রাবণ নিরঙ্কুশ এবং প্রবৃত্তির দাস। অশোকবনও কেবল অশোক গাছের বন নয়। ইহা নানা ভোগোপকরণে সমৃদ্ধ প্রমোদকানন। রামায়ণে মহর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের এবং রাবণের অশোক কানন, প্রমোদবনের ছবি নানা রূপে রঙে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মহাভারতেও মহারাজ যযাতির অশোকবনের চিত্র বর্তমান। রামচন্দ্রের অন্তরাত্মা সীতাদেবীকে শুদ্ধা এবং যশস্বিনী বলিয়া জানে; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে অগ্নি পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ দেখিয়াছেন। কিন্তু অযোধ্যার জনগণ তাহা মানিবে কেন? নগর ও জনপদের মুখর লোকেরা বলিতে লাগিল—

রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥
লঙ্কামপি পুরানীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি॥
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ততে॥

(উত্তরকাণ্ড, ৪৩/১৭-১৯)

এ অবস্থায় নিরপরাধ সীতাকেও মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে ন্যস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় রামচন্দ্র খুঁজিয়া পান নাই। আরোপিত কলঙ্ককে অস্বীকার করিয়া তিনি প্রজাবিদ্রোহ ডাকিয়া আনিতে পারেন না। বিদ্রোহ চূর্ণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অবশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহাতে 'রাজাপ্রজানুরঞ্জনাৎ' নিয়ম ব্যাহত হইত। তিনি তো আধুনিক কোনো রাজার মতো প্রেমের জন্য রাজ্যত্যাগ করিতে পারেন না কাবণ দেশের ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতি দিক্‌পালের অংশে রাজা হইয়াই জন্ম লাভ করিয়াছেন। সীতাকে জনকের গৃহে পাঠাইলে প্রকারান্তরে সীতার দোষ স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। মহিষীপদে অন্য কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিয়া সীতাকে সামান্য পরিজনে পরিণত করিলে প্রজারা হয়তো আপত্তি করিত না, কিন্তু তাহা তো সীতা এবং রামচন্দ্রের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও কঠোর শাস্তি হইয়া দাঁড়াইত। এই পরিস্থিতিতে রামচন্দ্র যাহা করিলেন, তাহা উভয়ের পক্ষে যতই মর্মন্তুদ হউক না কেন, মর্যাদার কোনো হানি করিল না। মহর্ষি বাল্মীকি সর্বজন বিশ্বাস্য, দেবোপম ব্যক্তি। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে সীতার ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ভাবী সন্তানের জাতকর্মাদি সংস্কার সুসম্পন্ন হইবে, যেমন হইয়াছিল রামের পূর্বপুরুষ অসিত (নামান্তর বাহু) রাজার স্ত্রী মহারাজ সগরের মাতার ক্ষেত্রে মহর্ষি ঔর্ব বা চ্যবনের আশ্রমে। (দ্রষ্টব্য : রামায়ণ ১/৭০, মহাভারত, ১২/৫৭/৮ ও বৃহন্নারদীয়পুরাণ, ৭ম অধ্যায়)।

বাধ্য হইয়া সীতাকে গৃহ হইতে নির্বাসন দিলেও রামচন্দ্র মনে মনে সীতার প্রতি কোনো বিরূপ ভাবনা পোষণ করেন নাই; বরং সোনার সীতাকে সহধর্মিণী করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা তিনি অন্যায় দোষারোপের প্রতিবাদই করিলেন। মথুরাযাত্রার পথে সীতার সন্তান প্রসবের সময় শত্রুঘ্ন বাল্মীকি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। আবার মথুরা হইতে অযোধ্যায় ফেরার পথেও শত্রুঘ্ন ওই আশ্রম হইয়া ফেরেন। ইহাও নিতান্ত কাকতালীয় নহে।

ক্রমশ জনগণের প্রতিরোধ ক্ষীণ হইল। মহর্ষি বাল্মীকির মধ্যস্থতায় সীতাকে স্বগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই সীতাদেবী মাতা পৃথিবীতে বিলীন হইলেন। এবার মৃত্যুর শীতল হস্ত তাঁহার চারিত্রশুদ্ধির নিকষোপলে পরিণত হইল। পুত্র লব ও কুশের পিতৃগৃহে স্বীকৃতির পক্ষে কোথাও কোনো বাধা দেখা দেয় নাই।

বাল্মীকিকে, রামচন্দ্রকে এবং ভারতীয় আদর্শকে অনুধাবন না করিয়া যিনি যাহাই বলুন না কেন, রামচন্দ্র ভারতের জাতীয় আদর্শ পুরুষ ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। সমাজনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় সমাজ বিবশ হইয়া পড়িলে শ্রীরামের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভারত বারবার নূতন করিয়া যাত্রা করিয়াছে। বৌদ্ধ প্লাবনের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমুন্নতির মুখে মহাকবি কালিদাস নূতন করিয়া রামকাব্য রচনা করেন। রঘুবংশ নামের গূঢ় অর্থ রঘুবংশোদ্ভূত রামচন্দ্রের চরিত্রকাব্য। মহাভারতে রামচন্দ্রকেই রঘুবংশ বলা হইয়াছে। কালিদাসের উক্ত কাব্যের মুখ্য পাঁচটি সর্গে রামচন্দ্র দেদীপ্যমান। পূর্ব ও পরবর্তী সর্গ কয়টি তাহার উপস্তরণ ও পিধান মাত্র। আবার বিজাতীয় অধিকারের পীড়নে ভগ্ন ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতের লোক-ভাষাগুলিতে নূতন করিয়া রামচরিত বর্ণনা সম্পূর্ণ জাতিকে যথা সম্ভব পর্যবস্থাপিত করিয়াছে। কেবল ভারতে কেন? সন্নিহিত এবং দূরবর্তী নানা দেশে রামকথার বিস্তার হইয়াছে। পাহাড় বা সমুদ্র তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। ধর্ম বা ভাষার প্রাচীরও সেখানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

আনন্দের কথা, ফাদার বুল্কের মতো বিশিষ্ট বিদ্বান সংস্কারমুক্ত মন লইয়া যাঁরা পৃথিবীতে রাম কথা প্রচারের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করিয়া প্রচলিত নানা অজ্ঞতা বা স্বেচ্ছাকৃত কুব্যাখ্যার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় আর্য রামায়ণের ঐতিহ্যব্যাখ্যাপরক গ্রন্থ বেশি লেখা হয় নাই। এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাবপূরণে আত্মনিয়োগ করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমলেশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। অল্প দিন পূর্বে আমরা তাঁহার 'মহাভারতের কথা'-কে স্বাগত জানাইয়াছিলাম। নানা পত্র-পত্রিকায় মনীষীবৃন্দ তাঁহাকে এই গ্রন্থ রচনার জন্য সাধুবাদ জানাইয়াছেন। উহার প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়াছে। হিন্দি ও ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজনও অনুভূত হইতেছে। আশা করি, প্রস্তুত রামকথাও সমান সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় অনাড়ম্বরভাবে নিয়ত ভারতভারতীয় সাধনা করিয়া চলিয়াছেন। বেদ, ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের পৃষ্ঠভূমিতে জাতীয় প্রয়োজনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি রামায়ণের নানা গ্রন্থি মোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। সংবেদনশীল মন, একান্ত যুক্তিনিষ্ঠা এবং বলিষ্ঠ লেখনী তাঁহার বক্তব্যকে স্পষ্টতা দেয়; রোচনীয় করিয়া তোলে। মহাভারত কথার মতো রামায়ণ কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা একথা বারবার অনুভব করিয়াছি। প্রত্যেকটি বিষয় তাঁহার কাছে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে বিবেচ্য এবং সাহিত্যিক দৃষ্টিতে প্রতিপাদনীয়।

রামায়ণের মুখ্য ও গৌণ চরিত্রগুলি তাঁহার হাতে নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। রাবণ তাঁহার দৃষ্টিতে নির্গুণ পাথর মাত্র নহে। তাহার চরিত্রে নানা মহনীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোনো কোনো দুর্বলতা তাহাকে

অধঃপতনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। তাহার জীবনে কোনো নোঙর ছিল না। পক্ষান্তরে তাহার প্রতিপক্ষ রামচন্দ্র ধ্রুবকে লক্ষ্য করিয়া চলেন। দুঃখ বা সুখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কখনও মনে হয় তিনি অত্যন্ত কঠোর; মনুষ্যোচিত সহানুভূতি বা করুণা যেন তাঁহাতে অনুপস্থিত, ঠিক এইখানে আমাদের গ্রন্থকার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেন, আপাতকঠিন বহিরঙ্গে মানবিক সমস্ত গুণের ফল্গুধারা সেখানে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান; আরোপিত কঠোরতা আমাদের দৃষ্টিভ্রম। দশরথ, কৈকেয়ী, বিভীষণ, অহল্যা, প্রভৃতি চরিত্রের নানা দিক বর্তমান গ্রন্থে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যাহা সাধারণত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত ছিল। কোথাও-বা প্রচলিত ধারণা সর্বথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। রামায়ণের প্রক্ষিপ্তবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে। আর্ষ রামায়ণের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লোকলোচনের আগোচরে চলিয়া গিয়াছিল, পরবর্তী সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হয় নাই, নিপুণ গ্রন্থকার সযত্নে তাহার উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করিয়াছেন। জন্মসূত্রে রাক্ষস অথচ আচরণে সুধার্মিক রাবণানুজ বিভীষণকে অনেকে স্বকুলদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের গ্রন্থকারের সুগভীর আলোচনায় ব্যক্তি ধর্ম, কুল ধর্ম, জাতি ধর্ম ও যুগ ধর্মের মধ্যে ক্রমিক গুরুত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই সমস্ত সীমিত ধর্মের শীর্ষদেশে অবস্থিত মানব-অন্তরাত্মার সনাতন ধর্ম বিভীষণকে বলীয়ান করিয়াছে। এ জন্য ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রতর ধর্মের বিরোধ বিভীষণ চরিত্রে নগণ্য।

মনস্বী পাঠক বর্তমান গ্রন্থের অনুসরণে অনেক চিন্তার খোরাক পাইবেন, অনেক সন্দেহ অতিক্রম করিতে পারিবেন এবং দেখিবেন, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির প্রথম সজীব আলেখ্য রামায়ণ মুখ্যত একই নিপুণ হাতের সৃষ্টি।

ক্রান্তদর্শী মহাকবি বাল্মীকি দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃসবিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

কালধর্মে দুর্ব্যাখ্যাবিষজর্জর এই মহাকাব্যের মালিন্যপ্রোঞ্ছনপূর্বক ইহাকে স্বীয় ভাস্বররূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেখক শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্যের এই পুণ্য প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

মাকরী পূর্ণিমা, ১৩৯৫ — শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

প্রাক-কথন

অমলেশ ভট্টাচার্যের 'রামায়ণ কথা' ছুঁয়ে আমি বিহ্বল হয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, তাঁর আবিশ্ব ব্যক্তিত্ব। যে-বিষয়কেই তিনি স্পর্শ করেন, হিরণদ্যোতনা অর্পণ করেন। দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই তাঁর এবারকার এষণা ও বিন্যাসের বিভাব: বাল্মীকির 'রামায়ণ'। বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনীয় অন্যতর প্রতিমান আর তো নেই। আমি এশিয়ার দূরান্তবিসারী গ্রামগ্রামান্তে গিয়ে, দেখেছি নাচে-গানে-লোকবৃত্তে আমাদের এই ভূখণ্ড উৎসায়িত প্রথম আদি মহাকাব্য সব জায়গায় আমাদের ভুবনজোড়া আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞান পত্র—ভিসা? —হয়ে আছে। কেন এটা সম্ভব, কী করে, তার নিরসন আমার হাতে নেই।

ইয়েটস কবেই বলে গিয়েছিলেন: প্রাচ্যের তো পরিণামী সমাধা আছেই, তাই তার কোনো ট্র্যাজিডিই নেই। আমার সতীর্থ অমলেশ ভট্টাচার্য, পক্ষান্তরে, দেখিয়েছেন আমাদের এই ভারত—মহাকাব্য—এক্ষেত্রে 'রামায়ণ'—বিষাদান্তক চেতনায় ভারাক্রান্ত। নিসর্গচেতনা কি প্রজাপালন, কি সংরক্ত প্রেমের চর্যায় কি আদিগন্ত কান্নার টানে এই মহাকাব্য আমাদের সমগ্র সত্তার কেন্দ্র ও প্রত্যন্ত জুড়ে চিরবিরাজিত। আমার বিদগ্ধ বন্ধু অমলেশ ভট্টাচার্যকে আমার আনত অভিনন্দন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অমৃতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ
The Lore of Mahabharata (2nd Edn.)
রামায়ণ কথা (৩য় সং)
রামায়ণ (হিন্দি)
মহাভারত (হিন্দি)
বেদমন্ত্র-মঞ্জরী
বেদাঙ্গবর্ণ
মর্ত্যেষু অমৃত
নিঃসঙ্গ আকাশ (কাব্যগ্রন্থ) ২য় সং
গান্ধর্বী
হরিপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধু (৩য় সং)
শ্রীঅরবিন্দ কথা
সেই কবে... (২য় সং)
ছোটদের শ্রীঅরবিন্দ (৫ম সং)
ছোটদের শ্রীমা (৫ম সং)
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম (৩য় সং)
অগ্নিবলয়
রবীন্দ্র বাণী-চয়ন
বন্দেমাতরম্ (২য় সং)
ধ্যান (৩য় সং)
হঠাৎ মনে পড়ে (১ম, ২য় পর্ব) হিন্দি ইংরেজি, বাংলা, উড়িয়া সংস্করণ
কথায় কথায় (১ম, ২য়, ৩য় পর্ব) হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, উড়িয়া সংস্করণ
I Remember
By The Way (1st, 2nd. 3rd part)

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

রামায়ণ কথা

এক

প্রস্তাবনা

মহাভারত যদি হয় ভারতবর্ষের ধীশক্তি, মেধা, মস্তিষ্ক--তাহলে রামায়ণ তার হৃদয়। মহাভারতের সৃজনপট বেদব্যাসের তপঃসিদ্ধ ধ্যানে, প্রজ্ঞার আলোতে, তার প্রতিটি চরণ যেন এক একটি ঋক্। রামায়ণের সৃষ্টি বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে, বাল্মীকির ব্যথিত হৃদয়ে, তার প্রতিটি চরণ যেন কবি-হৃদয়ের রক্তশোণিমা দিয়ে লেখা। শোক থেকেই শ্লোক। রামায়ণ চব্বিশ হাজার শ্লোকের একখানি সুরে বাঁধা তানপুরা। একটু স্পর্শেই ঝংকার ওঠে। যেন মীড়বাঁধা কোমলে-গান্ধারে—"সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্" (আদিকাণ্ড, ৪/৮)।

মহাভারতের মহিমার তুলনা কৈলাসচূড় হিমালয়—শিখরের পর শিখর, সানুব পর সানু, অটল মহিমান্বিত স্তব্ধতা, ধ্যানমৌন শিবের উন্নত শির। আর রামায়ণ? যেন শিবের জটায়-জড়িত জাহ্নবী—তরঙ্গের পর তরঙ্গ, উছলিত বিগলিত করুণাধারা। তাই রামায়ণের শুরুতেই আমরা শুনি হরহর গঙ্গার কলকল ধ্বনি। "তপোস্তেপে তপোধনা" (আদিকাণ্ড, ৩৫/১৯) গঙ্গার মাহাত্ম্য ও স্তোমস্তুতি—"পুণ্যাপুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি" (আদিকাণ্ড, ৪৩/৭)।

সৈষা সুরনদী রম্যা শৈলেন্দ্র তনয়া তদা।
সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাপা জলবাহিনী॥

(আদিকাণ্ড, ৩৫/২৩)

(এই সেই দেবনদী, অতি রমণীয়া হিমালয় কন্যা,
পাপনাশিনী পুলিনপ্রবাহিনী, স্বর্গলোকে
আরোহণ করেছিলেন।)

বিষ্ণুপাদচ্যুতাং দিব্যাং মহাপাপ প্রণাশিনীম্।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/২৪)

মহাভারত কৈলাস; রামায়ণ গঙ্গা। মহাভারত তপস্বী; রামায়ণ প্রেমিক। সে প্রেম তপস্যারই জ্যোতি। রামায়ণ আছে বলেই আমরা জানলাম, ভারতবর্ষ কেবল তার ব্রাহ্মীস্থিতিতে, তার তপস্যার রিক্ততায়, তার বৈরাগ্যের বৈভবে, তার অটল গাম্ভীর্যমূর্তিতেই স্থির নয়, ভারতবর্ষ আছে আবার তার তটস্থ গতিতে, তার প্রেমের ভক্তির ঐশ্বর্যে, তার স্মিত চঞ্চল হাস্যের মোহন মূর্তিতে। তাই ভারতবর্ষ যেমন তপস্বী, তেমনি আবার ভাবরসিক। তার জ্ঞান যেমন সন্ধিনী তেমনি হ্লাদিনী। ত্যাগকেও সে ভোগের আনন্দে উপচীত করে ধরতে পারে।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের ভাবমণ্ডলের দুই গোলার্ধ। একে অপরকে নিয়ে পূর্ণ

ও মহিমান্বিত। চিদ্‌ঘন যিনি, আনন্দঘনও তিনি। যে রাম সেই কৃষ্ণ। মহাভারত বলে, ভগবান আছেন, কিন্তু রামায়ণ বলে, ভগবান শুধু আছেন নয়, তিনি আসেন, তিনি ডাকেন, আমাদের মধ্যে আমাদেব মতো হয়ে ভালবাসেন। আনন্দ পান, দুঃখ পান। বাম তো স্বয়ং বিষ্ণু, কিন্তু তাঁর দুঃখ তাঁর ব্যথা সাধারণ দুঃখী মানুষেব চেয়েও বেশি। দেশের দরিদ্রতম মানুষটি পর্যন্ত যাঁর জন্য চোখের জল মোছে, সেই রাম কেবল বীর বলে নয়, রাজা বলে নয়, রামের দুঃখে যে পাষাণও কাঁদে, বজ্রেব হৃদয়ও দীর্ণ হয়—"গ্রাবো রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদযম্" (ভবভূতি, 'উত্তরবামচরিত', ১/২৮)। রাম মানুষ হয়ে মানুষের চেয়েও বেশি দুঃখ সয়ে, সকলেস্ব অন্তরেব দেবতা হয়ে উঠেছেন। "রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।" (শ্রীশ্রীচৈতন্যচারিতামৃত, পঞ্চম পরিচ্ছদ) দুঃখ রামের মধ্যে দেবতার বীর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিযাছেন।" [রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৬৬২ (৫)] শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "The Ramayana embodied for the Indian imagination its highest and tenderest human ideals of character." (—*The Foundations of Indian Culture, 1959, p. 331*) ভারতবাসীর কল্পনায় রামাযণ মানুষের চরিত্রের মধুরতম শ্রেষ্ঠতম আদর্শেব মূর্তি।

রামাযণ রচনাব আগে বাল্মীকি নারদকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এমন মানুষ কে আছে, যার মধ্যে সমগ্রা গুণলক্ষ্মী রূপ ধরেছেন?"

তখন নারদ বললেন, "এত গুণবান্ পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না। তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁর কথা বলি শোন।"

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্‌গুণৈর্‌যুতম্।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যোযুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥

করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত রামের জীবনকথা ভারতবাসীব হৃদয়ে পরম আদরে পরম ভালবাসায় চিরকালের জন্য ঠাঁই করে নিয়েছে। কিন্তু মানস সরোবরেব নীলপদ্মের মতো এমন যে রাম, তাঁকে বুক দিয়ে গ্রহণ করতে গেলে কোথায় যেন তীক্ষ্ণ কাঁটাব ব্যথা লাগে। যার হৃদয় আছে তাব কাছে রামের বালিবধ হয়তো সহ্য হতে পারে, কিন্তু সীতার নির্বাসন? সেই কাষায়বাসিনী "পরিপাণ্ডুদুর্বল কপোল-সুন্দব" সীতার মুখখানি মনে পড়লে রামকে আমাদের বড় নিষ্ঠুর মনে হয়। ভাবতে ভাল লাগে, উত্তরকাণ্ড না লেখা হলেই ছিল ভাল। অনেকে বলে থাকেন, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখা নয়। রাবণবধের পর যুদ্ধকাণ্ডের শেষে রামায়ণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, গ্রন্থের শেষেই সাধারণত গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়, তাতেই অনেকে অনুমান করেন, উত্তরকাণ্ড পরবর্তীকালে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। আদিকাণ্ডে নারদের বর্ণনাতেও সীতার বনবাসের উল্লেখ নেই। মহাভারতের বনপর্বে রাম উপাখ্যানেও সীতার নির্বাসন ও পাতাল প্রবেশের কথা নেই। মূল রামায়ণেও প্রথমে ছয় কাণ্ডের উল্লেখ করে অধিকন্তু হিসাবে উত্তরকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে—"ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্" (আদিকাণ্ড, ৪/২)। হয়তো কবি এইভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন, উত্তরকাণ্ড অনিবার্য হলেও উপসংহার মাত্র। উত্তরকাণ্ড যে রামায়ণেরই অংশ একথা যেন বলেও বলতে চান না। যথাস্থানে এই

প্রসঙ্গ আমরা একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করব। জীবনের মতো কাব্যও সুন্দর বটে, তবে সব সময় তা কোমল ফুলহার নয়। আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথেব কথা, "কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন।" একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, উত্তরকাণ্ডের রাম চরিত্রে মহত্ত্বে বীরত্বে গাম্ভীর্যে দৃঢ়তায় বাল্মীকিরই রাম।

সীতার দুর্নাম যখন রাজ্যের মধ্যে ক্ষ্যাপা কুকুরের বিষের মতো ছড়িয়ে পড়ল—"আর্লকং বিষমিব সর্বতঃ প্রসৃপ্তম্"—কোনো দৈব্যবাণী কোনো ঋষির শপথবাক্য, এমনকি অগ্নিতেও তা শোধন কবা গেল না, তখন সেই বিষকে রাম আপন অন্তরের দুঃখে দহন করে নিলেন। দুঃখেই সব বিষ দগ্ধ হয়। দুঃখ দিয়েই দুঃখ দূর করতে হয়—"দুঃখতৈর্দুখনির্বাপণানি" (ভবভূতি, 'উত্তররামচরিত' ৩/২৯)। সীতা নির্বাসনে সীতার যত দুঃখ, তার চেয়েও বেশি দুঃখ রামের। প্রেমের সেই দুঃখ রামের মুকুটে কোহিনূরের মতো জ্বলছে। বেদনার এই মহিমা সমস্ত সুখের মহিমাকে ম্লান করে দেয়। তাই আমাদের মন রামের প্রতি বিমুখ হয় না।

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরাধামে দুঃখ মহত্তম।

(—রবীন্দ্রনাথ)

তাই ভারতবাসীর কাছে অনেক পূজনীয় দেবতা আছেন, কিন্তু রামের মতো তাদের এমন প্রিয়তম কেউ নেই। ভারতবাসীর নিজেব ঘরের লোক এত আপন এত সত্য নয়, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাদেব যত আপন যত সত্য। তাই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ দ্বারা ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষ দ্বারা রামায়ণকে বুঝতে বলেছেন। বস্তুত ভারতবর্ষের আত্মকথা—হৃদয়েব কথা হল রামায়ণ; আর রামায়ণের কাব্যকথাই ভারতবর্ষ। ভাবতবাসীর জীবনে কোথায় সুখ, কোথায় দুঃখ, কিসে তাব ব্যথা, তার আনন্দ সেটা হৃদয় দিয়ে অনুভব না করলে রামায়ণের সৌন্দর্য ও তাৎপর্য সম্যক্ অনুধাবন কবা সম্ভব নয়। বামচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রীতির কল্যাণের ভালবাসার সত্যধৃতিব মানুষী বিগ্রহ। স্নি গ্ধ জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল মাধুরী। নারদ তাই রামচন্দ্রের বর্ণনা দিয়েছেন "নরচন্দ্রমাঃ" বলে। রাম নামেও রয়েছে সেই অর্থ। যা সবকিছুকে আনন্দ দেয়।

মহাভারতে বলেছে "যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ" (আদিপর্ব, ২/৩৯০)—এখানে যা নেই তা কোথাও নেই। অতি উর্দ্ধের ও ব্যাপক অর্থে একথা সত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজ মন নিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, সব আছে মানি, কিন্তু সারা মহাভারত খুঁজেও কি আমরা পাব লক্ষ্মণের ভরতের মতো ভাই? ভ্রাতৃভক্তির সেই উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা কি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যেও তত আছে? আছে কি এমন সমর্পিত ভক্তপ্রাণ মারুতি হনুমান? আছে কি এমন অন্তেবাসী রামভক্ত গুহ? মহাভারতে আর যাই থাক, নেই আমাদের অশ্রুবিধুরা "শরীরিণী বিরহব্যথেব করুণস্য মূর্তি" চিরদুখিনী সৌন্দর্য-লক্ষ্মী সীতা। প্রেম অশ্রু আর কারুণ্যে গড়া মৃন্ময়ী সেই দেবীপ্রতিমা। ভারতবাসীর হৃদয়ের উপকূলে একমাত্র অধিশ্বরী, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'উপকূলেশ্বরী সীতা।" (বঙ্কিম রচনাবলী, মৌসুমী ১৯৮৩, পৃ. ৩৮০)। মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থ আছে, কিন্তু কোথায় আমাদের সেই "পুণ্যোদ্যানা যশস্বিনী অযোধ্যা"?

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্ট সরযূতীরে প্রভুতধনধান্যবান্॥ ৫
অযোধ্যানামনগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্॥ ৬
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥ ৮

(আদিকাণ্ড, ৫/৫-৮)

(সরযূ নদীব তীরে কোশল নামে এক দেশ। বিশাল আয়তনের মহতী সমৃদ্ধিশালী ধনধান্যবান সতত সুখের অযোধ্যা নগবী। মানবশ্রেষ্ঠ মনু স্বয়ং যে নগরী নির্মাণ করেছিলেন। যার জলসিঞ্চিত রাজপথে সতত সুগন্ধী পুষ্পের শোভা।)

দিব্যগন্ধা এই পৃথিবীর যে এত রূপ আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে, হৃদয়ের গভীরে যে এত ব্যথা আছে, তা জানতে হলে মহাভারত নয়, আমাদের পড়তে হবে রামাযণ। ঋষি বাল্মীকি যেন তার ধ্যানের আঁখি উন্মীলিত কবে দুচোখ ভরে দেখেছেন, কাননদ্রুমা পত্রপল্লবে তরুলতায় পুষ্পে মধুপে নদী নির্ঝরিণী গিরিমালায় সেই অপরূপ সৌন্দর্য। শুধু নিজে দেখেন না, আমাদেরও ডেকে দেখান। সংসারে যা কিছু সুন্দর সুগন্ধ সুখকর, শ্যাম বনানী, ফুল্ল কুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি, নীলঘন মেঘ, মৃদুনিনাদিনী তটিনী, করি কুরঙ্গ বিহঙ্গকুল, সব কেমন রূপে রসে বর্ষণ-সিক্ত কদম্বের মতো শিহরিত হতে থাকে। আবার তার সঙ্গে মানবচিত্তবৃত্তির সবখানি আলোচ্ছায়া ব্যাকুল উদ্‌বেল হয়ে ভাসে। কখনো স্নেহমমতায় উথলিত, কখনো-বা শোকে দাহে দহিত। দুঃখে অশ্রুতে ঝুরিতে থাকে। কখনো আবার ক্রোধে দম্ভে রাক্ষসের মতো ফুলতে থাকে। জগৎ সংসার মনে হয় যেন অনলে-বাঁধা ঘর। এমনি করে রামায়ণে যা আছে মহাভারতে তা নেই।

মহাভারতের এই অপূর্ণতা বেদব্যাস নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। সমগ্র মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেও তাঁর প্রাণ ভরেনি। কিসের এক অতৃপ্তি অভাববোধ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন সেই মহাপুরুষ নিজেকে অসম্পন্ন বোধ করছিলেন। বিষণ্ণ মনে নির্জন সরস্বতী তীরে বসে তিনি ভাবতে লাগলেন, "আমার এমন কেন হল? ভগবানের হৃদয়ের কথা আমি কীর্তন করিনি বলে? তাই কী আমার মনে এই কষ্ট? তস্যৈবং খিলমাত্মনং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ?" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৪/৩১)

নির্জনে চিন্তিত বেদব্যাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন দেবর্ষি নারদ।

—"পরাশরতনয়, তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখছি কেন? নিখিল ভুবনের সকল তত্ত্বসার নিয়ে তুমি মহাভারত রচনা করেছ। ব্রহ্মসূত্র লিখে ব্রহ্মের বিচার ও মীমাংসা করেছ। ব্রহ্মকে সাক্ষাতও করেছ। তবু এমন অকৃতী ব্যক্তির মতো শোকার্ত হয়ে বসে আছ কেন? তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব?" (শ্রীমদ্ভাগবত. ৫/৪)

—"দেবর্ষি, আপনি যা বললেন তা সবই ঠিক। কিন্তু আমার আত্মা তৃপ্তিলাভ করতে পারছে না। নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।"

তখন নারদ বললেন, "মহর্ষি, তুমি ধর্ম ও তপস্যার কথা এত বলেছ। কিন্তু ভগবানের হৃদয়ের মহিমা তো বর্ণনা কবনি। কেবল ধর্মের তপস্যার কথা তো নিতান্ত কাকতীর্থ।

("তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি"), মানস সরোবরের রাজহংস সেখানে আসে না। তুমি ভগবানের হৃদয়ের মহিমা, তাঁর নির্মল যশোগান কীর্তন কর।"

বেদব্যাস তখন রচনা করলেন শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারতের হৃদয়। সংকীর্ণ পরিসরের "কাকতীর্থ" নয়, নির্মল ব্রহ্মমানসের মানসসরোবর।

বাল্মীকিও তেমনি তমসা নদীর তীরে নির্জন তপোবনে হৃদয়ের সিদ্ধাসনে তাঁর সাধনার আসন পেতেছেন। জগৎকে দেখেছেন হৃদয় দিয়ে—"হৃদ আ বি চষ্টে" (ঋগ্বেদ, ১-২৪-১২)। হৃদয়ের গভীর দিয়ে তিনি পথ করে চলেন। তন্ময় ধ্যানের তক্ষণে রূপ ফুটিয়ে তোলেন—"হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু" (ঋগ্বেদ, ১০-৭১-৮)

একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন বাল্মীকির তপোবনে। তমসা নদীর তীরে তরুপল্লবিত মনোরম সেই আশ্রম। চিরবসন্ত বিরাজ করে। নারদের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে উপবিষ্ট বাল্মীকি।

ঋষির মানসপটে সোনার জলছবিতে আঁকা এক মধুর স্মৃতি। অনেক দিন আগে গিয়েছিলেন একবার বৈকুণ্ঠে। পারিজাত পুষ্পশোভিত কল্পবৃক্ষের ছায়ায় ঘেরা নৈঃশ্রেয়স কানন। চন্দ্রালোকে আলোকিত সেই আনন্দধাম। পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের কণ্ঠের সুমঙ্গল গীতে মধুর হয়ে আছে মন্দার বাতাস। সেখানে নারদ বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন না। লক্ষ্মীকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন সেখানে বিরাজ করছেন চারি মূর্তি। ধনুর্ধর, হাস্যময়, নয়নাভিরাম। আর রয়েছেন শ্রীলক্ষ্মীর মতো মনোরমা এক নারী।

নারদ তখন বিস্মিত হয়ে গেলেন কৈলাসে শিবের কাছে। বললেন গোলোকে আজ চতুর্ভুজ নারায়ণকে দেখলাম না। দেখলাম ধনুর্ধারী চার মূর্তি আর যোগমায়ার ন্যায় কমনীয়া এক নারী।

কৈলাসপতি শিব বললেন, ভগবান এইরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হবেন। ধরাতলে সত্য ও ধর্ম যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, বেদমন্ত্র বিস্মৃত হয়ে যায়, তখন ব্রহ্মা ও দেবগণ ক্ষীর সাগরের কূলে গিয়ে অখিল ভুবনের আশ্রয় সর্বেশ্বর হরির স্তব করতে থাকেন। শ্রীহরি তখন আশ্বাস দেন, অচিরেই তিনি চার অংশে বিভক্ত হয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করবেন।...

ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে বাল্মীকি শুনছেন দেবর্ষি নারদের কথা। রাম নাম মহামন্ত্র। উমাপতি মহেশ এই মন্ত্র জপ করেন। এ-নাম চতুর্বর্গফলপ্রদ। ইহ লোকে আয়ুষ্কর ও যশস্কর। সর্বসুখপ্রদ রাম নাম পরম রমণীয়। মোক্ষ-মুক্তিদায়ী। মধুর সংক্ষিপ্ত ধ্বনিময় ওই নাম। স্বয়ং রামের চেয়েও রামনাম শ্রেষ্ঠ। নামীর চেয়ে নাম বড়। এই নামের মাহাত্ম্য বেদের সমান—" বেদৈশ্চ সম্মিতম" (আদিকাণ্ড, ১/৯৮)।

নারদ বলে চলেছেন রামের মাহাত্ম্য ও জীবনকথা। ইক্ষ্বাকু বংশের দশরথের পুত্ররূপে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। পৃথিবীর পাপ ও অসুর বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন নররূপে। আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, উন্নত শির, শঙ্খের মতো গ্রীবা, পদ্মপলাশ তার আঁখি। কান্তিমান বুদ্ধিমান ধীর সমদর্শী। ধর্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ সত্যসন্ধ যশস্বী ও জ্ঞানী। শুদ্ধাচারী বিনীত এবং স্থিরচিত্ত। তিনি আকাশের মতো মহান্, হিমালয়ের মতো অটল, সমুদ্রের মতো গম্ভীর। পূর্ণ-চন্দ্রের মতো তাঁর শোভা। অগ্নির মতো প্রজ্বলন্ত তাঁর বীর্য। অসীম ক্ষমায় তিনি পৃথিবীর মতো।...

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিযতাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥
বুদ্ধিমান নীতিমান বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ
বিপুলাংসো মহাবাহু কম্বুগ্রীবো মহাহনূঃ॥
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সু শিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ॥
সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্ছুভলক্ষণ॥
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্॥
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা॥
রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদ চ নিষ্ঠিতঃ॥
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান প্রতিভাবান্।
সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ॥
সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্য সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ॥
স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেন হিমবানিব॥
বিষ্ণুণা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥

(আদিকাণ্ড, ১/৮-১৮)

আদ্যপান্ত রামায়ণ সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন নারদ। বললেন, রামরাজ্যে প্রজাগণ সবাই হবে সুখী সন্তুষ্ট আনন্দিত। রোগ দারিদ্র্য ক্ষুধা ভয় কিছু থাকবে না। শ্রীহীন গুণহীন কেউ হবে না। যশ সৌভাগ্যলক্ষ্মী সতত বিরাজ করবে। ধর্ম সত্য ও পুণ্যে মহিমান্বিত হবে।

নারদেব কণ্ঠবীণায় সপ্তস্বরে ঝংকৃত হয়ে উঠল সমগ্র রামায়ণ। অথচ কত সংক্ষিপ্ত! মাত্র একশত শ্লোকে। সুরের একটি তানে যেমন সমগ্র রাগমালার ছন্দঝংকার কাঁপতে থাকে, তেমনি বাল্মীকির অন্তরে রামের জীবনকথা রণিত হতে লাগল।

আশীর্বাদ করে দেবর্ষি নারদ বিদায় নিলেন।...

আর বাল্মীকি নিভৃত তপোবনে বসে রামায়ণ কথা ধ্যান করতে লাগলেন...

রাত ভোর হল।

উষার অরুণ রাগে পূর্বাচল আরক্তিম।

মলয়পবনে ভাসে দেবতার মুখের সুরভি। দিক্ সব প্রসন্ন। তপোবনের তরুপল্লবে পুষ্পলতায় পাখির কলকাকলি। তমসা নদীর শীতল জলে প্রভাতের প্রথম আলো ঝলমল করছে। সাধুপুরুষদের অন্তঃকরণের মতো প্রসন্ন নির্মল স্বচ্ছ সেই তমসার জল—"রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা" (আদিকাণ্ড, ২/৫)। আশ্রমের অদূরে এক নীল সরোবর। তার উপকূলে বৃক্ষশাখায় অসংখ্য ক্রৌঞ্চপক্ষীর কলরব।

সেই শান্ত সকালে আশ্রম তরুছায়ায় পথ দিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি চলেছেন আপন মনে তমসা নদীর দিকে। পিছনে চলেছেন অনুগত শিষ্য ভরদ্বাজ। গভীর মন্ত্রময় নিসর্গ পরিবেশ।

মুগ্ধ বিস্ময়ে বাল্মীকি সেই নদী বনানীর শোভা দেখছেন, "ভরদ্বাজ, এখানে নদীর ঘাটে তোমার হাতের কলস রাখো। আমাকে বল্কল দাও। এই স্বচ্ছতোয়া জলে আমি স্নান করব।

ভরদ্বাজ তাঁর হাতে বল্কলটি দিলেন।

ঋষি এগিয়ে চলেছেন।

মাথার উপর প্রণয়কলস্বরে উড়ছে একটি ক্রৌঞ্চমিথুন।

স্নেহদৃষ্টিতে ঋষি এই উড়ন্ত পাখি দুটির লীলাবিভঙ্গ দেখছেন।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। এ কী? শান্ত প্রভাতের হৃদয় চিরে তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠল। রক্তাক্ত শরবিদ্ধ এক ক্রৌঞ্চ তাঁর সামনে পড়ে ছটফট করছে। আর মাথার উপরে চক্রাকারে উড়ে উড়ে করুণস্বরে বিলাপ করছে ওই ক্রৌঞ্চী। এমন সময় অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে ছুটে এল ধনুর্বাণ হাতে এক ব্যাধ।

বাল্মীকির প্রাণ কেঁদে উঠল।

ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে অভিভূত তিনি

সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর নিষাদ।

আবেগে ঋষির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল অভিশাপ বাক্য—

> মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥
> (ওরে নিষাদ, কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের
> মধ্যে এই ক্রৌঞ্চকে তুই বধ করেছিস।
> চিরকাল তোর আর কল্যাণ হবে না।)

একটু পরে বাল্মীকি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ আমি কী বললাম? আমার শোকাহত অন্তর থেকে এমন মিতাক্ষরা ছন্দবদ্ধ তন্ত্রীলয় সমন্বিত বাক্য নির্গত হল কেমন করে? আমার শোকার্ত হৃদয় থেকে এসেছে এই শ্লোক—"শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু"। (আদিকাণ্ড, ২/১৮)

স্নান করে ভাবতে-ভাবতে আশ্রমে ফিরে এলেন। মনে বড় বিষাদ। এমন করে প্রাণ কাঁদে কেন? শুধু বুকের মধ্যে বাঙ্ময় ধ্বনি হয়ে কম্পিত হতে থাকে সেই অপূর্ব স্বরাক্ষরা শ্লোকমূর্ছনা।

তখন স্বয়ং ব্রহ্মা এসে বললেন, "এমন উদাস হয়ে ভাবছে কেন? আমার ইচ্ছাতেই তোমার কণ্ঠে ওই সারস্বত বাণী নির্গত হয়েছে। নারদের কাছে তুমি রামের যে জীবনমাহাত্ম্য শুনেছ এই শ্লোকে তাই প্রকাশ কর। জগতে কিছুই তোমার কাছে অবিদিত থাকবে না। তুমি

যা লিখবে তাই সত্য হবে। যতকাল পৃথিবীতে নদনদী পর্বত স্থাবর জঙ্গম থাকবে ততকাল তোমার রচিত রামায়ণ কথা ও তোমার কীর্তি অমর হয়ে থাকবে।"

কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বং তৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।।

(আদিকাণ্ড, ২/৩৬-৩৭)

ব্রহ্মার আশীর্বাদে বাল্মীকির সকল সত্তা রোমাঞ্চিত হল। তিনি ধ্যানাসনে যোগমগ্ন হলেন। তাঁর অন্তরে যোগদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রামের সমস্ত জীবনকাহিনি। রচিত হল "চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানাম তথা সর্গ-শতান্ পঞ্চষট্ কান্ডানি তথোত্তরম্।" (আদিকাণ্ড ৪/২) ভগবান বাল্মীকির বাক্‌চৈতন্যের প্রকাশ এই রামায়ণ—"ভগবতো বাল্মীকেঃ স্বরস্বতীনিষ্যন্দঃ" (ভবভূতি, 'উত্তররামচরিত', ৬/৩১)

সেই দিন থেকে হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিটি ভারতবাসীব অন্তরে অনাহত রাগিণীতে ধ্বনিত হয়ে চলেছে এই গান। ভারতের হৃদয়ের কান্তিময় শ্রীময় মধুময় বাণী। তার বুকের সবটুকু নিঃশ্বাসে ভরা অন্তরের কথা। ভারতবর্ষের প্রতিটি বৃক্ষলতা, পুষ্পিত বনবিতান, তটিনীনির্ঝরিণীর কলতান, তার জীবজন্তু বনের পাখিটি পর্যন্ত, শীতে বসন্তে বর্ষায়, ঋতুচক্রের আবর্তে-আবর্তে, তাদের কত-না-রূপ, কত কথা, কত ব্যথা, হৃদয়-উথলিত ভাষায় ফুটে উঠেছে।

চেতনার একমুখে স্মৃতি, আর এক মুখে কল্পনা। স্মৃতি আহরণ করে সন্নিবেশ করে অতীতকে, আর কল্পনা চয়ন করে আনে অনাগত ভবিষ্যৎকে। ভারতের সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কবিচিত্তে সমাহিত হয়ে নির্মিত হয়েছে তার শাশ্বত রূপ। এক রূপে মহাভারত, আর এক রূপে রামায়ণ। একটি 'শ্রুতিজ্যোৎস্না'-ভরা ইতিহাস; আর একটি ধ্বনিগম্ভীরা মহাকাব্য। এই দুইটি ভাবজগৎ নিয়ে ভারতের সকল ভুবন ভরা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "the ensouled image of a great culture". *(The Foundations of Indian Culture, 1959, p. 334)*।

কিন্তু ধ্যান ও বাণী, তপস্যা ও প্রেম, সিদ্ধি ও ভক্তি মিলিয়েও ভারতবর্ষের পূর্ণ রহস্যের সন্ধান মেলে না। রামায়ণ ও মহাভারতের সকল কথা বলা হয়ে গেলেও ভারতের অধ্যাত্মরহস্য কিছু থেকেই যায়। শ্রীকৃষ্ণের নয়নের দৃষ্টির মতোই তা কাছে এসেও দূরে। যেমন যশোদা একদিন বালগোপালকে তাঁর কেশবন্ধনী দিয়ে বাঁধতে গেলেন, যতবারই চেষ্টা করেন, বাঁধনের দড়ি কিছু কম পড়ে, কিছুতেই তাকে বাঁধা যায় না—'তৎ দাম দ্ব্যঙ্গুলোনম্ অভুৎ' (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০-৯-১৫)। তেমনি মহাভারত এবং রামায়ণ এই দুই সোনার রাখী দিয়েও ভারতের সম্পূর্ণ রহস্যকে ধরা যায় না। কিছুটা অব্যক্ত অগোচর থেকেই যায়। সেখানেই ভারতের নিগূঢ় অধ্যাত্ম রহস্য—তার 'বেদরহস্য'।

কিন্তু সেই রহস্য এসে আপনি ধরা দেয়, যেমন বালক কৃষ্ণ নিজে ধরা দিয়েছিলেন—"কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০-৯-১৮)। ভারতের ভাবজগতের গভীরে

রয়েছে তার ভাগবত হৃদয়—হৃদা মনীষা—তাই দিয়েই তার রহস্যের পার পাও‌া যায়। ধরা-অধরার সেই আনন্দগ্রন্থি। সেই অদৃশ্য মৃণালেই রামায়ণ ও মহাভারতের লীলাপদ্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামায়ণের মধ্যে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।"

সে পাওয়া কি? সে পাওয়া কেমন? স্থূলের আবেষ্টনে হাতের মধ্যে যে পাওয়া সে ঠিক পাওয়া নয়। জীবনকে জীবনের সারসত্তাকে পাওয়ার প্রকৃষ্ট প্রণালী হল সাধনা, তপস্যা। রামায়ণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আপন তপস্যা দিয়ে নিজেকে পেয়েছে। প্রেমের তপস্যা, ত্যাগের তপস্যা, দুঃখের তপস্যা। রামায়ণের মধ্যে ভারতবর্ষ তার কল্যাণ তার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

দুই

রামের দীক্ষা

সৌন্দর্যে বৈভবে তপস্যার মূর্তসিদ্ধি এই অযোধ্যা নগরী। 'সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি'' (আদিকাণ্ড, ৫/১৯)। যেন মর্ত্যের অমরাবতী। কত বন উপবন আম্রকানন, ঘন বনবীথি ঘেরা সবুজ অরণ্যমেখলা। অদূরে কলকল্লোলে প্রবাহিত স্বচ্ছধারা সরযূ। শিবধাম কৈলাসে ব্রহ্মার মানস-সরোবর থেকে নিঃসৃত এই নদী। তাই নাম সরযূ নদী। পুষ্পিত কানন ঘেরা এই অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ, তিন যোজন বিস্তৃত। চারিদিকে গহিন জলের দুর্গম পরিখা। শত শতঘ্নী আয়ুধে উন্নত তোরণে সুদৃঢ় কপাটে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। বিপুল সৈন্যে সুরক্ষিত। শত্রুর পক্ষে অপ্রবেশ্য যেন সিংহের গুহা। সুরম্য রাজপথ, মহাপথ। নিত্যজলসিক্ত, পুষ্পশোভিত। সূত মাগধের মঙ্গল গীতি। দুন্দুভি মৃদঙ্গের ধ্বনি। সুশোভন পুরী, উচ্চ প্রাসাদ, প্রভান্বিত ধ্বজা। দেবতার স্বপ্ন নিয়ে আলো বাতাসে ভাসছে ওই অযোধ্যা নগরী।

পুরবাসী সকলেই আনন্দিত। ধর্মপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞ। আপন আপন বিত্তে সন্তুষ্ট। জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ সত্যাশ্রয়ী। সকলেই স্বাস্থ্যবান আয়ুষ্মান, কুণ্ডল-মুকুট-মাল্যধারী, পরিচ্ছন্ন বেশ, চন্দনবাসিত অঙ্গ।

নাস্তিক মিথ্যাবাদী অল্পশিক্ষিত ব্রতহীন কেউ নেই। নেই নিন্দুক পরশ্রীকাতর কুৎসিত কুরূপ কি বিকলাঙ্গ।

ধন-ধান্যে, রত্ন-ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্য-পুণ্যে, জ্ঞান-শক্তিতে, দান-দাক্ষিণ্যে অতুলনীয়া এই অযোধ্যা। যার আকাশে মহিমা, বাতাসে শান্তি, জলে মধু:

রত্নমণ্ডিত অযোধ্যার রাজসভা।

পাত্র মিত্র অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা দশরথ সিংহাসনে বসে আছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব তিনি। মহত্ত্বে মনুর সমান। বেদজ্ঞ শাস্ত্রবিশারদ মহাতেজা দীর্ঘদর্শী। তেজে ও ঐশ্বর্যে তিনি ইন্দ্র ও কুবের। সত্য ও ধর্ম-শীলতায় মহর্ষিকল্প। জগতে তাঁর কোনো শত্রু নেই। তিনিও কারো সঙ্গে শত্রুতা করেন না। হৃদয়বান্ জিতেন্দ্রিয় রাজর্ষি দশরথ—

..বেদবিৎ সর্বসংগ্রহ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপর্দাপ্রিয়ঃ ॥
ইক্ষ্বাকুণামতিরথো যজ্বা ধর্মপরো বশী।
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥

(আদিকাণ্ড, ৬/১-৩)

এমন যে রাজা, তাঁকে আমরা জেনে আসছি বৃদ্ধ দুর্বলচিত্ত স্ত্রৈণ বলে। যে দুঃসময়ে ঘটনার দুর্বিপাকে তাঁর এই অপবাদ, সেই পরিস্থিতি কি আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝে দেখি? শুধু হৃদয়হীনতা আর জনশ্রুতি দশরথকে নিন্দিত করেছে। কেবল বিচারহীন জনতার ক্ষুব্ধ মন নিয়ে আমরা এই নিষ্পাপ রাজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলি, এই স্ত্রৈণ দুর্বলচিত বৃদ্ধ রামায়ণের সকল দুর্ভাগ্যের কারণ। তাঁর দুর্বল স্নেহ আর নিষ্ফল অশ্রুপাত রামায়ণের কারুণ্যকে করেছে মেলো-ড্রামা। কিন্তু তাই কি? আর তো বেশি দেরি নেই। দশরথের সেই দুর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে আসছে। দ্বিতীয় কাণ্ডের শুরুতেই সকল উৎসবের রাজসমারোহের মধ্যেই অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে তাঁর বুকে এসে আছড়ে পড়বে বিষাক্ত কালকেউটের ছোবল। তার নীল বিষে সোনার অযোধ্যা বিবর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন এমন হল? হঠাৎ কোন উল্কার আগুনে এমন করে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল কেন?

সেকি দশরথের দোষ? দুর্ভাগ্য? না, ভবিতব্য? সেই কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা ভেবে দেখব, যা তিনি কোনোদিন চাননি, তাই কেন হল? ভাগ্য যদি মন্দ হয়, বিধি যদি বাম হয়, তাহলে হাতের ফুলমালা ভুজঙ্গ হয়ে ওঠে। প্রিয়তমা স্ত্রী কেউটের মতো ছোবল মারে। সুমুখ হয় দুর্মুখ। আশীর্বাদ অভিশাপ। মঙ্গলের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে অমঙ্গলের কালো ছায়া। যা যাবার তা যায়। কেউ ধরে রাখতে পাবে না। দশরথ কি করবেন? তাঁর পিতৃস্নেহের তাপিত বক্ষে এত শক্তি নেই যে তিনি রামকে ধরে রাখবেন।

আমরা অধৈর্য। মানুষের দোষ খুঁজি তার কাজে। কিন্তু কার্যের পিছনে থাকে কারণ। কারণের পিছনে থাকে আরো সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম সব কারণ। যা দেখা যায় না, যা অদৃষ্ট, তাকেই বলা হয় দৈব। আমরা তাই না-দেখে না-বুঝে দশরথের চরিত্রহনন করি।

কিন্তু পাঠক বিভ্রান্ত হলেও কবি কখনো ভুল করেননি। বাল্মীকির কাছে দশরথ চিরকালই "যথাপুরস্তান্মনুনা মানবেন্দ্রেণ ধীমতা" (আদিকাণ্ড, ৬/২০)—প্রাচীন যুগের মনুর মতোই দশরথ মানবশ্রেষ্ঠ ধীমান্। তিনি ধর্মাত্মা, আকাশের মতো নিষ্কলঙ্ক—"ধর্মাত্মা...আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/৯)

রাজাকে ঘিরে রাজসভায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বসে আছেন আটজন মন্ত্রী—ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র। তেজ ক্ষমা ও যশের অধিকারী। প্রত্যেকেই উদার বুদ্ধিমান ব্যবহারনিপুণ এবং ইঙ্গিতজ্ঞ। সুমন্ত্র হলেন প্রধানমন্ত্রী ("সুমন্ত্রংমন্ত্রিসত্তমম্"—আদিকাণ্ড, ৮/৪)। তিনি অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রামায়ণের প্রতিটি সংকটমুহূর্তে দেখি এই সুমন্ত্র রয়েছেন চির অনলস, সেবক সখা ও সচিব। বিশ্বস্ত কর্মে ধীর ব্যক্তিত্বে নিকষিত কনকরেখার মতো। রঘুবংশে সুমন্ত্রের মতো বন্ধু আর দ্বিতীয় নেই। বনবাসে যাওয়ার সময় রামের একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য সুমন্ত্রের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে ধরেছে—"ইক্ষ্বাকূণাং ত্বয়াতুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে" (অযোধ্যাকাণ্ড ৫২/২২)।

দশরথের অষ্টনিধি মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে আছেন আরও সাতজন ঋষি—সুযজ্ঞ, জাবালি, কশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন। এই সপ্তঋষি তাঁদের হোমহুতাশন তপস্যা নিয়ে অযোধ্যায় মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত। তাঁরা ছাড়াও রয়েছেন রাজার প্রধান দুই পুরোহিত বশিষ্ঠ ও বামদেব। দশরথের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের দুই উন্মীলিত চক্ষু—"নরেন্দ্রস্য জাগ্রতো নয়চক্ষুষা" (আদিপর্ব, ৭/১৬)।

গন্ধে মাল্যে ভূষিত অমাত্যগণ বসে আছেন। প্রজাদের জয়ধ্বনি থেকে থেকে দুন্দুভির মতো ধ্বনিত হচ্ছে। সালংকারা সুন্দরী রমণী শুভ্রচামর দুলিয়ে দশরথের হেম মুকুটে ব্যজন করছে। মুকুটের হীরামুক্তা নক্ষত্রের মতো জ্বলছে। রমণীর হাতের বলযকঙ্কনে মৃদু শিঞ্জন উঠছে। রাজার দুইপাশে যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো বসে আছেন বশিষ্ঠ ও বামদেব। পুষ্পে ধূপে চন্দনে গন্ধে আমোদিত সভাকক্ষ।...

এমন সময় দৌবারিক এসে সংবাদ দিল, "মহারাজ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

রাজা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

বশিষ্ঠের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "মহর্ষি আপনার শুভাগমনে আমরা ধন্য। আপনার আগমন সুপ্রভাতের মতো ("সুপ্রভাতা নিশা মম")। আপনাকে দেখে আমরা তীর্থদর্শনের পুণ্যলাভ করছি। আজ্ঞা করুন, আপনার অভীষ্ট পালন করব।"

পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্কে সমাদৃত হয়ে প্রসন্ন মনে বিশ্বামিত্র বললেন, "মহারাজ, ইক্ষ্বাকুরাজবংশের আপনি গৌরব। মহর্ষি বশিষ্ঠ আপনার পুরোহিত। তাই এমন শিষ্ট ও মার্জিত আপনার আচরণ। আমার একটি প্রার্থনা আছে, আপনি পূর্ণ করুন।"

—"প্রার্থনা নয়, আদেশ বলুন।"

—"রাক্ষসেরা আমার যজ্ঞস্থলে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। যজ্ঞে দীক্ষিত থাকায় আমি তাদের অভিশাপ দিতে পারি না। রাক্ষস মারীচ আর সুবাহু, সঙ্গে তাদের বিকট বাহিনী। তাই আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে দশ দিনের জন্য আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন। রাক্ষস নিধন করে রাম আমার যজ্ঞ রক্ষা করবে। অন্তরের দিব্য প্রভায় রাম তেজস্বী। তার কল্যাণ হবে। রামের যশ ত্রিলোকবিশ্রুত হবে। আপনারও মঙ্গল হবে।"

শুনে দশরথ ভীত হলেন।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু মহর্ষি, রাম যে এখনো বালক। মাত্র পনেরো বৎসর তার বয়স। ভাল করে যুদ্ধবিদ্যাও শেখেনি। সে কি করে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? রাক্ষসেরা ক্রূর, সংখ্যায় অসংখ্য, তারা কপট, মায়াযুদ্ধে নিপুণ। তারা যে কি ভয়ংকর আপনি জানেন।"

—"জানি, মহারাজ। রাক্ষসরাজ রাবণ পুলস্তের বংশধর। বিশ্রবা মুনির পুত্র। অতি নিষ্ঠুর, অতি ভয়ংকর। উৎকট তপস্যা করে সে ব্রহ্মার বর লাভ করেছে। দেব দানবের অজেয় সে। রাবণ স্বর্গে দেবতাদের মধ্যেও ত্রাস সৃষ্টি করেছে। মারীচ আর সুবাহু তারই অনুচর। ঋষিদের যজ্ঞধ্বংস করতে রাবণই তাদের পাঠিয়ে দেয়।"

—"আর আপনি সেই স্বর্গত্রাস ভয়ংকর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিয়ে যেতে চান আমার বালক পুত্র রামচন্দ্রকে? না, মহর্ষি। আপনি রামের প্রতি প্রসন্ন হন। যমতুল্য ওই রাক্ষসদের সামনে আমার রাজীবলোচন রামকে কিছুতেই পাঠাতে পারব না। বরং আপনি অনুমতি করুন, আমি যাব আমার অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে আপনার যজ্ঞ রক্ষা করতে।"

—"তার প্রয়োজন নেই, মহারাজ। আমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন নিজেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছেন। রঘুবংশের নামে কলঙ্ক দিয়ে মিথ্যাবাদী হয়ে আপনি বন্ধুদের নিয়ে সুখে থাকুন। আমি চলে যাচ্ছি।"

বিশ্বামিত্রের ক্রোধে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। দেবগণও ভীত হলেন। নিদারুণ আশঙ্কায় জগৎসংসার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল...

তখন বশিষ্ঠ দশরথকে বললেন, "মহারাজ, আপনি মূর্তিমান ধর্ম। আপনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবেন না। রাম বালক হোক আর যুদ্ধে অপটু হোক, সে জন্য কোনো শঙ্কা করবেন না। অগ্নি যেমন অমৃতকে রক্ষা করে, মহাতপা বিশ্বামিত্র তেমনি রামকে রক্ষা করবেন। তিনি যাবতীয় অস্ত্রের মন্ত্রগোপ্তা। দেব গন্ধর্ব রাক্ষস কিন্নর কেউ সেই সব অমোঘ অস্ত্রের সন্ধান জানে না। কোনো দিন জানতেও পারবে না। সুতরাং রামের জন্য আপনার কোনো ভাবনা নেই।"

বশিষ্ঠের বাক্যে দশরথ আশ্বস্ত হলেন।

তিনি সানন্দে রামকে অন্তঃপুর থেকে ডেকে পাঠালেন।

রাম-লক্ষ্মণ এসে প্রণত হয়ে দাঁড়ালেন।

এই প্রথম আমরা রামকে দেখছি। নবলকিশোর, নবদুর্বাদলশ্যাম। স্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা মুখে জগতের সকল পুণ্যরাশি। সকল গুণের সকল শক্তির সঞ্চয়। পদ্মপলাশ আঁখির দৃষ্টি যেন মূর্ত মহোৎসব। পাশে দাঁড়িয়ে কাকপক্ষ ধনুর্ধারী অভিন্নহৃদয় লক্ষ্মণ। ধ্বনির সঙ্গে যেমন থাকে প্রতিধ্বনি; যশের সঙ্গে যেমন গৌরব, উজ্জ্বল অস্ত্রের সঙ্গে যেমন থাকে তীক্ষ্ণদীপ্তি; তেমনি রামের পাশে লক্ষ্মণ। রামের বহিঃস্থিত আত্মা যেন সে। লক্ষ্মণ কাছে না থাকলে রামের ঘুম হয় না। সুখাদ্যে রুচি হয় না।

...বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ।
ন চ তেন বিনা নিদ্রাংলভতে পুরুষোত্তমঃ॥
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা।

(আদিকাণ্ড, ১৮/৩০-৩১)

বশিষ্ঠ মঙ্গলমন্ত্রে রাম-লক্ষ্মণকে অভিমন্ত্রিত করলেন।

দশরথ দিলেন সস্নেহ আশীর্বাদ।

ধনুষ্পাণি সালংকৃত দুই রাজকুমার চলেছেন বিশ্বামিত্রের পিছনে। যেন অচিন্ত্যশক্তি রুদ্রকে অনুসরণ করে চলেছেন অগ্নিপুত্র স্কন্দ ও বিশাখ।

ঋষির সেই গমনপথের চরণরেখা ধরে এখন রামায়ণ কথার গতিসঞ্চার হল। সোনার তন্তুজালে ঘটনা এবার ঘনিয়ে উঠবে। দেবতা ও অসুরের সেই চিরন্তন সংগ্রাম। রামায়ণ গানের ধ্রুবপদ।

অরণ্যের ভয়াল অন্ধকারে লুকিয়ে ওত পেতে রয়েছে রাবণের অনুচর মারীচ আর সুবাহু। আর তাদের অগণিত ক্ষুধিত রাক্ষস। ঘোরা বিকটদশনা ভয়ালকানী রাক্ষসী তাড়কা। কিন্তু এই তাড়কা আগে ছিল এক সুন্দরী যক্ষিণী। শুদ্ধাচারী কঠোর তপস্বী সুকেতুর কন্যা। সুকেতুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা আশীর্বাদ করেন। ব্রহ্মার বরে জন্ম নিল তার অতুলনীয়া এক সুন্দরী কন্যা। জম্ভের পুত্র সুন্দের সঙ্গে তার বিবাহ হল। এই যক্ষিণীর পুত্র মারীচ।

একদিন মারীচের পিতা সুন্দ কোনো এক অপরাধে অগস্ত্য ঋষির অভিশাপে নিহত হয়। তখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধে ক্রুদ্ধ মারীচ অগস্ত্যের আশ্রম আক্রমণ করে। যক্ষিণীও ছুটে যায় স্বামীহন্তা অগস্ত্য ঋষিকে বধ করতে। বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য সমাবৃত অগস্ত্যের আশ্রম তারা ধ্বংস করে দেয়।

অগস্ত্য ঋষি তখন তাদের অভিশাপ দেন, "তোমরাও রাক্ষস হও। রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি।" (আদিকাণ্ড, ২৫/১২)

সেই থেকে মাবীচ ও তার মাতা যক্ষিণী হয়ে গেল ঘোর দর্শন রাক্ষস রাক্ষসী। অগস্ত্যের পুণ্যাশ্রম হয়ে গেল রাক্ষস সমাকীর্ণ ভয়ংকর তাড়কাবন। কোনো লোকালয় নেই। দিনের বেলায়ও কেউ সেই অন্ধকার বনেব দিকে যায় না। ঋষি বিদ্বেষী যজ্ঞধ্বংসকারী মারীচ আর তাড়কার অত্যাচারে মলদ ও কবূষ নামে দুটি সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশান অরণ্যে পরিণত হল। (আদিকাণ্ড, ২৫ সর্গ)

দুটি সবুজ প্রাণের শিখা রাম আর লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র ঋষিকে অনুসরণ করে চলেছে সেই অরণ্যপথের সংকট যাত্রায়। জগতে হিংসা কি তারা এখনো জানে না। মানুষের কুৎসিত করাল দৃষ্টি তারা এখনো দেখেনি।

অনেক দূর চলে এসেছেন তারা।...

প্রায় অর্ধ-যোজন পথ হেঁটে এসেছেন।...

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর।...

পিছনে দেখা যায় শ্যামগম্ভীর অস্পষ্ট রেখায় চিত্রিত অযোধ্যা। দুই পাশে সবুজ প্রান্তর। সামনে ওই সরযূ নদী। সরযূব দক্ষিণ তীরে এসে দাঁড়ালেন বিশ্বামিত্র।...

নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন ঋষি।...

এতটা পথ কেউ কোনো কথা বলেননি।...

আমরা রাম লক্ষ্মণকে দেখেছি, কিন্তু তাঁদেব কণ্ঠস্বর এখনো শুনিনি।

বিশ্বামিত্র বললেন, "বৎস রাম, শীঘ্র গিয়ে ওই নদীর জলে আচমন করে এসো। তোমাকে মন্ত্র দেব।"

রাম সরযূর জলে আচমন করে দেহে মনে শুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রের সমীপে উপবেশন করলেন।

—"রাম, আমার জীবনের সকল তপস্যা সকল সিদ্ধি আজ তোমাকে দান করব। 'বলা' ও 'অতিবলা' নামে দুইটি মন্ত্র তুমি গ্রহণ কর। এই মন্ত্রবলে তুমি কখনো শ্রম জ্বর ক্ষুধা পিপাসায় পীড়িত হবে না। তোমার মধ্যে কোনো বিকার আসবে না। তুমি নিদ্রিত অথবা অসাবধানে থাকলেও কোনো রাক্ষস তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। শৌর্যে বীর্যে জ্ঞানে দাক্ষিণ্যে কর্মদক্ষতায় কর্তব্যনির্ধারণে বিচারে ও বাগ্মিতায় তোমার তুল্য কেউ হবে না। এই মন্ত্র নিখিল জ্ঞানের ও মঙ্গলের প্রসূতি। তুমিই উপযুক্ত আধার। তাই এই মন্ত্র তোমায় দিলাম।"

বাম বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন।...

সোনার প্রদীপে যেন অগ্নিশিখা সঞ্চারিত হল।...

বালক রামচন্দ্র সবার অলক্ষ্যে, এমনকী তাঁর নিজের অজ্ঞাতেও, আপন অধ্যাত্মসত্তায় হয়ে উঠলেন রঘুপতি রাঘব।

পথশ্রমে ক্লান্ত। তাই বিশ্বামিত্র তাঁদের বিশ্রাম নিতে বললেন। সেদিনের মতো পথ চলার বিরাম।

দিনান্তে নদীর ধারে গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপরে বসে তারা বিশ্বামিত্রের সঙ্গে কথা

বলছেন। ক্লান্ত ললাটে এসে লাগছে সরযূর শীতল বাতাস। মায়ের স্নেহস্পর্শের মতো। অঙ্গ জুড়িয়ে যায়। নয়নে ঘুম নামে। চারিদিকে সবুজ প্রান্তরের হাওয়া। দূরে ওই অস্পষ্ট লোকালয়। পাখি ডাকছে। অপরাহ্ন মেঘে ভেসে চলেছে শ্বেতপক্ষ বলাকা। সরযূর জলে সন্ধ্যামেঘের ছায়া। থেকে থেকে জলকলোচ্ছ্বাস।...

সোনার পালঙ্ক নেই, রাজশয্যা নেই, নেই পরিচারিকাদের হস্তের স্নিগ্ধ চামর ব্যজন। সেই খোলা মাঠে নদীর ধারে গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়লেন অযোধ্যাব দুই কিশোর রাজকুমাব রাম আর লক্ষ্মণ। বিশ্বামিত্র রামকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। এখন হয়তো দিচ্ছেন কষ্টসহিষ্ণুতার তপস্যা।...

ভোর বেলা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল।

প্রত্যুষে আহ্নিক দৈবকর্ম ও সাবিত্রী মন্ত্র জপ করে আবার তাঁরা পথ চলতে শুরু করলেন।

যেতে যেতে পথে পড়ল কন্দর্প আশ্রম।

আশ্রমবাসীরা সাদরে বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করলেন।

হোমে পুণ্যে জপে সে রাত্রি বিশ্বামিত্র আশ্রমে অতিবাহিত করলেন। বললেন, "রাম, এই হল সেই পবিত্র কন্দর্প আশ্রম। কাম দেবতা কন্দর্প এখানে তপস্যা করতেন। একদা মহাদেব এই আশ্রম-পথ দিয়ে গমন করছিলেন। পুষ্পধনু কন্দর্প তাঁকে কামমোহিত করতে চেষ্টা করেন। তখন রুদ্রের ক্রোধ-দৃষ্টিতে মদনের সর্বাঙ্গ ভস্ম হয়ে যায়। সেই থেকে কন্দর্প হলেন অনঙ্গ। আর এই স্থানেব নাম হল অঙ্গদেশ।"

পরদিন আবার যাত্রা শুরু।..

নৌকায় করে তাঁরা গঙ্গা পার হচ্ছেন।..

বিস্মিত হয়ে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, "মহর্ষি ও কিসের শব্দ?"

এই প্রথম আমরা বামের কণ্ঠস্বর শুনলাম। সেই কণ্ঠ যেন উৎসবকালীন মৃদঙ্গধ্বনি—"ধ্বনিশ্চ মঙ্গল্যমৃদঙ্গঃ"।

—"রাম, ওই শোন, গঙ্গা ও সরযূর সংগমে সংক্ষুব্ধ বারিরাশির তুমুল জলকলোচ্ছ্বাস। অগাধ পুলিনে কলকল্লোলে সঘোষা ঊর্জিতসলিলা শৈলসুতো গঙ্গার বিপুল প্রবাহ। এই ত্রৈলোক্যপাবনী সুরনদী গঙ্গাকে প্রণাম করো।"

রাম লক্ষ্মণ গঙ্গাকে প্রণাম করলেন।

নদী পার হতে না হতেই তাঁরা দেখলেন ওপারে ভয়াল এক অরণ্য। নরকের গহ্বরে পুঞ্জিত অন্ধকারের মতো দুর্গম। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। গাছের জটিল শাখায়-শাখায় জড়িয়ে আছে বিষধর সর্প। বৃক্ষশীর্ষে অসংখ্য শকুনি। ওই ভীষণ বনে বাঘ ডাকছে। সিংহ গর্জন করছে। আর কত হিংস্র জন্তুর বিকট শব্দ। মাটিতে কিলবিল করছে যত রক্তজিহ্বা সরীসৃপ। বনের বাতাসে ঘোর অমঙ্গলের আর অভিশাপের নিঃশ্বাস।...

ওই ভয়ংকর বনের দিকে রাম তাকিয়ে আছেন। সেই দৃষ্টিতে ভয় নেই, বিস্ময় নেই, প্রসন্ন সিংহশাবকের দৃষ্টির মতো স্থির—"প্রসন্নসিংহস্তিমিতং চ বীক্ষিতং"।

—"ব্রহ্মর্ষি, ওই ভীষণ অরণ্যের নাম কী? কার এলাকা?

—' রাম, ওই অরণ্যের ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। ওই সেই তাড়কাবন। ওখানে থাকে রাক্ষসী তাড়কা।"

তিন

দেবতা—মানুষ—রাক্ষস

ভয়াল অন্ধকার অরণ্য। গা ছমছম করে। চারিদিকে থমথম করছে বিভীষিকা। বাতাসে সাপের নিঃশ্বাস। পাতায়-পাতায় প্রেত পিশাচের আতঙ্ক।

রাম-লক্ষ্মণ এগিয়ে চলেছেন।...

তাঁদের পিছনে বিশ্বামিত্র।

"রাম, এই বনেই থাকে রাক্ষসী তাড়কা। তুমি তাকে বধ কর। স্ত্রীহত্যা হবে বলে দ্বিধা কোরো না। প্রজার কল্যাণের জন্য এ তোমার কর্তব্য। তোমার রাজধর্ম। রাজাকে দরকার হলে সব করতে হয়। নৃশংস অনৃশংস দোষের বা পাপের বলে পিছিয়ে যাওয়া চলবে না।

নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষাকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥

(আদিকাণ্ড, ২৫/১৮)

কোমলপ্রাণ সরলহৃদয় কিশোরচিত্তে হঠাৎ এই ভয়ানক পরিবেশে বিশ্বামিত্র দিচ্ছেন কঠোর রাজধর্মের নীতিশিক্ষা। রামের কোমল হৃদয়তন্ত্রীকে তিনি বুঝি ললিতে-কঠোরে তীক্ষ্ণ করে ধরতে চান। রাজাকে, বিশেষ করে রামকে তো কেবল ফুলের মতো কোমল হলেই চলবে না; তাঁকে আবার হতে হবে বজ্রের মতো কঠোর। তাই তিনি রামকে দীক্ষা দিয়েছেন, এই ভয়ানক পরিবেশে নিয়ে এসেছেন, এবার সেই শুদ্ধ নরম পাত্রে ঢেলে দিচ্ছেন তরল অগ্নির মতো জীবনের কঠোরতর শিক্ষা। বলছেন, হত্যা কর। আবার শুধু হত্যা নয়, নারী হত্যা। বিনা প্ররোচনায়। তাড়কা তাঁদের আক্রমণ করেনি। বিশ্বামিত্র এখনো যজ্ঞে দীক্ষিত হননি। এখন ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তাড়কাকে বধ করতে পারেন। তা না-করে তিনি রামকে বলছেন, বধ করো। রামের মনে দ্বিধা আসা স্বাভাবিক। তাই বিশ্বামিত্র রামের মনকে শক্ত করে ধরছেন যুক্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত দিয়ে। বলছেন, স্বয়ং ইন্দ্র একদা অসুর বিরোচনের কন্যা মন্থরাকে বধ করেছিলেন। মন্থরা না-হয় ছিল অসুরকন্যা। কিন্তু মহর্ষি ভৃগুর পত্নী পতিব্রতা ধর্মশীলা, শুক্রাচার্যের মাতা, তিনি অসুরদের প্রতি পক্ষপাত করে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য স্বয়ং বিষ্ণু ওই সাধ্বী রমণীকে বিনাশ করেন। (আমরা বুঝতে পারি শুক্রাচার্য কেন অসুরদের গুরু হয়েছিলেন। কেন তিনি অসুরদের দিয়েছিলেন অমরত্বের অমৃতত্বের মন্ত্র। শুক্রাচার্য তাঁর মাতৃহন্তা দেবতাদের ক্ষমা করতে পারেননি।)

বিশ্বামিত্র বলছেন, "রাম, মনে কোনো সংকোচ কোরো না। রাক্ষসীকে বধ কর—জহি মচ্ছাসনান্নৃপ।"

কিন্তু রামের মন থেকে সংশয় যায়নি।

রাম বললেন, "আসবার সময় পিতা আমাকে আদেশ করেছেন, বিনা দ্বিধায় আপনার বাক্য পালন করতে। তাই পিতার বাক্যের গৌরব রক্ষা করতে আপনার নির্দেশ শুনব।"

এই বলে রাম ধনুকে টংকার দিলেন।

অরণ্য আকাশ কম্পিত হল। সেই দারুণ শব্দে রাক্ষসী ভয়ে হুংকার দিয়ে উঠল। বিকট মূর্তি, প্রেতের বসন, নরকপালের মালা—তপ্ত শ্মশান—বাতাসের মতো সমস্ত বন কাঁপিয়ে ছুটে এল তাড়কা।

তাকে ছুটে আসতে দেখে রাম বললেন, "লক্ষ্মণ, দেখো, কি বিকট কি ভয়ংকর রাক্ষসী। দেখলে ভীরুর মন আঁতকে উঠবে। কিন্তু ও যে নারী। ওকে বধ করতে চাই না। ওকে কেবল অক্ষম হতবল করে ছেড়ে দিতে চাই।"

নহ্যেনামুৎসহে হন্তুং স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাম্।
বীর্যং চাস্যা গতিং চৈব হন্যামিতি হি মে মতি॥

(আদিকাণ্ড, ২৬/১২)

রাক্ষসেরা মাযা কপটবিদ্যায় নিপুণ। নানা রকম ভেল্কি প্রহেলিকা সৃষ্টি করে ভয় দেখাতে পারে। দেখতে-দেখতে কোথা থেকে কালো মেঘের ধোঁয়া এসে রাম-লক্ষ্মণকে ঢেকে ফেলল। ধূলা কাঁকরে তাঁদের চোখ অন্ধকার করে দিল। শিলাবর্ষণ হতে লাগল।

রাম বাণ মেরে শিলাবৃষ্টি বন্ধ করলেন।

রাক্ষসী তখন তার দুই নখরকরাল হাত বাড়িয়ে রামকে আক্রমণ করল।

রাম এক তীক্ষ্ণ বাণে রাক্ষসীর দুই হাত কেটে দিলেন। লক্ষ্মণ এসে তার নাক আর কান কেটে দিলেন। রক্তাক্ত মুখে বিকৃত রাক্ষসী বিকট শব্দে হুংকার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

বিশ্বামিত্র উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "সাবধান, রাম। ভীষণ ওই রাক্ষসীকে নারী বলে অবহেলা করো না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এই সময়ে ওরা দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। বিলম্ব করো না। পাপীয়সীকে হত্যা করো। বধ্যতাং—রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্ধর্ষাণি ভবন্তি হি।"

বিস্তৃতফণা সাপের মতো সরোষে ছুটে আসছে রাক্ষসী। তীক্ষ্ণ এক শরাঘাতে তখন রাম তার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। বিকট আর্তনাদ করে তাড়কা নিহত হল।

দেবতারা সন্তুষ্ট হলেন।

পৃথিবী থেকে একটা অমঙ্গল সরে গেল।

স্বস্তি নামল।

কিন্তু এখানে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসে। এই যে সব রাক্ষস খোক্কসের বর্ণনা, একি শুধু ছেলে ভুলানো রূপকথার গল্প? এই সব যক্ষরক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব কিন্নর গুহ্য সিদ্ধ ভূত প্রেত, এরা কারা? একি নিছক স্বপ্নকল্পনা? অসম্ভব আজগুবি অতিপ্রাকৃত ব্যাপার? আদিম যুগের মানুষের যত উৎকট মনের সৃষ্টি? কিন্তু বেদ উপনিষদ পুরাণ ভাগবত রামায়ণ

মহাভারত—ভারতের জ্ঞানমানসে সর্বত্র দেখি এরা রয়েছে। আমরা আধুনিকেরা অবশ্য এদের পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাই। মনে করি, এসব শুধু কল্পনা, বড়জোর রূপক অথবা প্রতীক মাত্র। মানুষ আর দেবতার মাঝে এই যত গন্ধর্ব কিন্নর রাক্ষস পিশাচের দল ঘোরা-ফেরা করে, এদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। হয়তো একটা তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই এদের অবতারণা। এরা যেন মায়াসৃষ্টি।

কিন্তু ছায়ার সঙ্গে কি দ্বন্দ্ব হয়? দেবতা ও অসুরে, মানুষে ও রাক্ষসে, রাম ও রাবণে যে যুদ্ধ যে সংঘর্ষ, এক পক্ষ অলীক অবাস্তব হলে কি তা হতে পারে? আরও কথা আছে, এরা সব আবার আলাদা আলাদা নয়। একই ব্যক্তি কখনো হচ্ছে যক্ষ, কখনো বা রাক্ষস। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব প্রকৃতি রূপ গুণও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন কাশীর রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির অভিশাপে হয়ে গেলেন নরখাদক রাক্ষস। (মহাভারত, আদিপর্ব, ১৭৬ অধ্যায়) ক্ষত্রিয় রাজা নহুষ বলে বীর্যে হয়ে উঠলেন স্বর্গের দেবতাদেরও রাজা। তিনিই আবার অগস্ত্য ঋষিব অভিশাপে হয়ে গেলেন রাক্ষসেরও অধম তীর্যক্‌যোনি সর্প। (মহাভারত, বনপর্ব, ১৭৯/১৮) দেবতাদেরও অধিক যেসব ঋষি তাঁদের ঔরসপুত্র হচ্ছে এক দিকে যেমন যক্ষ অসুর রাক্ষস অন্যদিকে আবার দেবতা। কশ্যপের পুত্র হল রাক্ষস হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। আবার তাঁরই অপর দুই পুত্র হলেন ইন্দ্র ও বিষ্ণু। (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/১৭ এবং হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৭৫ অধ্যায়) ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পুত্র অলম্বুষ বাক্ষস। (মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১০৬/১৬)।

যক্ষরাজ বৈশ্রবণ (কুবের) এবং রাক্ষসরাজ রাবণ (দশগ্রীব) উভয়েই বিশ্রবা মুনির পুত্র। তাঁদের মধ্যে আবার বিভীষণ রাক্ষস হয়েও দেবোপম। রাক্ষসের পুত্র প্রহ্লাদ চরিত্রে গুণে মহত্ত্বে দেবতারও অধিক। এদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ সম্পর্কও হচ্ছে। অপ্সরা হেমার কন্যা মন্দোদরী হলেন রাবণের পত্নী। (উত্তরকাণ্ড, ১২/১-২২) গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা সরমার বিবাহ হল বিভীষণের সঙ্গে। (উত্তরকাণ্ড, ১২/২৪) রাক্ষস সুমালির কন্যা কৈকসী এবং ঋষি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনী দুজনেরই বিবাহ হয় বিশ্রবা মুনির সঙ্গে। (উত্তরকাণ্ড, ৯/১১-১২ এবং উত্তরকাণ্ড, ২য়-৩য় সর্গ) ব্যবহারিক জীবনে দেখা যাচ্ছে এরা সব এক। যদিও স্বভাবে চরিত্রে গুণে প্রকৃতিতে অনেক পৃথক। কিন্তু সেই পার্থক্য বা বৈষম্যবেখাটি বড় অস্থির বড় চঞ্চল। সব সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। সুনিশ্চিত করে বলে না, কে রাক্ষস আর কে মানুষ। আপাত প্রতীয়মান হলেও তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। মানুষটা যে কখন রাক্ষস হয়ে যাবে, আবার রাক্ষস কখন হয়ে যাবে দেবতা, তারও কোনো স্থিরতা নেই। অমরকোষে এদের সকলকেই বলা হয়েছে দেবযোনি—

> বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষরক্ষো গন্ধর্বকিন্নরাঃ।
> পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥

জানি নির্ণয়ে জন্মের পরিচয়ের চেয়ে স্বভাবের পরিচয়ই বড় কথা। নিজের পরিচয় দিতে ঠিক এই কথাই বলছেন বিভীষণ।

মেঘনাদ যখন তাঁকে ধিক্কার দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পিতৃব্য, তোমার লজ্জা করে না? রাক্ষসকুলে জন্মে আমাদের বংশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কুলশত্রু রামকে সাহায্য করছ?

বিভীষণ বললেন, "যদিও আমি রাক্ষসকুলে জন্মেছি. তবু স্বভাবে গুণে শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম আমার।"

কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রাক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্।
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭/১৯)

প্রত্যেকের স্বভাব, তার অন্তরাত্মার গতি, তার নিয়তির ধারা, তার ভাগ্য-চক্র—তাই দিয়েই জীবন গড়ে ওঠে। স্বরূপ ফুটে ওঠে। মানুষে-মানুষে জেগে ওঠে স্বভাবগত ভেদ ও পার্থক্য। গীতায় ভগবান বলেছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" (গীতা, ৪/১৩)—কেবল মানুষে-মানুষেই নয়, এই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় দেবতার সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে অসুর ও রাক্ষসের। নইলে মানুষ তপস্যা করে, অসুরও তপস্যা করে, বরং অনেক কঠোর ঘোর উগ্র তপস্যাই তারা করে।

রাবণের তপস্যা তো কল্পনা করা যায় না।

হাজার-হাজার বছর ধরে সম্পূর্ণ উপবাসে থেকে নিজের এক-একটি মাথা কেটে অগ্নিতে আহুতি দিয়েছে। ব্রহ্মা যখন সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন, তখন রাবণ প্রার্থনা করল, "আমি যেন দেবতা সুপর্ণ নাগ যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষসগণের অবধ্য হই। অপর প্রাণীদের কথা ভাবি না। মানুষকে তো তৃণ জ্ঞান করি।"

সুপর্ণনাগযক্ষানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।
অবধ্যাঽহংপ্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ শাশ্বত॥
নহি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষ্বমরপূজিত।
তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ॥

(উত্তরকাণ্ড, ১০/১৯-২০)

কুম্ভকর্ণও কঠোর তপস্যা করেছে। গ্রীষ্মে চারিদিকে আগুন জ্বেলে পঞ্চাগ্নি সাধনা, বর্ষায় অবিশ্রান্ত ধারায় সিক্ত হয়ে, শীতকালে দিনরাত জলে নিমজ্জিত থেকে সে অসাধ্য সাধন করেছে। শেষে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন।

কুম্ভকর্ণ চাইল, "প্রভু, আমি অনেক অনেক কাল কেবল ঘুমাতে চাই—স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব! মমেপ্সিতম্।" (উত্তরকাণ্ড, ১০/৪৫)

বিভীষণও তপস্যা করেছেন। স্বাধ্যায়পরায়ণ হয়ে পবিত্র মনে অনেক কাল সূর্যের সাধনা করেছেন।

প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা বললেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর।"

বিভীষণ বললেন, "প্রভু, আমার তপস্যায় যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলেই আমি কৃতার্থ। আর কিছু চাই না। তবে যদি দয়া করেন, এই বর দিন, ঘোর বিপদের মধ্যেও আমার যেন ধর্মে মতি থাকে। বুদ্ধি যেন ধর্মের অনুকূল হয়। কর্মে যেন ধর্মই পালন করি। শক্তিতে যেন পাই ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান।

ভগবন্! কৃতকৃত্যোঽহংযন্মে লোকগুরু স্বয়ম্॥
প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত।

পরমাপদগতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ॥
অশিক্ষিতঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং ভগবন্! প্রতিভাতু মে।
যা যা মে জায়তে বুদ্ধির্যেষু যেষ্বাশ্রমেষু চ॥
সা সা ভবতু ধর্মিষ্ঠা তং তং ধর্মঞ্চ পালয়।

(উত্তরকাণ্ড, ১০/২৯-৩২)

তিন জনের তিন স্বভাব। গীতায় যাকে বলেছে—"ত্রিবিধ নিষ্ঠা" (গীতা, ১৭/২) তাই ফুটে উঠেছে।

রাবণ স্বভাবে রাক্ষস, তাই সে তপস্যায় পেল রাক্ষসী সিদ্ধি। কুম্ভকর্ণ ঘোর তামসিক, তাই তার সিদ্ধি নিয়ে এল তামসী নিদ্রা। আর ধার্মিক বিভীষণ যে স্বভাবে দেবতা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর বর প্রার্থনায়। বিভীষণ যে রাক্ষস নয়, ধর্মাত্মা পুরুষ, এ বিশ্বাস রাক্ষসদেরও ছিল, তাই শূর্পনখা বলেছে, "বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ। (অরণ্যকাণ্ড, ১৭/২৩)

সুতরাং জন্ম দিয়ে নয়, স্বভাব দিয়ে, গুণকর্ম দিয়েই জানতে হবে কে রাক্ষস আর কে মানুষ। তবে জন্মসংস্কার বাদ যায় না। স্বভাব ও গুণকর্ম জাতকের জন্মেরও নিয়ামক। যোগভ্রষ্টের গতি কি, অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সেই ইঙ্গিতই করেছেন। গুণ ও কর্মের সংঘাতে জন্মের তরী এসে ঠেকে কখনো ঘাটে, কখনো-বা আঘাটে। সবাই তো দেখতে একরকম। রাক্ষসদের চেহারাও মানুষেরই মতো। সেইজন্য রামচন্দ্র তাঁর বানর সেনাকে সাবধান করে বলছেন, "তোমরা মানুষের রূপ ধরে যুদ্ধ করো না। তাহলে রাক্ষসদের থেকে তোমাদের পৃথক করে চেনা যাবে না।

ন চৈব মানুষং রূপং কার্যং হরিভিরাহবে।
এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে জনে॥
বানরা এব বহিশ্চিহ্নং স্বজেনেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি।

(অরণ্যকাণ্ড, ৩৭/৩৩)

আসলে দেবতা, অসুর ও মানুষ তিনজনেই প্রজাপতির সন্তান—

"ত্রয়াঃ প্রজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি
ব্রহ্মচর্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা..."

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫/২/১)

তাঁরা তিনজন গিয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য। কিন্তু নিজের নিজের স্বভাব অনুসারে একই উপদেশ তিনজন বুঝলেন তিন রকম—

ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র ও বিরোচনের গল্পে এই কথাই আরও স্পষ্ট হয়েছে। অসুর অল্পজ্ঞানী। একটি উপদেশ পেয়েই সে মনে করল, সব জ্ঞান তার হয়ে গেছে। সব সে বুঝে ফেলেছে। অসুর ভাবল, এই দেহ, এই স্থূল আয়তন, এই ভোগসর্বস্ব জীবন, এই হল পরম তত্ত্ব। এই স্থূল মিথ্যাজ্ঞানকে তাই বলা হয় আসুরী উপনিষদ—"অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ" (ছান্দোগ্য, ৮/৮/৫)। বিরোচনকে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেতে দেখে প্রজাপতি মনে-মনে বললেন, "একে প্রকৃত জ্ঞান বলে যারা মনে করবে তারাই বিনষ্ট হবে। তে পরাভবিষ্যন্তীতি।" (ছান্দোগ্য, ৮/৮/৪)

কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ওই অসম্পূর্ণ জ্ঞানে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আবার ফিরে এলেন প্রজাপতির কাছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিয়ে। ইন্দ্র বারে বারে যাচ্ছেন আর ফিরে-ফিরে আসছেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন—সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সব তত্ত্বের অনুসন্ধান। এমনি করে একশো এক বৎসর প্রজাপতির কাছে তপস্যা করে ইন্দ্র লাভ করলেন পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান। তখন প্রজাপতি ইন্দ্রকে দিলেন শেষ দীক্ষা (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮/১৪)।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বড় সুন্দর করে বলেছেন, "অসুর সত্যের প্রথম পাদ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে রইল। তার বল, শারীরিক বল—বলং বলং বাহুবলং, তাদের লাভ ও বিজয় আশু। দেবতাদের প্রযত্ন সুদীর্ঘ, তাদের কাম্য সত্যকার সত্য, পূর্ণ সত্য—অর্ধসত্য বা সত্যাভাস নয়। তাদের বিজয় পরিশেষে, তাদের অপেক্ষা করতে হয় অনেক, তাদের অর্জন করতে হয় শারীরিক বল নয়—পূর্ণাত্মার বল।" (রচনাবলী, ৭ম্ খণ্ড, শৃণ্বন্তু, ১৯৮১, পৃ. ৩০৭)।

এমনি করে অসুরেরা বেছে নিল নিকটের ব্যক্ত জগতের স্থূল ভোগ আয়তনকে ("ইমম্"-কে); আর দেবতারা নিলেন সুদূরের অব্যক্ত লোকের তুরীয়ের পরাসত্যকে ("অমূম"-কে)—

"অমূম এব দেবা উপায়ন্ ইমম্ অসুরা।"

(শতপথব্রাহ্মণ, ৩/২/১/১৮)

দেবতারা তাই দূরের যাত্রী (চরৈবেতি)। সুদূরের পিয়াসী। উদাস চিরন্তনের অভিসারী। আর অসুরেরা স্থূল আয়তনে আবদ্ধ অচল স্থাণু। নিরেট রূঢ় এবং কর্কশ।

"তে দেবাশ চক্রম্ অচরঞ্ছালম্ অসুরা আসন্।"

(শতপথব্রাহ্মণ, ৮/৬/১/১)

মানুষের মধ্যে দেবতাও আছেন আবার আছে অসুর যক্ষ রক্ষ—"দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ" (গীতা, ১৬/৬)। দূর আর নিকট, স্থূল আর সূক্ষ্ম, মর্ত্য আর অমর্ত্য, আলো আর আঁধার, জ্ঞান আর অজ্ঞান, এই দুই বিপরীত বিষম সত্যের সম্পাতে মানুষের জীবন। মানুষ হল প্রকৃতির যজ্ঞ—তার কর্মশালা। সেখানে অহরহ আগুন জ্বলছে। ঢালাই-পেটাই হচ্ছে।

আমাদের ভাবনা-চিন্তায় কাজে-কর্মে আহারে-বিহারে যদি ভাল করে লক্ষ করি তাহলে অনেক সময় হয়তো নিজেদের রূপ দেখে নিজেরাই আঁতকে উঠব। কখনো হয়তো সেখানে দেখব, লোভে ক্ষোভে দর্পে কামে ক্রোধে রয়েছে একটা নিষ্ঠুর রাক্ষস। কিংবা নীচতায় হীনতায় কুৎসিত কদর্য ক্লেদে একটা অশুচি পিশাচ। অথবা রূপে গন্ধে সৌন্দর্যে শিল্পে কোনো মনোহর গন্ধর্ব। আবার যদি সুকৃতি থাকে, তাহলে হয়তো দেখব, অটল ধৈর্যে এক বিশুদ্ধ প্রশান্ত নির্ভয়। সত্যে ধর্মে ত্যাগে তপস্যায়, দয়া ক্ষমা শান্তির মঙ্গলময় শ্রী। লজ্জা শুচিতা সরলতা। ধ্যানে গভীর, জ্ঞানে গম্ভীর। তখন জানব, দেবতা এসেছেন। গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে মানুষের মধ্যে এই রকম নানা রূপ দেখিয়েছেন ভগবান।

সুতরাং অসুর রাক্ষস পিশাচ এরা নিছক অলীক কল্পনা নয়। রূপকথার গল্প নয়। আর, স্বভাব দিয়েই তো আকৃতি গড়ে ওঠে। একজন ক্রূর ক্রুদ্ধ খল মানুষের চেহারা যদি সাপের মতো দেখি, একজন কামুক নিষ্ঠুর দাম্ভিক মানুষকে যদি রাক্ষসের মতো দেখি, তাহলে কি

ভুল দেখা হবে? বরং মানুষের চেহারাটাই তার মুখোশ। আসল চেহারায় সে একজন শকুনি অথবা রাবণ।

বাল্মীকি রামায়ণের প্রতিটি চরিত্র এঁকেছেন প্রত্যেকের স্বভাব তার অন্তরাত্মার রং দিয়ে—শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন "soul-tone"। তারা আমাদের সামনে এসেছে স্থূল শরীরের চেহারা নিয়ে নয়, অন্তরাত্মার চেহারা নিয়ে। ভারতবর্ষের চিত্রকলায় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে কাব্যে এই আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই দেখা হয়েছে। ঋষির ধ্যানীদৃষ্টি বস্তুর বিষয়ের বাইরের চেহারাটাই শুধু দেখেনি, দেখেছে তাদের অন্তরাত্মার ভাবকে। বাইরে যে সুষম সুশ্রী ভিতরে সে হয়তো বিষম, হয়তো কুৎসিত বিভৎস। আবার বাইরে যে মলিন ও শীর্ণ, ভিতরে সে হয়তো উজ্জ্বল দেবতা। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন,... "The Ramayana suggests rather a transcript into literature of the spirit and style of Indian painting." *(The Foundations of Indian Culture, 1959, p. 330)*

দেবতা সত্য, আবার অসুর রাক্ষসও সত্য। শুধু সত্য নয়, পরস্পর অপরিহার্য। উভয়ে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। স্থূল দেহের আবেষ্টনের যে বল তা অসুরের। আর হৃদয়ে বুদ্ধিতে অন্তরাত্মায় যে শক্তি তা দেবতার। তাই জড়ের পার্থিব প্রকৃতিব উপরে কর্তত্ব ও বিজয়ের জন্য চাই অসুরের বল। যেমন পাষাণ ভাঙতে চাই লোহার ছেনি। যার যে শক্তি তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে সেই শক্তি দিয়েই। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, পার্থিব প্রকৃতির সকল বিরোধের উচ্ছেদ করতে হলে রাক্ষসের উপাসনা করতে হবে—"নির্ঋতিং ত্বভিচরণ যজেৎ" (শ্রীমদ্ভাগবত, ২/৩/৯)। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর "দুর্গাস্তোত্রে" বলেছেন, "জীবন-সংগ্রামে ভারত সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা; দাও মাতঃ প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র দেবের জ্ঞান।" ("শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী', ১৯৬৯, পৃ. ৩) বস্তুত প্রাণে অসুরের বল, আর হৃদয়ে দেবতার আলো, দুই-ই-চাই।

অসুর ভগবানের বাইরে নয়। ভগবানেরই শক্তি ও অংশ হল অসুর। তবে তারা ভগবানের বিপরীত দিক। তাঁর বামামূর্তি। অধর্ম্ম নির্ঋতি মৃত্যুর ভয়ংকর লোকসব সৃষ্টি হয়েছে প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশ থেকে—"অধর্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/১২/২৫)। ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি যত অন্ধকার তম মোহ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ ক্রোধ সংঘর্ষ। আর তাঁর জঘনদেশ থেকে সৃষ্ট হল যত অসুর—নিষ্ঠুর কামার্ত ভোগী। (তদেব, ৩/২০/২৩)

দেখে ব্রহ্মা বিমর্ষ হলেন।

তাঁর সৃষ্টির এ কি রূপ?...

নিজের সৃষ্টিকে ধিক্কার দিলেন পাপীয়সী সৃষ্টি বলে—"দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/১২/৩)। এই বিকারের জগৎ থেকে জন্ম নিল যত যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর প্রেত পিশাচ। (তদেব, ৩/১০/২৮-২৯)

এই সব ক্ষুধার্ত সৃষ্টি তখন ভগবানকেই গ্রাস কবতে চাইল।

ব্রহ্মা ভীত হয়ে বললেন, "না, না। আমাকে ভক্ষণ করো না। রক্ষা কর। মা মা জক্ষত রক্ষত।"

যারা ভক্ষণ করতে চাইল তারা হল যক্ষ। আর যারা রক্ষা করতে চাইল না, তারা হল রাক্ষস। (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/২০/২১)

রামায়ণে শুনি আর এক-গল্প।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন।

ওই জলের মধ্যে সৃষ্ট প্রাণী যত ক্ষুধায় কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা এখন কী করব?"

ব্রহ্মা বললেন, "তোমরা এই জল রক্ষা কর।"

তাদের মধ্যে কেউ বলল, "আমরা এই জল রক্ষা করব।"

কেউ বলল, "আমরা এই জলকে যক্ষণ (পূজা) করব।"

যারা "রক্ষা করব" বলল তারা হল রাক্ষস। আর যারা বলল "যক্ষণ (পূজা) করব" তারা হল যক্ষ—

রক্ষাম্ ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষ এব ভবন্তু বঃ॥

(উত্তরকাণ্ড, ৪/১৩)

এমনি করে রামায়ণে ও পুরাণের গল্পে এসে পড়েছে সৃষ্টিরহস্যের ছায়া।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বড় সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন এই সৃষ্টিরহস্যের নিগূঢ় অর্থ :

"সৃষ্টির মধ্যে অমঙ্গল কেন? অবিদ্যা কেন? পাপ এল কোথা হতে? শয়তানের জন্ম দিল কে?

ভগবানই যদি আছেন, তবে অ-ভগবানের আবির্ভাব কেন, অপ্রতিহত প্রভাব কেন?

যে সত্তা সর্বজ্ঞানময় সর্বশক্তিময় সর্বআনন্দময়—জাগ্রতের জগতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেল কি রকমে?

অ-ভগবানও ভগবান—ভগবানের ছায়া, ইতর রূপ, বিপরীত দিক্—বামা মূর্তি।

চরম বৈপরীত্যের প্রয়োজন, এক প্রান্তের "না"-কে অন্য প্রান্তের "হাঁ" তে পরিণত করবার জন্য—

এই সত্য প্রমাণ করবার জন্য যে, ভগবান এমনি এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু যে তাকে অস্বীকার করে চলেও শেষে তারই মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়।

চরম নেতি যেখানে ঠিক সেখানে পরম ইতি।" (রচনাবলী, ১০ম্ খণ্ড, ১৯৮৮ পৃ. ২৮-২৯)

অসুরেরাও ভগবানেরই সাধনা করছে, তবে বিপরীতভাবে, শত্রুরূপে। এইভাবেই তারা নিজেদের দ্রুত ক্ষয় লয় করে শেষে উত্তীর্ণ হয় পরম পদে। রাক্ষস রাবণ কি তাই নয়?

চার

আকাশ অরণ্যের ছায়া

তাড়কা বধের পর সেই গহন অরণ্যে তাঁরা রাত্রি যাপন করলেন। নিবিড় বনানী। শুভ্র চন্দ্রালোকের সঙ্গে মিশেছে ঘনছায়া নীল অন্ধকার। মাথার উপরে গাঢ় অভ্রলেখা। তারাভরা নিঃশব্দ আকাশ আর অরণ্যের স্তব্ধ মৌন রহস্য। এক নিথর দিব্যশক্তি রামের অন্তরে যেন সঞ্চারিত হতে থাকে।

বিশ্বামিত্র তাই চেয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি যজ্ঞের ছল করে দশরথের রাজচ্ছত্রতল থেকে রামকে নিয়ে এসেছেন এই প্রসারিত কাননদ্রুমার মৌন ছায়াতলে। অযোধ্যার রাজচ্ছত্র এর কাছে বড় অকিঞ্চিৎকর। ঋষি বুঝেছিলেন, রামের মস্তকে চন্দ্রতাপ হতে পারে একমাত্র এই অনন্ত আকাশ।

রাজমুকুট কখনো কাউকে স্বস্তি দেয়নি। রাজচ্ছত্র কখনো শান্তি দেয় না। তাই বৃদ্ধ রাজা দশরথ আক্ষেপ করে রামকে বলেছিলেন, "এতকাল আমি শুভ্র রাজচ্ছত্রতলে নিজেকে জীর্ণ করেছি মাত্র—পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্য চ্ছায়ায়াং জরিতং ময়া।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২/৭)

পরে বনবাসে এসে রাম ভরতকে ওই একই কথা বলেছিলেন, "ভরত, ফিরে যাও তুমি। অযোধ্যার রাজচ্ছত্র তোমার মাথায় ছায়া ধরুক। আর এই নিবিড় বনকানন আমার মাথার উপরে বিছিয়ে ধরবে তার শীতল ছায়া।"

ছায়াং তে দিনকরভা প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্ধিঃশীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমানাং
ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িস্যে।

(অযোধ্যাকাণ্ড. ১০৭/১৮)

"অযোধ্যার রাজভবনে বাস অপেক্ষা এই বনে আমি অধিক সুখে থাকব—"নিকেতাদধিকং সৌখ্যং বিপিনে নো ভবিষ্যতি"—(অধ্যাত্মরামায়ণ. অযোধ্যাকাণ্ড. ৭/১০)

এই আকাশ এই অরণ্যের শীতল ছায়া রামায়ণের শান্ত গম্ভীর চন্দ্রাতপ। ভারতের পুণ্যতোয়া কত নদী-নির্ঝরিণী, মুনিঋষিদের পবিত্র কত সিদ্ধাশ্রম, দেবতা ও ঋষিদের তপস্যা, কত পুণ্য কথা ও কাহিনি, উদাত্ত সামমন্ত্রধ্বনি হযে রামায়ণকে ধ্রুবপদে বেঁধে দিয়েছে। আদিকাণ্ড তারই চালচিত্র। তার পরিবেশ পরিমণ্ডল। এই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধরলে সমগ্র রামায়ণ—রামের জীবন কর্ম ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সঠিক অনুভব করা যায় না। এক ঊষর রূক্ষতার ভিতরে সব কেমন শ্রীহীন ম্লান হয়ে যায়। আদিকাণ্ডের এই অরণ্যবেষ্টন যখন

সরে গেল, আমরা তখন অযোধ্যাকাণ্ডের মাত্র পঁয়তাল্লিশটি সর্গেই হাঁপিয়ে উঠলাম রাজঅন্তপুরের শোক দুঃখ ষড়যন্ত্রের শ্বাসরুদ্ধ উত্তপ্ত বাতাসে। তারপর বনবাসী রামের সঙ্গে তমসা নদীর তীরে এসে আমাদের যেন প্রাণ জুড়াল। সেই নির্জন নদীতীরে রাত্রিতে গাছের তলায় পাতা বিছিয়ে রাম যখন তাঁর শয্যা রচনা করলেন, তখন মনে হল, এই তো রামের উপযুক্ত রাজশয্যা—"তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্বৃতাম্"। (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৬/১৪)

এই বিশাল বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রামায়ণকে বিচার করতে গেলে আমরা তার গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারব না। আশ্রম পরিবেশ থেকে সরে এসে দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা যেমন শ্রীহীন হতমান হয়ে পড়েছিলেন, রামায়ণও তাই হয়ে পড়বে। রামায়ণ যেন এক গভীর উদাত্ত সংগীত। তার সামগ্রিকতার মধ্যেই সবখানি সৌন্দর্যের আবেদন। তা থেকে কোনো একটি কথা ও কলিকে আলাদা করে বিচার করতে গেলে সেই গান থেমে যায়, সেই সুর হারিয়ে যায়। ছন্দে বাণীতে বাল্মীকির সৃজনপ্রতিভার এমন চমৎকারিত্ব যে, রাম যখন চলেন, মনে হয় যে ইক্ষ্বাকুবংশের সকল গৌরব, অযোধ্যার সমস্ত রাজমহিমা তাঁর সঙ্গে সচল হয়েছে। যখন কথা বলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে মনে হয় যেন গঙ্গার কম্বুধ্বনি শোনা যাচ্ছে—"জগ্মুগঙ্গাঃ শিবজলা শুভাঃ"। কেবল রামই নন, রামায়ণের প্রতিটি চরিত্র, এমনকী পশুপক্ষী বৃক্ষলতা তট ও তটিনীতে এসে মিশেছে সমস্ত আকাশের ছায়া, সকল যজ্ঞের পুণ্য, সকল নক্ষত্রের আলো।

"শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিত।"

(আদিকাণ্ড, ২৯/২৫)

বিশ্বামিত্রের অনুগমন করছেন রাম লক্ষ্মণ, তাঁদের চলার সঙ্গে কবি যোগ করে দিচ্ছেন নির্মল সুখস্পর্শ পুণ্য বাতাস—

"ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।"

(আদিকাণ্ড, ২২/৪)

আবার তপস্যার তপ্তমূর্তি এঁকে ধরছেন, যেন অগ্নি দিয়ে অগ্নির জ্যোতি প্রকাশ করছেন, বাণী যেন মন্ত্র হয়ে জ্বলে উঠছে—

তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্তিং তপাত্মকম্।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্॥

(আদিকাণ্ড, ২৯/১২)

এমনি করে আকাশ বাতাস অগ্নি অন্তরিক্ষ নদী বনানী পত্রপল্লবে রামায়ণের ধ্যানমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। কাহিনির মধ্যে যতি ও গতি এনে দিয়েছে। সেই ভাবমণ্ডলের গভীর অনুধ্যানেই রামায়ণের মাহাত্ম্য অনুভব। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন It has to be taken as a whole in the setting that Valmiki gave it...I consider myself under an obligation to enter into the spirit, significance, atomosphere of the Ramayana and identify myself with their timespirit..." (*Letters*, Tome One, 1958, pp. 418-19)

কিন্তু তত্ত্ব বিচার করে অনেকে বলে থাকেন, রামায়ণের বালকাণ্ড নাকি বাল্মীকির রচনা নয়। পরবর্তীকালের সংযোজন। তাঁদের বিচারের মূল যুক্তি হল এখানে রামকে অবতার বলে দেখানো হয়েছে। রামভক্তিতত্ত্ব প্রতিপাদ্য করে তোলা হয়েছে। অহল্যা উদ্ধার, হরধনু ভঙ্গ, পরশুরামের তেজহরণ, ইত্যাদি এখানে রামের মধ্যে অবতারত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাল্মীকির রচিত যে আদি রামায়ণ তার একটা স্পষ্ট রূপ হল মহাভারতের রামোপাখ্যান (বনপর্ব, ২৭৩-২৯২ অধ্যায়)। সেখানে বালকাণ্ডের কোনো কাহিনি নেই। রাম সেখানে দাশরথি রাম। অবতার নন।

এই প্রতিপক্ষ যুক্তি স্বীকার করে যদি আমরা ধরেও নিই যে, মহাভারতের রামোপাখ্যান বাল্মীকির আদি রামায়ণ এবং সেখানে রামকে অবতার বলা হয়নি। তবু রাম অবতার হয়েছেন বলে রামায়ণের বালকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ হয় না। কেননা মহাভারতেই রামকে বারবার অবতার বলা হয়েছে। রামভক্তির মাহাত্ম্যও ঘোষণা করা হয়েছে। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস যে কবি বাল্মীকিকে জানতেন, তাঁর কাব্য যে তিনি পড়েছিলেন, তারও উল্লেখ রয়েছে। যেমন—

১। অথ দাশরথির্বীরো রামোনাম মহাবলঃ
বিষ্ণুর্মানুষ্যরূপেণ চচার বসুধামিমাম্॥

(মহাভারত, বনপর্ব, ১৪৭/২৮)

(এখানে রামকে মনুষ্যরূপী বিষ্ণু বলা হচ্ছে)

২। বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স কর্মৈতৎকরিষ্যতি।

(মহাভারত, বনপর্ব, ২৬০/৫)

৩। বিষ্ণুনা বসতা চাপি গৃহে দশরথস্য বৈ।
দশগ্রীবো হতশ্ছন্নং সংযুগে ভীমকর্মণা॥

(মহাভারত, বনপর্ব, ২৯৯/১৮)

৪। অসিতো দেবলস্তাত বাল্মীকিশ্চ মহাতপাঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ত্যদ্ভূতং মহৎ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২০০/৪)

৫। অপি চায়ং গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।

(মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১১৮/৪৮)

(এখানে অসিত দেবল মার্কণ্ডেয়ের সঙ্গে কবি বাল্মীকিরও নাম করা হয়েছে। "গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা" বলে রামায়ণেরও উল্লেখ করা হচ্ছে।)

৬। রামো দাশরথির্ভূত্বা ভবিষ্যামি জগৎপতিঃ।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩২৬/৭৮)

(স্বয়ং বিষ্ণু আশ্বাস দান করছেন, তিনি রাম অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন)

৭। বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভারতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥

(মহাভারত, স্বর্গারোহণপর্ব, ৬/২৩)

(বেদে রামায়ণে ও মহাভারতের আদি মধ্যে এবং অন্তে সর্বত্র শ্রীহরি বিষ্ণুর জয়গান করা হয়েছে।)

অতএব মঃ ··বতের রাম সর্বত্র অবতার। রামভক্তির কথাও আছে। স্বয়ং রামভক্ত হনুমান ভীমকে বল · "আমি রাজীবলোচন রামের কাছে বর প্রার্থনা করেছিলাম, যতদিন জগতে রামকথা প্রচা· · থাকবে ততদিন কেবল আমি জীবিত থাকব। সেই থেকে গন্ধর্ব অপ্সরাগণ এখানে নিত্য আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের গুণ ও লীলাকীর্তন করে আনন্দ দিয়ে থাকে।"

তদিহাপ্সরসস্তাত গন্ধর্বাশ্চ সদানঘ।
তস্য বীরস্য চরিতং গায়ন্তো রময়ন্তি মাম্॥

(মহাভারত, বনপর্ব, ১৪৮/২০)

সুতরাং মহাভারতের রামোপাখ্যানের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে রামায়ণের বালকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয় এই যুক্তি দাঁড়ায় না। অবশ্য একথা ঠিক, পরবর্তীকালের রচিত কিছু কিছু সর্গ ও শ্লোক বালকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। রামায়ণের প্রচলিত বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে এবং রচনার গুণাগুণ ও প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে সেগুলি চিহ্নিত করা অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও অবশ্য সংশয়ের অবকাশ থাকে। তবুও সমগ্র রামায়ণের গঠন, বিন্যাস, কাহিনির একত্ব ও সংহতির দিকে লক্ষ্য রেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কিছু কিছু সংযোজন পরিবর্ধন সত্ত্বেও আগাগোড়া মহাকাব্যটি একই হাতের রচনা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অসাধারণ কবিদৃষ্টি নিয়ে এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন, "The main bulk of the poem in spite of much accretion is evidently by a single hand and has a les- complex and more obvious unity of structure." (*The Foundations of Indian Culture*, 1959, p. 330)

তাত্ত্বিকের বিচারে আর রসিকের অনুভবে অনেক সময় এমন ব্যবধান এসে পড়ে। কেননা তাত্ত্বিক বিচার করেন বাইরের ঘটনা উপকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠনকে, আর কবি ভাবুক রসিক অনুভব করেন অন্তর্নিহিত প্রাণের হৃদ্‌পুরুষের গতিধারা ও অভিব্যক্তিকে। আর সেটাই হল আন্তরিক পরিচয়।

এতকাল ধরে ভারতবাসী কীভাবে রামায়ণকে নিয়েছে, কী আদর্শে ভালবেসেছে, তাকে অন্তরের সামগ্রী করে তুলেছে, শ্রদ্ধাসহকারে রসিকের দৃষ্টি নিয়ে সেই ভাবপুঞ্জকে অনুভব করাই হল রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের যথার্থ সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬৬২/৪)

অতএব এই অরণ্য, এই আকাশ, এই বৃক্ষছায়া, এই পাখির কূজন, প্রান্তরের হাওয়া, নদীর কলোচ্ছ্বাস, মৌন ঋষি ও সিদ্ধসঙেঘর সঙ্গে নীরব অনুগমন এই হল রামায়ণের আদিকাণ্ডের আদি সুর। আমাদের সুখ দুঃখ নিত্য দিনের আকাশে বর্ণময় ইন্দ্রধনু। জীবন যেমন সত্যও বটে, আবার মায়াও বটে, তেমনি এই রামায়ণ কথাও সত্যময় এবং মায়াময়।

অরণ্যের রাত্রি ভোর হল।

বনের শাখাপল্লবে লতায় পাতায় ঘন সবুজের উপর সোনার আলো ঝলমল করতে লাগল। বাতাসে বনফুলের মিষ্টি গন্ধ। পাখি ডাকছে। ঝরা পাতার মর্মর। চ্যুত মঞ্জরী নাগকেশরের রেণু বিছানো বনপথে ত্রস্ত হরিণ ছুটেছে।

রামের কিশোর জীবনে এ এক নতুন সুপ্রভাত।

বিশ্বামিত্র ধ্যানাসনে বসে বললেন, "ভদ্রং তে রাজপুত্র! রাম, তোমার মঙ্গল হোক। আজ তোমাকে নিখিল জগতের সকল দিব্যাস্ত্র দান করব। প্রজাপতি কৃশাশ্বের মন্ত্রজাত অত্যুজ্জ্বল এইসব অস্ত্র। অমোঘ তার শক্তি। দেবতা গন্ধর্ব নাগ যক্ষ রক্ষ সকলে এই অস্ত্রের কাছে পরাজিত। বিবিধ তাদের নাম, বিবিধ শক্তি, বিবিধ বর্ণ ও আকৃতি।"

বিশ্বামিত্র আবাহন মন্ত্র জপ করলেন, তখন সেই মন্ত্র-বলে রামের সম্মুখে আবির্ভূত হল দিব্য উজ্জ্বল দেহধারী যত আয়ুধমূর্তি। বিদ্যুতের রেখায় রেখায় তাদের ঝলসিত দীপ্তি। কেউ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ; কেউ সূর্যের মতো প্রখর; কেউ বা পিঙ্গল, ধূম্র, ধূসর; কেউ আবার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অগ্নির মতো আবর্তিত ওই কালচক্র দণ্ডচক্র ধর্মচক্র বিষ্ণুচক্র। বজ্রশূল ব্রহ্মশিরা। ঐষীকী মোদকী শিখরী। ধর্মপাশ কালপাশ বরুণপাশ। কঙ্কাল মুষল কাপাল কিঙ্কিনী। ওই যে ভয়ংকর নারায়ণ অস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র। সৌম কন্দর্প মোহন মাদন পৈশাচ। সকল দেবতার দীপ্ত তপস্যার তেজ—"তেজাংসি তপোময়ানি"। ইচ্ছামাত্র এরা রূপ ধারণ করে। সংকল্প মাত্র পলকে সংহার করে। "কামরূপাণ মহাবলান"।

বিশ্বামিত্র প্রতিটি অস্ত্রের আবাহন, প্রয়োগ ও প্রত্যাহার মন্ত্র দান করলেন রামকে।

উজ্জ্বলকান্তি মন্ত্রমূর্তি অস্ত্ররূপী দেবশক্তি সব রামের সম্মুখে এসে প্রণত হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা সত্যবান্ সত্যকীর্তি, লক্ষ্য অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ সুনাভ, অর্চি শুচি রুচি ধৃতি, শতরূপে শতনামে দেবতাদের শক্তির সব শিখরমালা।

তাঁরা রামকে বললেন, "শাধি কিং করবাম্ তে? প্রণত আমরা, কী করব আজ্ঞা করুন।"

প্রসন্ন মনে রাম তাঁদের সাদরে স্নেহকরস্পর্শ করে বললেন, "তোমরা আমার মানসে বিরাজ করো। কার্যকালে আমার মনে অধিষ্ঠান থেকে সাহায্য কোরো।"

প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালোভ্য চ পাণিনা।
মানসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ॥

(আদিকাণ্ড, ২৭/২৭)

মানসাঃ কার্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ॥

(আদিকাণ্ড, ২৮/১৪)

আবার চলেছেন বিশ্বামিত্র।...

পিছনে রাম আর লক্ষ্মণ।

দীর্ঘপথে দুর্গম যাত্রায় এতদিন তো হয়ে গেল কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে একটি কথাও নেই। নীরবে ছায়ার মতো কেবল রামের অনুসরণ করে চলেছেন। প্রয়োজনে রামের পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্র ধরছেন, যুদ্ধ করছেন, কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। মৌন বনানী, মৌন ছায়া, মৌন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের এই নীরব ভাবমূর্তি আমাদের অন্তরে গভীরভাবে স্পর্শ করে। স্নেহ ভক্তি ভালবাসার এমন নির্বাক ছবি বাল্মীকি আমাদের অতি নিপুণ কৌশলে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

যেতে যেতে রাম একসময় দূরে ছায়াঘেরা এক পর্বতসানুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহর্ষি, আমরা গভীর বন পেরিয়ে এলাম। চারিদিকে এখন উন্মুক্ত প্রসার। আকাশভরা আলো আর বাতাস। স্থানটি বড় পুণ্যময় সুখকর লাগছে। ওই পাহাড়ের তলায় মেঘের কোলে ছায়াঘেরা এক সুন্দর আশ্রম দেখতে পাচ্ছি। নানারঙের কত পাখি উড়ছে। নীলনয়ন কত মৃগশিশু বিচরণ করছে। কার ওই পুণ্য আশ্রম?"

—"বৎস, ওই সেই পবিত্র সিদ্ধাশ্রম। ওখানে স্বয়ং বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মহাতপা কশ্যপও একদা ওখানে তপস্যা করে বিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন। বামনরূপে অবতীর্ণ হয়ে বিষ্ণু বিরোচনের পুত্র বলির যজ্ঞে ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। বলিকে নিগৃহীত করে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ওই সিদ্ধাশ্রমে এখন আমি বাস করি। ওখানেই হবে আমার যজ্ঞ। তুমি সেই যজ্ঞ রক্ষা করবে। তবে সাবধান, অনেক বিঘ্ন আসবে। বিপদ আসবে।"

এই বলে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কর্পূর ধূপে আমোদিত পবিত্র আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন।

পাঁচ

সন্ন্যাসী মারীচ

ঋষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞে বসেছেন। ছয় দিন ধরে চলবে তাঁর এই মহাযজ্ঞ। যজ্ঞবেদী প্রস্তুত। পবিত্র বেদীর চতুর্দিকে সমাসীন উপাধ্যায় পুরোহিত হোতা উদ্গাতা। থরে থরে সজ্জিত সকল উপচার—কুশ চমস স্রুকপাত্র সমিধ ঘৃতকলস। নানা বর্ণের পুষ্পডালি। বেদমন্ত্র পাঠ হচ্ছে। ফুলের গন্ধ ধূপের সৌরভ আর মন্ত্রের ধ্বনিতে ভাবগম্ভীর আশ্রম। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাসনে মৌন হয়ে যজ্ঞ ধারণ করে রয়েছেন।

অস্ত্রধারী রাম-লক্ষ্মণ উদ্যত শরাসনে বিনিদ্র হয়ে প্রহরা দিচ্ছেন।

যজ্ঞ হয়ে চলেছে।..

নির্বিঘ্নে কাটল পঞ্চরাত্রি।...

সকলের মনে তবু উৎকণ্ঠা। সব শুভকর্মেই তো আসে পদে-পদে বাধা।

ষষ্ঠ দিনে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত হল। বেদমন্ত্র যেন অগ্নিশিখা হয়ে লেলিহান হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সকলে চমকে উঠল।

এক অশুভ ঘোর শব্দে আকাশ কম্পিত হতে লাগল। চারিদিক আঁধার করে এল।

শস্ত্রভৃত রাম সচকিত হয়ে উঠলেন। পদ্মপলাশ আঁখিতে তাঁর বিক্রমবহ্নি। বুঝলেন, শত্রু এসেছে। এই মুহূর্তটির জন্যই তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। শুভযজ্ঞের অগ্নিতে আগে জেগে ওঠে যত অশুভ বিরোধী অপশক্তির অন্ধকার।

দেখলেন যজ্ঞবেদির পাশে আকাশ থেকে পড়ছে যত অশুচি রক্তধারা। শূন্যের অন্ধকারে যত বিকট রাক্ষসমূর্তি। তাদের চালনা করছে ক্রুদ্ধচক্ষু মারীচ আর সুবাহু।

কার্মুক টংকার দিয়ে রাম বললেন, "লক্ষ্মণ, দেখ। ওই যে সব রাক্ষস এসেছে। দুর্বৃত্ত নরখাদক। ওরা স্বভাবে হীন। ওদের মেরে কি হবে! বায়ু যেমন আকাশের মেঘকে সরিয়ে দেয়, তেমনি মানবাস্ত্র দিয়ে আমি ওদের দূরে হটিয়ে দেব।

রামের ধনুতে জ্বলে উঠল ভীষণ মানবাস্ত্র। সেই অস্ত্রের আঘাতে পরাভূত মারীচ হতচেতন হয়ে নিক্ষিপ্ত হল শতযোজন দূরে সমুদ্রের গর্ভে। নিহত হল সুবাহু। রামের দিব্যাস্ত্র নিমেষের মধ্যে বধ করল শত শত রাক্ষসবাহিনী।

অন্ধকার সরে গেল।...

যজ্ঞের বিঘ্ন দূর হল।...

বীরশ্রেষ্ঠ রাম। কিন্তু তাঁর হৃদয়খানি পদ্মকোষের মতো কোমল। মমতাময় হৃদয় তাঁর বীরত্বকে দিয়েছে এক মহত্ত্ব ও মর্যাদা। ক্ষমা আর দয়ার দুই অটল তটে বাঁধা রামের বীরত্ব।

তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যতবার অস্ত্র তুলে ধরেন, ততবারই তাঁর প্রেমের হৃদয় বলে, আমি এদের হত্যা করতে চাই না—"নোৎসহে হন্তমীদৃশান" (আদিকাণ্ড ৩০/১৬), "নহ্যেনামুৎসহে হন্তুং (আদিপর্ব ২৬/১২)।

রামের যুদ্ধশিবিরে রাবণের গুপ্তচর শুক ও সারণ অনুপ্রবেশ করেছে। বিভীষণ তাদের চিনতে পেরে ধরে ফেলেছেন। রামের কাছে নিয়ে এসে বলছেন, "মহারাজ, এরা রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ। ছদ্মবেশে যুদ্ধ শিবিরে প্রবেশ করে আমাদের সৈন্যবল ও সকল গুপ্তসংবাদ জেনে নিতে এসেছে।"

বন্দি দুই রাক্ষস তখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে করজোড়ে কাঁপছে।...

শত্রুর গুপ্তচর। তাদের প্রাণদণ্ডই রাজধর্মের বিধি।

কিন্তু রাম ঈষৎ হাস্যে প্রসন্ন বদনে তাদের বললেন, "ভয় নেই। ধরা পড়লেও আমি তোমাদের প্রাণে মারব না। ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভেতব্যং জীবিতং প্রতি।" (যুদ্ধকাণ্ড, ২৫/২০)

এমনকী চরম শত্রু যে রাবণ, যখন সে যুদ্ধে আহত অবসন্ন হতোন্মুখ, যখন একটি মাত্র আঘাতেই তাকে বধ করা যায়, জয়লাভের এমন সুযোগ পেয়েও রাম তা গ্রহণ করলেন না। তিনি অস্ত্র সংবরণ করলেন। রণক্লান্ত শত্রুকে রাম কখনো আঘাত করেন না। মুমূর্ষু রাবণকে নিয়ে তার সারথি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। (যুদ্ধকাণ্ড, ১০৩ সর্গ)

এমন দৃশ্য আমরা বারবার দেখি। রাম যখন শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করেন, তখনও তাঁর মনে কোনো ক্রোধ নেই, হিংসা নেই, নিষ্ঠুরতা নেই। শান্তচিত্তে কল্যাণবুদ্ধি নিয়ে ক্ষত্রিয় ধর্মে উদ্‌বোধিত অন্তরে তিনি তাঁর অস্ত্র হানেন। রামের এই মহত্ত্বকে অকপটে স্বীকার করেছে তাঁরই চিরশত্রু রাবণ। রাবণ মারীচকে বলছে, "রাম যুদ্ধের সময় ক্রুদ্ধ হয় না। একটিও কর্কশবাক্য বলে না। 'অনুক্ত্বা পরুষং কিঞ্চিচ্ছিবৈর্ব্যাপারিতং ধনুঃ'।" (অরণ্যকাণ্ড ৬৩/৮)

রাম অনায়াসেই মারীচকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু তাকে প্রাণে মারলেন না। আহত করে দূরে নিক্ষেপ করলেন মাত্র। মারীচের জন্য তাঁর মনে হয়তো দয়া হয়েছিল। হতভাগ্য মারীচ। অগস্ত্যের অভিশাপে পিতা সুন্দকে হারিয়েছে। মাতা সুন্দরী যক্ষিণী; চোখের সামনে হয়ে গেল রাক্ষসী তাড়কা। বিড়ম্বিত সে নিজেও হল রাক্ষস। আশ্রয় নিল রাক্ষসরাজ রাবণের। মারীচের জীবনের এই বিপর্যয় পতিতপাবন রামকে ব্যথিত করেছিল। তাছাড়া কদিন আগে তার মাতা তাড়কাকে তিনি বধ করেছেন। তাই মারীচকে বধ করতে তাঁর হাত উঠল না। মহাকবি কালিদাস বড় সুন্দর করে বলেছেন, রাম যে পুত্রহীনের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, অনাথের নাথ—"পিতৃমান বিনেত্রাতৈনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী" (রঘুবংশ, ১৪/২৩)।

রামের দয়া মারীচের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এল। শাসনে যা হয় না অনেক সময় ক্ষমা সেখানে আশ্চর্য সাধন করে। শাসন কেবল দুষ্ট প্রাণটাকে ছিন্ন করতে পারে, কিন্তু ক্ষমা সর্বক্ষেত্রে না হলেও মলিন প্রাণে দিতে পারে উজ্জীবনের আলো। রামের ক্ষমা রাক্ষস মারীচকে রূপান্তরিত করে দিল। সে বুঝেছিল, রাম তাকে দয়া করেই বধ করেননি। মারীচ নিজেই বলেছে, "নেচ্ছতা মাং হন্তুং" (অরণ্যকাণ্ড, ৩৮/২০)।

মারীচের যেন নবজন্ম হল।

অনুতপ্ত সে। রামের রূপে গুণে মহত্ত্বে মুগ্ধ। সমুদ্রের উত্তরকূলে রমণীয় অরণ্যে কুটির বেঁধে মারীচ সন্ন্যাসী হয়ে তপস্যা করতে লাগল। কৃষ্ণাজিন জটামণ্ডলধারী নিয়ত-আহারী সন্ন্যাসী মারীচ। (অরণ্যকাণ্ড, ৩৫/৩৮)

দিবারাত্র স্বপ্নে জাগরণে রামকে দর্শন করে। সমস্ত বনকানন তার চোখে রামময়। প্রতিটি বৃক্ষ যেন তার চোখে কৃষ্ণাজিনধারী রামমূর্তি। "বৃক্ষে বৃক্ষে হি পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনম্বরম্" (অরণ্যকাণ্ড, ৩৯/১৫)। রাম তার চোখে বিগ্রহবান্ সাক্ষাৎ ধর্ম। দেবরাজ ইন্দ্রের মতো জগৎচরাচরের প্রভু।

রামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ সাধু সত্যপরাক্রমঃ।
রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ॥

(অরণ্যকাণ্ড, ৩৭/১৩)

একজন রাক্ষসের জীবনে এই রূপান্তর বিস্ময়কর। সীতাহরণের কুপ্রস্তাবে রাবণের প্রতি মারীচের উক্তি আরও বিস্ময়কর। মারীচের গুণ গরিমা মহত্ত্বে আমরা চমৎকৃত হই। তপে ও সত্যে বলিষ্ঠ, নীতি ও ধর্মে উদ্দীপ্ত, মারীচের কথা শুনে দুর্ধর্ষ রাবণ পর্যন্ত সসম্ভ্রমে মেনে নিল। তাকে সমীহ করে লঙ্কায় ফিরে গেল। মারীচ দৃঢ় কঠোর স্বরে রাবণকে বলেছিল, "এই বুদ্ধি আপনাকে কে দিল? জানবেন সে আপনার বন্ধু নয়, শত্রু। আপনি নিজের ও রাক্ষসবংশের ধ্বংস ডেকে আনছেন। কালসাপের মুখে হাত দিতে যাচ্ছেন। যে আপনাকে এই কুমতলব দিয়েছে, জানবেন সে আপনার গুপ্তঘাতক। বড়বানলে ঝাঁপ দিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। আপনি লঙ্কায় ফিরে যান। পরস্ত্রীর প্রতি লোভ ত্যাগ করে নিজের ভার্যাতে অনুরক্ত থাকুন।" (অরণ্যকাণ্ড, ৩১/৪২-৪৯)

রাবণ নিরস্ত হয়ে ফিরে গেল।...

কিন্তু তার সর্বনাশ তার নিয়তি তাকে আবার টেনে নিয়ে এল।

মারীচ আবার দৃঢ়তার সঙ্গে রাবণকে সাবধান করে দিল। রামায়ণের মর্মলোকের একটি মূল সত্যকেই সে যেন উচ্চারণ করল, "সীতার জন্ম কি তবে আপনার মৃত্যুর জন্য? অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা? আপনি অতি দুর্বুদ্ধি দুঃশীল স্বেচ্ছাচারী। পাপসংসর্গে নিজের মৃত্যু ডেকে আনছেন। সূর্য থেকে যেমন তার প্রভাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি শ্রীরামরক্ষিতা সীতাকেও হরণ করা যায় না। রাম প্রজ্বলিত অগ্নি। তীক্ষ্ণ বাণগুলি তার শিখা। খড়্গ আর ধনু সেই অগ্নির ইন্ধন। আপনি সেই আগুনে প্রবেশ করবেন না। আপনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাক্ষসকুল এবং সোনার লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বলপূর্বক পরস্ত্রী গমন অপেক্ষা মহাপাপ আর নেই। পরদারাভিমর্শাত্তু নান্যৎ পাপতরং মহৎ (অরণ্যকাণ্ড, ৩৮/৩০)। যদি বাঁচবার ইচ্ছা থাকে তাহলে নিরস্ত হন।"

নৃশংস রাবণের মুখের উপরে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলার সাহস একমাত্র মারীচেরই ছিল। এই তেজ ও শক্তি সে লাভ করেছিল তপস্যায় তাতে সন্দেহ নেই।

তাই আমাদের ভাবতে কষ্ট হয়, এমন দৃঢ়চেতা মারীচ শেষ পর্যন্ত কি না রাবণের অর্ধরাজ্য দানের প্রলোভনে কিংবা প্রাণনাশের হুমকিতে, লোভে অথবা ভয়ে, তার পাপকর্মের অনুবর্তী হল? রাবণের হাতে বরং মৃত্যু বরণ করাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে কি স্বভাবের

মধ্যে নিহিত তার রাক্ষসপ্রকৃতি এতদিনের তপস্যাতেও সম্পূর্ণ শোধন হয়নি? রক্তে কি তখনো ছিল অতীত জীবনের বিষ? কিংবা মারীচ কি বুঝেছিল, মরতে তাকে হবেই হয় রাবণের হাতে, না-হয় রামের হাতে, বরং ভগবানের হাতে মৃত্যুবরণ করাই ভাল। তাই কি সে বেছে নিল শেষ পর্যন্ত এই আত্মহত্যার পথ? মারীচ নিজেই রাবণকে বলছে, "আমি রামের দর্শন মাত্রই নিহত হব। আর সীতা হরণ করে আপনিও সবংশে নিহত হবেন, একথা নিশ্চিত জানবেন"—

দর্শনাদেব রামস্য হতং মামবধারয়।
আত্মানঞ্চ হতং বিদ্ধি হৃত্বা সীতাং সবান্ধবম্॥

(অরণ্যকাণ্ড, ৪১/১৮)

আমাদের সংশয় হয়, কোথায় যেন একটা মস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে। মারীচ কি সত্যিই রাবণকে সাহায্য করেছিল? প্রাচীন কিছু কিছু জাতক ও পুরাণে সীতা হরণে মারীচের কোনো উল্লেখ নেই। কেবল বলা হয়েছে, রাবণ একাই ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করেছিল।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর রচনা 'অনামকম জাতকম' এ বলা হয়েছে, রাম যখন বনে ফল আহরণ করতে গিয়েছেন তখন এক দুষ্ট নাগ এসে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

'পত্তমচরিয়ম্'-এ (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর) বলছে, লক্ষ্মণের উপর সীতা রক্ষার ভার অর্পণ করে রাম খরদূষণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। যাবার সময় লক্ষ্মণকে বলে গেলেন, "বিপদে পড়লে আমি সিংহনাদ করব। তখন আমার সাহায্যে যাবে, তার আগে নয়। তুমি সীতাকে রক্ষা করো।" রাবণ "অবলোকন" নামে মায়াবিদ্যা বলে এই কথা জানতে পারল। এবং রামের কণ্ঠস্বর নকল করে সিংহনাদ করতে লাগল। লক্ষ্মণ তখন রাম বিপন্ন হয়েছেন এই আশঙ্কায় সীতাকে ছেড়ে রামকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন। সেই অবসরে রাবণ এসে সীতাকে হরণ করে পুষ্পক রথে পালিয়ে যায়।

'ব্রহ্মচক্রে' উল্লেখ আছে, মারীচ নয় শূর্পনখাই মায়ামৃগরূপ ধারণ করেছিল।

কূর্মপুরাণে (নবম খ্রিস্টাব্দে) বলা হয়েছে, রাবণ একাকী অরণ্যে বিচরণ করতে করতে সীতাকে পর্ণকুটিরে দেখতে পেয়ে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে যায়—"চরন্তীং বিজনে বনে...সীতাং গৃহীত্বা"... (কূর্মপুরাণ, উত্তর বিভাগ, ৩৪ অধ্যায়)।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২৯ অধ্যায়ে আছে, রাবণ ভিক্ষুকের রূপ ধরে এসে সীতাকে বলছে, "রানি কৌশল্যা আপনাকে একবার দেখতে চান। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' এই বলে ছল করে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে।

'কথা সরিৎসাগর'-এও মারীচের উল্লেখ নেই। কেবল বলা হয়েছে, রাবণ ছল করে "অহরৎ সীতাং মায়য়া রাবণঃ" (কথা সরিৎসাগর, ৯-১-৬২)।

বাল্মীকি রামায়ণেও কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে লক্ষ্মণ হনুমানকে বলছেন, "এক কামরূপী রাক্ষস এসে পঞ্চবটী আশ্রম থেকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। রাক্ষসাপহৃতা ভার্যারহিতে কামরূপিণা।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৪/১৪) এখানে মারীচের কোনো উল্লেখ নেই।

রামায়ণ ও মহাভারতের গবেষণায় প্রখ্যাত সুপণ্ডিত শ্রীচিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য তাঁর *The Riddle of the Ramayana* গ্রন্থে (পৃ. ১৪৪) একটি যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর

কর্তব্য অনুধাবন করার মতো। শ্রীবৈদ্য বলেছেন, বাল্মীকির আদি রামায়ণে মারীচের মায়ামৃগ রূপ ধারণের কোনো উল্লেখ ছিল না। এই অদ্ভুত রসের গল্পটি লোকরঞ্জনের জন্য পরে সম্ভবত সংযুক্ত হয়েছে। তাঁর যুক্তিতে, মারীচের স্বর্ণমৃগ হওয়ার গল্পটা যদি সত্যি হয় তাহলে পর্ণকুটিরে সীতার সঙ্গে রাবণের সাক্ষাতের বৃত্তান্ত (অরণ্যকাণ্ড, ৪৬ সর্গ থেকে ৫৩ সর্গ পর্যন্ত) অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ হয়ে দাঁড়ায়।

অবস্থাটা তাহলে পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

একটি নাটকীয় পরিস্থিতি। সোনার হরিণ ধরবার জন্য রাম বহুদূরে বনের মধ্যে চলে গেছেন। পর্ণকুটিরে সীতার কাছে লক্ষ্মণ। এমন সময় দূরে রামের আর্ত কণ্ঠস্বর। নিশ্চয় রামের কোনো বিপদ হয়েছে। সীতা অস্থির হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণকে বলছেন, "সৌমিত্র, শীঘ্র যাও। রামকে গিয়ে রক্ষা করো।"

লক্ষ্মণ তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি জানেন, ত্রিভুবনে রামকে বিপন্ন করতে পারে এমন কেউ নেই। নিশ্চয় এ কোনো রাক্ষসী মায়া। তাদের বিভ্রান্ত করে অনিষ্ট করার ষড়যন্ত্র।

সীতা দিশাহারা। অস্থির। লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করছেন অত্যন্ত কদর্য ভাষায়। সীতা যে লক্ষ্মণের চরিত্র নিয়ে এমন কুৎসিত ইঙ্গিত করতে পারেন তা ভাবতেও পারা যায় না। লক্ষ্মণ স্তম্ভিত। আমরাও বিমূঢ়। নিজেদের কানকেও যেন বিশ্বাস হয় না। রামের বিপদ আশঙ্কায় সীতা যেন পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর ধৈর্য মর্যাদা সম্ভ্রম এমনকী সুরুচি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন।

তখন অপমানিত লক্ষ্মণ অরণ্যে ছুটে গেলেন রামের সাহায্যে। আর দুশ্চিন্তার ভয়ে উদ্‌বেগে সীতা পর্ণশালায় বসে থরথর করে কাঁপছেন।...

এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে সন্ন্যাসীর বেশে রাবণের প্রবেশ।

রাবণ এসে কী করল। নিতান্ত কামুকের ভাষায় সীতার অতুলনীয় দেহসৌন্দর্যের স্তব করতে লাগল? সীতার ঘৃণা ও বিরক্তি জাগা স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে ওই পরিস্থিতিতে তো আরও। কিন্তু প্রত্যুত্তরে সীতা রাবণকে আপ্যায়ন করে পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। আতিথ্য দিয়ে সমাদর করলেন। তারপর রাবণের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। দীর্ঘ দুটি সর্গ জুড়ে নিজেদের পরিচয় বনবাসের কাহিনি শোনালেন। একটু আগের ওই চরম উদ্ভ্রান্ত পরিস্থিতিতে সীতার পক্ষে এই আচরণ কি সম্ভব না সংগত? সন্ন্যাসীবেশী রাবণের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের সময় সীতা একবারও বললেন না, একটু আগে কী বিপদ ঘটে গেছে। হোক অতিথি এবং সন্ন্যাসী, তবু সেই অস্থির আর্ত উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে সীতা কী করে এমন ধীরে সুস্থে কথা বললেন? আর বললেন যদি, একটু আগের কথাটা গোপন করলেন কেন? যদি বলা হয়, অজ্ঞাত অপরিচিত অতিথিকে সীতা বিশ্বাস করেননি তাই বলেননি। তাহলে প্রশ্ন, অপরিচিত সেই অতিথিকে বিশ্বাস করে তাঁদের অতীত জীবনের এতকথা বললেন কী করে?

শেষকালে সীতা রাবণকে বলছেন, "আমার স্বামী লক্ষ্মণের সঙ্গে মৃগয়া করতে গেছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। আমি তাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করছি। তত সুবেষং মৃগয়াগতং পতিং প্রতীক্ষমাণা সহলক্ষ্মণং তদা।" (অরণ্যকাণ্ড, ৪৬/৩৮)

সীতার এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাহিনির সূত্র সন্ধানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। আসলে সোনার হরিণ ধরতে নয়, রাম হয়তো মৃগয়ায় গিয়েছিলেন লক্ষ্মণের সাথে। তাও তাই বলছেন। সেই অবসরে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এসেছে রাবণ। একমাত্র তাহলেই তার সমস্ত আচরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। আর মারীচের মায়ামৃগরূপ ধারণ এবং তারই পরিণামে লক্ষ্মণের প্রতি সীতার অপমানকর কটূক্তিভরা এই অদ্ভুতরসের গল্পটি তাহলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। রাবণের প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান এবং তার ভয় দেখানোকে উপেক্ষা করে তপস্বী মারীচের চরিত্রও তাহলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জীবন যখন তার নিজের কাছেই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তখন সব কথার শেষ উত্তর কি এত সহজে মেলে? সেজন্য অপেক্ষা করতে হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মহাকাব্যের চরিত্রগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়। হয়তো তাও হয় না। শেষ যবনিকা পতনের পরেও আমাদের মর্মপটে এক বিস্ময়-জিজ্ঞাসা তখনও কাঁপতে থাকে।

ছয়

অহল্যার বিচার

বিশ্বামিত্রের মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। দিক্ সব প্রসন্ন। যজ্ঞধূমের ঘ্রাণে সুমঙ্গল বাতাস। আশ্রম বনকাননে ফুলে পল্লবে শান্ত মহিমা। যজ্ঞস্নান করে এসে দাঁড়ালেন ঋষি। যেন ঘৃতাহুত জ্বলন্ত হোমশিখা।

—"বীরশ্রেষ্ঠ রাম, গুরুবাক্য সিদ্ধ করেছ। সার্থক তুমি। সার্থক এই সিদ্ধাশ্রম। তোমার বীরত্বে তোমার যশোগৌরবে আজ আমি কৃতার্থ হলাম।"

বিশ্বামিত্র সস্নেহে প্রশংসা করছেন। ঋষিগণ সমবেত হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। রামের প্রশস্ত ললাটে দিনান্তের আলো জয়তিলক এঁকে দিয়েছে। পাশে উজ্জ্বলমূর্তি মৌন লক্ষ্মণ।

এবার তো তাঁদের ফিরে যেতে হবে। স্নেহাতুর পিতা তাঁদের আসা-পথ চেয়ে বসে আছেন। অপেক্ষায় আছে পুণ্যশালিনী অযোধ্যা।

দুজনে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন।

রাম বললেন, "আমরা দুজন আপনার কিংকর। এবার আজ্ঞা করুন"...

বিদায় দিতে মন চায় না। তাই আশ্রম মুনিগণ বললেন, "রাম, আমাদের নিমন্ত্রণ এসেছে। মিথিলায় জনকরাজার সভায় এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আমরা যাব। তোমরাও সঙ্গে চলো। তোমরা গেলে রাজা আপ্যায়িত হবেন। তাছাড়া সেখানে গেলে এক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাবে।"

—"কী সেই আশ্চর্য মহাত্মন্?"

—"একদা যজ্ঞের আশীর্বাদস্বরূপ দেবতারা জনকরাজাকে দিয়েছিলেন স্বর্গের বিখ্যাত হরধনু। মহাদেবের নিজ হস্তের সেই বিশাল দৈবশক্তিচাপ। নাম সুনাভ। নিদ্রিত অনন্তনাগের মতো ভীষণ ('প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভীষণং"—রঘুবংশ ১১/৪৪)। সেই হরধনু জনকভবনে রক্ষিত আছে। ধূপে গন্ধে অগরুচন্দনে নিত্য পূজিত। দেব গন্ধর্ব অসুর ত্রিভুবনে কেউ সেই মহাধনুকে জ্যা আরোপণ করতে পারে না।"

—"ভারতবর্ষের কোনো রাজা, কোনো রাজপুত্র ওই ধনুকে গুণযোজনা করতে পারেননি?"

—"না, রাজকুমার। সবাই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি আমাদের সঙ্গে মিথিলায় যাও তাহলে সেই অদ্ভুত ধনু আর উৎকৃষ্ট যজ্ঞ দেখতে পাবে।"

শুনে রাম-লক্ষ্মণ উৎসাহিত হলেন।

আকাশের পুনর্বসু নক্ষত্রদ্বয়ের মতো দুই ভাই ঋষিদের সঙ্গে চললেন মিথিলায়। "গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূঃ" (রঘুবংশে ১১/৩৬)।

সিদ্ধাশ্রম থেকে তাঁরা যাত্রা করলেন উত্তরাভিমুখে।

সমস্ত আশ্রম যেন মুহ্যমান। পুষ্পলতা ম্রিয়মাণ। পাখি ডাকে না। মৃগশিশু তৃণ ভক্ষণ করে না। হংস সারসের দল জলবিহার করে না। পক্ষপুটে চঞ্চু রেখে নীরবে বসে আছে সরোবর তটে। তাদের প্রাণের আনন্দ আজ চলে যাচ্ছে।...

আশ্রম বনদেবতাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঋষি।

আলো-ছায়া-ঘেরা বনপথ দিয়ে চলেছেন তাঁরা। মৃগপক্ষীগণ তাঁদের পিছনে পিছনে আসছে। বিশ্বামিত্র সস্নেহে অনেক করে তাদের নিবৃত্ত করলেন।

মৃগপক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
অনুজগ্মহাত্মানো বিশ্বামিত্রং তপোধনম্॥
নিবর্তয়ামাস ততঃ সর্ষিসঙঘঃ স পক্ষিণঃ।

(আদিকাণ্ড, ৩১/১৮-১৯)

এমনি করে রামায়ণের প্রতিটি ছন্দকম্পনে রয়েছে স্নেহ প্রেম ভালবাসার সজল ছায়া। প্রতিটি বৃক্ষলতা পশুপক্ষী অরণ্য চরাচর যেন এক একটি জীবন্ত চরিত্র। তাদের নীরব আঁখি, সরব কাকলি, সবুজ পত্রপল্লবের মর্মরবিতান, অহরহ রামায়ণের অনুচ্চারিত মর্মকথাটি বলে যায়। রামের জীবনে সীতা যত আপন যত সুন্দর, ঠিক ততখানি সুন্দর ও আপন হল এই শ্বেতসলিলা গঙ্গা, নীলধারা যমুনা, চিত্রকূটের মুক্তাহার মন্দাকিনী। সরযূর জলে রাজহংসমালা। গোদাবরী-বক্ষবিহারী সারসশ্রেণী। পুষ্পলাবতী পম্পাসরোবর। মধুগন্ধেভরা বনকানন। আধফোটা কদম্বকেশর। স্তনস্তবকে আনত তন্বী অশোকলতা। উন্মুখনয়ন বনের হরিণ। এই সবকিছু নিয়ে রামায়ণের আকাশ বাতাস প্রভাত সন্ধ্যা জুড়ে রয়েছে রামের দৃষ্টি, সীতার নিঃশ্বাস। উজ্জ্বল আকাশ যেন রামের শাণিত অস্ত্রের দীপ্তি—"নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩০/৩৬)। প্রতিটি সুপ্রভাত যেন ঋষিপ্রবোধিত রামের প্রসন্ন অন্তর— "প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ (আদিকাণ্ড, ২৬/৩৬)। সন্ধ্যা যেন সুখস্পর্শে উন্মীলিতা রাগবতী (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩০/৪৫) রাত্রি যেন জ্যোৎস্নাময়ী শুক্লাম্বরা নারী—"পুক্লাংশুক সংহতাঙ্গী" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩০/৪৬)। শীতের রাতে আকাশের হিমক্লিষ্ট চন্দ্রমা তো সীতারই মলিন মুখচ্ছবি—"জ্যোৎস্নাতুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং"... (অরণ্যকাণ্ড, ১৬/১৪)। আবার হেমন্তের মাঠে পাকাধানের সোনার মঞ্জরী, সে তো সীতার হেমকান্তি আনত মুখশ্রী— "শিরভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ" (অরণ্যকাণ্ড, ১৬/১৭)। বনান্তরালে পদ্মগন্ধেভরা নির্মল বায়ুর নিঃস্বন তো সীতারই নিঃশ্বাস বায়ু—

পদ্মকেশরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিসৃতঃ।
নিঃশ্বাস ইব সীতয়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১/৭২)

এমনি করে রামায়ণের আকাশে বাতাসে বনে বনান্তরে সীতার স্পর্শ, সীতার নিঃশ্বাস। তিনি শুধু রঘুবংশের গোত্রমঙ্গল "নারীনামুত্তমা বধূঃ" (আদিকাণ্ড, ১/২৭) নন, সীতা হলেন

ভারতলক্ষ্মী। ভারতমাতা। ভারতের চিরসীমন্তিনী হিন্দু নারীর অক্ষয় সিঁথির সিন্দুর। চিরগৌরব সতীত্বের রক্তরাগ। মহাকবি কালিদাস তাই বলেছেন, বর্ষাপগত শরৎজ্যোৎস্নার মতো ধরিত্রীদেবী সীতা—"বর্ষাতায়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দো...ধৃতিমতীং" (রঘুবংশ, ১৩/৭৭)। জগৎপ্রকৃতি সীতারই আলম্বন বিভাব।

তাই রামায়ণের পঞ্চবটী তমসা মুরলা পৃথিবী জীবন্ত রূপ ধরে এসেছে ভবভূতির নাটকে। তারা মুখফুটে বলেছে সেই সব কথা ও ব্যথা, যা তারা রামায়ণে মৌন থেকেই ব্যক্ত করেছে। রামায়ণে তারা কথা বলে না কিন্তু ইঙ্গিতে সব বলে দেয়—'বক্তুকামা ইহ হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে" (অরণ্যকাণ্ড, ৬৪/১৬)।

সীতা হরণের পর শোকার্ত রাম যখন বনে-বনে ছুটে বেড়াচ্ছেন, প্রতিটি বৃক্ষলতাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তোমরা কি সীতাকে দেখেছ? যদি দেখে থাক আমাকে বল। শংস ত্বং। শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা।"

তখন একটা হরিণ বারবার রামের দিকে তাকাচ্ছে। সে যেন কি বলতে চায়।

রাম হরিণটির দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সীতা কোথায়? ক্ব সীতেতি?

সেই হরিণ সহসা তখন তারা শৃঙ্গ নেড়ে মাথা তুলে আকাশের দিকে দেখাল। তারপর বারবার রামের দিকে তাকাতে-তাকাতে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল। একবার পথের দিকে তাকায়, একবার রামের দিকে তাকায়। আর থেকে থেকে কাতর শব্দ করতে থাকে।

লক্ষ্মণ বুঝলেন হরিণটি ইঙ্গিতে কী যেন বলতে চায়। তিনি রামকে বললেন, "ও আমাদের দক্ষিণ দিক দেখিয়ে দিচ্ছে। চলুন, আমরা ওই দিকে যাই।"

শোকে দুঃখে আনন্দে বেদনায় এরা এমনি করে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

রামের বিবাহের পরে অযোধ্যায় ফেরার পথে পশুপক্ষীদের দারুণ অশুভ শব্দ শুনে দশরথ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করছেন। বশিষ্ঠ বলছেন, "মহারাজ পশুপক্ষীদের কলরবে মনে হচ্ছে সম্মুখে ভীষণ ভয় উপস্থিত। কিন্তু বনের হরিণ আমাদের প্রদক্ষিণ করছে। তাদের ইঙ্গিতে মনে হয় ওই ভয় প্রশমিত হবে।

এমনি করে এদের অস্ফুট শব্দে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে নিবিড় করে ধরেছে মহাকাব্যের যত না-বলা বাণীর ঘনদ্যোতনা।

তাই যাওয়ার সময় বিশ্বামিত্র বন-দেবতাদের সান্ত্বনা দেন। আশ্রমপালিত মৃগশিশুদের অনেক কষ্টে প্রতিনিবৃত্ত করেন। নদী পার হওয়ার সময় সপ্তধারা গঙ্গার স্তব করেন। জীবন আর প্রকৃতি যেন সহস্র স্নেহের নাড়ীতে বাঁধা। এদের ভোলা যায় না। জোর করে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না। নানা আখ্যান উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে এই বন্ধনকে আরও অটুট করে ধরা হয়েছে।

মিথিলার পথে চলতে চলতে বিশ্বামিত্র সেই সব উপাখ্যান বলতে থাকেন। পথে কত দেশ কত জনপদ। তার সঙ্গে জড়িয়ে কত ইতিহাস পুরাণ। ভগীরথের তপস্যা, গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ, ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন, তাতে উঠল অমৃত আর হলাহল। দেবতারা অমৃত পান করলেন। আর মহাদেব কণ্ঠে ধারণ করলেন হলাহল। প্রাচীন ভারতের কত তপস্যা কত তীর্থ কত নগর। রাম-লক্ষ্মণ শুনে রোমাঞ্চিত হন। এইভাবে কথায়-কথায় কবি বাল্মীকি গড়ে তুলছেন রামের জীবনের সকল সুখ-দুঃখের আধার ভারতের ভাগবত শরীর।

এক সন্ধ্যায় তাঁরা এলেন শোণ নদীর কূলে। সেই কৌশাম্বী গিরিব্রজ দেশ। পাঁচটি পর্বতের ভিতর দিয়ে তরল মুক্তার মতো প্রবাহিত সুমাগধী নদী। এখানে বিশ্বামিত্র নিজের পরিচয় দিয়ে চমকিত করলেন। আমরা অবাক হই। পথের ধারে বৃক্ষমূলে বসে আছেন যে ঋষি, বিশ্বাস হয় না, একদিন তিনিই ছিলেন এই রাজ্যের রাজা। নরপতি কুশনাভের পুত্র সম্রাট গাধির তনয় বিশ্বামিত্র।

—"রাম, পরম ধার্মিক রাজা। গাধি আমার পিতা। আমার জ্যেষ্ঠভগ্নী সত্যবতী। মহর্ষি ঋচিকের পত্নী। আমার ভগ্নী বড় পুণ্যবতী ছিলেন। তাঁরই মাহাত্ম্য নিয়ে প্রবাহিত হিমালয়ের কৌশিকী নদী। বড় স্নেহশীলা সেই নদী। সেই নদী আমাকে ডাকে। আমি তাই কোথাও থাকতে পারি না। এমনকী সিদ্ধাশ্রমেও না। ছুটে আসি এই হিমালয়ে।"

ঋষির কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে। বাষ্পাকুল আঁখির দৃষ্টি।...

ক্রমে রাত নামে।...

দূরে শোণ নদীর গর্জন। তারাভরা রাতের আকাশ। ধীরে-ধীরে চাঁদ উঠছে। বনবৃক্ষের শাখাপল্লবে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। কুলায় নিদ্রিত পাখি। অন্ধকার নিঃশব্দ চরাচর।...

পাখির ডাকে সুপ্রভাত হল।

তাঁরা মিথিলায় এসে উপস্থিত হলেন।

সুরম্য নগরী। মঙ্গলময় সৌধপ্রাকারবেষ্টিত জনকের রাজধানী। তাঁরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে সব দেখতে দেখতে চলেছেন। যেতে-যেতে একটা উপবন দেখলেন। মনে হয় এককালে কোনো মনোরম আশ্রম ছিল। আজ লোকালয়-বর্জিত পরিত্যক্ত নির্জন। আগাছা জঙ্গলে কণ্টকাকীর্ণ।

রামায়ণের অন্তরের এক গভীর ক্ষতস্থানে বিশ্বামিত্র আমাদের এনে উপস্থিত করেছেন। অভিশপ্ত বেদনায় পাষাণ-চাপা দুঃখ এখানে পাথর হয়ে আছে। নারীর সতীত্বের লাঞ্ছনার এক বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস। রামের কাছে তা যেন এক দারুণ নৈতিক প্রশ্ন হয়ে বহুকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে। বুঝি রামের জীবনের এক ভাগ্যপরিহাস।

কী করবেন রাম? এখন যা করবেন, পরবর্তীকালে নিজের জীবনে কি তাই করতে পারবেন? আর কদিন পরেই তো হবে রামের বিবাহ। জনকনন্দিনী সীতার পতি হবেন তিনি। অসতীত্বের অপবাদে অভিশপ্ত অহল্যাকে আজ তিনি উদ্ধার করবেন ঠিকই। কিন্তু ভবিষ্যতে লোক অপবাদে অভিশপ্ত সীতাকে কি তিনি উদ্ধার করতে পারবেন? পাষাণী অহল্যার উদ্ধার হবে; কিন্তু সীতার জন্য তিনি যে নিজেই হয়ে যাবেন পাষাণ। পাথর জীবন্ত হবে, কিন্তু জীবন্ত সীতা হয়ে যাবেন সোনার প্রতিমা। এ রামের গৌরব, না ব্যর্থতা? সমগ্র রামায়ণে কবি তারই উত্তর দেবেন। এখন শুধু ঘটনা সন্নিবেশে সেই বিষাদ-গম্ভীর প্রশ্নটিই তুলে ধরলেন।...

রাম জিজ্ঞাসা করলেন, "মহর্ষি, এই তপোবন একসময় কোনো আশ্রম ছিল বলে মনে হচ্ছে। আজ কেমন নির্জন হতশ্রী হয়ে পড়ে আছে। এখানে কোনো মুনি ঋষি বাস করেন না কেন?

—"বৎস রাম, এ এক অভিশপ্ত স্থান। কিন্তু একদিন দেবগণপূজিত স্বর্গাশ্রমের মতো পবিত্র ছিল। মহর্ষি গৌতম তাঁর পত্নী ব্রহ্মার কন্যা অহল্যার সঙ্গে এখানে তপস্যা করতেন।"

—"তারপর?"

—"সে এক করুণ কাহিনি। একদা মহর্ষি গৌতম আশ্রমে ছিলেন না। কুটিরে একা ছিলেন অহল্যা। তিনি পরমা সুন্দরী। তাই ইন্দ্র কামার্ত হয়ে গৌতম মুনির ছদ্মবেশে অহল্যার কাছে এলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে কামনা করলেন। দুর্বুদ্ধি অহল্যা দুর্বলতাবশত সম্মত হলেন। তারপর হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রকে বললেন, সুরশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এখন শীঘ্র পলায়ন করুন। গৌতমের ক্রোধ থেকে নিজেকে এবং আমাকে রক্ষা করুন।

হর্ষোৎফুল্ল ইন্দ্র তখন হাসতে হাসতে কুটির থেকে নির্গত হচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখলেন, দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন মহর্ষি গৌতম। তীর্থস্নান করে ফিরছেন। হাতে যজ্ঞের কুশ ও সমিধ। তপোবলে প্রদীপ্ত দেহ। উজ্জ্বল দৃষ্টি। তাঁকে দেখে ভয়ে ইন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল। ত্রস্তে পলায়নপর ইন্দ্রকে দেখে সর্বজ্ঞ ঋষি সব বুঝতে পারলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। অভিশাপ দিলেন অহল্যাকে, অনুতপ্তচিত্তে এইখানে থাক তুমি। লোকচক্ষুর আড়ালে অনাহারে ভস্মশয্যায় বায়ুভুক হয়ে। যেদিন দাশরথি রাম এসে দর্শন দেবেন, সেই দিন তুমি উদ্ধার পাবে। রাম, এই সেই অভিশপ্ত গৌতম আশ্রম। তুমি আশ্রমে প্রবেশ করে অহল্যাকে শাপমুক্ত কর।"

বড় যত্নে বড় মমতায় বাল্মীকি এখানে অহল্যার করুণ মূর্তিখানি এঁকে ধরেছেন। অনুতপ্ত অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণতনু পাষাণ প্রতিমা। মৌন এক তপঃপ্রভা। মানুষ দূরের কথা, দেবতারাও সেদিকে তাকাতে পারেন না। এক জ্যোতির্ময় মায়াময় দিব্য আলোকের স্থির স্থাপত্য। ধূমাচ্ছাদিত যেন অগ্নিশিখা। মেঘতুষারে ঢাকা যেন পূর্ণচন্দ্র। জলমগ্ন যেন সূর্যপ্রতিবিম্ব।

দর্দশ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ॥
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব॥

(আদিকাণ্ড, ৪৯/১৩-১৫)

সত্য হোক আর মিথ্যা হোক রূপসীর ভাগ্যে কলঙ্ক রটে। কিন্তু এতখানি রূপের সঙ্গে এতবড়ো কলঙ্ক অহল্যা ছাড়া আর কারো হয়নি। বিনাবিচারে অহল্যা শাস্তি পেয়েছেন। প্রশ্ন জাগে, অহল্যা কি সত্যিই দোষী? সে কি ব্যভিচারিণী?

বিশ্বামিত্রের কথায় অবশ্য তাই প্রমাণ হয়। তিনি অহল্যাকে দোষী "দুর্মেধা" বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, "ইন্দ্র গৌতম মুনির ছদ্মবেশে এলেও অহল্যাকে প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের পরিচয় জেনেই অহল্যা সম্মত হয়েছিলেন। পরে অহল্যা আরও বলেছেন, আমি কৃতার্থ হলাম। এবার তুমি পালিয়ে যাও। গৌতমের ক্রোধ থেকে নিজেকে এবং আমাকে রক্ষা কর।"

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥...

কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।।
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ।

(আদিকাণ্ড, ৪৮/১৯-২১)

স্পষ্টত এই উক্তি অহল্যার বিরুদ্ধে একটা বড় সাক্ষী। কিন্তু, বিশ্বামিত্র ছাড়াও রামায়ণে আরও সাক্ষ্য আছে। তাতে অহল্যা নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে তার সম্পর্কে সবটা জানা দরকাব। যিনি সবটা জানেন তাঁর কথাই বেশি প্রণিধানযোগ্য। উত্তরকাণ্ডে ৩০ সর্গে স্বয়ং ব্রহ্মা বলছেন অহল্যার জন্ম থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত। তিনি যা বলছেন তা বিশ্বামিত্রের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রহ্মা বলছেন, ইন্দ্র গৌতম মুনির ছদ্মবেশে আসেন। ইন্দ্র অহল্যাকে নিজের পরিচয় দেননি। অহল্যা নিজের স্বামী বলেই ইন্দ্রকে মনে করেছিলেন। তাই ক্রুদ্ধ গৌতমকে অহল্যা বলেছেন, "মহর্ষি আমি তাকে চিনতে পারিনি। আমি জানতাম না। ইন্দ্র আপনার রূপ ধরে এসেছিল। সে আমাকে প্রতারণা করে কলঙ্কিত করেছে। যা ঘটেছে তা আমার স্বেচ্ছাচারে নয়, আমার অজ্ঞানতায়।"

অজ্ঞানাদ্ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেন দিবৌকসা।
ন কামকারাদ্ বিপ্রর্ষে প্রমাদং কর্তুমর্হসি।।

(উত্তরকাণ্ড, ৩০/৪২)

তাহলে অহল্যার দোষ কোথায়? অপরাধ যদি হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ ইন্দ্রের। ইন্দ্র চিরকালই অহল্যার প্রতি লুব্ধ ছিলেন। সেই সব কথা ব্রহ্মা এখানে বলে দিচ্ছেন। তিনি সব জানেন। কেননা অহল্যা তাঁর কন্যা। জগতের সকল জীবের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য নিয়ে তিনি যে নারীমূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে কোনো 'হল' অর্থাৎ শ্রীহীনতা ছিল না। তাই নাম রাখলেন অহল্যা। "যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা" (উত্তরকাণ্ড, ৩০/২৫)। তিনি ভাবলেন, এই পরমা সুন্দরী কার পত্নী হবে? সকল দেবতা অহল্যাকে মনে মনে কামনা করতে লাগলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ধরেই নিলেন অহল্যা হবে তাঁরই পত্নী। কিন্তু ব্রহ্মা আপাতত অহল্যাকে গৌতম মুনির আশ্রমে রেখে এলেন। অনেক দিন পরে গৌতম অহল্যাকে পুনরায় ব্রহ্মার কাছে প্রত্যার্পণ করলেন। মুনির এই সংযম ত্যাগ ও তপঃসিদ্ধি দেখে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন। এবং তাঁরই হাতে পত্নীরূপে দান করলেন অহল্যাকে। গৌতম-অহল্যার পুত্র হল শতানন্দ, যিনি জনকরাজার পুরোহিত (আদিকাণ্ড, ৫১/২)। জনকের যজ্ঞশালায় বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ সহ প্রবেশ করলে শতানন্দ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছেন, "এই রাজপুত্র কি দীর্ঘ তপস্যা নিরতা আমার যশস্বিনী মাতাকে দেখেছেন? আমার মায়ের প্রতি ইন্দ্রের দুষ্ট আচরণের কথা কি রামকে বলেছেন? অপি রামায় কথিতং...দেবেন দুরনুষ্ঠিতম্? (আদিকাণ্ড, ৫১/৬) নিরপরাধিনী মাতার জন্য পুত্রের বুকের ব্যথাটা আমরা অনুভব করতে পারি। অহল্যার এক কন্যার কথাও আছে মহাভারতে, তার সঙ্গে গৌতমের শিষ্য উতঙ্কের বিবাহ হয়।

অনেকে মনে করেন অহল্যা ভূমির প্রতীক। যেখানে 'হল' অর্থাৎ লাঙ্গল চলেনি (virgin land)। রবীন্দ্রনাথ এইরকম একটা অর্থ দেখেছেন। ভূমির সঙ্গে বর্ষার দেবতা ইন্দ্রের একটা সম্পর্ক আছে। হয়তো তাই থেকে পরে ইন্দ্র অহল্যার গল্পটি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাব্যের বিচারে সে আলোচনা এখানে গৌণ।

যাইহোক ইন্দ্রের মুখের উপরে ব্রহ্মা বলছেন, "অহল্যাকে না পেয়ে তুমি নিরাশ ও কুপিত হয়ে উঠলে। তোমার মন কামে পূর্ণ ছিল। তুমি কামার্ত হয়ে মুনির আশ্রমে গিয়ে অহল্যাকে ধর্ষিতা করেছ।"

ত্বং ক্রুদ্ধাস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্তেন সমন্যুনা॥

(উত্তরকাণ্ড, ৩০/৩১-৩২)

অহল্যার যে দোষ ছিল না তার আরও কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আমরা উপস্থিত করতে পারি। যেমন,

ব্রহ্মপুরাণ বলছে, অহল্যা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে চিনতে পারেননি—"ন বুবোধ ত্বহল্যা তং জারং মেনে তু গৌতমম্" (ব্রহ্মপুরাণ, ৮৭/৪৪)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দুবার অহল্যাকে নির্দোষ বলা হয়েছে। ইন্দ্র বারবার এসে অহল্যাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন। প্ররোচিত করছেন। ইন্দ্রের পত্নী শচীকে তাঁর দাসী করে দেবেন এমন কথাও বলছেন। কিন্তু অহল্যা রূঢ়ভাবে তাকে প্রত্যাখান করেছেন। ইন্দ্রের সেই সব কামুক প্রস্তাবের কথা গৌতমকে এসে বলে দিচ্ছেন অহল্যা। শেষ পর্যন্ত অহল্যাকে রাজি করতে না-পেরে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে এসে তাঁকে কলঙ্কিত করলেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, ৪৩ ও ৬১ অধ্যায়)

স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ডে (৬, ৮০ ও ৬১ অধ্যায়ে) অহল্যাকে নির্দোষ বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণের অনেক শ্লোকই হুবহু মহাভারত থেকে নেওয়া।

মহাভারতেও সর্বত্র অহল্যা নির্দোষ প্রমাণিত। তাঁর প্রতি কোথাও গৌতমের অভিশাপের উল্লেখ নেই। শান্তিপর্বে আমরা দেখি, গৌতম মনে মনে অনেক চিন্তা করে বলছেন, "ইন্দ্রের আসক্তির জন্য যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল, তার জন্য আমার স্ত্রী বা আমার কোনো অপরাধ নেই"—

পরবানস্মি চৈত্যুক্ত প্রণয়িষ্যতি তেন চ।
অত্র চাকুশলে জাতে স্ত্রিয়া নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥
এবং ন স্ত্রী চৈবাহং...অপরাধ্যতি

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৬৬/৪৯-৫০)

উদ্যোগপর্বে নহুষ দেবতাদের কাছে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন; কিন্তু অহল্যার কোনো দোষের কথা বলছেন না। নহুষ বলছেন. "গৌতমপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেছিল ইন্দ্র। আপনারা তাকে নিবারণ করেননি কেন?

অহল্যা ধর্ষিতা পূর্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী।
জীবিতো ভর্তুরিন্দ্রেণ স বঃ কিং ন নিবারিতঃ।।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১২/৬)

কালিদাস অবশ্য এই বিতর্ক এড়িয়ে গেছেন তাঁর কবিত্বের চাতুর্য দিয়ে। তিনি শুধু সংক্ষেপে বলেছেন, অহল্যা ক্ষণকালের জন্য ইন্দ্রের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন—"বাসবক্ষণকলত্রতাং

যযৌ'' (রঘুবংশ, ১১/১৩)। অহল্যা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেছিলেন কিনা কালিদাসের এই কথা থেকে তা বোঝা যায় না।

কিন্তু আমাদের বাঙালি কবি কৃত্তিবাস অহল্যাকে নিরপরাধিনী মনে করেছেন, তিনি বলেছেন, ইন্দ্রকে চিনতে না-পেবে অহল্যা তাঁকে নিজের স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিলেন—

একদিন গৌতম গেলেন তপস্যায়।
গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায়॥
অহল্যা গৌতম-জ্ঞানে করে সম্ভাষণ।
অতি শীঘ্র আজি কেন ঘরে আগমন॥
পতিব্রতা নাহি লঙ্ঘে পতির বচন।
তখন শয়ন-গৃহে করিল গমন॥

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড)

তবু ভাগ্যেব পরিহাস, সাধারণ লোকেব কাছে বিনাদোষে আজো অহল্যা কলঙ্কিনী। কবি ভবভূতি যথার্থই বলেছেন, নারীকে নিন্দার হাত থেকে রক্ষা করা খুবই কঠিন। বাক্যের শুদ্ধি আব নারীব শুদ্ধি সাধারণ মানুষ বিচার কবতে পারে না। তারা সত্যই দুর্জন। "সর্বথা ব্যাহর্তব্যং কুতো হ্যবচীনতা। যথা স্ত্রীণাং তথা বাচং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ।'' (ভবভূতি, উত্তব রামচরিত, ১/৫) তাই হিন্দুব প্রাতঃস্মবণীয়া যে পঞ্চকন্যা, তাঁদেব মধ্যে সবচেয়ে হতভাগিনী অহল্যা।

সাত

রামায়ণী শক্তি

রামায়ণ কেবল একখানি মহাকাব্য নয়; অতুলনীয় কবিত্বই এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়; রামায়ণ একটি শক্তি। ভারত-শক্তি। ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা ধর্ম-কর্ম তার জীবন-প্রতিভা, তার গঠন-গরিমাকে মূর্ত করেছে যে তপঃশক্তি, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত নাম দিয়েছেন 'রামায়ণী-শক্তি'। এক উদার বৃহৎ প্রসন্ন কান্তগুণে মণ্ডিত এই শক্তি ভারতবাসীর চিত্তবৃত্তিকে, তার প্রাণের ধারাকে সরল সুকুমার সমর্থ ভাবশীলতা দিয়ে গঠন করেছে। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলছেন, "ভারতের প্রাণে রামায়ণী শক্তি আনিয়া দিয়েছে তারুণ্য, সৌকুমার্য—সহজ মহানুভবতা, নৈসর্গিক গরিমা—অনায়াস সৌষ্ঠব, অযত্নলব্ধ পারিপাট্য—সারল্য আর্জব।" ('রচনাবলী', নলিনীকান্ত গুপ্ত, ৫ম খণ্ড, ১৯৭৯, পৃ. ৮৫) রামায়ণের যে গাম্ভীর্য যে শান্তি যে সৌন্দর্য, তার প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয় হল এই তপঃশক্তি। "সৌম-সহাস বাল্মীকি আমাদের প্রাণে যে সামর্থ্য সঞ্চারিত করিতেছেন, তাহাতে কোনো জোর কোনো প্রয়াস বুদ্ধির কোনো সঙ্কল্প নাই; তাহা হইতেছে বর্ধিষ্ণু শিশুর বা তরুলতার যে অটুট অব্যর্থ অথচ প্রশান্ত গোপনচারী জীবনীশক্তি—তাহার প্রতিষ্ঠা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে।" (তদেব, পৃ. ৮৭) পৃথিবীর জলেস্থলে ওষধি বনস্পতির মধ্যে বৈদিক ঋষিগণ এই শান্তি-বিধৃত শক্তিরই ধ্যান করেছেন।

> ...শং যোরভি স্রবন্তনঃ ॥
> পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তি।
> বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ...

(যজুর্বেদ, ৩৬ অধ্যায়)

রামায়ণের সবুজপ্রাণ প্রতিটি বৃক্ষ বনপাদপ যেন এক-একটি ঋষিতনয়। কবি কালিদাস বলেছেন, "সুপুত্রেম্বিব পাদপেষু" (রঘুবংশ, ১৩/৪৬)।

রামায়ণের তন্ত্রীলয়সমন্বিত যে সুর যে ছন্দঝংকার তার গভীরে এই শক্তির মৌন একতানতা। বাল্মীকির ধ্যান, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কঠোর দুস্তর তপস্যা, দশরথ রাম সীতা লক্ষ্মণ ভরত হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ—এঁদের জীবন ও কর্মকে অন্তর থেকে অনুপ্রাণিত করেছে, মহত্ত্ব ঔদার্য ও বিশালতা দিয়ে ভরে দিয়েছে। এই শক্তি শিখরবান্ পর্বতের মতো উঠে গিয়েছে সানুর পর সানু "যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমা সশিখরা ইব" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১/৪)।

কিন্তু অধ্যাত্মশক্তির এই উত্থান বড় সংকুল বড় বিঘ্ন-বহুল। বদরীবিশালের গিরিপথের বাঁকে-বাঁকে অকস্মাৎ কত ধস কত চ্যুতি! কত অসতর্ক পদস্খলন। দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনা

হঠাৎ মুহূর্তের ভুলে মিথ্যা হয়ে যায়। পথ থেকে ফেলে দেয় অতল গিরিখাদে। সম্মুখের আলো সরে যায়। ঝড়ো বাতাসে বারেবারে নিভে যায় হাতের প্রদীপ। তবু আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। আঁধার-পথে একলা চলতে হয়। অনেক অন্ধকার পেরিয়ে তবে আলোয় পৌঁছাতে হয়। রামায়ণের তথা ভারতের প্রতিটি ঋষির জীবন এই সংকট-যাত্রার ইতিহাস।

জনকের যজ্ঞশালায় পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করে রাজপুরোহিত শতানন্দ শোনাচ্ছেন বিশ্বামিত্রের সুকঠোর তপস্যার জীবন। রামায়ণের আদিকাণ্ডের কেন্দ্রপুরুষ বিশ্বামিত্র। সকল শ্লোকেব ভিতব দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁরই তপস্যার জ্যোতি। এখানে কবি দেখিয়ে দিচ্ছেন কেমন করে সাধনায় সেই শক্তি আয়ত্ত হয়েছে।

কৌশাম্বীর রাজা গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় নরপতি তিনি। একদা চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে গেলেন মৃগয়ায়। পথে বশিষ্ঠের আশ্রমে অতিথি হলেন। বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনুর সাহায্যে অতিথিকে আপ্যায়িত কবলেন। রাজা তখন ঋষির কামধেনুটি চাইলেন। বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না। ক্রুদ্ধ রাজা তখন জোর করে কামধেনু হরণ করতে গেলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের রাজশক্তি বশিষ্ঠের ব্রহ্মবলের কাছে পরাজিত হল। অপমানিত বিশ্বামিত্র তখন পুত্রের হাতে রাজত্ব দিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন তপস্যা করতে। তপস্যায দিব্যশক্তি আয়ত্ত করে বশিষ্ঠের উপরে প্রতিশোধ নেবেন।

দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করলেন।...

মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তুমি কি বর চাও বল। বরো যস্তে কাঙ্ক্ষিতঃ।"

—"হে দেবাদিদেব, আমাকে সকল দিব্যাস্ত্র দান করুন।"

—"তথাস্তু।"

দিব্য অস্ত্রে শক্তিমান এখন বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠের উপর প্রতিশোধ নিতে গেলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের কাছে বিশ্বামিত্রের সকল দিব্যাস্ত্র ব্যর্থ হল। তাঁর দর্প চূর্ণ হল। তিনি বুঝলেন, ক্ষত্রিয় বলে ধিক্। অকলঙ্ক ব্রহ্মবলের কাছে সব শক্তি, এমনকী দিব্যশক্তিও ব্যর্থ।

ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তখন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য দুষ্কর তপস্যায় মগ্ন হলেন। বহু বৎসর কেটে গেল দুরূহ তপস্যায়।...

একদিন ব্রহ্মা তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "কৌশিকী, সাধনার বলে তুমি রাজর্ষি হয়েছ।"

শুনে লজ্জিত দুঃখিত বিশ্বামিত্র নতমুখে ভাবতে লাগলেন, এতদিন এত তপস্যা করলাম, সে কি সব তবে বৃথা হল? বশিষ্ঠের মতো ব্রহ্মর্ষি হতে পারলাম না?

তিনি এখন না ক্ষত্রিয়, না ব্রাহ্মণ। না স্বর্গে না মর্ত্যে। ঠিক যেন ত্রিশঙ্কুর মতো। তাঁর অন্তর্জীবনেব প্রতীক এই ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান।

ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা ত্রিশঙ্কু। তিনি চেয়েছিলেন কেবল যজ্ঞ করেই সশরীরে স্বর্গে যাবেন। তাঁর এই ইচ্ছা বশিষ্ঠকে জানালেন।

বশিষ্ঠ বললেন, "তা হয় না।"

তখন ত্রিশঙ্কু গেলেন বশিষ্ঠের পুত্রদের কাছে। বললেন, "আপনারা আমার গুরুপুত্র। আমার যজ্ঞের হোতা হন।"

তাঁরা বললেন, "পিতা বশিষ্ঠের কাছে যাও। তিনিই তোমার গুরু।"

—"তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

—"মূর্খ রাজা! গুরু যাকে প্রত্যাখ্যান করেন, গুরুপুত্র তাকে কী করবে?"

—"বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনারাও করলেন। তাহলে এবার আমি অন্যত্র হোতার সন্ধান করি।"

বশিষ্ঠের পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, "রাজা, তোমার বুদ্ধি চণ্ডালের মতো। তাই আজ থেকে তুমি চণ্ডাল হও।"

রাত পোহাতেই অভিশপ্ত রাজা চণ্ডাল হয়ে গেলেন। রুক্ষ কর্কশ দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নীল বস্ত্র। খর্বকেশ গলায় শ্মশানের নরকঙ্কালের মালা। হাতে কানে লোহার অলংকার। পায়ে লোহার বলয়। চণ্ডাল ত্রিশঙ্কু এলেন শেষে বিশ্বামিত্রের কাছে।

বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ করতে সম্মত হলেন।

অদ্ভুত সেই যজ্ঞ। চণ্ডালের যজ্ঞে ক্ষত্রিয় পুরোহিত। তাই সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ এলেন না। দেবতারাও বিমুখ হলেন।

তখন সেই ব্যর্থ যজ্ঞের ক্রুদ্ধ পুরোহিত বিশ্বামিত্র যজ্ঞের স্রুব উত্তোলন করে নিজের তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করলেন।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গে আসছেন দেখে দেবরাজ ইন্দ্র তার গতিরোধ করে বললেন, "ক্ষান্ত হও, মূঢ় ত্রিশঙ্কু! গুরুর অভিশাপে তুমি পতিত। তোমার স্বর্গবাসের অধিকার নেই। তুমি অধোমস্তকে ভূতলে পতিত হও।"

ত্রিশঙ্কু ত্রাহি ত্রাহি করে মহাশূন্যে পড়তে লাগল।

বিশ্বামিত্র আপন তেজে তার পতন রুদ্ধ করলেন। দক্ষিণ আকাশে জ্যোতিশ্চক্রের বাইরে এক কৃত্রিম সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। সেখানে অধঃশিরা নক্ষত্র হয়ে থেকে গেল হতভাগ্য ত্রিশঙ্কু।

বিশ্বামিত্র যেন নিজেও তাই। তাঁর তপস্যা আছে, কিন্তু আত্মশুদ্ধির স্থিতি নেই। ক্ষত্রিয় ক্রোধ ও উগ্রতা আছে, কিন্তু নেই ব্রাহ্মণের ক্ষমা ও নম্রতা। ত্রিশঙ্কু কেবল যজ্ঞ করে স্বর্গে যেতে চেয়েছিল। তিনি নিজেও কেবল তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হতে চাইছেন। কিন্তু শুধু তপস্যায় কিছু হয় না। এমনকী ঘোর উগ্র তপস্যাতেও না। তার জন্য চাই অন্তরাত্মার স্বভাবের একটা শোধন ও শুদ্ধি। সত্তার মূল উপাদানে ও গঠনে এক ঊর্ধ্বতর সত্যের সঞ্জীবন। জীবনের ভিতর থেকে আবাহন করে যে স্থির তপস্যা, আর উপর হতে তাতে সাড়া দেয় যে ভগবদ প্রসাদ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের সেই শুদ্ধিস্নান এখনও হয়নি। তিনি কঠোর তপস্যা করেছেন, সাধনোচিত লোক সব জয় করেছেন, কিন্তু এখনও তাঁর ব্রাহ্মণত্ব অর্জন হয়নি। অন্তরে তিনি এখনও ক্রোধী। ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। তাঁর সাধনা সকাম। ব্রাহ্মণত্বের কামনা নিয়েই সাধনা করছেন। আবার শুধু কামনা নয়। কামও আছে।

অপ্সরা মেনকাকে দেখে তাঁর তপোভঙ্গ হল। বহু বৎসরের তীব্র তপস্যা মুহূর্তের কামের আগুনে ভস্ম হয়ে গেল। সাধকের জীবনে এমন হয়। উত্থান আসে, পতন আসে। স্বভাবের তিল পরিমাণ অসম্পূর্ণতা তপে উত্তপ্ত হয়ে সারা জীবন ঢেকে ফেলে। কণামাত্র তৃষ্ণা বর্ধিত

হয়ে গোটা জীবনকে মরুভূমি করে দেয়। এমনি করে বাধা বিঘ্ন এসে সাধককে দেখিয়ে দেয়, কোথায় তার ত্রুটি। কোন্খানে তার দুর্বলতা। কিন্তু যে-মাটিতে সাধক পড়ে যায়, সেই মাটি ধরেই তাকে উঠতে হয়। পতনকে সে করে তোলে অভ্যুদয়ের সোপান।

বিশ্বামিত্র তাই অনুতাপে ব্যথিত হলেন। আপন স্বভাবের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেখতে পেয়ে চিন্তিত ও লজ্জিত হলেন।

সুব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দন॥

(আদিকাণ্ড, ৬৩/১০)

সাধক সজাগ হলে বাধা সরে যায়।

বিশ্বামিত্রের অনুতপ্ত দীর্ঘশ্বাস দেখে মেনকা ভীত কম্পিত হয়ে হাত জোড় করে ঋষির সামনে এসে দাঁড়ালেন—

ভীতামপ্সবসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্।

(আদিকাণ্ড, ৬৩/১৩)

বিশ্বামিত্র কিন্তু মেনকার উপর ক্রুদ্ধ হলেন না। সে যে তাঁকে পতনের ভূমিতে নামিয়ে এনে দেখিয়ে দিয়েছে পথের বিপদ কোথায়। কোন্ দিকে সাবধান হতে হবে। তপস্যার বিঘ্ন হয়ে এলেও, এক হিসাবে মেনকা বিশ্বামিত্রেব গুরু।

মধুর বচনে তাই মেনকাকে তিনি বিদায় দিলেন।

তারপর চলে গেলেন উত্তর পর্বতের গভীর অরণ্যে। তাঁকে আরো তপস্যা করতে হবে। এই কামকে জয় করতে হবে।

উত্তরং পর্বতং বাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ।
স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ॥

(আদিকাণ্ড, ৬৩/১৪)

দীর্ঘ কঠোর তপস্যা করেন বিশ্বামিত্র।

একদিন ব্রহ্মা এসে বললেন, "বিশ্বামিত্র, তুমি এখন মহর্ষি। তপস্যাবলে তুমি সিদ্ধ ঋষিদের পুণ্যলোক জয় করেছ।"

কিন্তু এখনো তাঁর ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়নি।

অবিচলিত চিত্তে তিনি আরও গভীর তপস্যায় রত হলেন।

আবার এল বাধা।

পুষ্পমাস। ফুলের গন্ধভরা মলয় পবন। গোধূলিরাগের মোহন আবেশ। তরুপল্লবে পিককণ্ঠের সুরশৃঙ্গার...

ধ্যানস্থ ঋষির সামনে এসে দাঁড়ালেন অনাবৃত যৌবনা অপ্সরা রম্ভা। বিলোল কটাক্ষে কামাতুর তৃষ্ণা...

কিন্তু বিশ্বামিত্রকে এবার টলাতে পারল না। ধ্যানের আঁখি উন্মীলিত করে তাকালেন তিনি। বললেন, "রম্ভা, আমি কাম ক্রোধ জয় করব বলে তপস্যা করছি। তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করতে এসেছ? অভিশাপ দিলাম, এখানে পাষাণ হয়ে থাক।"

অপ্সরা রম্ভা পাষাণ হয়ে গেল।

কিন্তু বিশ্বামিত্রেরও পতন হল। এবার কামে নয়, ক্রোধে। স্বভাবের ত্রুটি এক যায় তো আর এক আসে। কাম যায় তো ক্রোধ। ক্রোধ যায় তো ঈর্ষা থাকে।

রম্ভাকে অভিশাপ দিয়ে ক্রোধে তাঁর তপস্যা নষ্ট হয়ে গেল। "কোপেন তপোঽপহরণে কৃতে"... (আদিকাণ্ড, ৬৪/১৬)।

এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, "আমি আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না। আর কখনও অভিশাপ দেব না। যতদিন ব্রাহ্মণত্ব লাভ না হয় ততদিন শরীর শুষ্ক করে দেব। রুদ্ধনিঃশ্বাসে একাসনে বসে তপস্যা করব।"

অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
তাবদ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণং তপসার্জিতম্।
অনুচ্ছ্ব সন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ॥

(আদিকাণ্ড, ৬৪/১৮-১৯)

তাঁর অন্তরাত্মা এবাব দুর্জয় সংকল্পে গর্জন করে উঠল। সাধকের এমন সংকল্পে আকাশ কেঁপে ওঠে। স্বর্গ টলে যায়।...

আমাদের মনে পড়ে, বিশ্বামিত্রের মতোই ঠিক এমনি করে ভারতবর্ষের আর এক রাজপুত্র শাক্যসিংহ বৃক্ষমূলে বসে এমনি সংকল্প করেছিলেন, ঠিক এক ভাষা, এক প্রতিজ্ঞা—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥
(এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হয় হোক।
ত্বক্ অস্থি মাংস ক্ষয় হয়ে যায় যাক্।
তবু বহুকল্প দুর্লভ বোধি লাভ না করে
এই আসন ছেড়ে উঠব না।)

এমন সংকল্প বৃথা হয় না। শাক্যসিংহ হলেন বুদ্ধ। যেমন বিশ্বামিত্র হয়েছিলেন ব্রহ্মর্ষি।

রুদ্ধশ্বাস তপস্যায় বিশ্বামিত্রের মস্তক থেকে তেজ ও অগ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। ত্রিভুবন ব্যাকুল হয়ে উঠল। দিক্ সব ধূমায়িত। বসুধা কম্পিত। বায়ু বিক্ষুব্ধ। সমুদ্র উদ্বেলিত। মহর্ষির তেজে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। পর্বত সব বিশীর্ণ হয়ে গেছে।

স্বর্গ বিচলিত হল।

দেবগণ সমাবৃত স্বয়ং ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে তখন বললেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

শুনে বিশ্বামিত্র কৃতার্থ।

একি শুনলেন তিনি! স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করছেন! আজ তিনি ব্রাহ্মণ!

প্রণাম করে বিশ্বামিত্র বললেন, "ভগবান্, যদি ব্রাহ্মণত্ব দিয়েছেন, তাহলে ওঙ্কার বষট্কার এবং সমুদয় বেদ আমাকে বরণ করুক। আর ব্রহ্মার পুত্র গুরু বশিষ্ঠ আমাকে একবার ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করুন।"

বিশ্বামিত্র আজ কত শান্ত, কত নম্র। কোথায় গেল বশিষ্ঠের প্রতি তার সেই ঈর্ষা আর আক্রোশ? ব্রহ্মা তাঁকে বর দিয়েছেন, তথাপি তিনি ধন্য হবেন, যদি বশিষ্ঠ একবার তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেন।

তখন বশিষ্ঠ এসে তাঁকে বললেন, "বিশ্বামিত্র, তুমি আজ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের সকল গুণ তোমাতে সঞ্চিত হবে।"

ব্রহ্মর্ষিস্ত্বং ন সন্দেহঃ সর্বং সম্পদ্যতে তব।

(আদিকাণ্ড, ৬৫/২৬)

এমনি করে অনেক আঁধার পার হয়ে বিশ্বামিত্র হলেন ব্রহ্মর্ষি। যে মন্ত্রে ব্রাহ্মণ হয় দ্বিজ, সেই ব্রহ্মগায়ত্রীর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তিনি। পূর্বপিতামহদের ধীঃশক্তি। তাঁদের হৃদয়ের গান—"মতিহৃদ্ আ বচ্যমানা...পিত্র্যাঃ ধীঃ" (ঋগ্বেদ, ৩/৩৯/১-২)— সে মন্ত্র বিশ্বামিত্রের। আর এই শক্তিই রামায়ণী শক্তি। রামায়ণেব সঙ্গে মিশেছে শ্রুতিমন্ত্রের এই তেজ ও মাধুরী। রামায়ণ দেবী সরস্বতীর পূর্ণপাত্র মধুপর্ক।

কোশল রাজকিশোর রঘুবংশমণি শ্রীবামচন্দ্র এই ঋষি বিশ্বামিত্রের হাত ধরেই তাঁর কৈশোর থেকে শ্যামগৌরব সুখধাম যৌবনে উপনীত হলেন।

আট

মিথিলা ও অযোধ্যা

নির্মল প্রভাতের পুণ্য ঘোষণা করে জনকের রাজভবনে মঙ্গল আরতিব বাদ্য বেজে উঠল। রাজা জনক স্তোত্র মন্ত্র পাঠ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করলেন।

—''ভগবন্, স্বাগতম্ তেহস্তু। আপনাকে প্রণাম করি। কি আদেশ, আজ্ঞা করুন।

—''কোশলরাজকুমার রাম আর লক্ষ্মণ এসেছেন আমার সঙ্গে। আপনার রাজবংশে রক্ষিত পরমাশ্চর্য সেই হরধনু দেখবার জন্য তাঁরা উৎসুক।''

—হ্যাঁ, মহর্ষি। বিদেহ রাজবংশের মহিমা আর গৌরব এই হরধনু। লোকবিশ্রুত সে পুণ্যমাহাত্ম্য। যখন দক্ষযজ্ঞে মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হল না, তখন রুদ্র কুপিত হয়ে তাঁর হরধনুতে টংকার দিলেন। সকল দেবতার শিবচ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। তখন দেবতারা মহাদেবকে স্তব করতে লাগলেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন আশুতোষ। তিনি তাঁর সংহার উদ্যত ধনু নত করে দেবগণকে দান করলেন। পরে দেবতারা আমার পূর্বপুরুষ রাজা নিমির পুত্র দেবরাতকে সেই ধনু রক্ষা করতে দেন। সেই থেকে দেবতাদের আশীর্বাদস্বরূপ ওই শৈবচাপ আমাদের রাজগৃহে অগুরু চন্দনে নিত্য পূজিত হয়। বিদেহ বংশের শক্তি ও মহিমার প্রতীক।

এছাড়া আবও একটা সৌভাগ্য আমার লাভ হয়েছে। একদা যজ্ঞভূমিতে হলকর্ষণ করবার সময় ভূমির হলরেখা থেকে উত্থিত হয় এক সুলক্ষণা কন্যারত্ন। যদিও মা বসুমতীর কোল থেকে পেয়েছি, তবু সে আমাব কন্যা। হলের সীতারেখা থেকে উঠেছে তাই তার নাম রেখেছি সীতা। অযোনিসম্ভবা সীতা আমাব কন্যা, আমার বংশের সৌভাগ্যলক্ষ্মী।''

রাম মৌন আগ্রহে শুনছেন। বিশ্বামিত্র স্থিরাসনে উপবিষ্ট। প্রভাতে সমীরণে মঙ্গলবাদ্যের সুর। শান্ত গম্ভীর রাজসভাতল।

রাজা জনক বলে চলেছেন, ''মহর্ষি, আমার মনে হয়েছে, এই দুই দুর্লভ সৌভাগ্যের মধ্যে একটা কোনো গৌববেব সম্বন্ধ আছে। তাই স্থির করেছি, যে হরধনুতে গুণযোজনা করতে সক্ষম হবে তারই হাতে অর্পণ করব আমার সীতাকে। শিবের শক্তিবীর্যে পরীক্ষিত হবেন সীতাপতি। সীতা আমার বীর্যশুল্কা।

অতীতে তাব পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছেন অনেক পরাক্রান্ত রাজা। কিন্তু তাঁবা কেউই হরধনু উত্তোলন করতে পারেননি। তাই আমিও তাদের কন্যাদান করিনি। আমার প্রত্যাখানে সকলে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হল। তারা একসাথে মিথিলা আক্রমণ ও অবরোধ করল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে আমার সমস্ত সৈন্যবল ধনবল নিঃশেষ হয়ে গেল। এক বৎসর মিথিলা

অবরোধ করে তারা অত্যাচার উৎপীড়ন করতে লাগল। আমি আর্ত অসহায় হয়ে পড়লাম। তবু প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলাম। বীর্যশুল্কা আমার সীতাকে কোনো দুর্বল রাজার হাতে কখনো দেব না। শেষে দেবগণ প্রসন্ন হলেন। দৈবের সাহায্যে আমি শত্রুদের পরাস্ত করে বিতাড়িত করি।"

বিশ্বামিত্র বললেন, "মহারাজ, দেবতার শক্তি ও আশীর্বাদ যারা বহন করেন তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বদা জগতের ঘোর অপশক্তি সব শত্রু হয়ে ওঠে।"

—"মহর্ষি, আপনার আজ্ঞায় আমি সেই হরধনু রামকে প্রদর্শন করব। তার আগে প্রতিজ্ঞা করছি, রাম যদি সেই মহাধনুতে গুণযোজনা করতে পারেন তাহলে তাঁর হাতে আমি সীতাকে অর্পণ করব।"

...এই হবধনু ভঙ্গ রামের শৌর্য বীর্য পরাক্রমের প্রতীক রূপে দেখান হয়েছে। যদিও মহাভারতেব বামোপাখ্যানে হরধনুর কোনো প্রসঙ্গ নেই। তাই থেকে অনেকে অনুমান করেন, বাল্মীকির আদি রামায়ণে এই আখ্যান ছিল না। পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়েছে। পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্তে যে অনেকখানি হঠকারিতা আছে একথা অনুসন্ধিৎসু পাঠমাত্রেই স্বীকার করবেন। মহাভারতের বামোপাখ্যানে যা মিলবে না সেসবই আদি রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে করতে হবে, এমন ত্বরিত সিদ্ধান্তের মধ্যে গায়েব জোর যতটা আছে যুক্তি ততটা নেই। মনে রাখতে হবে মহাভারতে বেদব্যাস ভারতেব ইতিহাস রচনা করেছেন। তাই নানা আখ্যান উপাখ্যান সংকলিত করেছেন। সেজন্য স্বভাবতই তাঁকে অনেক কিছু সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত রেখায় প্রধান প্রধান ঘটনা ও তথ্য সন্নিবেশ করতে হয়েছে। রেখাচিত্র যেমন পূর্ণ রূপচিত্র নয়, রূপের একটা আভাস মাত্র, তেমনি মহাভারতের রামোপাখ্যানও বাল্মীকির রামায়ণ নয়, এমনকী তথাকথিত আদি রামায়ণও নয়।

তাছাড়া কৌতুহলী পাঠক মূল মহাভাবতেই হরধনুর উল্লেখ দেখতে পাবেন। যেমন—

আনতেনাথ শূলেন পাণিনামিততেজসা।
পিনাকমিতি চোবাচ শূলমুগ্রায়ুধ প্রভুঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৭৮/১৮)

(শিব তাঁর আপন হস্তের শূল আনত
করে উগ্রায়ুধ পিনাকে পরিণত করলেন।)

মহাভারতের অনুশাসনপর্বেও (দাক্ষিণাত্য পাঠ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর সংস্করণ, পৃ. ৫৯১৫) বলা হযেছে, ব্রহ্মা একটি বংশখণ্ড থেকে শিবের এবং বিষ্ণুর জন্য ধনু নির্মাণ করেন; আর তাব শেষ অংশ থেকে নির্মাণ করলেন গাণ্ডীব।

মহাভারত ছাড়াও নৃসিংহপুরাণ (৪৭ অধ্যায়/১৪৬), অধ্যাত্মরামায়ণ (১/৭/১১) আনন্দ রামায়ণ (১/৩/৩৫০), দেবীভাগবত পুরাণ (৩য় স্কন্ধ ২৮ অধ্যায়), পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড, ১৬২/২৬৯ অধ্যায়) ভট্টি কাব্য, বালরামায়ণ (৪/৫৪), রঘুবংশ (১১ সর্গ), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ইত্যাদি সর্বত্র হরধনু ভঙ্গের প্রসঙ্গ আছে। দেবীভাগবত পুরাণে একটু অধিকন্তু সংবাদ আছে। সেখানে রাবণ সীতাকে বলছে, "আমি জনকের কাছে তোমার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলাম। কিন্তু হরধনু পরীক্ষা দিতে হবে জেনে তোমার স্বয়ম্বর সভায় যাইনি। শিবধনু স্পর্শ করার সাহস আমার হয়নি—"রুদ্রচাপভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্তু স্বয়ম্বরে।"

হরধনুর বিষয়টি প্রক্ষিপ্ত হলে নানা প্রসঙ্গে রামায়ণের বহুস্থানে এমন করে তার উল্লেখ থাকত না। কাহিনির আখ্যানের সঙ্গে এমন গুরুত্বপূর্ণভাবে ওতপ্রোত হয়ে যেত না। বাল্মীকির রামায়ণের শুধু আদিকাণ্ডের ৩১, ৬৬, ৬৭ এবং ৭৫ অধ্যায়েই নয়, অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৮ অধ্যায়েও ঋষি অত্রির পত্নী অনুসূয়াকে সীতা বলছেন,—

> মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
> দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ॥
> অসঞ্চাল্যং মনুষ্যৈশ্চ যত্নেনাপি চ গৌরবাৎ।
> তন্ন শক্তা নময়িতুং স্বপ্নেষ্বপি নরাধিপাঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/৩৯-৪০)

> (দেবতা বরুণ প্রসন্ন চিত্তে দেবরাতের যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে
> ওই শ্রেষ্ঠধনু ও অক্ষয় তূণ দান করেন। অনেক নৃপতি
> বহু চেষ্টা করেও সেই ধনু নাড়াতে পারল না।
> গুণযোজনা করার কথা তো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।)

এই আখ্যানের ভিতর দিয়ে রামের তেজ বীর্য শক্তিমত্তা যেমন চমৎকারভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে, তেমনি সীতার অন্তরে তাঁর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধানম্র গরবিনী প্রেমের লজ্জারুণ আভা সঞ্চার করা হয়েছে। একে প্রক্ষিপ্ত মনে করলে বাল্মীকির অসাধারণ কবি প্রতিভাকেই খর্ব করে দেখা হবে।

অত্রি মুনির আশ্রমে ঋষিপত্নী অনুসূয়ার কাছে সীতা তাঁর স্বামীর প্রতি বুকঢালা ভালবাসার কথা বলছেন। তপস্বিনী অনুসূয়ার নিভৃত স্নেহের সেই নম্র আবেষ্টনে সীতা বিহ্বল। রামচন্দ্রের জন্য তাঁর হৃদয়ের গভীর প্রেম শ্রদ্ধায় গর্বে সোহাগে শরতের সুগন্ধি শিউলির মতো ঝরে পড়ছে :

—"আর্যে, আমার বিবাহের সময় অগ্নিসাক্ষী করে আমার মা আমাকে বলেছিলেন, পতিই নারীর গুরু। আমার শ্বশ্রুমাতা কৌশল্যাও আপনার মতো বলেছিলেন, ইহকালে পরকালে নারীর একমাত্র বন্ধু স্বামী। একমাত্র ধর্ম স্বামীসেবা। সাবিত্রীর যেমন সত্যবান্, রোহিণীর যেমন চন্দ্র, আমার কাছে তেমনি শ্রীরামচন্দ্র। সেদিনের কথা মনে পড়ে, সৌন্দর্যদ্যুতিমান রাঘব যজ্ঞদর্শন করতে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলায় এলেন। আমার পিতা সত্যপরাক্রম রামকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে তাঁকে শিবধনু দর্শন করালেন। ইতিপূর্বে কোনো রাজা স্বপ্নেও ওই ধনু নত করতে সক্ষম হননি। কিন্তু বীর্যশালী মহাবলবান রামচন্দ্র নিমেষের মধ্যে সেই বিশাল ধনু আনত করে তাতে গুণ যোজনা করলেন। তাঁর হস্তের বিপুল আকর্ষণে সেই ধনু বজ্রনাদ করে ভেঙে গেল। তখন পিতা পুণ্যবারি স্পর্শ করে রামচন্দ্রের হাতে আমাকে সম্প্রদান করলেন।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/১-১০)

> ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদধনুঃ সমুপানয়ৎ।
> তদ্ধনুর্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় দৈবিকম্॥
> নিমেষান্তরমাত্রেণ তদানম্য মহাবলঃ।
> জ্যাং সমারোপ্য ঝটিতি পূরয়ামাস বীর্যবান॥

তেনাপূরয়তা বেগান্মধ্যে ভগ্নং দ্বিধা ধনুঃ।
তস্য শব্দোঽভবদ্ ভীমঃ পতিতস্যাশনের্যথা॥
ততোঽহং তত্র রামায় পিত্রা সত্যাভিসন্ধিনা।
উদ্যতা দাতুমুদ্যম্য জলভাজনমুত্তমম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/৪৭-৫০)

কথাগুলির মধ্যে বীরপত্নী সীতার গরিমাদীপ্ত প্রেমের স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়েছে। কবি এখানে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন, রাম শুধু বীর্যবলে হরধনুই ভঙ্গ করেননি, একই সঙ্গে কুমারীহৃদয়ের গন্ধমুকুল প্রেমকলিকেও উদ্‌ভিন্ন করেছেন। সীতার হৃদয়ের এই পবিত্র প্রেমই তাঁর অক্ষয় দিব্য অঙ্গরাগ। ঋষিপত্নী অনুসূয়া তাঁর তপস্যাপূত তেজ মাধুর্যের যে গন্ধ অনুলেপন দিয়ে সীতাকে ভূষিত করলেন, সে কেবল সীতার বাহ্য অলংকার মাত্র। সীতার হৃদয়ের প্রেম তার সকল পুণ্য ও পবিত্রতা নিয়ে তাঁর দেহকান্তি দিয়ে চিরকাল এক আগ্নেয় আভা এক দিব্যরশ্মি বিকীর্ণ করত। অনুসূয়ার অঙ্গরাগ তাকে সমুজ্জ্বল করল মাত্র। বিবাহে কি বনবাসে, অগ্নিপরীক্ষায় কি নির্বাসনে সর্বদা সীতার সোনার অঙ্গ ঘিরে রাখত শুদ্ধ অগ্নির এক প্রভামণ্ডল। কবি কালিদাস বড় সুন্দর বলেছেন।

স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমানুসূয়ং সা বিভ্রতী শাশ্বতমঙ্গরাগম্।
ররাজ শুদ্ধেতি পুনঃ স্বপুর্যৈ সন্দর্শিতা বহ্নিগতেব ভর্ত্রা॥

(রঘুবংশ, ১৪/১৪)

কবি ভবভূতিও বলেছেন, যজ্ঞভূমি সমুত্থিতা সীতার অনুগ্রহে সমস্ত ধরণী পবিত্র—"স্বজন্মানুগ্রহ পবিত্রিত বসুন্ধরে" (উত্তররামচরিত, ১/৪৩)।

সমগ্র মিথিলা সেই পবিত্রতার আধার। আর দৃঢ়চিত্ত সংকল্পবলিষ্ঠ জনক সেই মিথিলার রাজা। যিনি চরম বিপদে বিপর্যয়ে রাজ্যনাশেও ধৈর্যহারা হন না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন না। ক্ষত্রিয়ের তেজ আর ব্রাহ্মণের তপস্যা মিলিত হয়েছে তাঁর চরিত্রে। ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর বন্ধু। যেমন বাল্মীকি রাজা দশরথের বন্ধু।

জ্ঞান সাধনা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মিথিলা। মঙ্গলময়ী সেই নগরী মুনিঋষি দ্বারা সম্পূজিত। "সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন" (আদিকাণ্ড, ৪৮/১০)।

অন্যদিকে অযোধ্যা হল ধর্মের বীরত্বের সমৃদ্ধির রাজ্য। মিথিলার জ্ঞান আর অযোধ্যার গরিমা—এই দুয়ে মিলে আর্য ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড। ভারতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিভা।

ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান রাজ্যের মধ্যে মিলন ও ধর্মবন্ধন ঘটালেন বিশ্বামিত্র। কেননা তিনি চেয়েছিলেন ভারতের পূর্ণপ্রতিভা জাগ্রত হোক। তিনি ব্রহ্মর্ষি, এবং একদা ছিলেন রাজা, তাই তাঁর ঋষিদৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল প্রখর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। তিনি বুঝেছিলেন, ভারত যদি তার পূর্ণ মহিমা পেতে চায়, তাহলে তার জ্ঞানের সঙ্গে চাই শক্তি। ব্রহ্মতেজের সঙ্গে ক্ষত্রতেজ।

মিথিলার সীতা আর অযোধ্যার রাম—এই তপ ও তেজের যুগলমূর্তি। সৌন্দর্য ও শক্তি, প্রেম ও পরাক্রম, লক্ষ্মী ও নারায়ণের মিলনবিগ্রহ রাম ও সীতা—"বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবরামেশ্বর" (আদিকাণ্ড ৭৭/২৯)। সীতা "তপোবলসমন্বিতা" (অযোধ্যাকাণ্ড,

১১৮/১৬) "দেবমায়া নির্মাতা" (আদিকাণ্ড, ১/২৭), আর রাম গুণবিক্রমে ইন্দ্রসম (অযোধ্যাকাণ্ড, ২/২৮)।

বিশ্বামিত্র জানেন, রাম-সীতার বিবাহ অর্থ ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রী ও লক্ষ্মীর সঙ্গে তার দিব্যশক্তির মিলন। এই বিবাহে তাই ত্রিকালদর্শী ঋষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ দুজনেরই এত আগ্রহ। দুজনে তাঁরা একই সঙ্গে বলেছিলেন, "ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এই দুই রাজবংশ গুণে গরিমায় অতুলনীয়। এদের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধ স্থাপিত হলে যে কল্যাণ হবে তা অকল্পনীয়"—

অচিন্ত্যান্য প্রমেয়ানি কুলানি নরপুঙ্গব।
ইক্ষ্বাকুণাং বিদেহানাং নৈষাং তুল্যোঽস্তি কশ্চন॥
সদৃশো ধর্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।

(আদিকাণ্ড, ৭২/২-৩)

এই সম্বন্ধকে অটুট ও নিশ্চিত করার জন্যই তাঁবা দশরথের চাব রাজকুমারকে এক সঙ্গে একই পরিবারে বিবাহেব ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, পাছে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশে বিবাহ হলে, বংশের ভিতরে আত্মকলহ হয় এবং সূর্যবংশের কুল ভেঙে যায়।...

শুভকার্য সম্পন্ন হতে দেরি হল না।

দ্রুতগামী অশ্বে রাজদূত ছুটে গেল অযোধ্যায়

শুনে দশরথ আনন্দিত হলেন। মন্ত্রীবর্গ সম্মতি দিলেন। বশিষ্ঠ তো সর্বাগ্রে অনুমোদন করেছেন।

দশরথ তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, "সুমন্ত্র, কোষাধ্যক্ষকে আদেশ কর, রাজকোষ থেকে পর্যাপ্ত ধন ও মণিরত্ন নিয়ে উৎকৃষ্ট সব দোলা আর শিবিকা সজ্জিত করে অদ্যই মিথিলায় যাত্রা করুক। তাদের সঙ্গে উপযুক্ত সশস্ত্র রক্ষী দিতে ভুলো না। সঙ্গে যাবে চতুরঙ্গ সেনা। শুভযাত্রায় পুরোভাগে থাকবেন ঋষি বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি কশ্যপ মার্কণ্ডেয় এবং কাত্যায়ন।"

—"যে আজ্ঞা, মহারাজ।"

—"আর শোন, তুমি আমার রথ যোজনা কর। শুভ কার্যে বিলম্ব নয়।"...

সমগ্র বিদেহ নগর আজ উৎসবমুখর। মঙ্গলবাদ্য-পূরিত। আলোকমালায় সজ্জিত। চারিদিকে ভাট ও নান্দীকরের নৃত্য গীত। বিদেহ ও রঘুবংশের যশোগান করছে যত সূত মাগধ ও চারণবৃন্দ।

জনক রাজা তাঁর পুরোহিত শতানন্দকে সঙ্গে নিয়ে দশরথকে অভ্যর্থনা করলেন, "রঘুকুলপতি, আপনাব শুভাগমন হোক। আপনার পদার্পণে আমরা সৌভাগ্যবান হলাম। ভগবান বশিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের পুণ্য আগমনে আমার রাজকুল ধন্য হল। আমার রাজ্য ও প্রজার জীবন পবিত্র হল।"

সমাদৃত হয়ে দশরথ বললেন, "বিদেহ অধিপতি, আপনি ধর্মজ্ঞ, কন্যা দান করবেন, তাই আপনিই দাতা, আমরা গ্রহীতা মাত্র। দাতার অধীন আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করব শুধু।"

পরাক্রান্ত রাজা দশরথের এমন শ্রেয় যশস্কর বিনয়বাক্য শুনে জনক মুগ্ধ হলেন। মুনিঋষিগণও পরস্পর মিলিত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করলেন।...

মিথিলার পাশে ইক্ষুমতী নদী। সেই নদীর কূলে সাঙ্কাশ্য নগরী। শোভায় সৌন্দর্যে যেন স্বর্গের পুষ্পক বিমান। ধার্মিক তেজস্বী কুশধ্বজ তার রাজা। তিনি জনকের ভ্রাতা। জনকের সকল দৈবকার্যের সহায়ক।

উত্তর ফাল্গুনী তিথিতে, শুভ পুনর্বসু নক্ষত্রে, কর্কট রাশি ও কন্যালগ্নে বিবাহযজ্ঞ শুরু হল।

কনক সিংহাসনে বসে আছেন রাজা জনক ও কুশধ্বজ। পাশে রত্নসিংহাসনে রাজা দশরথ।

বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করলেন। সোনার পালিকায় অলংকৃত বেদির চারিদিকে গন্ধপুষ্পের ডালি। পল্লবাঢ্য পূর্ণকুম্ভ। যজ্ঞের অর্ঘ্য যত স্রুক ও স্রুব। কলসে ঘৃত, শরাবে সোম। শঙ্খ ও ধূপপাত্র। পূর্ণলাজপাত্র। শুদ্ধিকৃত অক্ষত তণ্ডুল, যজ্ঞের কুশ ও সমিধ।

বশিষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞের অগ্নি সমিদ্ধ করলেন।

বিবাহের রীতি অনুসারে রাজপুরোহিতগণ পাত্র পাত্রীর কুলপরিচয় দান করলেন। বশিষ্ঠ দিলেন দশরথের সূর্যবংশের পরিচয়—ব্রহ্মাব মানসপুত্র মরীচি কশ্যপ বিবস্বান ও মনু। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর চার পুরুষ পরে রাজা পৃথু ত্রিশঙ্কু ধুন্ধুমার যুবনাশ্ব মান্ধাতা। তাঁদের চাব পুরুষ পরে সগর অসমঞ্জ অংশুমান দিলীপ ভগীরথ। তাঁদের ছয় পুরুষ পরে অম্বরীষ নহূষ যযাতি নাভাগ অজ। অজের পুত্র রাজা দশরথ। তাঁর চার পুত্র রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন।

তখন জনক বললেন, "মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, কন্যা দানের পূর্বে আপন কুলপরিচয় জ্ঞাপন করা শাস্ত্রবিধি। বিবাহে সেই কুলগৌরব বৃদ্ধি হয়। সুতরাং আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি আমার বংশপরিচয় কীর্তন করছি। আমা দর পূর্বপুরুষ ধর্মাত্মা রাজা নিমি। নিমির পুত্র মিথি। তাঁরই নাম অনুসারে এই রাজ্যের নাম মিথিলা। মিথির পুত্র জনক। তাঁরই নামে এই বংশের কৌলিক উপাধি জনক নামে পরিচিত। জনকের পর চার পুরুষ—উদাবসু নন্দিবর্ধন সুকেতু দেবরাত। তাঁদের চতুর্দশ পুরুষ পরে আমার পিতা হ্রস্বরোমা। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সীরধ্বজ, আর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই কুশধ্বজ।

দুই রাজার বংশ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সমগ্র আর্যভারতের রাষ্ট্রগৌরব শক্তির একটা রাজনৈতিক রূপরেখা। এই দুই রাজবংশের পরম্পরা ধরে প্রধানত ভারতের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অপ্রতিহতভাবে চলে এসেছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে পর্যন্ত। তাঁদের সব কথা ও কীর্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরাণে কল্পশুদ্ধিতে। রাম সীতার বিবাহে ভারতের সেই সুপ্রাচীন মহত্ত্বই পুনরুজ্জীবিত হল। ভারত সভ্যতার স্বর্ণযুগ "রাম রাজত্ব" রূপে শ্রেষ্ঠ আদর্শ লাভ করল। ভারতবাসীর অন্তরে আজও সেই আদর্শ অম্লান রয়েছে।

বশিষ্ঠ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন।

রাজা জনক তখন সর্বাভরণভূষিতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাকে যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে নিয়ে এলেন। চন্দনে যবাঙ্কুরে চর্চিত তাঁর কপোল। জ্যোৎস্নাকিরণে চন্দ্রমণিহারের মতো দীপ্ত তাঁর অঙ্গ।

বনহরিণীর মতো দুই নয়নে তাঁর অমৃত অঞ্জন। সীতার মঙ্গলময়ী শুভ্র মৃণাল হাতখানি রামের বরহস্তে দান করে জনক বললেন, "আমার কন্যা কল্যাণী সীতা তোমার সহধর্মিণী হোক। তুমি তার পাণিগ্রহণ কর। পতিব্রতা সীতা ছায়ার মতো তোমার অনুগামিনী হবে।"

ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব॥
প্রতীচ্ছ চৈনং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা।

(আদিকাণ্ড, ৭৩/২৬-২৭)

এই বলে কন্যা সম্প্রদান করে রাজা জনক রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন করলেন।

স্বর্গে দেবগণ আনন্দিত হলেন।

অন্তরীক্ষে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল।

আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

ঋষিগণ স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন।

ওই একই বাসরে বিবাহ হল লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার। কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের।

দ্যুলোকে গন্ধর্বদের গান, অপ্সরাদের আনন্দ নৃত্য হতে লাগল। রাজভবনে তূর্যধ্বনি। দিকে দিকে মঙ্গলশঙ্খ।...

সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যে প্রভাতে বিশ্বামিত্র বিদায় নিয়ে উত্তর পর্বতে চলে গেলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে একটা মহামঙ্গল সাধন করে ঋষি বিশ্বামিত্র নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন। মহাপুরুষগণ কর্তব্য শেষ করে আর একমুহূর্তও অপেক্ষা করেন না।...

শুভকাজ শেষ করে রাজা দশরথ অযোধ্যায় ফিরছেন। তাঁদের সঙ্গে চলেছে রাশি-রাশি উপঢৌকন, লক্ষ লক্ষ ধেনু অশ্ব রথ। ভারে ভারে কত উৎকৃষ্ট বস্ত্র সম্ভার, রজত সুবর্ণ মুক্তা প্রবাল। থরে থরে মণি রত্ন অলংকার।

মিথিলা ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছেন তাঁরা। এমন সময় পথে নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিল। সহসা চারিদিক আলোড়িত করে প্রবলবেগে ঝড় উঠল। ধূলায় ভস্মে চতুর্দিক আঁধার করে এল। বৃক্ষ-শাখায় ভয়ার্ত পক্ষীর আর্ত কলরব।

হঠাৎ দশরথ দেখলেন, সম্মুখে দাঁড়িয়ে পুঞ্জীভূত তেজরাশির মতো এক পুরুষ আকৃতি। কৈলাসের মতো দুর্ধর্ষ, কালাগ্নির মতো দুঃসহ। ভীমদর্শন ক্ষত্রিয়নাশন ভৃগুপুত্র পরশুরাম। স্কন্ধে কুঠার, হস্তে ধনুক, গলে যজ্ঞপবীত। যেন ভুজঙ্গবেষ্টিত এক চন্দনতরু—"সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দন-দ্রুম" (রঘুবংশ, ১১/৬৪)। ত্রিপুরনাশী রুদ্রের মতো প্রজ্বলন্ত।

রামচন্দ্রকে সম্বোধন করে বলছেন, "তোমার বীরত্ব এবং হরধনু ভঙ্গের কথা শুনেছি। কিন্তু এই দেখ আমার বৈষ্ণব ধনু। হরধনুর চেয়েও ভয়ংকর। ভগবান বিষ্ণু তাঁর এই মহাধনু ভৃগুবংশের ঋষি ঋচীককে দান করেন। মহাতেজস্বী ঋচীক অহিংস অক্রোধ শান্ত আত্মা। তাই তিনি তাঁর ধনু পুত্র জমদগ্নিকে দান করেন। জমদগ্নি তপস্যারত হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করেন। এই ধনুতে শরযোজন করে তোমার বীরত্ব দেখাও। যদি সক্ষম হও তাহলে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করব।"

দশরথ ভীত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, "ভগবন্ শান্ত হন। আপনি ইন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করে অস্ত্র ত্যাগ করে তপস্যা করছেন। আপনি রামকে অভয় দিন। রাম হত হলে আমরা কেউ আর বাঁচব না।"

পরশুরাম দশরথকে উপেক্ষা করে পুনরায় রামকে আহ্বান করলেন।

রামের সম্মুখে আর এক রাম।...

ধনুর্ধারী দাশরথি রামের সম্মুখে কুঠারধারী ব্রাহ্মণ পরশুরাম।...

তখন নম্র শান্ত কণ্ঠে রাম বললেন, "হে ভার্গব, আমি আপনার কীর্তি গাথা জানি। কিন্তু আমার শক্তিকে অবজ্ঞা করছেন, এ আমি সহ্য করব না।"

এই বলে ভার্গবের ধনু গ্রহণ করে তাতে অক্লেশে গুণযোজনা ও শরসংযোগ করে রাম বললেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আমার গুরু বিশ্বামিত্রের আত্মীয়, আপনি আমার পূজনীয়। তাই আপনাকে বধ করব না। কিন্তু হয় আপনার গতিশক্তি, না হয় আপনার তপোবল নষ্ট করে দেবে। বৈষ্ণব ধনুঃশর কখনো ব্যর্থ হয় না।"

তখন ব্রহ্মা দেবগণ গন্ধর্ব কিন্নর ঋষি সিদ্ধ চারণ সকলে সেখানে উপস্থিত হলেন।

সহসা পরশুরামের সকল তেজ নির্বাপিত হয়ে গেল। তাঁর প্রদীপ্ত তেজ-রাশি রামচন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হল। তিনি হতবল নির্জীব হয়ে পড়লেন।

---"রাম, তুমি আমার ধনু গ্রহণ করা মাত্র বুঝেছি, তুমি স্বয়ং মধুসূদন। ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তুমি শরমোচন কর। কিন্তু আমার গতিশক্তি নাশ করো না। বরং আমার সকল তপোবল নষ্ট করে দাও। তোমার কাছে পরাজিত হয়ে আমার কোনো লজ্জা নেই। আমি মহেন্দ্র পর্বতে চলে যাব।

রামচন্দ্র তখন শরনিক্ষেপ করলেন।

রামকে প্রদিক্ষণ করে যাওয়ার সময় ভার্গব বলে গেলেন, এই নিগ্রহ আমার কাছে তোমার অনুগ্রহ—ত্বয়া নিগ্রহোঽপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ (রঘুবংশ, ১১/৯০)।

পথের বিপত্তি কেটে গেল।...

হৃষ্ট মনে তাঁরা আবার অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন।...

আদিকাণ্ডের যবনিকাপাত হল।

দীর্ঘ বারো বৎসর আর এই যবনিকা উত্তোলন হবে না। ততদিনে রাজপ্রাসাদের অন্তরালে ঘনিয়ে উঠবে শোক দুঃখ বঞ্চনা হাহাকার। ধূমায়িত ঈর্ষা ষড়যন্ত্রের গুপ্ত চক্রান্ত। এর ভিতরে রাম-সীতার জীবনের মধুমাস মধুবর্ষগুলি কেটে যাবে। আমরা তার কিছুই জানতে পারব না। নীরবতায় মণ্ডিত রামায়ণের সেই নিভৃত বারোটি বৎসর আমরা কেবল উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করব। আমাদের চোখের সামনে শুধু দুলবে মহাকাব্যের মৌন গম্ভীর কম্পমান রহস্য-যবনিকা।...

নয়

অন্ধকারে অলক্ষ্যচারী নিষাদ

দীর্ঘ বারো বৎসর পর আবার আমরা অযোধ্যায় এলাম।

সেই রাম, সেই অযোধ্যা, সবই আছে, কিন্তু কি যেন হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদ ঘিরে কেমন যেন প্রদোষের ম্লান গাম্ভীর্য। সকল সমারোহ সকল ঐশ্বর্যের মধ্যে একটা উদ্‌বেগের ছায়া। একটা চাপা অস্থিরতা ও আশঙ্কা।

দশরথ এক জরুরি সভা ডেকেছেন। নানা দেশ থেকে দিকপাল সব রাজারা এসেছেন। উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের যত ব্রাহ্মণ ও পুরজন। রাজসভা গমগম করছে।

মন্ত্রী অমাত্য পুরোহিত পরিবেষ্টিত হয়ে দশরথ সিংহাসনে বসে আছেন। মাথার উপরে শ্বেতছত্র। কিঙ্করীদের শুভ্র চামর ব্যজন। হেমদণ্ডে রত্নদীপ জ্বলছে। অগুরু চন্দন পুষ্পের গন্ধে আমোদিত সভাকক্ষ।

দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর রাজমুকুটের প্রান্তভাগে পলিত পক্ককেশ। রাজপরিচ্ছদের অন্তরালে জীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহ। শীর্ণমুখে বার্ধক্যের বলিরেখা। আর তাঁর ক্লান্ত দৃষ্টিতে বুঝি রয়েছে একটা দুঃস্বপ্নের ছায়া। কিন্তু কোনো রাজা তো চোখে-মুখে মনের ভাব প্রকাশ করেন না, তাই তিনি চেষ্টা করে একটা প্রসন্নতার ভাব ধরে রেখেছেন। যদিও তার মধ্যে কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই। প্রভাতের আসন্ননির্বাণ প্রদীপশিখার মতো কেমন নিষ্প্রভ—"আসীদাসন্ন-নির্বাণঃ প্রদীপার্চিরিবোষসি" (রঘুবংশ, ১২/১)।

রুদ্ধ উৎকণ্ঠার নীরব সভাকক্ষ।...

তখন দুন্দুভিগম্ভীর কণ্ঠে রাজা দশরথ সকলকে আহ্বান করলেন। তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর রাজোচিত। অথচ সেই সঙ্গে মধুর স্নিগ্ধ ও কমনীয়—

দুন্দুভিস্বরকল্পেন গম্ভীরেণানুনাদিনা।
স্বরেণ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন॥
রাজলক্ষণযুক্তেন কান্তেনানুপমেন চ।
উবাচ রসযুক্তেন স্বরেণ নৃপতির্নৃপান্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২/২-৩)

—"সমবেত সভাসদগণ, আপনারা জানেন, আমার পূর্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু বংশের শ্রেষ্ঠনরপতিগণ পুত্রতুল্য স্নেহে এই রাজ্য প্রতিপালন করে এসেছেন। আমিও তাঁদের অনুসরণ করে এতদিন যথাসাধ্য প্রজাপালন করেছি। কিন্তু আজ আমি বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত। তাই আপনাদের অনুমতি নিয়ে রাজপদ থেকে অবসর গ্রহণ করে বিশ্রাম নিতে চাই।"...

শীতের হাওয়ার মতো সভার মধ্যে একটা বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হল। দশরথ একটু থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন,

—"আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম সর্বগুণের আধার। সে কর্মকুশল ধার্মিক শ্রেষ্ঠ নরোত্তম। আপনারা অনুমোদন করলে, আগামীকাল শুভ পুষ্যানক্ষত্রে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাই। আর যদি অনুমোদন না করেন, যদি আপনাদেব অন্য কোনো প্রস্তাব থাকে, তাহলে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাও আমাকে উপদেশ করুন।"

দশরথেব প্রস্তাবে সভাস্থ সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। বাহিরে অপেক্ষমান জনতার তুমুল আনন্দ কোলাহল।

সবাই এক বাক্যে বললেন, "আমরা রঘুবীর রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখতে চাই।"

শুনে দশরথ আনন্দিত হলেন। কিন্তু আপন মনোভাব ব্যক্ত না-করে আবার বললেন, "কিন্তু আমার সংশয় হচ্ছে, হয়তো আমি এই প্রস্তাব করেছি বলেই আপনারা অনুমোদন করছেন। তা নয়, আমি চাই, আপনাবা অকপটে স্পষ্টভাবে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করুন।"

দশরথ নিঃসংশয় হতে চান। প্রজাদের সমর্থন যেন হয় স্বতঃস্ফূর্ত। কোনো ভয় সংশয় দ্বিধা যেন না থাকে। তিনি চান, কেবল রাজ-আজ্ঞায় নয়, রাম রাজা হোক প্রজার অকুণ্ঠ সমর্থনে ও সম্মতিতে।

রামায়ণের যুগে প্রাচীন ভারতের এই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। ভারতীয় ঋষিদের দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র হল রাজধর্ম। ধর্মের কর্মময় আয়তন। রাজা শাসক হলেও তিনি ধর্মের প্রতিনিধি। ধর্মের রক্ষক ও সেবক। প্রাচীন ভারত এমন একটি রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ উদ্ভাবন করেছিল যার মধ্যে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের স্বাধীন সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। রাজার সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে যথোচিত সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করত রাজ্যের শক্তিশালী জনমত। পৌরজীবনের যত সামাজিক আর্থিক লৌকিক ও ধর্মীয় সংগঠন, তাদের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেই, রাজাকে দেওয়া হয়েছিল এক সর্বময় প্রশাসনিক কর্তৃত্ব। রাজা যেমন প্রভু তেমনি আবার জনগণের সেবক ও শিষ্য। তাই ভারতবর্ষে রাজাব কর্তৃত্ব থাকলেও, তাঁদের শাসনের মধ্যে ছিল না স্বৈরাচারী একনায়কত্বের কঠোরতা বা নিষ্ঠুরতা। এই আশ্চর্য সমাধান সম্ভব হয়েছিল ভারতীয় ঋষিদের জ্ঞানদৃষ্টি বলে। যে দৃষ্টিতে রাজা প্রধান এবং মুখ্য নন, প্রজাও প্রধান এবং মুখ্য নন। রাজত্ব যেমন রাজার নয়, তেমনি প্রজারও নয়। রাজত্ব হল ধর্মের। ধর্মই প্রধান এবং মুখ্য। রাজা কেবল ধর্মের সেবক ও প্রতিনিধি। আর প্রজা সেই ধর্মের ব্যবহারিক আয়তন। বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্যন্ত ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো এই আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। মনুসংহিতায় (সপ্তম অধ্যায়ে) তার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দর করে বলেছেন, "Indian civilisation evolved and admirable political system, built solidly and with an enduring soundness, combined with a remarkable skill the monarchical, democratic and other principles and tendencies to which the mind of man has leaned in its efforts of civic construction and escaped at the same time the excess of the mechanising turn which is the defect of the modern European State...And in the Ramayana we have and idealised picture of such a Dharmarajya, a settled universal empire. Here too it is not an autocratic

despotism but a universal monarchy supported by a free assembly of the city and provinces and of all the classes..." (*The Foundations of Indian Culture*, 1959, pp. 414, 425)।

তাই দশরথের ক্ষমতা থাকলেও প্রজার সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া তিনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে পারেন না। এবং যেহেতু তিনি ধর্মের প্রতিনিধি, তাই ভয় দেখিয়ে বা জোর করে সেই সম্মতি আদায় করতে চান না। দশরথ জানেন, জনমতকে দুর্বল বা খর্ব করলে পরিণামে রাজাই দুর্বল হয়ে পড়েন। তাতে রাজা এবং প্রজা কারোই মঙ্গল হয় না। তাই তিনি প্রজাদের সম্মতিকে এমন করে বারবার যাচাই করে নিতে চাইছেন।

তাছাড়া আরও একটা বড় কারণ আছে। সেকথা তাঁর ললাটের উৎকণ্ঠিত রেখার আড়ালে ঢাকা। একটা ঘোর আশঙ্কা ও সংশয় বুঝি আসন্ন। তাই তিনি বেঁচে থাকতেই তাড়াতাড়ি রামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চান। দশরথ ভয় পেয়েছেন। কিন্তু সেকথা বলতেও পারছেন না। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ তীক্ষ্ণদর্শী রাজা। রাজনীতির ঘূর্ণী ঝড় কখন যে কোন দিক্ থেকে আসে তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। মানবচরিত্র বুঝতে তাঁর ভুল হয় না। একটু পরেই তিনি তাঁর আশঙ্কার কথা গোপনে রামকে বলবেন। ঠিক বলবেন না, সামান্য একটু আভাস দেবেন মাত্র। বিপদ একটা আসছে ঠিকই। কিন্তু দশরথ ভুল করেছেন। মারাত্মক ভুল। কোথা থেকে যে সেই বিপদ আসছে তা তিনি ধরতে পারেননি। অনেক সময় আমরা যেদিক থেকে বিপদ আশঙ্কা করি, বিপদ ঠিক সেদিক থেকে আসে না, আসে অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য দিক্ থেকে। যেখানে বিশ্বাস করা উচিত ছিল, দশরথ সেখানেই সন্দেহ করছেন, আর যেখানে তিনি নিশ্চিন্ত সেইখান থেকেই অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। আর পরিণামে শোক হাহাকার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

আদিকাণ্ডে ক্রৌঞ্চমিথুনের শরাহত বেদনায় যে রামায়ণের শুরু—যে শোক থেকে উৎসারিত হল শ্লোক—তা যেন সমগ্র রামায়ণের একটা প্রতীকচিত্র। শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে সীতার দুঃখ এক হয়ে গেছে, বাল্মীকি তারই ইঙ্গিত করেছেন এই কথা বলে "বিযুক্তা পতিনা তেন" (আদিকাণ্ড ২/১২)। আনন্দের নিবিড় মুহূর্তে, যখন মনে হয় এর চেয়ে সুখের অবস্থা আর হয় না, তখনই ভাগ্যের অন্ধকার থেকে ছুটে আসে কোন এক অলক্ষ্য নিষাদের নিক্ষিপ্ত শর। ছিন্নভিন্ন করে দেয় সব সুখস্বপ্ন। সুখের বুক চিরে ফেটে বেরিয়ে আসে ক্রৌঞ্চীর আর্তনাদের মতো তীক্ষ্ণ ক্রন্দনের সুর। হাসির মধ্যে কান্না, স্নেহের মধ্যে শোক প্রেমের মধ্যে ঈর্ষার ফণা।

রামায়ণে বারবার এমনটি ঘটেছে।...

রাম রাজা হবেন। চারিদিকে অভিষেকের আনন্দ উৎসব। ঘটনার চক্রান্তে হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল নিষ্ঠুর বাণ। রাম গেলেন বনবাসে।

বনবাসে রাম-সীতার জীবন এক রকম সুখেই কাটল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে শান্ত বনানীর কোলে তাঁদের প্রাণের পাত্র সুধায় ভরে উঠল। সে-আনন্দের কাছে অযোধ্যার রাজ-ঐশ্বর্য রামের তুচ্ছ মনে হয়েছিল, "নাযোধ্যায়ৈ রাজ্যায় স্পৃহয়ে" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৫/১৭)। এমনি করে তেরো বৎসর কেটে গেল। আর এক বৎসর বাকি। রাম অযোধ্যায় ফিরবেন। আবার রাজা হবেন। সুখের দিন এল বলে। ঠিক তখনই অতর্কিতে ছুটে এল আবার সেই নিষ্ঠুর বাণ। রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল সীতাকে।

তারপর, রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করলেন রাম। এবারে আমরা নিশ্চিন্ত। যাক, এতদিনে দুঃখের পরে শুরু হবে তাঁদের সুখের জীবন। সীতা হলেন গর্ভবতী। পূর্ণগর্ভা আনন্দিতা সীতা। ঠিক তখনই আবার তাঁদের সুখের ভরা ঘট ভেঙে গেল। রামের দাম্পত্য সুখে আগুন লাগল। সীতা হলেন নির্বাসিতা। এমনি করে বারেবারে অন্ধকার থেকে ছুটে এসেছে অলক্ষ্যচারী কোন নিষাদের নিক্ষিপ্ত শর। আনন্দের মুহূর্তকে বিদ্ধ করেছে শোকের বিষাক্ত ফলকে। আর আমরা বাল্মীকির মতোই ব্যথিত হৃদয়ে থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠেছি, "মা নিষাদ—মা নিষাদ"—

হয়তো দশরথের এই অতি সাবধানতাই তাঁর দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছে। তাঁর মিথ্যা সন্দেহই পরিস্থিতির মধ্যে সত্যকার বিপদ ঘনিয়ে তুলেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন যথার্থ বলেছেন, "কোন অশুভ গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি রামাভিষেকের অচিন্ত্যপূর্ব বিঘ্নরাশি স্বয়ং আশঙ্কার দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিলেন।" ('রামায়ণী কথা', ১৩৭৬ পৃ. ১৮)

দশরথ যে সভা ডেকেছেন তাতে সকল দেশের রাজাকেই নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু আমন্ত্রণ জানাননি কৈকেয়ীর পিতা কেকয়রাজ অশ্বপতিকে। এবং মিথিলার রাজা জনককে। জনককে সংবাদ দেননি এইজন্য যে, অশ্বপতিকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য যাতে কোনো কথা না ওঠে। অযোধ্যার উত্তরাধিকার নির্বাচনের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সভায় তাঁরা দুজনেই অনুপস্থিত। তাঁরা কিছুই জানলেন না। ভরত ও শত্রুঘ্নও রয়েছেন মাতুলালয়ে। তাঁরাও কিছু জানলেন না। এতখানি ত্বরা এবং গোপনীয়তার কারণ কি? ব্যাপারটা কারো দৃষ্টি এড়াল না। সভায় একটা গুঞ্জন উঠল।

অবস্থা বুঝে দশরথ একটা কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলেন। বললেন, "আগামী কাল শুভ তিথি। তাই শীঘ্র অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে। এই আনন্দ সংবাদ তাঁরা পরে শুনবেন। ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্। (অযোধ্যাকাণ্ড, ১/৪৮)

সভায় দশরথ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করছেন, "উপস্থিত রাজন্যবর্গ, এবং সম্মানীয় পুরজনবাসী, আপনারা বলুন, কেন আপনারা রামকে রাজপদে বরণ করতে চান?"

—"মহারাজ, রঘুকুলচন্দ্র রাম আমাদের সকল মঙ্গলের নিধি। শক্তিতে তিনি ইন্দ্রতুল্য। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। বহুশাস্ত্রদর্শী, কীর্তি যশ ও তেজের আধার। ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ। উদার প্রিয়ভাষী ক্ষমাশীল। ধর্মার্থনিপুণ সত্যপরাক্রম জিতেন্দ্রিয়। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবণিতা প্রভাতে সায়াহ্নে নীলোৎপলকান্তি রামচন্দ্রের মঙ্গল কামনায় দেবগণকে প্রণাম করে থাকে। সূর্যবংশের সূর্যসংকাশ রামচন্দ্রকে আমরা তাই রাজপদে অধিষ্ঠিত দেখতে চাই।"

—"উত্তম। তাহলে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব, আপনারা রামের অভিষেকের আয়োজন করুন।"

সভায় হর্ষধ্বনি উঠল।...

—"সুমন্ত্র, যাও, রামকে এই সভায় নিয়ে এস।"

—"যে আজ্ঞা, মহারাজ।"

চৈত্রদিনের বসন্ত প্রভাতের মৃদু সমীরণ। রাজসভায় অভিনন্দন হর্ষ। সিংহাসন থেকে আকাশের মতো পিতৃস্নেহ নিয়ে দশরথ তাকিয়ে আছেন...

সুমন্ত্রের সঙ্গে রাম সভায় প্রবেশ করছেন...

ধীর গজেন্দ্রগতি। দীর্ঘবাহু মহাসত্ত্ব চন্দ্রকান্তি।

দশরথ যেন তাঁর নিজেরই যৌবনের প্রতিমূর্তি দেখছেন।...

প্রণত পুত্রকে আলিঙ্গন করে রত্নাসনে বসালেন। উদিত সূর্যের প্রভায় উজ্জ্বল মেরুপর্বতের মতো দশরথকে বড় মহিমান্বিত দেখাচ্ছে।

—"বৎস রাম, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, আমার একান্ত প্রিয়। তুমি নিজের গুণ ও চরিত্রবলে প্রজাদের মন জয় করেছ। আগামীকাল শুভ পুষ্যানক্ষত্রে তোমার রাজ্যাভিষেক হবে। আশীর্বাদ করি, তুমি বিনয়ী জিতেন্দ্রিয় হয়ে, কামক্রোধ ব্যসন পরিহার করে, অমাত্য ও প্রজাদের প্রতি অনুরাগী থেকে রাজ্য শাসন কর।"....

দশরথের কথা শেষ না-হতেই সভাকক্ষ অভিনন্দনে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

রামের হিতৈষী বন্ধুগণ অনেকে তখন অন্তঃপুরে ছুটে গেল কৌশল্যাকে এই আনন্দ সংবাদ দিতে।...

দশরথকে প্রণাম করে, সভার সকলের প্রতি সম্ভ্রমে মস্তক আনত করে, হর্ষধ্বনির মধ্যে ধীরে ধীরে রাম প্রস্থান করলেন।

সভা ভঙ্গ হল।

একে-একে অমাত্য রাজন্যবর্গ বিদায় নিলেন।...

তখন পর্বত গুহায় যেমন সিংহ প্রবেশ করে তেমনি দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু অন্তঃপুরে এসে দশরথকে আবার চিন্তিত দেখা গেল। তিনি অস্থিরভাবে পদচারণা করছেন।

—"সুমন্ত্র!"

—"মহারাজ।"

—"শীঘ্র তুমি রামকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

সুমন্ত্র বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

—"তাকিয়ে আছ কেন? যাও শীঘ্র রামকে গিয়ে বল, মহারাজ তার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

সুমন্ত্র নীরবে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

অন্তপুরে তখন কৌশল্যা আনন্দে সকলকে দুহাত ভরে উপহার দিচ্ছেন। সামনে যে আসছে তাকেই দান করছেন অজস্র সুবর্ণ রত্ন ও ধেনু।

রামের ভবনে এলেন সুমন্ত্র।

—"দ্বারপাল, যুবরাজকে সংবাদ দাও, জরুরি প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দ্বারপাল ছুটে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, "আসুন যুবরাজ অপেক্ষা করছেন।"

—"কী সংবাদ, সুমন্ত্র?"

—"মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন।"

—"পিতা আবার ডেকেছেন? কী হল?"

—"জানি না যুবরাজ! বললেন, জরুরি।"

শঙ্কিত হয়ে দ্রুতপদে রাম বললেন, "চল"।

দশ

অন্তঃপুরের রাজনীতি

এই মাত্র রাজসভা থেকে ফিরেছেন, এরই মধ্যে আবার কেন সুমন্ত্র ডাকতে এলেন? রাম শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—"শ্রুত্বৈব চাপি রামস্তং প্রাপ্তং শঙ্কান্বিতোঽভবৎ (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪/৫)। একটা অনিশ্চিত ভয় ও আশঙ্কা বুঝি পিছনে ছায়ার মতো ফিরছে। সকলেরই মন বারবার কেঁপে-কেঁপে উঠছে। একটা অশুভ যেন নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসছে।

পিতার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে রাম উদ্‌বিগ্ন হলেন। একটু আগে রাজসভায় দশরথ কত ধীর গম্ভীর শান্ত হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর কি হল? তাঁকে এমন অস্থির বিচলিত দেখাচ্ছে কেন?

রামকে কাছে ডেকে দশরথ শঙ্কিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "রাম আমার কাছে এসে বোসো। তোমাকে কয়েকটি জরুরি কথা বলব বলে ডেকেছি। আমার দীর্ঘ জীবনে আয়ু যশ কীর্তি সকলই লাভ করেছি। স্বাধ্যায় যজ্ঞ দক্ষিণায় কৃতার্থ হয়েছি। এখন শুধু তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করা ছাড়া আমার কোনো কর্তব্য নেই। গত রাত্রে আমি একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। যেন আকাশ থেকে বজ্র উল্কাপাত হচ্ছে। চারদিকে ঘোর অমঙ্গলের বিকট শব্দ। পণ্ডিতেরা গণনা করে দেখেছেন আমার জন্মনক্ষত্র সূর্য এখন রাহু ও মঙ্গলগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে, এ বড় অশুভ লক্ষণ। রাজার মৃত্যু ও রাজ্যের বিপদ সূচনা করে। জ্যোতির্বী ও দৈবজ্ঞগণ এই নিয়ে জল্পনা করছেন। তাই, কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আগেই তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে যেতে চাই। মানুষের মতিগতির কথা তো বলা যায় না। কে জানে, হয়তো আমারও বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যেতে পারে। তাই আমার মন বড় উতলা হয়েছে। আগামী কালই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হোক।"

> তদ্‌যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
> তদ্‌যাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাংমতিঃ;
> ...মনস্ত্বরয়তীব্ মাম্।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৪/২০, ২২)

দশরথ একটু থেমে কিঞ্চিৎ দ্বিধা করে আবার বললেন, "তাছাড়া, আমি বলি কি, ভরত এখন রাজধানী ছেড়ে প্রবাসে আছে; এই অবকাশেই তোমার অভিষেক হয়ে যাওয়া ভাল।

> বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেবো পুরাদিতঃ।
> তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তে কালো মতো মম॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৪/২৫)

মানুষের মতিগতির কথা কে বলতে পারে। (কিন্নু চিত্তং মনুষ্যণামনেত্যমিতি)। যদিও ভরত সৎ ধার্মিক এবং উদার, কিন্তু সাধু ব্যক্তির মনেও তো বিকার আসে (সতঞ্চ ধর্মনিত্যানাং কৃতশোভি...)।

তুমি আজ সস্ত্রীক ব্রত উপবাসে শুদ্ধচিত্ত হয়ে কুশশয্যায় শয়ন করে অধিবাস রাত্রি যাপন কর। এখন তবে এস। তোমার বন্ধুরা যেন আজ সাবধানে তোমাকে রক্ষা করে। সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য সমন্ততঃ।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪/২৪)

দশরথের কথাগুলি বড় সাংঘাতিক। শেষ কথাটি আরও সাংঘাতিক। তিনি খুব ভয় পেয়েছেন। নিজের উপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। সংশয়ে উদ্‌বেগে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দশরথের এই দুঃশ্চিন্তার কারণ কি? তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন, গ্রহনক্ষত্রের অশুভ সমাবেশ ঘটেছে, শুধু এই জন্যই কি তাঁর আশঙ্কা? তাঁর কথার মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, তিনি অন্য কারণে ভীত হয়েছেন। বড় নিষ্ঠুর সেই আশঙ্কা।

সম্ভবত রাজপদের উত্তরাধিকার নিয়ে, প্রকাশ্যে না হলেও অন্তত পরোক্ষভাবে রামের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিপক্ষের কানাঘুষো চলছিল। রাজ্যাভিষেকের সময় কোনোভাবে কোনো দিক্ থেকে হয়তো একটা বাধা আসতে পারে, এমন আশঙ্কা দশরথের ছিল। "ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্যাণ্যেবং বিধানি হি" (অযোধ্যাকাণ্ড ৪/২৪) একথা দশরথ নিজেই বলছেন। এমনকী রাম হয়তো নিজেও আক্রান্ত হতে পারেন, তাঁর জীবনও বিপন্ন হতে পারে, সে ভয়ও দশবথ করছেন। তাই রামকে সাবধান করে দিয়ে তিনি বলছেন, "তোমার বন্ধুরা যেন সতর্ক হয়ে তোমাকে রক্ষা করেন।"

রামের বিরুদ্ধে যে একটা শত্রুপক্ষ ছিল, তার ইঙ্গিত কৌশল্যাও করেছেন। অভিষেকের সংবাদে কৌশল্যা রামকে আশীর্বাদ করে বলছেন, "হতাস্তে পরিপন্থিনঃ—তোমার বিরুদ্ধপক্ষ নিপাত যাক।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪/৩৯)

কিন্তু এই প্রতিপক্ষ যে কারা তা বোঝা যাচ্ছে না। স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলছেনও না। শুধু একবার মাত্র দশরথ রামকে ইঙ্গিত করেছেন, "ভরত এখন প্রবাসে আছে, এই অবকাশে তোমার অভিষেক হয়ে যাওয়া ভাল।" তাহলে দশরথ কি ভরতকেই সন্দেহ করছেন? পিতা হয়ে অবিশ্বাস করছেন পুত্রকে? তাও এমন পুত্র, যে অত্যন্ত সরল উদার পবিত্র ও ধার্মিক। দশরথ তো নিজেই বলেছিলেন, ভরতকে আমি রাম অপেক্ষাও বেশি ধার্মিক বলে মনে করি। রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্। (অযোধ্যাকাণ্ড, ১২/৬১) অথচ ভাগ্যের পরিহাস, এমন পুত্রকেও তিনি সন্দেহ করছেন। কিংবা হয়তো ঠিক ভরতকে নয়। তাঁর ভয়, পাছে ভরতকে উপলক্ষ্য করে বাধা আসে ভরতের মাতুল বংশের থেকে। দশরথ বিরোধীপক্ষ হিসাবে আশঙ্কা করছেন কেকয়রাজ অশ্বপতি ও যুধাজিৎকে।

কৌশল্যার উক্তিতেও একই আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। তিনি রামকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, "তুমি রাজ্যশ্রী লাভ করে আমাকে ও সুমিত্রার বন্ধুদের সুখী কর। জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তাঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪/৩৯) তাঁর কথায় নিপুণভাবে বাদ পড়েছেন কৈকেয়ী। কৌশল্যা ও সুমিত্রা ছাড়া অন্তপুরে আর কি কেউ সুখী হবেন না? কৌশল্যা ভাবছেন কৈকেয়ী শত্রুপক্ষ। দশরথ ভাবছেন কৈকেয়ীর পিতৃকুল শত্রুপক্ষ।

বৌদ্ধ রামায়ণ 'আনামকম্ জাতকম্'—এ এই আশঙ্কাই স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রামের রাজ্যাভিষেকে বাধা দেবার জন্য কেকয়রাজ্য থেকে যুধাজিৎ সসৈন্যে অযোধ্যা আক্রমণ করতে আসছেন। এই সংবাদ শুনে রাম আত্মীয়বিরোধ ভ্রাতৃবিরোধ এড়াবার জন্য রাজ্য ত্যাগ করে সীতা ও লক্ষ্মণসহ বনে গমন করেন।

রামের যে একটা বিরোধী শত্রুপক্ষ সক্রিয় ছিল তার আভাস বাঙালি কবি কৃত্তিবাসও দিয়েছেন—

কতশত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু, কেবা মিত্র, কেবা তাহা জানে।
আমি বিদ্যমানে ধর ছত্র নবদণ্ড।
কি জানি, আসিয়া কেহ হয় বা পাষণ্ড॥

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, "শ্রীরামচন্দ্রের অধিবাস")

রাজত্বের উত্তরাধিকার নিয়ে রামের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল, এবং তাতে রাম যে মনে-মনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন, তার ইঙ্গিত আছে অধ্যাত্মরামায়ণেও। বনবাসের প্রস্তাব শুনে রাম কৈকেয়ীকে বলছেন "আমার মনের কথাই আপনি ব্যক্ত করেছেন মাত্র—ময়েব প্রেরিতা বাণী তব বক্তাদ্বিনির্গতা।" (অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৯/৬৩)

এমনি করে সন্দেহ আর ঈর্ষা, এই দুই আগুনের মাঝে পড়ে দগ্ধ হয়েছেন নিষ্কলঙ্ক ভরত। দশরথের জন্য আমাদের দুঃখ হয়; কিন্তু ভরতের জন্য হয় কষ্ট। এমনকী রামের জন্য তত কষ্ট হয় না। কেননা অকারণে দুঃখ বঞ্চনা তবু সহ্য হয়, তার মধ্যে একটা মহিমা আছে। কিন্তু বিনা দোষে আজীবন কলঙ্ক বহন করার মধ্যে থাকে শুধু তীব্র গ্লানি। রামের দুঃখে তো সবাই ব্যথিত, এমনকী শত্রুও তাঁকে ভালোবাসে। কিন্তু ভরত? তিনি সারাজীবন যাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, তারা সকলে তাঁকে ঘৃণা করেছে, অবিশ্বাস করেছে। এই দুঃখ যে রামের দুঃখের চেয়ে কত তীব্র আমরা তা মনে মর্মে অনুভব করি। ভরতের এই আত্মগ্লানির দাহ তাঁকে চিরসন্ন্যাসী করে তুলেছে। আর আমাদের হৃদয়কে করে তোলে ব্যথাতুর বিষণ্ণ উদাস।

কালিদাস বলেছেন, "ভরত মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন—মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরৎ" (রঘুবংশ, ১২/১৯)। কিন্তু শুধুই কি মায়ের পাপ? পিতা দশরথের কি কোনো পাপ হয়নি? নিরপরাধ ধার্মিক পুত্রকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করা প্রাজ্ঞ রাজার পক্ষে কি পাপ নয়? মাতা ও পিতা উভয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্তই কি ভরত সারা জীবন ধরে করেননি? কৈকেয়ীর চেয়ে বরং দশরথের দোষ ও দায়িত্বই বেশি। তিনি যদি প্রথম থেকেই ভরতের বিরুদ্ধে মনে-মনে একটা বদ্ধমূল সন্দেহ পোষণ না করতেন, যদি ভরত রামের অভিষেক উৎসবে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে কৈকেয়ীর সাধ্য ছিল না কোনো অনর্থ ঘটায়। ভরতের অনুপস্থিতিতেই পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে উঠেছিল। পরে যখন ভরত অযোধ্যায় এলেন তখন সব শেষ। তাঁর আর করার কিছু ছিল না।

অসহায় ভরতের চারিদিকে তখন কেবল সন্দেহ বক্রদৃষ্টি ধিক্কার। নিরুপায় হয়ে তিনি বারে-বারে মন্ত্রী ও অমাত্যদের সামনে ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে শপথ করে বলেছেন, "আমি কখনো রাজ্য চাইনি। আমার জননীকেও কোনো কুপরামর্শ দিইনি। আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের

রাজ্যাভিষেকের যে আয়োজন হয়েছিল তাও আমি জানতাম না। রাম লক্ষ্মণ সীতার বনবাসের কথাও কিছু জানতাম না।"

> রাজ্যং না কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্॥
> অভিষেকং না জানামি যোঽভূদ্ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ।
> বিপ্রকৃষ্টে হ্যহং দেশে শত্রুঘ্নসহিতোঽভবম্।
> বনবাসং না জানামি রামস্যাহং মহাত্মনঃ।
> বিবাসনঞ্চ সৌমিত্রেঃ সীতায়াশ্চ যথাভবৎ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৫/২-৪)

কিন্তু কে বিশ্বাস করে তাঁর এই কথা? চোখের জলে কি মিথ্যা দুর্নামের কালিমা মোছা যায়? মন্ত্রী অমাত্য রাজপুরবাসী কেউ এসে ভরতকে একটি সান্ত্বনার বাক্য বলেনি। একমাত্র শত্রুঘ্ন ছাড়া অত বড় রাজবাড়িতে মূর্ছিত ভরতকে ধরবার কেউ নেই! নিজগৃহে ভরত যেন পরবাসী শত্রু।

এমনকী শোকাতুর কৌশল্যা সুমিত্রাকে ধরে কাঁপতে-কাঁপতে এসে বললেন, "ভরত, তুমি রাজত্ব চেয়েছিলে, এখন তবে নিষ্কণ্টকে রাজত্ব ভোগ কর। ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৫/১১)

ব্যাধের নিষ্ঠুর তীর এসে যেমন মৃগশিশুকে বিদ্ধ করে তেমনি ভরতের দীন আর্ত হৃদয়কে বিদ্ধ করল কৌশল্যার এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। সপত্নী-পুত্রের প্রতি একজন প্রাকৃতস্বভাব গ্রাম্য নারীর মুখে এমন নিষ্ঠুর বাক্য হয়তো শোভা পায়, কিন্তু রামচন্দ্রের জননী মহীয়সী কৌশল্যার মুখে একথা মানায় না। তাঁব শোকার্ত দশার কথা ভেবেই আমরা কেবল নীবব থাকি। কিন্তু কবি বাল্মীকি নীবব থাকতে পারেননি। তিনি বলেছেন, "কৌশল্যার এই তিরস্কার বড় নিষ্ঠুর বড় ক্রূর—(...বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সর্ন্তুৎসিতিঃ)। তা যেন ভরতের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সূচবিদ্ধ করল (ব্যবথে অতীব ব্রণে সূচিনা)।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৫/১৭)

ভরত তখন কৌশল্যাকে আবার বললেন, "মা, আমি এর কিছুই জানি না। আমি নির্দোষ। রাঘবকে যে আমি কত ভালবাসি তা কি আপনি জানেন না? তবে কেন আমাকে তিরস্কার করছেন?

> আর্যে অস্মাদজানন্তং গর্হসে মামকল্মষম্।
> বিপুলাঞ্চ মম প্রীতিং স্থিতাং জানাসি রাঘবে।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৫/২০)

প্রায় দীর্ঘ একটি সর্গ জুড়ে ভরত এমনি কবে কৌশল্যার সামনে শপথ করলেন, নিজেকে নানাভাবে অভিশাপ দিলেন, শেষে কৌশল্যার মন একটু নরম হল। তবু মন থেকে সন্দেহ সম্পূর্ণ গেল না। তিনি বললেন, " তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে শুভলক্ষণ। তোমার মন ধর্ম থেকে বিচলিত হয়নি। যদি সত্যনিষ্ঠ হও তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৫/৬২)

কৌশল্যার কথার মধ্যে তখনও সংশয় সন্দেহের ছায়া কাঁপছে। বস্তুত ভরতের বিরুদ্ধে এই সন্দেহ কোনোদিন কারো মন থেকেই চলে যায়নি। কেউ তাঁকে বিশ্বাস করেনি। ভরতের

আগমনে অযোধ্যার ঘরে-ঘরে বিলাপ উঠেছিল, "কসাইয়ের হাতে যেমন বধ্যপশু, আমরা তেমনি ভরতের হাতে পড়লাম। ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৮/১৮)

শুধু পিতা দশরথই নন, এমনকী রাম লক্ষ্মণ সীতা পর্যন্ত মনে-মনে ভরতে অবিশ্বাস করে এসেছেন। ঋষি ভরদ্বাজও সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। অথচ তার কোনো কারণ নেই। সরল শুদ্ধ হৃদয়ের প্রতি এতখানি অবিচার মহাকাব্যে আর কোথাও হয়নি। রামায়ণের মর্মে এ এক গভীর ব্যথা।

আমরা ব্যথা পাই যখন রাম সীতাকে বলছেন, "তুমি ভরতের সামনে আমার প্রশংসা করো না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি অন্যের প্রশংসা সহ্য করতে পাবে না। তাই ভরতের সামনে আমার গুণকীর্তন করো না।

ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যং কদাচন।
ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্।
তস্মান্ন তে গুণা কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২৬/২৪-২৫)

শুধু এই একবার নয়, যুদ্ধকাণ্ডের শেষে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময়ও রাম আবার হনুমানকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, "আমার সংবাদ দিয়ে ভরতের হাবভাব খুব ভাল করে লক্ষ করবে। তার আন্তরিকতা যাচাই করবে। তার চোখমুখের চেহারা দৃষ্টি কথাবার্তা মনোভাব খুব ভাল করে বুঝে নেবে। পৈতৃক রাজ্য হাতে পেলে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া যে স্বাভাবিক।"

এতচ্ছ্রুত্বা যমাকরং ভজতে ভরতস্ততঃ।
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি॥
জ্ঞেয়াঃ সর্বে চ বৃত্তান্ত। ভরতস্যেঙ্গিতানি চ।
তত্ত্বেন মুখবর্ণেন দৃষ্ট্যা ব্যাভাষিতেন চ।
সর্বকামসমৃদ্ধং হি হস্ত্যশ্বরথক্কুলম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং কসা নাবর্তয়েন্মনঃ॥
সঙ্গত্যা ভরতঃ শ্রীমান্ রাজ্যেনার্থী স্বয়ং ভবেৎ।
প্রশাস্তু বসুধাং সর্বামখিলাং রঘুনন্দনঃ।
তস্য বুদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় ব্যবসায়ঞ্চ বানর॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১২৫/১৪-১৮)

রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চিত্রকূটের অরণ্যে ভরত আসছেন। তাঁকে দূর থেকে দেখেই লক্ষ্মণ অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, "ভরত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করবার জন্য আমাদের হত্যা করতে আসছে। আপনি যার জন্য আজ রাজ্যহারা বনবাসী হয়েছেন, সেই চিরশত্রু ভরত আসছে। ভরতকে আমি বধ করব। সে আমাদের অপকারী। তাকে বধ করায় কোনো দোষ নেই।"

সম্পন্নং রাজ্যমিচ্ছংস্তু...
আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকয্যা ভরতঃ সুতঃ॥
যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যচ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ॥
সম্প্রাপ্তোঽয়মরিবীর ভরতো বধ্য এব হি।
ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৬/১৭, ২২-২৩)

তবু লক্ষ্মণের কথায় আমরা ততটা বিস্মিত হই না। কারণ তাঁর চরিত্রে অশেষ স্নেহ প্রীতি বিনয় ভক্তি সত্ত্বেও তাতে আবার মিশে আছে কিছুটা ক্রুদ্ধতেজ, উগ্রচণ্ড ভাব। অন্যায় দেখলে মুহূর্তেই তিনি দপ করে জ্বলে ওঠেন। রামের বনবাস হবে শুনে লক্ষ্মণ তো পিতা দশরথকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, "পিতা যদি কৈকেয়ীর কথায় এমন করে শত্রুতা করেন, তাহলে তাঁকে আমি বধ করব, অথবা বন্দি করব। প্রোৎসাহিতঽয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা। অমিত্রভূতো নিসঙ্গং বাধ্যতাং বধ্যতামপি॥" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২১/১২)

কিন্তু আমরা বিস্মিত হই সীতার কথায়। সীতা—যিনি স্বর্গের করুণা দিয়ে গড়া স্নেহময়ী দেবীপ্রতিমা, যাঁর পবিত্রতার জন্য গঙ্গার আর এক নাম সীতা (আদিকাণ্ড, ৪৩/১৩)—সেই তিনিও কিন্তু মনে-মনে ভরতকে ঘৃণা করে এসেছেন। শত্রুর মতো অবিশ্বাস করেছেন। ভয়ে ও ক্রোধে অসতর্কভাবে একবার তা প্রকাশ হয়েও পড়েছিল। সীতা লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, "তুমি ভরতের চর। গুপ্তশত্রুর মতো আমাদের সঙ্গে এসেছ। কিন্তু বলে রাখছি, তোমার বা ভরতের অভিপ্রায় কখনো সফল হবে না।...প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্ত ভরতেন বা। তন্ন সিদ্ধতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।" (অরণ্যকাণ্ড, ৪৫/২৪-২৫)

এমনকী সকল স্বার্থ দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে দেবকল্প ঋষি ভরদ্বাজ, তিনিও ভরতকে সন্দেহ করেছেন। চিত্রকূটের পথে ভরত যখন ঋষির আশ্রমে এসেছেন, তখন ভরদ্বাজ তাঁকে তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো সংশয় তুলে জিজ্ঞাসা করছেন, "এখানে তোমার আগমনের কি প্রয়োজন? আমার মন থেকে আশঙ্কা যাচ্ছে না। নিষ্কণ্টকে রাজত্বভোগের জন্য রাম লক্ষ্মণকে অনিষ্ট করতে কোনো পাপ মতি নিয়ে আসনি তো?"

কিমিহাগমনে কার্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ।
এতদাচক্ষ্ব সর্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ॥
কচ্ছিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি।
অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৯০/১০, ১৩)

ভরতের দুর্ভাগ্য। কোনো দোষ তিনি করেননি, অথচ সকল কলঙ্ক সকল লাঞ্ছনা তাঁরই পবিত্র শিরে বর্ষিত হয়েছে। রামায়ণের এক-একটি মহৎ চরিত্র ভারতের সঙ্গে ব্যবহারে কিন্তু নেমে এসেছে অত্যন্ত সাধারণ স্তরে। ভরতের শুদ্ধ চরিত্রের নিকষে তাঁদের সকলের অন্তরের ন্যূনতা, সোনার সঙ্গে খাদটুকু যেন ধরা পড়েছে। দশরথ কৌশল্যা রাম লক্ষ্মণ সীতা—এমনকী ঋষি ভরদ্বাজ পর্যন্ত বাদ যাননি। ভরতকে তাঁরা যত সন্দেহ করেছেন ততই তাঁরা নেমে এসেছেন. অন্তত সাময়িকভাবে, একেবারে প্রাকৃত মানুষের কাছাকাছি। তুলনায় ভরত তাঁর ত্যাগে তিতিক্ষায়, পবিত্রতা ও সরলতায়, উত্তরোত্তর উঠে গিয়েছেন মহত্ত্বের শীর্ষে।

একটা ঘূর্ণমান চক্রের আবর্তন যেমন নাভিকেন্দ্রে তার কীলকদণ্ডকে আশ্রয় করে ঘোরে, তেমনি রামায়ণের কাহিনি-আবর্তের স্থির কীলকদণ্ড হলেন ভরত। যদিও রামচন্দ্র নায়ক, তথাপি ঋষি দৃষ্টিতে ভরতই এই কাহিনির আশ্রয়। সকল দিকের চাপ এসে পড়েছে ভরতেরই বুকে। ঋষি বাক্য তাই বলেছে, ''ভরতায়েতি কীলকম্''। অযোধ্যাকাণ্ডের বীজমন্ত্রও তাই 'ভং'। এবং বিনিয়োগ মন্ত্রে প্রণাম জানান হয়েছে ভরতকেই—''ওঁ দাশরথিভরতপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ''।

ভরত বড় দুঃখেই ভরদ্বাজ ঋষিকে বলেছিলেন, ''আপনি সর্বজ্ঞ ঋষি হয়েও যদি আমার সম্পর্কে এমন ভাবেন তাহলে তো আমার জন্মই বৃথা। হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে।'' (অযোধ্যাকাণ্ড ৯০/১৫)

লক্ষ্মণ যেখানে ক্রুদ্ধ আস্ফালনে বারবার বলেছেন, ''ভরতকে বধ করাতে আমি কোনো দোষ দেখি না। ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি।'' সেখানে ভরত অশ্রুপূর্ণনয়নে লক্ষ্মণ সম্পর্কে বলেছেন, ''লক্ষ্মণ ধন্য। সে রামচন্দ্রের পদ্মপলাশ আঁখি, তাঁর সুন্দর চন্দ্রাননখানি দেখতে পাচ্ছে।''

সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৮/৮)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন যথার্থ বলেছেন, ''জগতে নিরপরাধের দণ্ড অনেক বার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মতো আদর্শ ধার্ম্মিকের প্রতি এরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল।'' ('রামায়ণী কথা', ১৩৭৬, পৃ. ৭৯)

ভরতকে এত শাস্তি এত বড় দণ্ড দিয়েছেন, কিন্তু কৈকেয়ী নন, আর কেউ নন, তাঁরই পিতা দশরথ। ভরত সম্পর্কে তিনি যেন প্রথম থেকেই কেমন সন্ত্রস্ত ছিলেন। কিন্তু কেন? ভরতকে নিয়ে দশরথের এত ভয় কেন? কি সেই গোপন রহস্য?

এগারো

সফল রাজা—কিন্তু বিফল পিতা

ঘটনাচক্রে পরিস্থিতির চাপে একজন ধার্মিক নিরপরাধ মহৎ ব্যক্তি যে সারা জীবন কীভাবে লাঞ্ছিত হতে পারেন তার করুণ দৃষ্টান্ত হলেন ভরত। ভরত দুঃখের এক সিদ্ধরূপ। তাঁর জীবনে বেদনার পুষ্প থেকে তপস্যার মধু সবন করেছেন কবি। ভরতেব হৃদয়ের সঙ্গে যেন রামায়ণের করুণ মর্মতন্ত্রী বাঁধা। দুঃখকে তিনি তপস্যার মহিমা দিয়েছেন।

বাল্মীকি বলেছেন, ভরত সকল গুণের আধার শুদ্ধচরিত্র নির্মলবুদ্ধি—"সর্বৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ প্রসন্নধীঃ" (আদিপর্ব, ১৮/১৩-১৫)। কালিদাসের মতে ভরত পূতচরিত্র সাধু—"অনঘাং স সাধুঃ" (রঘুবংশ, ১৩/৬৫)। যাঁর জীবনের কথা ভাবলে সকল হৃদয় শুদ্ধ হয়, সকল উৎপাত শান্ত হয়। তাই তুলসীদাস বলেছেন, "ভরত চরিত জপযাগ।" (তুলসীদাসী রামায়ণ, ১/৫২)।

চার ভাইয়ের মধ্যে ভরত যেন স্বতন্ত্র। রাম গম্ভীর, লক্ষ্মণ উদ্‌বেল, শত্রুঘ্ন শান্ত, কিন্তু ভরত স্থির—ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক অটল মূর্তি। অতি বড় নিন্দুকেও সমগ্র রামায়ণে ভরতের চরিত্রে তিল মাত্র দোষ দেখতে পাবে না। খুঁজলে হয়তো রামের চরিত্রেও অনেক দোষ ত্রুটি চোখে পড়বে, অন্তত আধুনিক দৃষ্টিতে, কিন্তু ভরত সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। দশরথ নিজেই বলেছেন, "আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিক ধার্মিক বলে মনে করি—রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১২/৬১)। রামচন্দ্রও বলেছেন, "ভরত সত্যবাদী সুমঙ্গল মহাত্মা—সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১১১/৩০)। ঋষি ভরদ্বাজ তাই শেষ পর্যন্ত সানন্দে বলেছেন, "ভরত, তুমি ধর্মাত্মা ধর্মবৎসল। তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র আর কেউ নেই। সঞ্চিত জলাশয়ের মতো আর্যোচিত সকল গুণ তোমাতে আছে। তোমার ন্যায় সুপুত্রের জন্য দশরথ ঋণমুক্ত হয়েছেন।"

> নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে।
> যদার্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নোৎসৃষ্টমিবোদকম্॥
> অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।
> যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ॥
>
> (অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৩/১৬-১৭)

এত মহান এত পবিত্র তবু তাঁর কপালে এত কষ্ট এত লাঞ্ছনা কেন? তপ্ত বিষের মতো এত গ্লানি জীবনভরে তাঁকে পান করতে হল কেন? কেননা অযোধ্যাব রাজপ্রাসাদের ভিতর থেকে

উত্থিত রাজনীতির যত বিষবাষ্প, শান্ত সবুজ বনস্পতির মতো ভরত যেন তা আত্মসাৎ করে, আবহকে নির্মল করে ধরেছেন। জগতে পবিত্র হৃদয়ের এই তো পুরস্কার!

ভরতের পক্ষে কোনো দোষ না-থাকাটাই যেন এক রকমের দোষ। কবি ভবভূতির ভাষায়, অতি ভালও ভাল নয়—"সর্বমতিমাত্রং দোষায়" (উত্তর রামচরিত, ৬/৬)

ভরত জীবনে পাওয়ার মধ্যে পেয়েছেন কুমাতা, সন্দিগ্ধ পিতা, সংশয়ী ভ্রাতা, আর বিরূপ যত প্রজা ও পরিজন। এ যেন তাঁর বিধিলিপি। ভরত জীবনে কি পাবেন, আর কি পাবেন না, তা যেন তাঁর জন্মের আগেই বিধাতা বণ্টন করে দিয়েছেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দশরথের যজ্ঞচরু বণ্টনের ভিতর দিয়েই যেন এই সত্য প্রতীক হয়ে উঠেছে।

দশরথ প্রথমে যজ্ঞের প্রসাদী পায়সের অর্ধেকটা দিলেন কৌশল্যাকে। বাকী অর্ধেক দুই ভাগ করে তার একভাগ (অর্থাৎ সমগ্রের ১/৪ অংশ) দিলেন সুমিত্রাকে। অবশিষ্ট পায়সটুকু তো কৈকেয়ীকেই দেওয়ার কথা। কিন্তু দশরথ তা দিলেন না। তিনি তা থেকে আবার দুই ভাগ করে অর্ধেকটা (অর্থাৎ সমগ্রের ১/৪ অংশের অর্ধেক ১/৮ অংশ) দিলেন কৈকেয়ীকে। দশরথের হাতে তখনো প্রসাদী পায়স রয়েছে। তিনি তখন চিন্তা করতে লাগলেন ("অনুচিন্ত্য")। দশরথের এই থম্‌কে গিয়ে চিন্তা করাটা অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়। তিনি ভাবছেন, কৈকেয়ীকে দেবেন? কি, দেবেন না? শেষ পযন্ত অবশিষ্ট চরুটুকু সুমিত্রাকেই আবার দিলেন। কৈকেয়ীকে দিলেন না। মোটের উপর তাহলে দাঁড়ালঃ কৌশল্যা পেলেন ১/২ অংশ; সুমিত্রা ৩/৮ অংশ; এবং কৈকেয়ী ১/৮ অংশ।

কৌশল্যায়ৈ নরপতি পায়সার্ধং দদৌ তদা।
অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ॥
কৈকেয়্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্॥
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ॥

(আদিকাণ্ড, ১৬/২৭-২৯)

যজ্ঞের এই পায়স বণ্টনের বৈষম্যের ভিতর দিয়েই দশরথের মনের চিন্তা দ্বিধা সংশয় এবং ভয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তিনি এর মধ্যে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছেন। "অনুচিন্ত্য" কথাটি বাল্মীকি বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন। যদিও যজ্ঞের প্রসাদের পরিমাণের উপর কিছু নির্ভর করে না। কণামাত্র প্রসাদও সমান মাহাত্ম্য ও সমান কল্যাণকর। তাই প্রসাদের কমবেশি পরিমাপ নিয়ে চিন্তা করাটা অনাবশ্যক। দশরথের মনের দ্বিধা অন্য কারণে।

কৌশল্যা প্রধানা মহিষী, তাঁর পুত্রই হবে রাজ্যের অধিকারী, সুতরাং কৌশল্যার পুত্র বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ হোক এই আশায় যদি দশরথ তাঁকে অর্ধেকটা পায়স দিয়ে থাকেন, তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর মধ্যে বণ্টনের সময় এত চিন্তা ভাবনা কেন?

কারণ দশরথ সুমন্ত্রের কাছে শুনেছিলেন ঋষি সনৎকুমারের এক ভবিষ্যৎবাণীর কথা। তাতে তিনি জেনেছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গমুনির যজ্ঞে তাঁর চারিটি পুত্রের জন্ম হবে। তিন রানির গর্ভে যদি একসাথে চারিটি পুত্রের জন্ম হয় তাহলে অবশ্যই কোনো এক রানির গর্ভে যমজ পুত্র জন্মাবে। এখন কোন রানি? কৌশল্যার হলে ভাবনা নেই, কেননা তাতে রাজ্যের

উত্তরাধিকারীই বলবৃদ্ধি হবে। অন্যথায় সুমিত্রা? না, কৈকেয়ী? দশরথ চান না কৈকেয়ীর দুইটি সন্তান হোক। তাই অবশিষ্ট বেশির ভাগ পায়সটুকুই দিলেন সুমিত্রাকে। কৈকেয়ীর অংশের থেকেও অর্ধেকটা তুলে নিয়ে সুমিত্রাকে দিলেন। ভাবলেন, বরং সুমিত্রার হোক, তবু কৈকেয়ীর যেন যমজ সন্তান না হয়।

কিন্তু কেন? কৈকেয়ীর সন্তানের প্রতি দশরথের এই বিরূপ পক্ষপাত কেন? তাঁর মনে কিসের ভয় কাজ করছে? কৈকেয়ীকেই তো তিনি বেশি ভালবাসতেন। কৈকেয়ী সুন্দরী, তরুণী। বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সের তরুণী ভার্যা তো প্রাণের চেয়েও প্রিয়—"স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০/২৩)। তিনি তো বেশির ভাগ সময় কৈকেয়ীর কক্ষেই কাটাতেন—"রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৭২/১২)। তবু যজ্ঞের সৌভাগ্য বণ্টনে দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি এমন কার্পণ্য দেখালেন কেন?

তার কোনো সুস্পষ্ট উত্তর বাল্মীকি দেননি। মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের নানা উক্তি এবং কাহিনি ও ঘটনা সন্নিবেশের মধ্যে যেসব প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলি অনুসন্ধান করে একটা স্পষ্ট উত্তর খুঁজে নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই।

প্রথমত, দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি যতই অনুরক্ত থাকুন না কেন, তিনি কখনো ভোলেননি, তিনি কোশলাধিপতি নরোত্তম সম্রাট। কৈকেয়ীর প্রতি অনুরাগ তাঁর রাজোচিত তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর কাছে কোশল সাম্রাজ্য, ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব ও প্রতিপত্তি সবচেয়ে বড়। অযোধ্যার উপরে কোনো সুযোগে কোনো রাজশক্তি যাতে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে তিনি সর্বদা অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাঁর অযোধ্যাকে এমন ভাবে সুরক্ষিত করেছিলেন যে, শত্রুর কাছে তা ছিল দুর্ভেদ্য। তাই অযোধ্যা "ভূয়ঃ সত্যনামাঃ" (আদিকাণ্ড, ৬/২৬)।

এখন, কৌশল্যা হলেন তাঁরই রাজ্যের অধীন দক্ষিণ কোশলের কন্যা। সুমিত্রার পিতৃবংশের পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায় না। কিন্তু কালিদাস তাঁর রঘুবংশে বলেছেন, সুমিত্রা ছিলেন মগধের রাজকন্যা "মগধ দুহিতরঃ" (রঘুবংশ, (৯/১৭)। মগধ তখন কোশলের কর্তৃত্বাধীনে। কোশল রাজ্যের বিস্তৃতি কতদূব তার বর্ণনা স্বয়ং দশরথই দিয়েছেন—

দ্রাবিড়ঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ-মগধাঃ মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০/৩৭)

অতএব সেদিক থেকে কোনো আশঙ্কার কারণ ছিল না।

কিন্তু কৈকেয়ী কেকয় রাজার কন্যা। কোশল থেকে অনেক দূরে উত্তর পশ্চিম ভারতের বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের নাম গিরিব্রজ বা কেকয়। তার স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজা অশ্বপতি। দশরথ ভেবেছিলেন, বিপদ যদি আসে তো ওই দিক্ থেকেই আসতে পারে। আর কৈকেয়ীকে তিনি ভালবাসলেও সে যে বিলক্ষণ স্বার্থপর আত্মাভিমানী উদ্ধত গর্বিত এবং ক্রোধন স্বভাবের তাও তিনি ভালভাবে জানতেন।

অযোধ্যা থেকে ভরতের কাছে যখন দূত গিয়েছিল, তখন ভরত সকলের কুশল জিজ্ঞাসা

করে শেষ প্রশ্ন করছেন, "উগ্রচণ্ডী স্বার্থপর আত্মবুদ্ধিতে অহংকারী আমার মা কেমন আছেন?"

আত্মকামা সদাচণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০/১০)

পুত্র হয়ে ভরত যদি একথা বুঝতে পারেন তাহলে দশরথ কি বুঝতেন না? তিনি জানতেন বলেই শঙ্কিত ছিলেন। পাছে কৈকেয়ীর অমার্জিত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে কোশল রাজ্যের উপর কেকয় রাজ্যের আধিপত্য এসে পড়ে সেই ভয় দশরথের ছিল। আর এই জন্যই তিনি কৈকেয়ীর সন্তানের প্রতি আশঙ্কিত হয়ে যজ্ঞের চরু বণ্টনে এত দ্বিধা ও কার্পণ্য করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, আরও একটা বড় কারণ, অনেকে মনে করেন এটাই একমাত্র কারণ, শোনা যায় দশরথ নাকি কৈকেয়ীকে বিবাহের সময় কৈকেয়ীর পিতার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন, কৈকেয়ীর পুত্রকেই তিনি অযোধ্যার রাজা করবেন। কিন্তু দশরথের এই অঙ্গীকার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা সাক্ষী নেই। বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যে দশরথের বিবাহের কোনো বর্ণনা দেননি। সুতরাং কি ঘটেছিল না ঘটেছিল তা আমাদের লোকমুখে শুনে নিতে হয়। কিন্তু দশরথের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের কথা আমরা একবারও কারো মুখে শুনি না। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, কৌশল্যা অথবা কৈকেয়ী, যাঁদের জানার কথা, তাঁরা কেউই কিছু বলেননি। দশরথ নিজেও কখনো কারো কাছে বলেননি। এমনকী মৃত্যুর আগে তাঁর স্বকৃত ভুলের জন্য যখন অনেক আক্ষেপ করছেন তখনও না। কোনো বিবেচনা না করে কৈকেয়ীকে দুইটি বর দানের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেজন্য আর্তকণ্ঠে বিলাপও করেছেন, "পাপমতী কৈকেয়ীকে বরদানের সময় আমি আমার মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ অমাত্যদের সঙ্গে কেন পরামর্শ করিনি!"

কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া।
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৯/১৮)

দশরথের তখন যা মনের অবস্থা তাতে কৈকেয়ীর পিতার কাছে যদি তিনি কোনো অঙ্গীকার করে থাকতেন তবে তা গোপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আর কেউ না জানুক অন্তত কৈকেয়ীর তো জানার কথা। কিন্তু সমগ্র রামায়ণে কৈকেয়ীর মুখে একবারও সেকথা উচ্চারিত হয়নি।

কথাটি আমরা একবার মাত্র শুনি রামচন্দ্রের মুখে। কিন্তু পিতার বিবাহে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক চুক্তির সাক্ষ্য কখনো পুত্র হতে পারে না। রামের তো তখন জন্মই হয়নি। তিনি যা বলেছেন তা নিশ্চয়ই শুনেছেন অন্য কারো কাছ থেকে। কিন্তু কার কাছ থেকে? তার কোনো উল্লেখ নেই।

যাই হোক, এখন দেখা যাক রাম কি বলেছেন? বনবাস থেকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন ভরত এসে রামের কাছে কাতর মিনতি করছেন, তখন রামচন্দ্র বলছেন—

পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭/৩)

রামের এই কথার আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, "আমার পিতা তোমার মাতাকে বিবাহের সময় মাতামহের নিকট রাজ্যস্বরূপ পণ স্বীকার করেছিলেন।"

এই কথা থেকে এমন বোঝায় না যে, কৈকেয়ীর পুত্রকে রাজা করা হবে। শুধু এইটুকু মাত্র স্পষ্ট হয় যে, বিবাহের সময় পণ হিসাবে "রাজ্যশুল্ক" অঙ্গীকৃত হয়েছিল। অবশ্য অধ্যাত্মরামায়ণে রামের এই উক্তি আরও স্পষ্ট। রাম পরিষ্কার বলছেন, দশরথ পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বরদানের চেয়েও মুখ্য কারণ হল সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা। তিনি স্ত্রৈণতার বশে কিংবা মূঢ়বুদ্ধিতে ভরতকে রাজত্ব দেননি, দিয়েছেন পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভয়ে—"ন স্ত্রীজিতঃ পিতাব্রুয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ। পূর্ব প্রতিশ্রুতং তস্যৈ দদৌ ভয়াৎ।। (অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৯/৩৪)। কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণ নয়, আমাদের বিচার বাল্মীকি রামায়ণ নিয়ে।

এখন প্রশ্ন হল, "রাজ্যশুল্ক" কথাটি কন্যাপণ? না বরপণ? কন্যাপণ হলে, অর্থাৎ কৈকেয়ীকে দেয় হলে, কথাটি বহুব্রীহি সমাসে কন্যাবাচক বিশেষণ যুক্ত হওয়াই উচিত ছিল, তাতে পদটির রূপ হত "রাজ্যশুল্কামনুত্তমাম্"। যেমন সীতার বিবাহে কন্যাপণ হিসাব তাই বলা হয়েছে "অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্যশুল্কা" (আদিকাণ্ড, ৬৮/১০)। [প্রসঙ্গত শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ প্রণীত 'রামায়ণ রহস্যম্' ১৯৮১, পৃ. ৪৯-৫৪ দ্রষ্টব্য।]

কন্যাপণ হিসাবে ভরতকে রাজত্বদানের অঙ্গীকারেব কথা যদি সত্য হত তাহলে কৈকেয়ী এই শর্তের কথা দশরথের কাছে অন্তত একবারও উল্লেখ করতেন। তিনি দশরথের অঙ্গীকৃত দুইটি বর দানের জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করেছেন। নানাভাবে দশরথকে সত্যবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রাজ্যশুল্কের কথাটা একবারও তোলেননি। বস্তুত সে উল্লেখ আমরা কারো মুখেই শুনি না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দুইটি বর দানের কথা আমরা অন্তত সাতবার শুনি। মহাকাব্যের প্রথম সর্গেই নারদ বলছেন বাল্মীকিকে, "পূর্বাং দত্তবরা দেবী বরমেনবযাচত" (আদিকাণ্ড, ১/২২), তারপর মন্থরা দুইবার বলেছে কৈকেয়ীকে, "তুষ্টেনতেন দত্তৌ তে দৌ বরৌ" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯/১৭); "তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯/২৮) ; কৈকেয়ীও দুইবার বলেছেন একবার দশরথকে, "বরৌ মে তদা দত্তৌ" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১১/২৪-২৫)। একবার রামচন্দ্রকে, "পিত্রা তে মম বরৌ দত্তৌ" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৮/৩২) রামচন্দ্রও দুইবার বলেছেন, একবার সীতাকে. "কৈকেয্যৈ পুরা দত্তৌ মহাবরৌ (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৬/১১), আর একবার ভরতকে, "দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭/৫)। একই কথা সকলে এতবার করে বললেন কিন্তু রাজ্যশুল্কের কথাটা কেউ উচ্চারণও করলেন না। অথচ কৈকেয়ী ওই একটি শর্তেই ভরতের জন্য সিংহাসন দাবি করতে পারতেন, আর কোনো কথার প্রয়োজনই ছিল না। সকলে ভুলে গেলেও, কুচক্রী মন্থরাব ভুল হত না। সে ঠিক সময় মতো কৈকেয়ীকে মনে করিয়ে দিত। অনর্থ সাধনে সর্বনাশ ঘটাতে শয়তানের কখনও ভুল হয় না।

তাছাড়া রামের উক্তিতে (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭/৩) দশরথের অঙ্গীকৃত যে রাজ্যশুল্কের

কথা আমরা পাই, তাব অর্থ যদি হত ভরতকে রাজত্ব দেওয়া, এবং রাম যেহেতু দেখা যাচ্ছে একথা আগেই জানতেন, তাহলে সত্যাশ্রয়ী রাম এই প্রথমোক্ত পিতৃসত্য পালনের জন্যই বহু পূর্বেই রাজত্বের দাবি ত্যাগ করতেন। অভিষেকের প্রস্তাবেও সম্মত হতেন না। অন্তত তখন আপত্তি তুলতেন। কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তির সেই শোকাবহ দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন না।

রাম এই রাজ্যশুল্কের কথাটা উল্লেখ করে ঠিক তার পরের শ্লোকেই কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তির কথাটা বললেন, রামের বক্তব্য হল, ভরত তুমি তো পিতার প্রথম প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাতামহের দত্তরাজ্য গ্রহণ করেছিলে, এবার কৈকেয়ীকে প্রদত্ত পিতার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে অযোধ্যার রাজত্ব গ্রহণ কর।

তাহলেই রামের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর কথার সামঞ্জস্য থাকে। নইলে ভরতকে রাজত্ব দানের প্রতিশ্রুতিতে দশরথ আগে থেকেই সত্যবদ্ধ একথা রাম জেনেও এতদিন চুপ করে ছিলেন? সমস্ত ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলেন? এতখানি কপট ও রাজ্যলোভী নিশ্চয়ই রামচন্দ্র ছিলেন না। তাহলে বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যে রামকে আরাধ্য নায়ক করতেন না।

আরও কথা আছে। দশরথ অপুত্রক বলেই একাধিক বিবাহ করেছিলেন। তিনি পুত্রলাভের জন্য কৈকেয়ীকেও বিবাহ করেন। তিনি আর্যশাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম দৈব আর্য ও প্রাজপত্য এই চারটি শাস্ত্রসম্মত বিবাহ প্রথা। কিন্তু কন্যা বা কন্যার পিতাকে শুল্ক দান করে যে বিবাহ তাকে আসুর বিবাহ বলে। মনুসংহিতায় এই আসুর বিবাহকে নিন্দিত অপকৃষ্ট অসুর ধর্ম বলে বলা হয়েছে।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিনং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানাং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে।।

(মনুসংহিতা, ৩/৩১)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের তো কথাই নেই, এমনকী শূদ্রজাতিরও কন্যার বিবাহে শুল্ক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

অদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ।

(মনুসংহিতা, ৯/৯৮)

ধর্মজ্ঞ রাজা দশরথ এমন হীনকার্য করতেই-বা যাবেন কেন, আর আভিজাত্য গৌরবে যশস্বী রাজা অশ্বপতিই-বা তা গ্রহণ করবেন কেন? শুল্ক গ্রহণ করে কন্যা দান করা অর্থ কন্যা বিক্রয় করা, যা কিনা গো-বধের তুল্য পাপ। তাছাড়া বোধায়নের ধর্মসূত্র মতে অর্থদ্বারা ক্রীত স্ত্রীকে তো ধর্মপত্নীই বলে না।

পরবর্তী মহাভারতের যুগেও আসুর বিবাহ অত্যন্ত নিন্দিত ও নিষিদ্ধ ছিল।

...আসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কথঞ্চন॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ৪৪/৯ এবং আদিপর্ব, ৭৩/১১)

মহাভারতে আরও বলা হয়েছে, কন্যার বা পুত্রের বিবাহে শুল্ক গ্রহণ করলে কালসূত্র নামক নরকে পতিত হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীত ধনমিচ্ছতি
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি।।
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহবয়ে।

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৪৫/১৮-১৯)

তাছাড়া শাস্ত্রে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, কন্যাকে শুল্ক দান করে বিবাহ করলে, ক্রূরকর্মা, মিথ্যাবাদী, বেদবিদ্বেষী অধার্মিক নিষ্ঠুর ইতর পুত্র জন্মে।

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥

(মনুসংহিতা, ৩/৪১)

দশরথ নিশ্চয়ই এমন কুপুত্র কামনা করে আসুর বিবাহ করতে যাবেন না। এমনকী কৈকেয়ীর রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিবাহ করতে চাইলেও, তাঁর গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং পুরোহিত বামদেব নিশ্চয়ই সম্মতি দিতেন না। এবং শাস্ত্র গুরু এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আদেশ অমান্য করে ধর্মবিরুদ্ধ পাপকর্ম করবেন এতখানি অধার্মিক ও হীনবুদ্ধি রাজা দশরথ নিশ্চয়ই ছিলেন না। তাহলে বাল্মীকি তাঁকে মহর্ষিপ্রতিম দেবকল্প ("দেবসংকাশং"—আদিপর্ব, ৬৮/২) এবং কালিদাস তাঁকে শিবতুল্য ("শর্বরী শর্বকল্প"—রঘুবংশ, ১১/৯৩) বলতেন না।

সম্ভবত এই অনুমান অযৌক্তিক নয়, রামচন্দ্র ভরতকে যে রাজ্যশুল্কের কথা বলেছেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭/৩), আসলে তা ছিল বরপণ। কৈকেয়ীর পিতা তাঁর জামাতা দশরথকে বিবাহের যৌতুক হিসাবে কিছু রাজ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দশরথ তা স্বীকার করেন মাত্র।

এই অনুমান সমর্থিত হয় যখন আমরা শুনি, দশরথের মৃত্যুর পর পরামর্শরত মন্ত্রী অমাত্যদের কাছে গুরু বশিষ্ঠ বলছেন, মাতুলবংশের দত্তরাজ্য লাভ করে ভরত শত্রুঘ্নের সাথে বেশ সুখেই বাস করছেন।"

যদসৌ মাতুলকুলে দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী।
ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন মুদান্বিতঃ।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৮/২)

ভরতকে প্রদত্ত এই "দত্তরাজ্যই" আসলে দশরথের বিবাহের প্রতিশ্রুত সেই রাজ্যশুল্ক। নইলে দীর্ঘ বারো বৎসর ভরত মাতা পিতাকে ছেড়ে ভ্রাতাদের ছেড়ে সুদূর কেকয় রাজ্যে থাকতে যাবেন কেন? আমরা দেখি ভরত সেখানে গিয়েই রাজ্যশাসন করছেন। যদিও পিতা মাতা এবং ভাই রাম লক্ষ্মণের জন্য তাঁর মন কেমন করছে, তবু রাজকার্যে বাধ্য হয়ে তিনি আছেন, কিন্তু তাঁর মনটা পড়ে আছে অযোধ্যায়।

তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১/৩)

প্রবাসী ওই দুই পুত্রের জন্য রাজা দশরথেরও মন বারবার উতলা হয়েছে—"রাজাপি তৌ

মহাতেজাঃ সম্মার প্রোষিতৌসুতৌ'' (অযোধ্যাকাণ্ড, ১/৪)। ভরত মামা-বাড়িতে নিতান্ত বেড়াতে যাননি, গিয়েছিলেন পিতার আদেশ ও আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্যশাসন করতে (আদিকাণ্ড, ৭৭/১৬-১৭)। এবং রামের অনেক আগেই যে ভরত রাজ্যশাসনে নিপুণ একজন সুদক্ষ প্রশাসক হয়ে উঠেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পববর্তীকালে আমরা দেখি, ভরতের কুশলী রাজ্যশাসনে অযোধ্যার রাজকোষ দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল—'সর্বং কৃতং দশগুণং ময়া'' (যুদ্ধকাণ্ড, ১২৭/৫৬)।

অস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় বিচক্ষণ ভরত রামেরই সমকক্ষ (আদিকাণ্ড, ১৮/২৫)। চেহারায় স্বভাবেও সে রামেব সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব যেন। তেমনি শ্যামবর্ণ আয়ত পদ্মপলাশ আঁখি, মহাভুজ, ক্ষীণকটি, সিংহস্কন্ধ, মহাসত্ত্ব। শান্ত নম্র প্রিয়দর্শন। ক্ষমাশীল সত্যবাদী মঙ্গলময়।

সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৭/২)

পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যাম শ্রীমান্নিরুদরো মহান্।
ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
প্রিয়াভিভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ॥

(অরণ্যকাণ্ড, ১৬/৩১-৩২)

রামের মতো ভরতের জন্মরাশিও কর্কট। রামের চেয়ে ভরত মাত্র একদিনের ছোটো। পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ বলেন, ''গণনায় জানা যায়, ভরত রাম হইতে মাত্র একদিনের কনিষ্ঠ।'' (রা- ়ণ চবিতাবলী, ১৩৯৩, পৃ. ৮৫)

তাই ভর ্ক নিয়ে দশরথ পিতা হিসাবে যেমন গর্বিত তেমনি রাজা হিসাবে কিছুটা চিন্তিত। গুণে ্বিত্রে স্বভাবে দক্ষতায় ভরত রামের সমকক্ষ এবং রামের আগেই সে রাজ্যচালনায় অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ প্রশ াক। তদুপরি তার পিছনে সহায় ও সমর্থন হিসাবে আছে মাতুল বংশের পরাক্রান্ত কেকয় রাজ্য। আরও আশঙ্কা, সে স্বার্থপর আত্মম্ভরী চঞ্চলবুদ্ধি কৈকেয়ীর পুত্র। যদিও রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যের অধিকারী, কিন্তু মাত্র একদিনের জ্যেষ্ঠত্বের দাবিতে রাম যদি রাজা হয় তাহলে, দশরথের ভয়, হয়তো প্রবল বাধা আসবে। অবশ্য ভরত ধর্মাত্মা ত্যাগী, রামের প্রতি ভক্তিমান, তবুও যদি কোনো কারণে তার মতিভ্রম হয় তাহলে সংঘর্ষ অনিবার্য। ভ্রাতৃবিরোধে অযোধ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে। দশরথ এই চিন্তা করছিলেন। সমস্ত পরিস্থিতিকে তিনি বিচার করেছেন, স্নেহময় পিতার দৃষ্টিতে নয়, তীক্ষ্ণধী রাজার দৃষ্টিতে। তাই ভরত সম্পর্কে তিনি স্নেহশীল হয়েও, তিনি তাঁকে দেখেছেন, পিতার চোখে নয়, রাজার চোখে। এইখানেই তাঁর যেমন সার্থকতা তেমনি ব্যর্থতা। দশরথ সফল রাজা, কিন্তু বিফল পিতা।

বারো

সোনার পাত্রে তপ্ত গরল

কৈকেয়ীর শয়ন কক্ষ। দশরথের বিলাস মঞ্জিল। সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে। শিল্পীর স্বপ্নলোকের মায়া দিয়ে গড়া রাজার নিভৃত নিকেতন। কক্ষতলে পুষ্পপরাগের মতো কোমল মণিকুট্টিম। তার উপরে সোনার পালঙ্ক। তাতে মণিমানিক্যেব লতাচিত্রলেখা। বাতায়ন পথে পুষ্পোদ্যানের শোভা। চৈত্রদিনের বসন্ত বাতাস।

রাজশয্যায় অলসে-বিলাসে অর্ধশায়িত কৈকেয়ী। রূপ যেন তার শরৎ আকাশের চন্দ্রকলাব মতো—"চন্দ্রলেখেন শারদী" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৭/৩১)। যৌবন যেন তার নিপুণ শিল্পীব হাতে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য সুষমা। গিরিব্রজের পাহাড় আর অযোধ্যার সরযূ—এই দুয়ে মিলে কৈকেয়ীর সৌন্দর্যকে দিয়েছে কাঠিন্য ও লালিত্য। তার রূপের মধ্যে যেমন আকর্ষণ আছে, তেমনি তার উগ্র ভাবের মধ্যে আছে আবার বিকর্ষণ। তার স্বভাবে দুই-ই আছে, মধু আর কটু।

তবু কৈকেয়ী তার রূপের অহংকারে নিজেকে নিয়ে আপন মনে বেশ সুখেই আছে। রাজপ্রাসাদের বিশাল পরিমণ্ডলে সকলের স্নেহে প্রশ্রয়ে এক রকম মানিয়ে গেছে। তার স্বভাবের জন্য সকলে মাঝে-মাঝে ব্যথিত হলেও তাতে বিশেষ কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। ববং তার সকল ক্রোধ আবদার এবং তার ওই কটু মেজাজটুকু সকলে যেন কিছুটা বিব্রত কৌতুকে সহ্য করে এসেছে। স্নেহের সঙ্গে উপেক্ষা করেছে।

তখনকার মানুষের চিত্তে কেমন একটা সহজ শান্ত স্নেহপ্রবাহ ছিল। যা সংসারেব বহু অবাঞ্ছিত জালজঞ্জালকে বহন করে নিয়ে যেত, কিন্তু জীবনকে দূষিত হতে দিত না। মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ তো সব সময়ই আছে। সেকালেও ছিল। কিন্তু তখনকার ভালর মধ্যে ছিল একটা তেজ, একটা শুদ্ধি একটা স্রোতের বেগ, যা মন্দকে শুধু বহন করত না, তাকে শোধনও করত। চরিত্রের একটা উজ্জীবনশক্তি দিয়ে অপ্রিয়কে কেবল প্রিয় করেই নিত না, তাকে শ্রেয় করেও তুলত। আজকের দিনে মন্দটা যে এত দুঃসহ হয়ে উঠেছে তার কারণ ভালর ভিতরে সেই তপস্যার তেজ মন্দীভূত স্তিমিত হয়ে পড়েছে। ভাল আজ নিরীহ দুর্বল। তার আত্মশক্তি ক্ষীণ। তাই মন্দটা এত দুর্ধর্ষ।

কিন্তু সেদিন কৈকেয়ী অলস বিশ্রামে অর্ধশায়িত। তার এলায়িত কেশে বাতায়নেব চূর্ণ আলোকরশ্মি। স্তনচূড়ার কন্দরে কণ্ঠহারের মধ্যমণি সূর্যের আলোতে জ্বলছে সাপের চোখের মতো। তার নীল দ্যুতি ঠিক্‌রে পড়েছে গ্রীবায় ও কপোলে। কৈকেয়ী যেন আপনাতে আপনি বিভোর।

এমন সময় আচমকা হায়-হায় করতে করতে ঘরে ঢুকল দাসী মন্থরা। বিবাহের সময় পিতৃগৃহ থেকে এসেছে কৈকেয়ীর এই কুরূপা কুব্জা দাসী।

—"ও মা, কী সর্বনাশ হয়ে গেল গো!"

—"কেন রে? তোর আবার কী হল?"

—"কী আবার হবে? যা হবার তাই হল। কোন আহ্লাদে এখনো শুয়ে আছ? বিপদ, ভীষণ বিপদ।"

বিরক্ত হয়ে কৈকেয়ী বলে, "আঃ কি জ্বালা! কী হয়েছে বলবি তো?"

—"কী হয়েছে? এখনো বুঝতে পারছ না কী হয়েছে? বলি কপাল ভেঙেছে। সুখের ঘরে আগুন লেগেছে। সব শেষ হয়ে গেল গো!" মন্থরা থপ করে মেঝেতে বসে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

কৈকেয়ী বিচলিত হয়ে বিছানা থেকে উঠে বলল, "মন্থরে, তোর কি কোনো অমঙ্গল হয়েছে? এমন করে কাঁদছিস কেন?

—"আমি দাসীবাদী, আমার আবার ভাল মন্দ কী? আমি কাঁদছি তোমার দুঃখে। তুমি কত অবোধ। রাজা তোমাকে মুখে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে, আর তুমি তাতেই গলে যাও। স্বামীর সোহাগে দেমাকে তোমার মাটিতে পা পড়ে না। তুমি ভাব, রাজা তোমাকে খুব ভালবাসে। সব মিথ্যে। সব ফাঁকি। তলে-তলে রাজাটা শঠ। ভিতরে-ভিতরে কুবুদ্ধি।"

ক্রুদ্ধ হয়ে কৈকেয়ী ভর্ৎসনা করে, "কুঁজি, খেঁদি, কানী, কী সব আজেবাজে বকছিস? তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।"

—"আমাকে বকলে কী হবে? কোনো খবর রাখ? এদিকে তলে-তলে কী হচ্ছে?"

—"কী হচ্ছে?"

—"কী হচ্ছে জান না? সারা রাজ্যের লোক জানে। চারদিকে এত ধূমধাম হই-হই। আর তুমি তার কিছুই জান না?"

—"কই না তো! কী ব্যাপার?"

—"ওই কথাই তো বলছি। তোমার মাথায় বাজ পড়েছে। গ্রীষ্মের নদীর মতো তোমার সুখের নদী শুকিয়ে গেছে। তোমার ভরতের সর্বনাশ হয়েছে।"

—"আমার ভরতের সর্বনাশ? কী বলছিস তুই? ভরতের কী হয়েছে?" কৈকেয়ী বিচলিত হয়ে ওঠে।

—"তবে নয়তো কী? মা হয়ে ছেলের মঙ্গল চাও না? যাকে বুকে জড়িয়ে এত আহ্লাদ কর সে তোমাব স্বামী নয়। কাল সাপ। শোন তবে বলি, ভাবলাম এত ধূমধাম কিসের, দেখে আসি তো। ছাদে উঠে দেখি, সারা রাজ্যের ঘরে-ঘরে ফুলের মালা, পতাকা দিয়ে সাজানো। চন্দন জলে পথঘাট ধোয়া। সব তকতক করছে। মন্দিরে-মন্দিরে আলপনা। ব্রাহ্মণেরা স্নান করে মালাচন্দন পরে বেদপাঠ করতে-করতে চলেছে। কাতারে কাতারে নানা রঙের সব মিছিল। হাতির পিঠে জরির হাওদা, নিশান উড়িয়ে চলেছে সোনার রথ আর যুদ্ধের ঘোড়া। শাঁখ বাজছে। বাজনা বাজছে।"

মৃদু হেসে কৈকেয়ী বলে, "তাই বুঝি? রাজা হয়তো কোনো উৎসবের আয়োজন করেছেন।"

—"তোমার পোড়া কপাল। ওই আহ্লাদেই থাক। ছাদে উঠে রামের দাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে, এত ঘটাপটা কিসের জন্যে লা? তা সে বলল, ওমা, জান না? কাল যে রামচন্দ্রের অভিষেক হবে। রাম রাজা হবে, তাই রাজ্যে এত আনন্দ উৎসব। বড় রানিমা সকলকে দুহাত ভরে সোনা দানা দিয়ে দান ধ্যান করছেন।"

আনন্দে উৎফুল্ল কণ্ঠে কৈকেয়ী বলে, "তাই নাকি? এ তো বড় আনন্দের কথা। তুই সকাল বেলায় আমাকে এমন একটা সুখবর দিলি, এই নে, আমার গলার হারটা তোকে দিলাম।"

কৈকেয়ী তার কণ্ঠহার খুলে মন্থরাকে দিতে দিতে বলল, "এমন প্রিয় সংবাদে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। তোকে আরও কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কী নিবি বল? রামের অভিষেক হবে, রাম রাজা হবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আমার কাছে ভরত আর রামে কোনো প্রভেদ নেই।"

ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে॥
রামে বা ভরতে বাঽহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৭/৩৪-৩৬)

তখন ক্রোধে দুঃখে মন্থরা কৈকেয়ীর দেওয়া অলংকার ছুঁড়ে ফেলে কুপিত হয়ে বলল, তোমার কি হিতাহিত জ্ঞান নেই গো? তুমি নির্বোধ। নইলে সতীনের ছেলের উন্নতি দেখে কেউ কি এমন করে আনন্দ করে? কথায় বলে সতীন পুত শত্রু। শত্রুর উন্নতি দেখার চেয়ে মরণ ভাল। বলি, রাম একা কেন রাজা হবে? সম্পত্তিতে ভরত ও আর সব ভায়েদেরও তো অধিকার আছে ("ভরতাদেব রাজ্যসাধারণাৎ"...২/৮/৫)। রাম ভাল করেই জানে, অন্য ভাইদের থেকে কোনো ভয় নেই। কিন্তু রামের পরেই ভরত, ইচ্ছা করলে ভরত রাজত্ব অধিকার করতে পারে ("প্রত্যাসন্নক্রমেনৈব ভরতস্যৈব"...২/৮/৭)। তাই রাম রাজা হয়ে আগেই ভরতের ক্ষতি করবে বলে দিলাম। তোমার ছেলের বিপদ হল। এখন থেকে সে রামের দাসত্ব করবে। কৌশল্যা রাজমাতা হবে। আর তুমি সেই সতীনের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দাসীবৃত্তি করবে। ওদিকে সীতা তার সখীদের নিয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়াবে, আর তোমার ছেলের বউ মাণ্ডবী মনের দুঃখে আড়ালে চোখের জল ফেলবে।"

অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্॥
ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণাদ্ভয়ম্।...
সুভগা কিল কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।...
উপস্থাস্যসি কৌসল্যাং দাসীবত্ত্বং কৃতাঞ্জলিঃ॥
পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি।।

হৃষ্টা খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমা স্ত্রিয়ঃ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৮/৪-৫, ৯-১২)

এমনি করে মন্থরা তার কথার ভিতর দিয়ে কৈকেয়ীর অন্তরে বিষ ঢেলে চলেছে, কিন্তু কৈকেয়ী তখনো নির্মল। দেবীর মতো সহাস স্নেহসিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, "কুব্জা, পোড়ারমুখী এমন মঙ্গলের দিনে উৎসবের বাড়িতে তোর মনে এত খেদ কিসের রে? এত জ্বালা কেন? তুই কী জানিস না? রাম পরম ধার্মিক সত্যবাদী গুণবান শান্ত কৃতজ্ঞ পবিত্রস্বভাব। রাম জ্যেষ্ঠপুত্র, সেই তো রাজা হবে। আমি যেমন ভরতের শুভার্থিনী তেমনি, হয়তো তার চেয়েও বেশি, আমি রামের শুভার্থিনী। রাম আমাকে তার নিজের মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসে। রাম তার সকল ভাইদের নিজের শরীরের মতো আপন মনে করে। রাম রাজা হলে, আমি মনে করব ভরতই রাজা হল।"

ধর্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি॥
ভ্রাতৃন্ ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্॥
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে॥
যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ॥
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু॥
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা॥
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৃংস্তু রাঘব॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৮/১৪-১৫, ১৭-১৯)

এমনি করে দুটি সর্গ জুড়ে পাপের প্ররোচনার মধ্যে কৈকেয়ী দাঁড়িয়ে আছে শান্ত, নিষ্কম্প। তার অন্তরের ঔদার্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। তার রূপ যত সুন্দর, তার চেয়েও সুন্দর যেন তার হৃদয়। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কৈকেয়ীর সম্বন্ধে কোনো নিন্দা শুনতে যেন আর ইচ্ছা করে না। এত রূপ এত স্নেহ যার, সেই অতুলনীয়া রমণীই যে রামায়ণের সকল দুঃখের সকল শোকের কারণ, একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। বাল্মীকি নিজেই যাকে বলেছেন "শুভাননা" "প্রমদোত্তমা" (২/৭/৩১, ৩৩) "দেবী কৈকেয়ী" (২/৮/১৩)—তার চরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্তন বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য। কেবল আমাদের কাছেই নয়, কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতায় যার জীবনে চরম দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল সেই রামচন্দ্রের কাছেও। বনবাসে যাওয়ার আগে রাম তাই লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, "মাতা কৈকেয়ী আমাতে ভরতে কোনো প্রভেদ দেখতেন না। ভরতের চেয়ে বরং তিনি আমাকেই বেশি ভালবাসতেন। সৎস্বভাববতী স্নেহময়ী রাজনন্দিনী মাতা কৈকেয়ীর এই রূঢ় আচরণ চিন্তাও করা যায় না। মানুষের মন যখন হঠাৎ এমন করে অকল্পনীয়ভাবে পালটে যায়, তখন বুঝতে হবে তার পিছনে দৈব আছে।"

জানামি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্।
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা॥
কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা।
যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২২/১৭, ১৯-২০)

কিন্তু হোক দৈব, তবু সেই দুর্দৈব কেমন করে কৈকেয়ীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারল? ট্রাজেডি প্রবেশ করে চরিত্রের কোনো ত্রুটি বা ছিদ্র ধরে, লখিন্দরের বাসরঘরে যেমন প্রবেশ করেছিল কালনাগিনী।

যদিও কৈকেয়ী দেবী প্রতিমা, কিন্তু সে প্রতিমা কাদামাটি দিয়ে গড়া। মন্থরার দ্বারা অধর্মের অভিঘাতে পাপের টানে সেই দেবী মূর্তি ভেঙে খানখান হয়ে গেল। কৈকেয়ী ভাল ছিল, ভাল থাকতেও পারত, কি স্বভাবের দুর্বলতা, অস্থিরচিত্ত লঘুতা তাকে নির্মমভাবে বিকৃত করে দিল। সকলের জীবনেই কমবেশি নিত্য এই অপঘাত ঘটে চলেছে। মঙ্গলের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সুখের প্রলোভন বাসনার পথে পাপ আমাদের এমনি করে টেনে নিয়ে যায়। দুর্বলচিত্ত মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতির এ এক গভীর ট্রাজেডি—চিরকালের অশ্রুলেখা।

কৈকেয়ীর হৃদয় সুন্দর, কিন্তু তা গভীর ছিল না। অশুভ প্ররোচনার মধ্যে বেশিক্ষণ স্থির থাকার মতো শক্তি ও সংযম ছিল না। যে তেজ যে ধৃতি যে সামর্থ্য হৃদয়কে অটল রাখে, কৈকেয়ী তা পায়নি। রাজার একমাত্র কন্যা, আদরের দুলালী, অত্যন্ত স্নেহ আর প্রশ্রয়ে পালিত। কখনো শাসন পায়নি, আত্মসংযম শেখেনি। তার কোনো ইচ্ছা কোনো আবদার কখনও প্রতিহত হয়নি। দিনে দিনে তাই কৈকেয়ী আত্মসুখপরায়ণ অসহিষ্ণু ও জেদী হয়ে উঠেছিল। তার উপরে তার অসামান্য রূপ, উপযুক্ত শিক্ষায় সুরুচিতে মার্জিত না হয়ে সেই রূপ তার স্বভাবকে করেছে উগ্র ও আত্মম্ভরী। আবাব সে বৃদ্ধ রাজার তরুণী ভার্যা— তাই পেয়েছে শুধু অতিমাত্রায় আদর আর প্রশ্রয়। চারিদিকে এত আদর আব যত্নে তার চিত্তের অসংযম ক্রমেই বর্ধিত পল্লবিত হয়ে উঠেছে। জীবনকে সে দেখেছে শিশুর হাতে রং করা মাটির খেলনার মতো। সুতরাং তা যে একদিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এ তো স্বাভাবিক। কুব্জা মন্থরা উপলক্ষ্য মাত্র। মন্থরা না থাকলেও তার জীবন যে অনিবার্যভাবেই দুঃখময় হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অযোধ্যার স্নিগ্ধ রাজপুরীতে এমনি করে তার স্বভাবের তলে তলে নিদারুণ দুর্দৈব ঘনিয়ে উঠেছিল, বৈশাখের তপ্ত মেঘের আড়ালে যেমন করে অলক্ষ্যে সঞ্জাত হয়ে ওঠে ঘোর অশনি।

কৈকেয়ী এই স্বভাবটি পেয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে। সুমন্ত্রের কথায় (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৫ সর্গ) আমরা তা জেনেছি। রাম বনে গমন করছেন, সেই শোকাহত মুহূর্তে সুমন্ত্র তার সকল ধৈর্য হারিয়ে কৈকেয়ীকে কঠোর ভাষায় বলছেন, "লোকে বলে, নিম গাছের গোড়ায় দুধ ঢাললে নিম ফল কখনো মিষ্ট হয় না। নিম গাছে কখনো মধু ক্ষরে না। আপনার স্বভাবটা হয়েছে ঠিক আপনার মায়েরই মতো। আমি শুনেছি, এক ব্রাহ্মণের বরে আপনার পিতা অশ্বপতি বিশেষ এক গুপ্ত বিদ্যা লাভ করেন। সেই বিদ্যা অন্যকে জানালে তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু হবে একথা জেনেও আপনার মা তা জানার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। শেষে

সেই ব্রাহ্মণের উপদেশে আপনার পিতা আপনার মাকে পরিত্যাগ করেন। স্বামীর মৃত্যুকামী সেই পতিপরিত্যক্তা নারীর কন্যা হলেন আপনি। কন্যা তো মায়ের স্বভাব নিয়েই জন্মায়।"

যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ॥
আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব তে।
ন হি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ॥
পিতৃন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৫/১৬-১৭, ২৮)

সুতরাং কৈকেয়ী তার স্বভাবের বিষ আপন রক্তেই বহন করেছে। অভিশপ্ত তার জীবন। আর বস্তুত সত্যই তার জীবনে এক ব্রাহ্মণের অভিশাপের ঘটনা ঘটেছিল। বাল্মীকি রামায়ণের গৌড়ীয় পাঠে (অযোধ্যাকাণ্ড, ৮/৩৩-৩৭) এবং পশ্চিমোত্তরীয় পাঠে (অযোধ্যাকাণ্ড, ২২/৩৭-৪১) উল্লেখ আছে যে, কোনো এক ব্রাহ্মণকে কৈকেয়ী ছোটোবেলায় নিন্দা করেছিল, ফলে ব্রাহ্মণ তাকে অভিশাপ দেন, "তোর জীবন নিন্দিত হবে।"

কৃত্তিবাসও বর্ণনা করেছেন,—

ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে।।
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে।।
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল ব্রহ্মশাপ।।
দেখিয়া করিস ব্যঙ্গ, কহিস কর্কশ।
সর্বলোকে গায় যেন তার অপযশ।।
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেক এসব ঘটন।।

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, "কুঁজীর কুমন্ত্রণা দান")

একে তো শিরে ব্রহ্মশাপ, তার উপরে আবার বিবাহের পরে পিতৃগৃহ থেকে সঙ্গে এসেছে 'কুটিলা কুরূপা কুব্জা' দাসী মন্থরা বিকৃত মনের সে এক বিকৃত আকার। জন্মান্তরের রাক্ষসী প্রতিহিংসা। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের ভিতরে প্রচ্ছন্ন বিষবৃক্ষ। পূর্বজন্মে মন্থরা ছিল অসুররাজ বিরোচনের কন্যা। অসুরের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের সময় দেবতাদের বিমান ও বাহন সব বিরোচনের কন্যা মন্থরা প্রতিহত করে। তখন বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র তাকে বজ্রাঘাতে নিহত করেন। বিরোচন-কন্যা তখন বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসায় জন্ম নিল মন্থরা হয়ে (সত্যোপাখ্যান, ১০-১৪ অধ্যায়)। কোথাও-বা পাওয়া যায়, মন্থরা ছিল আর জন্মে পুতনা রাক্ষসী (আনন্দরামায়ণ, ৯/৫/৩৫)। মহাভারতে (বনপর্ব, ২৬০/১০) এবং পদ্মপুরাণে (পাতালখণ্ড, ১৫ অধ্যায়) বলা হয়েছে, মন্থরা হল দুন্দুভী নামে এক গান্ধর্বী।

তাই রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কৈকেয়ীকে বলেছিলেন, "এ সব দৈবের বিধান তোমার দোষ কি? দেবি, তুমি আমার মাতৃসম। তোমার উপরে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই।"

দেবকৃতে কোঽপরাধঃ।
ত্বং মে মাতৃসমা দেবি ত্বয়ি মে নাস্তি দুর্মনঃ।
(তত্ত্বসংগ্রহ-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১ সর্গ)

কৈকেয়ীর মতো এত বড় অন্যায়ও কেউ করেনি, আবার এতখানি ক্ষমাও কেউ পায়নি। যে অপরাধে কোনো শাস্তিই যথেষ্ট নয়, সেখানে কবি বাল্মীকি এমন এক দণ্ডের বিধান করলেন, যা পৃথিবীতে একমাত্র ভারতবর্ষই দিতে পারে। জঘন্যতম অপরাধের মহত্তম দণ্ড—ক্ষমা। দণ্ড শাস্তি দেয়, আবার রক্ষাও করে। কেননা দণ্ডই ধর্ম।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজা সর্বাঃ দণ্ড একভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্ম বিদুর্বুধাঃ॥
(মনুসংহিতা, ৭/১৮)

মানুষ যখন আপন দোষে কোনো অন্যায় করে তখন তার শাস্তি। শাসন করেই তাকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু অকল্পনীয় কারণে দৈববশে যখন সে কোনো অনর্থ ঘটায়, তখন ভারতবর্ষ জানে, সেখানে কোনো ব্যক্তি অপরাধী নয়, তার পিছনে আছে দৈব। তখনই প্রয়োজন শ্রেষ্ঠতম দণ্ড—ক্ষমা। কেননা দৈব সময় সময় অমঙ্গল দিয়ে মঙ্গল সৃষ্টি করেন। দৈবের সূক্ষ্মতম বিধানে ঘোর অমঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে মহত্তম কল্যাণ।

রাম একথা বুঝেছিলেন, তাই লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, "বিচলিত হয়ো না। আরব্ধ কর্ম যদি হঠাৎ বাধা পায়, পরিবর্তে যা কোনোদিন ভাবিনি তাই যদি ঘটতে থাকে, তাহলে জানবে সেখানে দৈব কাজ করছে।"

অসঙ্কল্পিতমেবেহং যদকস্মাৎ প্রবর্ততে।
নিবর্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্ননু দৈবস্য কর্ম তৎ॥
(অযোধ্যাকাণ্ড, ২২/২৪)

তাই ভরত যখন কৈকেয়ীকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে ধিক্কার দিচ্ছিলেন, তখন ঋষি ভরদ্বাজ বললেন, 'কৈকেয়ীকে দোষ দিও না। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই রামের এই বনবাস হয়েছে।"

ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতং সুখোদর্কং ভবিষ্যতি॥
(অযোধ্যাকাণ্ড, ৯২/৩০)

অন্যত্র ঋষি বামদেবও বলেছেন, "রামের বনবাসের জন্য দশরথ কিংবা কৈকেয়ী কেউই দায়ী নন,—রাজা বা কৈকেয়ী বাপি নাত্র কারণমন্বপি। (অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫/২৩)

এখানেই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। অপরে যেখানে প্রয়োগ করেছে হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা, ক্রোধের দমনে অধিকতর ক্রোধ, সেখানে ভারতবর্ষ দণ্ড বিধান করেছে নৈতিক ও আত্মিক শক্তির মহত্তম বল দিয়ে। দণ্ড কেবল ভয়াল নয়, দণ্ড দয়াল। ক্ষমাও দণ্ড। সেই কঠোর ক্ষমা দিয়ে কৈকেয়ী শীর্ণ ছায়ার মতো চিরকাল রামায়ণের পুণ্য অঙ্গনের অন্তেবাসিনী হয়ে থেকেছে।

দৈবের অভিঘাতকে রোধ করতে পারে দুর্বলচিত্ত অল্পবুদ্ধি কৈকেয়ীর সাধ্য কি?

শুনিয়া কুঁজির কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজির বচনে তার বুদ্ধি হইল নাশ॥

পেঁচা যেমন বৃক্ষনীড় থেকে পক্ষীশাবককে টেনে নিয়ে যায় তার তীক্ষ্ণ নখরচঞ্চু দিয়ে, তেমনি মাতৃত্বের পুণ্যবেদি থেকে কৈকেয়ীকে টেনে নামিয়ে আনল কুব্জা মন্থরা। নারী সব সইতে পারে কিন্তু সপত্নীর আধিপত্য তার কাছে দুর্বিষহ। কৈকেয়ীর সেই দুর্বল স্থানে মন্থরা বারবার তার বিষদাঁত ফোটাতে লাগল। বন্য শবরী যেমন বিষের বাঁশি বাজিয়ে বনের হরিণকে মৃত্যুমোহে বিবশ করে ফেলে, তেমনি মন্থরার কথার বিষে কৈকেয়ী আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল—"শবরী গানমৃগী জনুমোহী" (তুলসীদাসী রামায়ণ, ২/১৭)

—"জান না তো, রাজনীতি বড় উগ্র। সেখানে দয়া মায়া নেই। বন্ধুও শত্রু হয়ে যায়। তাই বলছি, এখনো সময় আছে, ভাল চাও তো আমার কথা শোন। নইলে রাম রাজা হয়ে ভরতকে কারাগারে বন্দি করবে, কিংবা নির্বাসনে পাঠাবে। তোমাকে সতীনের দাসীবাদী হয়ে দিন কাটাতে হবে। তোমার ছেলের বউ চিরদুখিনী হয়ে চোখের জল ফেলবে। এতকাল তুমি যে কৌশল্যার উপর দেমাক দেখিয়েছ, এবার সেও তোমার উপর তার শোধ নেবে, মনে রেখ। আমার ভয় হচ্ছে, ভরত ফিরে এলে রাম তাকে না প্রাণে মেরে ফেলে। রামের হাতে মবার চেয়ে ভরত বরং মামাবাড়ি থেকে বনে চলে যাক সেও ভাল।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৮/২১-৩৯)

কৈকেয়ী আর সইতে পারল না। বিবর্ণ মুখে উত্তেজনায় সে ঘামতে লাগল। প্রবৃত্তির তোড়ে তার শেষ বাধা ভেঙে পড়ল। মন্থরার কথার চাবুকে তার অন্তর ছটফট করে উঠল।

সা হি বাক্যেন্ কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৯/২৭)

কশাহত অশ্বের মতো তার মন তখন বিপথে ধাবিত হল। কাহিনির গতিও ভয়ানকভাবে বাঁক নিল। অযোধ্যার সোনার পাত্রে এবার তপ্ত গরল ঢালা হতে লাগল।

কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম্॥
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্।

*

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্যং শস্যং বা সলিলং বিনা॥
ন তু রামং বিনা দেহ তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১২/১১-১৪)

রামকে ছাড়তে হবে শুনলেই তিনি তাই আতঙ্কে চমকে ওঠেন। এমনকী মাত্র কদিনের জন্য স্বয়ং বিশ্বামিত্র তাকে সঙ্গে নিতে চাইলেও দশরথ আপত্তি করেন,...“না, রাম আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাকে ছাড়তে পারব না।”

নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।

(আদিকাণ্ড, ২০/২৫)

তবু তাকে ছাড়তে হবে; এবং চিরদিনের জন্য। দশরথের নিষ্ঠুর নিয়তি। রামের গমনপথের দিকে আকুল দুটি হাত বাড়িয়ে যতই তিনি বুকফাটা আর্তনাদ করুন না কেন, তবু রাম আর ফিরে আসবে না। তাঁর পিতৃস্নেহের তাপিত বক্ষে এত শক্তি নেই যে রামকে তিনি ধরে রাখবেন।

হয়তো তাঁর এই করুণ ভবিতব্যকে লক্ষ্য করেই ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁকে প্রথম সাক্ষাতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, “আপনি রামের প্রতি এতখানি স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়বেন না।”

ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব।

(আদিকাণ্ড, ১৯/১৩)

দশরথের কোলে মাথা রেখে কৈকেয়ী শুয়ে আছে। তার ঘন কুন্তলরাশি পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই তিমিরকেশের অন্ধতমসায় তিনি হাত বুলিয়ে আদর করছেন। হয়তো সান্ত্বনা পেতে চাইছেন—“কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূর্ধজেষু” (২/১১/৪)। তিনি জানেন না, ওই বিস্রস্ত চিকুরপাশ অরণ্যের অন্ধকারে পাতা নিষ্ঠুর ব্যাধের মরণফাঁদ—মৃত্যুর বাগুরা।

—“মহারাজ, আপনার মনে আছে—সেই দেবাসুরের যুদ্ধের কথা? দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে শম্বর অসুরের সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করেছিলেন?

—“হাঁ দেবী। মনে পড়ছে।”

—“যুদ্ধে আপনি আহত হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন?”

—“হাঁ, কল্যাণী। তুমিই আমাকে রক্ষা করেছিলে। মাতার মতো শুশ্রূষা করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। আমার প্রিয়তমা কৈকেয়ী তুমি।”

—“তখন আপনি আমাকে দুইটি বর দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি গ্রহণ করিনি, বলেছিলাম, আপনার বর আপনার কাছেই থাক।”

প্রেমার্দ্র কণ্ঠে দশরথ বললেন, “হাঁ সুন্দরী। প্রিয়ার্হা, অতুলনীয়া তুমি।”

—“এখন তবে আমাকে সেই দুইটি বর দান করুন।”

শিকারি ব্যাধের শব্দমোহে আচ্ছন্ন হরিণ যেমন পায়ে পায়ে ফাঁদের দিকে এগিয়ে যায়,

তেমনি দশরথ কৈকেয়ীর কথায় আগ্রহান্বিত হলেন—"প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১১/২২)।

—"কী চাও তুমি বল, দেবি? কোনো মহামূল্য রত্ন, না অলংকার? কোনো সম্পদ ঐশ্বর্য না ভূষণ?"

হঠাৎ উচকিত কণ্ঠে কৈকেয়ী বলল, "স্বর্গের দেবতারা শুনুন। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, আকাশ অন্তরীক্ষ পৃথিবী শোন। শোন গন্ধর্ব রাক্ষস নিশাচরগণ। সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ আমাকে বর দান করছেন।"

এই বলে কৈকেয়ী কঠোর স্বরে উচ্চারণ করল সেই ভয়ংকর ঘোর অপ্রিয় বাক্য, "আমি চাই ভরতের অভিষেক। আর চতুর্দশ বৎসরের জন্য রামের বনবাস"।

শুনে দশরথ বজ্রাহত। কিছুক্ষণ তিনি স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। পৃথিবী কাঁপছে। সমস্ত রাজপ্রাসাদ যেন টলছে। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি নিদ্রিত, না জাগরিত? এ কী অলীক দুঃস্বপ্ন? মায়া, না চিত্তবিভ্রম? কোনো প্রেতের বিভীষিকা?

বনের বাঘিনীকে দেখে হরিণ যেমন ভীত হয়, তেমনি কৈকেয়ীকে দেখে দশরথ ভীত হয়ে পড়লেন—"ব্যাঘ্রীং দৃষ্টা যথা মৃগঃ" (২/১২/৪)। তাঁর সমস্ত শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল। পরে মূর্ছাহত সংবিত ফিরে এলে দুঃখে আত্মগ্লানিতে ধিক্কার দিয়ে তিনি বললেন, "কৈকেয়ী, তুমি নৃশংস। রঘুবংশের কলঙ্কিনী পাপীয়সী। রাম তোমার কী করেছে? আমিই-বা তোমার কী করেছি? এমন নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনলে কি করে? তোমার বুদ্ধি বিকৃত হয়ে গেছে। হয়তো কোনো প্রেতাত্মা ভর করেছে। রঘুবংশে পাপ ঢুকেছে। তোমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি নিজেই তো কতবার আমাকে বলেছ, রাম আর ভরত তোমার কাছে সমান। ভরতের চেয়েও রাম তোমাকে বেশি ভক্তি করে। তোমার অনুগত সেই রামচন্দ্রকে আজ কেন বনবাসে পাঠাতে চাও? কৈকেয়ী, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এই শেষ জীবনে আমাকে আর এতবড় আঘাত দিও না। আমার বিশাল রাজ্যের আর যা-কিছু সব দেব। কেবল আমার রামকে রক্ষা কর। আমাকে অধর্মে লিপ্ত করো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ে আমি ভিক্ষা চাইছি।"

দিশাহারা রাজা পাগলের মতো বারবার কৈকেয়ীর পায়ে মাথা কুটে মিনতি করতে লাগলেন। আর দুঃখে শোকে, কখনো ক্ষোভে লজ্জায় মুহ্যমান হয়ে পড়তে লাগলেন।

তখন রূঢ়স্বরে কৈকেয়ী বলল, "প্রতিজ্ঞা করে এখন অনুতপ্ত হয়ে অস্বীকার করতে চাইছেন? লোকের কাছে ধার্মিক বলে পরিচয় দেবেন কি করে? লোকে জিজ্ঞাসা করলে কি বলবেন? বলবেন, একদিন কৈকেয়ী আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তার দয়ায় আমি আজও বেঁচে আছি, তাকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু তা রক্ষা করিনি। আপনিই বংশে কলঙ্ক ডেকে আনছেন। স্মরণ করুন, রাজা অলর্ক সত্যরক্ষার জন্য নিজের দুই চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন। মহারাজ শিবি সত্যরক্ষার জন্য নিজের শরীরের মাংস শ্যেন পক্ষীকে দিয়েছিলেন। আপনি যদি আজ সত্যরক্ষা না করেন তাহলে আপনার সামনে আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব। কৌশল্যা রাজমাতা হয়েছে এই দেখার চেয়ে আমার মরণ ভাল। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার দুর্মতি হয়েছে। রামকে রাজা করে কৌশল্যার সঙ্গে বিহার করবেন বলে ইচ্ছা হয়েছে; তার আগে আপনার সামনেই আমি আত্মহত্যা করব।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১২/৩৬-৪৮)

দশরথ করুণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর জীর্ণ বুকের মধ্যে দুঃখের সাগর মথিত হচ্ছে। তিনি আতুর চিত্তে বিকারগ্রস্তের মতো, মন্ত্রের দ্বারা নিস্তেজ সর্পের মতো ছটফট করতে লাগলেন। মোহপাশে আবদ্ধ রাজা সত্যের শৃঙ্খলে বাঁধা। লাঞ্ছিত তাঁর বিবেক।

—"কে তোমাকে এই দুর্বুদ্ধি দিয়েছে? প্রেতলোকের বশীভূত হয়ে এইসব বলতে তোমার লজ্জা করছে না? আমি রামকে কোন মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা বলব? কৌশল্যাকেই-বা কি জবাব দেব? কৌশল্যা এতকাল মায়ের মমতা, ভগ্নীর স্নেহ, দাসীর মতো শুশ্রূষা দিয়ে সাধ্বী স্ত্রীর মতো আমাকে সেবা করেছে। কিন্তু সেই রামজননী কৌশল্যাকে আমি যোগ্য সমাদর করিনি শুধু তোমার জন্য। কৈকেয়ী, তুমি বর চাইছ, না নিজের বৈধব্য কামনা করছ? তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু জানতাম না ওই রূপ শুধু বিষমিশ্রিত সুরা। তোমাকে সতী মনে করেছিলাম, কিন্তু আজ দেখেছি, তুমি দুষ্টাচারিণী, তুমি অসতী। মূর্খ আমি, এতকাল ফুলের মালা মনে করে ফাঁসির দড়ি গলায় পবে রয়েছি। তুমি আমার স্ত্রী নও। তুমি সর্বনাশী বিষধরী কালনাগিনী। আর আমি এও বলছি, রামের বনবাস যদি ভরতের প্রীতিপ্রদ হয়, তাহলে আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন আমাকে পিণ্ডজল না দেয়।"

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ॥
ভার্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা॥
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব।

*

সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যাম্যসতীং সতীম্।
রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ॥

*

রমমাণস্ত্বয়া সার্ধং মৃত্যুং ত্বাং নভিলক্ষয়ে।
বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্॥

*

প্রিয়ং চেদ্ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
মা স্ম তে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১২/৬৮-৭০, ৭৬, ৮১, ৯২)

এমনি করে দশরথ বিলাপ করছেন; কখনো কৈকেয়ীর পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। একবার শোকে উন্মাদের মতো বলে উঠলেন, "শঠ স্বার্থপর এই নারীজাতিকে ধিক্। ধিগস্তু যোষিতা নাম শঠাঃ স্বার্থ পরায়ণাঃ" (২/১২/১০০)। কিন্তু পরক্ষণেই হয়তো মনে পড়েছে কৌশল্যা সুমিত্রা সীতার কথা—ভারতের মহীয়সী কত নারীর কথা—স্ত্রিয়া সকলা জগৎসু—তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললেন, "না, আমি সকল নারীজাতিকে বলছি না। আমি কেবল ধিক্কার জানাচ্ছি ভরতের মাকে। ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১২/১০০)

—"পাপীয়সী, একদিন অগ্নিসাক্ষী করে তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু আজ তোমাকে এবং সেই সঙ্গে তোমার পুত্র ভরতকে আমি ত্যাগ করলাম।"

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৪/১৪)

এমন করে রাত গভীর হতে থাকে।...

বাইরে নক্ষত্রমালিনী নিশা। স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ। সুখস্বপ্নে নিদ্রিত অযোধ্যা। শুধু আর্ত বিনিদ্র রাজা দশরথ। জ্যোৎস্নামণ্ডিত নিশীথ আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বিলাপ করছেন, "হে মঙ্গলময়ী নিশা, আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি, চিবকাল এমনি করে জগৎকে তোমার অন্ধকারে ঢেকে রাখ। এই কালরাত্রি যেন ভোর না হয়। প্রভাতের আলো যেন আর না ফোটে। এই ঘৃণা এই কলঙ্ক এই লজ্জা যেন প্রকাশ না হয়।" পরক্ষণেই উন্মাদের মতো অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলেন, "না, না, এই অন্ধকার দূর হোক। এই দুঃস্বপ্ন সরে যাক। এই নির্মম নারী, এই নিষ্ঠুর নির্দয় নৃশংস কৈকেয়ীকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নাও।"

ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে।।
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ।
অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাম্।।
নৃশংসাং কৈকেয়ীং দ্রষ্টুং যৎকৃতে ব্যসনং মম।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৩/১৭-১৯)

তবু সেই দুঃখের রাত ভোর হল।...

সা নিশা জগাম ঘোরং।...

প্রভাতী বৈতালিক মঙ্গলবাদ্য বাজিয়ে রাজপুরী প্রবোধিত করে তুলল। বন্দিগণ রাজার বিজয়স্তোত্র পাঠ করতে লাগল।

শুনে আর্ত দশরথ উন্মত্তের মতো চিৎকার করে উঠলেন, "এই! কে আছ? মঙ্গলবাদ্য থামাও। স্তব্ধ কর ওই স্তুতিপাঠ।"

বাদ্য থেমে গেল।...

তখন দ্বারে এসে দাঁড়ালেন মন্ত্রী সুমন্ত্র, "মহারাজের জয় হোক।"

চমকে উঠলেন রাজা।

ভীত অপরাধীর মতো সংকুচিত হয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কে? ও, সুমন্ত্র!"

—"মহারাজ, অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ। ভগবান বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পুরজন সমাগত। সকলেই আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন।"

শুষ্ক মুখে দীন নয়নে দশরথ তাকিয়ে আছেন। কথা বলতে পারছেন না।

চোদ্দ

ক্রোধে ক্ষোভে অশ্রুতে উদ্বেল

শোকার্ত দশরথ করুণ দৃষ্টিতে দুঃখীর মতো চেয়ে আছেন। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ। বিপর্যস্ত কেশ। বাক্‌রুদ্ধ দুর্বল দেহ থরথর করে কাঁপছে। কথা বলতে পারছেন না। অতি কষ্টে কম্পিত স্বরে বললেন, "রাম...আমার রাম..."

সুমন্ত্র বিস্মিত হয়ে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজের কী হয়েছে? তাঁকে এমন কাতর দেখাচ্ছে কেন?"

—"ও কিছু নয়। রাজা সারা রাত রামের অভিষেকের আনন্দে উৎসুক হয়ে জেগে ছিলেন। তাই তাঁকে অমন পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। সুমন্ত্র, তুমি যাও, এখনি রামকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। মহারাজ তাঁকে দেখতে চান।"

মিথ্যা কি নিদারুণ! কতখানি হৃদয়হীন নৃশংস হলে তবে এমন মিথ্যা বলা যায়! কিন্তু একি শুধুই মিথ্যা? মিথ্যায় কি থাকে এতখানি বিষ? এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ? আসলে কৈকেয়ী নিজের কুকর্মের পরিণাম দেখে নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। তাই মিথ্যা দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। স্পষ্ট দিবালোকে দশরথের মতো সেও বুঝি নিজের মুখ দেখতে চাইছে না। রাতেব অন্ধকারে যে পাপ সে অনায়াসে করতে পারল দিনের আলোতে সেকথা সে বলতেও পারছে না। বিশেষ করে সুমন্ত্রের মতো বিশ্বস্ত রাজপুরুষের কাছে। হয়তো মনটাকে আরও শক্ত করার জন্য তার কিছুটা সময় দরকার। দংশনের পরে সাপও তার ফণা লুকিয়ে ফেলে।

—"কিন্তু মহারানি, রাজার অনুমতি না পেলে আমি কেমন করে যাই?" দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে সুমন্ত্র জানায়।

তখন দুহাতে বুক চেপে দীর্ঘশ্বাসের মতো দশরথ বললেন, "সুমন্ত্র তুমি রামকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

—"যে আজ্ঞা, মহারাজ।"

সুমন্ত্র চলেছেন রামের ভবনে।...

ভাবলেন রানি কৈকেয়ী হয়তো অভিষেকের আগে রামকে আশীর্বাদ ও উপঢৌকন দেবেন তাই ডাকছেন।

যেতে যেতে দেখলেন রামের অভিষেকের বিপুল আয়োজন। গ্রাম পুরবাসীগণ সমবেত হয়েছে। বিশাল মণ্ডপে ধ্বজা পতাকা। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। ঋষিগণ পরিবৃত হয়ে বশিষ্ঠ শুভকার্যের তত্ত্বাবধান করছেন। আমন্ত্রিত অতিথি রাজন্যবর্গ বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হয়ে অপেক্ষা করছেন। মণ্ডপে ভদ্রপীঠ রচিত হয়েছে। স্বর্ণকলসে পবিত্র তীর্থবারি। আলিম্পন

শোভিত উদুম্বর কাষ্ঠের পুণ্য আসন। অভিষেক কালে রাম সেখানে উপবেশন করবেন। কুশ পুষ্প দধি দুগ্ধ। ঘৃত সমিধ ব্যাঘ্রচর্ম। স্বর্ণমালাভূষিত সুলক্ষণ বৃষ, শ্বেত অশ্ব, মদমত্ত হস্তী। আরত্রিকের জন্য জবাঙ্কুর নবপল্লব। মণিরত্নের নানাবিধ দক্ষিণাসম্ভার। বাদ্যবাদিত্র হস্তে সালংকরা সুন্দরী বারবণিতাগণ। মাঙ্গলিক আচারে নিরতা আয়তীবৃন্দ। উপহার হস্তে অপেক্ষ্যমান প্রজাগণ।

শুভ মুহূর্তের আর বিলম্ব নেই।

সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। রাজা দশরথ এখনও আসছেন না কেন? চারিদিকে অস্থির গুঞ্জন কোলাহল।...

সুমন্ত্র দ্রুতগতি রথে চলেছেন রাম ভবনের দিকে।...

রামের ভবনে সশস্ত্র প্রহরা। অনুগত বিশ্বস্ত একদল কুণ্ডলধারী যুবক বর্শা ও কার্মুক হস্তে রামকে পাহারা দিচ্ছে। দুয়ারে দাঁড়িয়ে বেত্র হস্তে দ্বাররক্ষীগণ। তাদের পরনে রক্তবস্ত্র। কপালে রক্ত তিলক। মধ্যম কক্ষে অস্ত্র হাতে স্বয়ং লক্ষ্মণ। দশরথ রামের বিপদ আশঙ্কা করেছিলেন, তাই হয়তো এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। দুর্ভেদ্য রক্ষীবেষ্টনী।

স্বর্ণপর্যঙ্কে সীতার পাশে বসে আছেন রাম, যেন চিত্রানক্ষত্রশোভিত পূর্ণচন্দ্র—ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা। রামের অঙ্গে রক্তচন্দনের অনুলেপন। ননা আভরণ ভূষণে সজ্জিত। সীতা চামর দুলিয়ে ব্যজন করছেন।

সুমন্ত্র প্রবেশ করে বললেন, "যুবরাজ, একবার মহারাজ আপনাকে তাঁর মহিষী কৈকেয়ীর সঙ্গে দর্শন করতে চান।"

শুনে রাম প্রফুল্ল হয়ে সীতাকে বললেন, "আমার প্রিয়কামা জননী কৈকেয়ী বড় সুদক্ষিণা স্নেহদৃষ্টিময়ী। অভিষেকের সংবাদে তিনি হয়তো আনন্দিত হয়ে আমার জন্য মহারাজের কাছে কিছু প্রার্থনা করেছেন। আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসছি।"

লক্ষয়িত্বা হ্যভিপ্রায়ং প্রিয়কামা সুদক্ষিণা।
সঞ্চোদয়তি রাজানাং মদর্থমসিতেক্ষণা।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৬/১৬)

রাম সুমন্ত্রের রথে উঠলেন।

মেঘের মতো গম্ভীর শব্দে রথ ছুটে চলল।

পথের দুপাশে উচ্ছ্বসিত জনতা তাঁকে হর্ষোৎফুল্ল অভিনন্দন জানাতে লাগল।

কিন্তু দশরথকে দেখে রাম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। উন্মাদের মতো শোকাহত উদ্ভ্রান্ত তিনি।

—"মহারাজের কী হয়েছে? তিনি শোকাকুল হয়ে আছেন কেন? কারো কোন অমঙ্গল হয়নি তো? পিতা আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? আমার কি কোনো অপরাধ হয়েছে? ভরত শত্রুঘ্ন অথবা আমার মাতৃগণের কুশল তো? আপনি কি অভিমান বশে পিতার মনে দুঃখ দিয়ে কোনো কটুবাক্য বলেছেন? মহারাজ এমন বিষাদে অবসন্ন হয়ে আছেন কেন?

ব্যথিত কণ্ঠে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করেন রাম।

কৈকেয়ী নির্লজ্জের মতো বলল, "না, মহারাজ পীড়িত হননি। কারো কোনো অমঙ্গলও হয়নি। তবে তাঁর একটা বক্তব্য আছে। তোমার ভয়ে বলতে পারছেন না। তুমি তার অত্যন্ত প্রিয়। তোমাকে অপ্রিয় বাক্য বলতে তাঁর সংকোচ হচ্ছে।"

—"কী কথা? অসংকোচে বলুন আমাকে, দেবী।"

—"শোন, রাজা এক সময় আমাকে আদর করে দুটি বর দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর অনুতাপ হচ্ছে। তাই রাজার সত্যরক্ষার দায়িত্ব তোমার। তিনি তোমাকে যা বলবেন, তা শুভ হোক আর অশুভ হোক, যদি তুমি স্বীকার করতে সম্মত থাক, তাহলেই তোমাকে সব কথা বলতে পারি। যা বলবার আমিই বলব। উনি তোমাকে কিছুই বলতে পারবেন না।"

কৈকেয়ী বিলক্ষণ বাক্‌চতুর। কথার জালে আটঘাট বেঁধে নিতে পারে। কৈকেয়ী এত সাবধানে কথা বলছে কারণ রাম অসম্মত হলে তার চেষ্টা সব বিফল হবে। "তুমি যদি কথা না রাখ তাহলে কিন্তু বলব না—যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৮/১৯-২৬)

—"আমাকে এমন সন্দেহ করছেন কেন? পিতার আদেশে আমি নির্দ্বিধায় বিষ খেতে পারি। সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি। আগুনে প্রবেশ করতে পারি। পিতা আমার গুরু। তিনি যা চাইবেন তাই করব। আমাকে বিশ্বাস করুন। রাম কখনো দুরকম কথা বলে না।"

অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে॥
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ॥
তদ্ ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৮/২৮-৩০)

শুনে কৈকেয়ী আশ্বস্ত হল, "বেশ, তাহলে শোন। রাজা একবার যুদ্ধে আহত হন। আমি তাঁকে রক্ষা করি। তিনি তখন আমাকে আদর করে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি এখন সেই দুটি বর চেয়েছি। চেয়েছি ভরতের অভিষেক। আর তোমার দণ্ডকারণ্যে গমন (ভরতস্যাভিষেচনম গমনং দণ্ডকারণ্যে তব)। তুমি চতুর্দশ বৎসরের জন্য চীর ধারণ করে বনে গমন কর। আর ভরত অভিষিক্ত হয়ে রাজ্য শাসন করুক। রাজা আমাকে বর দিয়েছেন বলে দুঃখে লজ্জায় তিনি তোমার দিকে তাকাতে পারছেন না। এখন তুমিই তাঁর সত্য রক্ষা করে তাঁকে লজ্জা থেকে পবিত্রাণ কর।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৮/৩১-৪০)

—"বেশ, তাই হবে। ভরত আমার ভাই। রাজ আজ্ঞায় কেন, আপনিও যদি চান, আমি সানন্দে ভরতকে আমার ধন প্রাণ ঐশ্বর্য এমনকী সীতাকে পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। শুধু আমার দুঃখ, পিতা নিজে কেন আমাকে এই কথা বললেন না! আপনি পিতাকে সান্ত্বনা দিন। তিনি যেন অমন করে মুখ নীচু করে অশ্রুপাত না করেন। এখনই ভরতকে আনবার জন্য দূত পাঠান হোক। আমিও সত্বর দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি।"

—"হাঁ, তাই কর। নেহাত লজ্জিত হয়েই রাজা তোমাকে বলতে পারছেন না। তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। মহারাজের মনের কষ্ট দূর করতে আজই তুমি বনে গমন কর। তুমি না গেলে রাজা স্নান আহার কিছুই করবেন না।"

কৈকেয়ীর এই কথা শুনে দশরথ আর্তনাদ করে উঠলেন, "ওঃ! কি কষ্ট! ধিক্, আমাকে ধিক!"

দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

রাম ছুটে গিয়ে অচৈতন্য পিতাকে কোলে তুলে ধরলেন।

—"দেখছ তো? যতক্ষণ তুমি থাকবে ততক্ষণই ওঁর কষ্ট বাড়বে।" কৈকেয়ী বলে।

দশরথের দুঃখে রামের বুক ভেঙে যেতে লাগল। কশাহত অশ্বের মতো তিনি ছটফট করতে লাগলেন। পারলে এই মুহূর্তেই তিনি ছুটে বনে চলে যেতে চান।

—"দেবি, আমার উপর কি আপনার কোনো জোর নেই? এসব কথা আমায় না বলে পিতাকে বলে কষ্ট দিতে গেলেন কেন? আমাকে কি এতই নিকৃষ্ট ভাবেন? আমি স্বার্থপর হয়ে বাঁচতে চাই না। মাকে প্রণাম করে, সীতার কাছে বিদায় নিয়ে, আজই আমি বনে গমন করব।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৯/২০-২৫)

আহত সিংহের মতো রাম বেগে প্রস্থান করলেন। আর ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ তাঁর অনুসরণ করে চললেন।...

উৎসব মণ্ডপের পাশ দিয়ে দ্রুত পদে চলেছেন রাম। চারিদিকে অভিষেকের বিপুল আয়োজন সম্ভার। রাম তাকিয়েও দেখলেন না। তাঁর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। শান্ত দৃষ্টি। শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতো ধীর মুখমণ্ডলের স্থির প্রসন্নতা—"শারদঃ সুমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ"। (২/১৯/৩৭)

ততক্ষণে অন্তঃপুরে কান্নার রোল উঠেছে। সেই ক্রন্দনের সঙ্গে ধিক্কার শোনা যাচ্ছে, "রাজা দশরথের বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তিনি ধার্মিক পুত্রকে ত্যাগ করছেন।" শুনে দুঃখে লজ্জায় আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ দশরথ আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হয়ে শবদেহের মতো শয্যায় পড়ে রইলেন।...

অন্তঃপুরে ক্রন্দন শুনে রাম একটু থমকে দাঁড়ালেন। রজ্জুবদ্ধ গজরাজের মতো একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কৌশল্যার কাছে উপস্থিত হলেন।

কৌশল্যা তখন পূজার ঘরে। শ্বেতশুভ্রবস্ত্রে শুদ্ধাচারিণী হয়ে তিনি বিষ্ণুর পূজা করছেন। ঘরে হোম হচ্ছে। পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ। ঘৃতাগ্নির পবিত্র গন্ধ। পূর্ণকুম্ভে শ্বেতপুষ্পের মালা। স্বর্ণপাত্রে নৈবেদ্যপায়স।

রামকে দেখে মায়ের মুখে দিব্য আভা ফুটে উঠল। পুত্রকে সাদরে কাছে ডাকলেন। হাতে পূজার প্রসাদ দিতে গেলেন। অঞ্জলি প্রসারিত করে রাম বললেন, "মা, তুমি জানো না, আজ তোমার, লক্ষ্মণের ও সীতার বিপদ উপস্থিত হয়েছে। মহারাজ ভরতকে রাজত্ব দিয়েছেন। আর আমাকে নির্বাসন দিয়েছেন দণ্ডকারণ্যে।"

ভরতয় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রযচ্ছতি।
মাং পুনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২০/৩০)

কৌশল্যার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হল। তিনি কুঠারছিন্ন শালতরুর মতো অথবা শাখী কদলীর মতো মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। যেন স্বর্গের দেবীর মর্ত্যে পতন হল।

সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা॥
তামদুঃখোচিতাং দৃষ্ট্বা পতিতাং কদলীমিব।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২০/৩২-৩৩)

পরে সংজ্ঞা লাভ করে কৌশল্যা বিলাপ করতে লাগলেন, "তোকে কোলে ধরে আমার কপালে কি এত দুঃখ ছিল! এর চেয়ে যে বন্ধ্যা হওয়াও ছিল ভাল। আমি স্বামীর অনুরাগ ভালবাসা কখনো পাইনি। ভেবেছিলাম পুত্রের মুখ দেখে শান্তি পাব। কিন্তু রাজমহিষী হয়েও আমি উপেক্ষিতা অনাদ্রিতা! কৈকেয়ী সর্বদা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অপমান করে। কর্কশ বাক্য বলে। পাছে কৈকেয়ী রুষ্ট হয় এই ভয়ে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতেও সাহস করে না। আমি তো সপত্নী দাসীর চেয়েও অধম হয়ে আছি। নারী জীবনে এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে? তুই কাছে থাকতেও যদি আমার এত নিগ্রহ এত লাঞ্ছনা হয়, তাহলে তুই চলে গেলে আমার কী হবে? এত অপমান সহ্য করে কেবল তোর মুখ চেয়ে বেঁচে আছি।

ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।
অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া।।
সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী।।
অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদাণাং ভবিষ্যতি
মম শোকো বিলাপশ্চ যাদৃশোঽয়মনন্তকঃ।।
ত্বযি সন্নিহিতেঽপ্যেবহমাসং নিরাকৃতা।
কিং পনুঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে।।
অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুনিত্যমসম্মতা।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২০/৩৮-৪২)

এতক্ষণ লক্ষ্মণ বহুকষ্টে মনের রাগ চেপে নীরবে ছিলেন। আর থাকতে পারলেন না। ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "রাঘব, রাজ্য ত্যাগ করে আপনি বনে গমন করবেন, এ হতে পারে না। এ অন্যায়। আমি সহ্য করব না। বৃদ্ধ বয়সে রাজার বুদ্ধি বিকল হয়ে গেছে। তিনি স্ত্রৈণের মতো আচরণ করছেন। কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান থাকলে এমন দেবতুল্য পুত্রকে কেউ ত্যাগ করে না। গুরুজন যদি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বিপথগামী হন, তাহলে তাঁকেও শাসন করা উচিত। একটা স্ত্রীলোকের কথায় আপনি রাজ্য ত্যাগ করতে পারেন না। রাঘব, লোকে জানবার আগেই আপনি সবলে রাজ্য অধিকার করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করব। দেখি কার সাহস বাধা দেয়। অযোধ্যাবাসী কেউ যদি ভরতের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমি অযোধ্যাকে শ্মশান করে দেব। কৈকেয়ীর অনুবর্তী হয়ে পিতা যদি এমন শত্রুতা করেন, তাহলে আমি তাঁকে বন্দি করব, অথবা বধ করব।"

প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বাধ্যতাং বধ্যতামপি॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২১/১২)

লক্ষ্মণ কৃতান্তের মতো ভীষণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর দুই চোখে বিদ্রোহের আগুন। কৌশল্যাও উত্তেজিত। তাঁর কমলা মূর্তির আড়ালে যেন দেবী চণ্ডীর আভাস। যদিও তাঁর পরনে পট্টবস্ত্র, ললাটে চন্দনলেখা, তর্পণসিক্ত হাতে পুষ্পচন্দনের সুবাস, নয়নে অশ্রু, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কঠোর ইঙ্গিত। তিনি রামকে বললেন, "পুত্র, লক্ষ্মণের কথা শুনেছ? যদি মনে কর তবে তাই করো।"

ভ্রাতুস্তে বদতঃ লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২১/২১)

স্পষ্টই এখানে কৌশল্যা রামকে বিদ্রোহ করতে বলছেন। লক্ষ্মণকে সম্মতি দিচ্ছেন। তাঁর নিজের স্বামীকে বন্দি করতে। রাজপ্রাসাদের অন্তর্বিপ্লবের ধূমায়িত বহ্নি তাঁর দুই চোখে।

দুঃখ নারীর বুককে পাষাণ করে। কিন্তু কৌশল্যার অন্তরের পুঞ্জীভূত নিরুদ্ধ দাহ তাঁর উত্তপ্ত বক্ষকে করে তুলেছে আগ্নেয়গিরি।

অযোধ্যায় বুঝি এবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। বৃদ্ধ পিতার বুকের রক্তে বুঝি পুত্রের হাত লাল হয়ে উঠবে।

কিন্তু না। তা হবে না।

কৌশল্যা ও লক্ষ্মণের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন রাম। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে রাম বললেন, "লক্ষ্মণ, শান্ত হও। এই উগ্র অনার্য বুদ্ধি ত্যাগ কর। আমি তোমার বিক্রম জানি। আমার প্রতি তোমার স্নেহ যে কত গভীর তাও জানি। কিন্তু ধর্মই সত্য। সত্য প্রতিষ্ঠিত ধর্মে। আমি কখনো পিতা মাতা ও ব্রাহ্মণের বাক্য লঙঘন করতে পারব না। তুমি এই দুর্মতি ত্যাগ করো।"

ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
সংশ্রুত্য চ পিতুর্বাক্যং মাতুর্বা ব্রাহ্মণস্য বা।
ন কর্তব্যং বৃথা বীর ধর্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা॥
তদেতাং বিসৃজানার্যং ক্ষত্রধর্মাশ্রিতাং মতিম্।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২১/৪১-৪২, ৪৪)

তারপর রাম করজোড়ে কৌশল্যাকে বললেন, "মা, এই ক্রোধ ও শোক সংবরণ করো। ধৈর্য ধরো। অপমানকে হৃদয়ে স্থান দিও না। এ দৈব, ভবিতব্য। এজন্য কেউ দোষী নয়। কৈকেয়ী পিতাকে বঞ্চনা করেছেন; তুমিও কি স্বামীকে ত্যাগ করবে? নারীর পক্ষে সে অতি নিষ্ঠুর কাজ। চিন্তা করাও পাপ। এ কাজ তুমি কখনো কোরো না। মহারাজ দশরথ তোমার স্বামী এবং তিনি আমার পিতা, তিনি আমাদের দুজনেরই গুরু। তাঁকে সেবা করা, তাঁর আজ্ঞানুবর্তী হওয়াই আমাদের কর্তব্য। আমাকে বনে যেতে অনুমতি দাও। আর দেখো, যেন পিতা মনে কোনো কষ্ট না পান।"

কৈকয্যা বঞ্চিতো রাজা ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন নূনং বর্তয়িষ্যতি॥

ভর্তুঃ পুনঃ পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ॥
স ভবত্যা ন কর্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ॥

*

ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্তব্যং বচনং পিতুঃ।
রাজা ভর্তা গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষামীশ্বরঃ প্রভু॥

*

শ্রমং নাবাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুরু।
(অযোধ্যাকাণ্ড, ২৪/১১-১২, ১৬, ২৪)

কৌশল্যা অনেক বিলাপ করেও রামকে সংকল্প থেকে টলাতে পারলেন না। অগত্যা পুত্রবিচ্ছেদের জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করে তিনি আশীর্বাদ করলেন, "বৎস, কবে বনবাস থেকে ফিরে আসবে সেই আশায় বেঁচে থাকব। ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৫/৩) কৌশল্যা তাঁর সকল ক্রোধ ও ক্ষোভের সাগর পার হয়ে আবার যেন তাঁর অচলা মাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর মাতৃহৃদয়ের মহত্ত্ব ওই শান্ত আশীর্বাদের মধ্যে যেন প্রতিফলিত হয়ে উঠল।

কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুতেই শান্ত হতে চান না। ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করে, ক্ষিপ্ত গজরাজের মতো হস্ত আস্ফালন করে তিনি বলতে লাগলেন, "স্বার্থে লোভে শঠতা ষড়যন্ত্র করে যারা এই লোকনিন্দিত কাজ করতে চলেছে, আমি তাদের সহ্য করব না। আমাকে ক্ষমা করুন। সংসারে ধর্মের ছলনা ও ভণ্ডামী আমি অনেক দেখেছি। কৈকেয়ীকে এই বরদানের ব্যাপারটা শুনছি তো অনেক দিনের কথা। এতকাল তা দেওয়া হয়নি কেন? এতদিন পরেই-বা সেই প্রশ্ন উঠছে কেন? আমি বলছি, এ কপট ষড়যন্ত্র। এই অন্যায় গর্হিত কার্যকে আপনি ধর্ম বলছেন? তাহলে সেই ধর্মকে আমি ঘৃণা করি। একে দৈব ভবিতব্য বলছেন? তাহলে সেই দৈবকে আমি অগ্রাহ্য করি। যারা দুর্বল যারা মোহগ্রস্ত তারাই কেবল দৈবের দোহাই দেয়। কিন্তু যারা বীর তারা পুরুষকার আশ্রয় করে। যারা আপনার বনবাসকে দৈবের বিধান বলে ভাবছে, তারা আজ দেখুক, দৈব বড়, না পুরুষকার বড়। আমার এই দুটি বাহু শুধু শোভাবর্ধনের জন্য নয়। পৃষ্ঠের এই ধনুক শুধু অলংকার নয়। এই খড়্গ এই তূণ শুধু বৃথা বহন করবার জন্য নয়। রাঘব, আজ আমার পৌরুষ প্রদর্শনের দিন।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩/১-৩০)

রাম তখন শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ক্ষান্ত হও, লক্ষ্মণ। তুমি জানবে, পিতার আদেশ পালন করাই আমার দৃঢ় সংকল্প। এই আমার সত্য পথ। পিত্রোর্বচনে ব্যবস্থিতং নিবোধ মামেষ হি সৌম্য সৎপথঃ।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩/৪১)

এই একটি কথায় লক্ষ্মণের অশান্ত বিক্ষোভকে রাম শান্ত করে দিলেন।..

এবার তিনি চললেন সীতার কাছে বিদায় নিতে।...

রামকে এতক্ষণ আমরা দেখেছি শান্ত ধীর অটল মূর্তিতে। কৌশল্যার ক্ষোভে, লক্ষ্মণের ক্রোধে ও উত্তেজনায় তিনি পর্বতের মতো স্থির। একটা সৌম্য গম্ভীর মহিমা। কিন্তু সীতার সামনে এসে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। তিনি যেন তাঁর মনের কঠিন শিলাতট থেকে

এসে এবার দাঁড়ালেন হৃদয়ের কুসুম বেদিকায়। রামের হৃদয় যে কঠোর-লালিতে গড়া। কবি যথার্থই বলেছেন, "বজ্রের মতো কঠোর, কুসুমের মতো কোমল, রামচন্দ্রের মতো লোকাত্তর মহাপুরুষের মন কে বুঝতে পারে?"

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।

(উত্তররামচরিতম্, ২/৭)

সীতার সম্মুখে রাম মনের দুঃখ গোপন করতে পারলেন না। বিষণ্ণ চিন্তিত তিনি। আনত মুখখানি ঘর্মাক্ত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। তাঁর শান্ত বিবর্ণ মুখের ভাবে অন্তরের শোক প্রকাশ হয়ে পড়েছে! 'অপশ্যচ্ছোকসন্তপ্তং চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম॥ বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৬/৬, ৮)

রামকে অমন করে আসতে দেখে সীতার বুক কেঁপে উঠল, "শুভদিনে তোমাকে এত উদ্‌বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন?

সব জানিয়ে রাম বললেন, "বনে যাওয়ার আগে তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তুমি আমার শোকার্ত মাতা কৌশল্যাকে দেখো। আর নিয়ত ব্রত উপবাসে দেবার্চনায় নিবিষ্ট থেকো।"

আমরা ভেবেছিলাম, সীতা হয়তো কৌশল্যার মতোই শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়বেন। অথবা ক্রন্দনে বিলাপে বেপথুমান হবেন। কিন্তু সীতা যে সর্বংসহা, রামচন্দ্রের আত্মতেজের শক্তিভূতা শ্রীমূর্তি। সীতাকে তাই বলা হয়েছে, "মূল প্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্" (অধ্যাত্মরামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১/৯৩)—জগতের সৃষ্টির আদিমূল শক্তি সীতা। সীতা রঘুকুলের মঙ্গলপ্রদীপ। প্রদীপের আলো আমাদের ঘর সংসারের সবকিছুকে আলোকিত করে, তাই বলে আমাদেব ঘরের কোনো দুঃখ মালিন্য তাকে স্পর্শ করে না—"গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ" (বিবেকচূড়ামণি, ৫০৬)! ঝড়ের মধ্যেও সে দীপশিখা কখনো কাঁপে না। শিরে বজ্রাঘাত হলেও সীতা হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন। যেন কিছুই হয়নি। দুঃখকে তিনি মৃদু পবিহাসে লঘু করে নিতে পারেন।

—"তুমি আমাকে তুচ্ছ ভেবে এসব কি বলছ? শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। একজন শাস্ত্রজ্ঞ বীর রাজপুত্র হয়ে তুমি এমন অসার কথা বলছ কেমন করে? পিতা-মাতা ভ্রাতা পুত্র পুত্রবধূ—এরা সবাই যে যার পুণ্যফল আর ভাগ্য নিয়ে বাঁচে। কিন্তু নারীর একমাত্র ভাগ্য তার পতি। পতির চরণেই নারীর একমাত্র আশ্রয়। পতির সঙ্গে বাস স্বর্গবাস। তোমাকে ছাড়া স্বর্গও আমার কাম্য নয়। তুমিই স্বর্গ। তোমার বিরহই আমার নরক। তোমার যদি বনবাসের আদেশ হয়, জানবে সেই সঙ্গে আমারও বনবাসের আদেশ হয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

—"কিন্তু সে যে ঘোর অবণ্য। আহার নেই, আশ্রয় নেই। হিংস্র যত শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা। পদে-পদে মৃত্যুর ভয়। সে কষ্টের জীবন তুমি ভাবতেও পার না।"

—"তুমি আছ, আমার কিসের ভয়? বনে ফলমূল আছে, ঝর্ণার জল আছে, বৃক্ষমূলে আশ্রয় আছে। সেই মধুগন্ধ বনে তুমি আর আমি জলাশয়ে হংসমিথুনের শোভা দেখব, স্নান করব, পদ্মফুল তুলব।" সীতা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

—"না, না, তুমি বুঝতে পারছ না। বনবাসের কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না। অন্ধকার বনে বাঘের ডাক সিংহের গর্জন শুনলে তুমি ভয়ে কাঁপতে থাকবে। জলে শুধু পদ্মই ফোটে না, তার মধ্যে থাকে কত হাঙর মকর কুমীর।" রাম সীতাকে বিরত করতে চেষ্টা করেন।

—"আমি বুঝতে পারছি না। আমার পিতা কি শেষে একজন পুরুষবেশী স্ত্রীলোককে জামাতা করেছেন? জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্।" সীতার কণ্ঠে কৌতুক মিশ্রিত বিদ্রূপ। (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০/৩)

"মৈথিলী, আমি তোমার মন দেখছিলাম। তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না। সত্য বলতে কি, চোদ্দো বছর কেন, এক মুহূর্তও তোমার বিরহ আমি সহ্য করতে পারব না। ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০/২১)

রামের এই অনুরাগমাখা কথা শুনে সীতার প্রেমকম্পিত বক্ষ আনন্দে দুলে উঠল। মুখে লজ্জা আর হাসি, সেই সঙ্গে দুই চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করতে লাগল।

পনেরো

কথার আড়ালে ব্যথা

প্রাচীনকালে তপস্বিনী সুবর্চলা যেমন সূর্যকে অনুগমন করেছিলে, সীতাও তেমনি রামের অনুবর্তী হলেন—"যথা সূর্যং সুবর্চলা" (২/৩০/৩০)। বনবাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত তাঁরা। রাজমহলের স্ফটিক অলিন্দ পার হয়ে চলেছেন। দাসদাসীরা শোকবিহ্বল দৃষ্টিতে হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে দুঃখে ভয়ে শঙ্কিত ছায়ার মতো তারা কাঁপছে।

এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্মণ ছুটে এসে রামের চরণ দুটি ধরে আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন, "রাঘব, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আপনাকে ছেড়ে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য চাই না। স্বর্গ কিংবা দেবত্বও কামনা করি না।"

> অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ॥
> ন দেবলোকাক্রমনং নামরত্বমহং বৃণে।
> ঐশ্বর্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩১/৩, ৫)

লক্ষ্মণ করজোড়ে সাশ্রুনয়নে নতজানু হয়ে মিনতি করছেন রামের চরণে। লক্ষ্মণের আর সেই ক্রোধ নেই। আস্ফালন নেই। নেই সেই বিদ্রোহ। রামের গমনপথে বসে অসহায় শিশুর মতো কাঁদছেন।

আর দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সত্যের পথে চলতে যাঁর পা টলে না, সেই রঘুনাথ রামচন্দ্র তখন স্নেহাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। শক্তির বাধাকে অবহেলে সরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু স্নেহের এই দুর্বল অবরোধকে তিনি উপেক্ষা করবেন কেমন করে?

লক্ষ্মণের মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন। রামের কণ্ঠস্বর যেন গম্ভীর সমুদ্র। তাতে আবেগের উত্তাপ নেই, আছে অন্তরাত্মার নির্মোহ শান্তি। দৃঢ় সংকল্পের এক বলিষ্ঠ ভার।

—"সৌমিত্র, আমি জানি, তুমি আমাকে কত ভালবাস। তুমি আমার সখা। আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তুমি ধার্মিক ধৈর্যবান্। কিন্তু তুমি চলে গেলে আমাদের মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে দেখবে? ভরত রাজা হয়ে তাঁদের উপেক্ষা করবে। কৈকেয়ীও তাদের দুঃখ দেবেন।"

—"না, রাঘব। আপনার ভয়ে ভরত কখনো তাঁদের অবহেলা করতে সাহস করবে না। আর যদি করে, আমি তাকে বধ করব। তাছাড়া মাতা কৌশল্যার ভরণপোষণের জন্য কোনো ভাবনা নেই। তাঁর নিজেরই অনেক সম্পত্তি আছে। আমাদের মতো শত সহস্র ব্যক্তির প্রতিপালন করতে তিনি সক্ষম।"

কৌসল্যা বিভৃয়াদার্যা সহস্রং মদ্‌বিধানপি।
যস্যা সহস্রং গ্রামাণাং সংপ্রাপ্তমুপজীবিনম॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩১/২২)

তখন রাম বললেন, "বেশ, তাহলে চল আমার সঙ্গে। আচার্য বশিষ্ঠের গৃহ থেকে সঙ্গে নাও আমার বরুণপাশ, অক্ষয়, তূণ, সূর্যতুল্য মণিময় খড়্গ আর অগ্নিময় যত আয়ুধ অস্ত্র। মাতা ও প্রিয়জনের কাছে বিদায় নিয়ে এসো।"

অনুমান করি, লক্ষ্মণ এবার অন্তঃপুরে বিদায় নিতে গেলেন। কিন্তু সেই নেপথ্য দৃশ্য আমরা দেখলাম না। মহাকবি আমাদের চোখের সামনে একটা কালো যবনিকা টেনে দিলেন। এখানে বাল্মীকির কবিপ্রতিভার পরমোৎকর্ষ। যিনি শ্রেষ্ঠ কবি তিনি যেমন সুচারুভাবে জানেন, কি বলতে হবে, তেমনি আবার আরও ভাল জানেন, কি বলতে হবে না। নীরবতা দিয়ে অনেক সময় তিনি বাক্যের শূন্যতা ভরাট করে দেন।

বাস্তবিক, ঊর্মিলাকে পাঠকের সম্মুখে আনলে তাঁর দুঃখ কিছু লাঘব হত না। পরন্তু লক্ষ্মণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হত। সাশ্রুনয়না ঊর্মিলার পাশে দাঁড়ালে লক্ষ্মণের ত্যাগের মহিমা অনেক ম্লান হয়ে পড়ত। কিন্তু দৃশ্যমান দুঃখের চেয়ে নেপথ্যে বেদনা আরও গভীর, আরও মর্মস্পর্শী। না-বলা বাণীর ঘন যামিনীতে যে ব্যথা গুমরে ওঠে, তার গভীর ছন্দ কি কোনো অনুষ্টুপে ধরা যায়? বাল্মীকি তাই দেবতাদের মতোই এখানে একটু আড়ালে একটু অন্তরালের পক্ষপাতী হয়েছেন—"পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৪/২২)। তিনি জানেন, পল্লবের অন্তরালে না থাকলে পুষ্পের সৌন্দর্য সতেজ হয় না।

যদিও রবীন্দ্রনাথ আদিকবির কাছে অনুযোগ করেছেন, "কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখ বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন কবিকমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্র ললাটে সিঞ্চিত হইল না? হায়, অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো মহাকাব্যের সুমেরু শিখরে একবার মাত্র উদিত হইয়াছিলে, তারপরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী, তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পৃ. ৬৬২/৩৮)

রবীন্দ্রনাথের অনুযোগ (কিংবা অভিমান) হল, এই পক্ষপাতকৃপণ মহাকাব্যে সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছে গেছে। প্রশ্ন করছেন, "পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?" (তদেব, পৃ. ৬৬২/৪০)

বস্তুত এখানে বাল্মীকির কবিপ্রতিভার সংযম ও শক্তি বিস্ময়কর। কবিত্বের দাবি অনেক সময় এমন নিষ্ঠুর হয়। শুধু বাল্মীকি কেন, ভবভূতিও তো মাত্র ক্ষণিকের জন্য ঊর্মিলার চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেই ত্বরিতে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। আমাদের একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার অবসরও দেন নাই।

অনেক সময় কবি যা দেখান, তার চেয়ে বেশি দেখতে চাওয়া সমীচীন হয় না। তাতে ব্যথা বাড়ে, মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় মাত্র।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বড় সুন্দর বলেছেন, "(বাল্মীকি) শুধু যে ঊর্মিলাকে একেবারে ভুলে গিয়েছেন তা নয়, লক্ষ্মণকেও ভুলেছেন...আমাদের এসব জিজ্ঞাসার উত্তর রামায়ণে নেই, আছে আমাদের হৃদয়ে। আর সেই হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি। তিনি নিজে যা বলতে ভোলেন সেকথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে। ...হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম; হয়তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা।" ...(প্রবন্ধ সঙ্কলন, ১৯৬৬, পৃ. ১৫৭-৫৮)

আবার শুধু ঊর্মিলাই-বা কেন? ভরতের পত্নী মাণ্ডবী, শত্রুঘ্নের পত্নী শ্রুতকীর্তি? এঁদেরও তো আমরা একবার মাত্র দেখেছিলাম সেই বধূবেশে বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তারপর নবসীমন্তিনী হয়ে অলক্তচরণে সেই যে তাঁরা অযোধ্যার রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, আর তো তাঁদের দেখা পেলাম না। এত শোক দুঃখের মধ্যে রাজবাড়িতে তাঁদের একটি অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনিও আমরা শুনতে পেলাম না। এত দুঃখেও তবু ঊর্মিলার একটা বড় গর্ব বড় সান্ত্বনা ছিল। তাঁর স্বামী রামচন্দ্রের অনুগামী সেবক ও সহচর। কিন্তু মাণ্ডবীর তো সে সান্ত্বনাও নেই। বিনা দোষে তাঁর স্বামী সকলের সন্দেহ ও নিন্দার ভাজন।

আবার কৌশল্যার দুঃখে আমরা ব্যথিত হই, কিন্তু সুমিত্রা? কৌশল্যার মতোই সকল বঞ্চনা অনাদর ও উপেক্ষা নিয়েও চিরমৌন তিনি। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিমান নেই। মুখে একটি কথা নেই। নিজের সকল দুঃখকে অন্তরে প্রশমিত করার অসীম ধৈর্য তাঁর। কৌশল্যার বিলাপ অপেক্ষা সুমিত্রার এই শান্ত নীরবতার শক্তি যে কত গভীর, তা বাল্মীকি আশ্চর্যভাবে ব্যক্ত করেছেন। কোনো শ্লোক রচনা করে নয়, তাঁর পুঁথির ভূর্জপত্রের শূন্য তল দিয়ে। সুমিত্রা নিঃশব্দচারিণী সান্ত্বনা ও সহিষ্ণুতার এক মৌন মূর্তি যেন।

কাব্য তো জীবন। জীবনে কত কথাই না-বলা থেকে যায়। কত দুঃখ আমরা ভুলে যাই। কত বেদনা শুধু মৌন স্মৃতি হয়ে অন্তরে কাঁপে। কিছু তার বলা যায়; কিছু বলা যায় না। আবার কখনো সেই দুঃখের স্মৃতি, কালিদাস বলেছেন, চিন্তা করেও না কত সুখ! "প্রাপ্তানি দুঃখ্যানাপি সঞ্চিত্যমানানি সুখান্যভূবন্" (রঘুবংশ, ১৪/১৫)। কবি তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে অনেক কিছু বলেন; আবার অনেক কিছু বলেনও না। হয়তো আশা করেন, সহৃদয় পাঠক সেই সব না-বলা কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করবেন।

বাল্মীকির নির্মোহ কবিদৃষ্টির নিপুণতা এখানেই যে, তিনি ঊর্মিলাকে দেখাচ্ছেন না। পারতপক্ষে সুমিত্রাকেও সামনে আনছেন না। তাহলে সেই জটিল স্বরসংঘাতে রামায়ণের বীণার তার ছিঁড়ে যেত। রাম লক্ষ্মণ সীতার ভাবতরঙ্গকে কবি সুর দিচ্ছেন আস্থায়ী ও আভোগে। আর ঊর্মিলা সুমিত্রা এঁরা হলেন সেই সুরের অন্তরা। তাঁদের যত কথা ও ব্যথা সব সমে নিখাদে নিম্নসপ্তকে বাঁধা। বাল্মীকি কেবল চিত্রকর নন, তিনি একজন আশ্চর্য সুরকার। তিনি কেবল কথা দিয়ে ছবি আঁকেন না, ব্যথা দিয়ে সুর তোলেন।

বনবাস যাত্রার একেবারে শেষ মুহূর্তে নিতান্ত বাধ্য হয়ে কবি সুমিত্রাকে এনেছেন। না এনে তাঁর উপায় ছিল না। কারণ রাম সীতার সঙ্গে বনবাসে চলেছেন, তখন পুত্র লক্ষ্মণ যদি মাকে

প্রণাম না করে আশীর্বাদ না নিয়ে চলে যান তাহলে বাল্মীকির কবিত্বের ব্যত্যয় ঘটত। লক্ষ্মণও তাহলে আর লক্ষ্মণ থাকতেন না। ঠিক একই কারণে ঊর্মিলাকে তিনি সামনে আনেননি। কারণ সীতার মতো ঊর্মিলাও যদি অমোঘ যুক্তি দেখিয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে যেতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার মতো যুক্তি বা সাধ্য বাল্মীকির ছিল না। সেক্ষেত্রেও তাঁর কবিত্বের ব্যত্যয় ঘটত। তাই নিরুপায় কবি আমাদের দুঃখ দিয়ে আমাদেরই হৃদয়ের সহানুভূতির আশ্রয়ে ঊর্মিলাকে রেখে গেলেন। আর সুমিত্রাকে আনলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।

আনলেন বটে, কিন্তু বলতে দিলেন সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা। কিন্তু সংক্ষিপ্ত কটি কথাতেই সুমিত্রা রামায়ণের আকাশে প্রত্যুষের নির্জন তারার মতো জ্বলজ্বল করছেন। স্বল্পভাষিণী মনস্বিনী সুমিত্রা সেই অল্প কটি কথাতেই ভারতবাসীর অন্তরে চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছেন।

তিনি লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করে বললেন, "বৎস, আমি তোমাকে বনগমনের অনুমতি দিচ্ছি। রামের সঙ্গে তুমি যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। এক্ষেত্রে তোমার অন্যথা করা চলে না। সম্পন্ন অথবা বিপন্ন সকল অবস্থায় একমাত্র রামই তোমার আশ্রয়। রামকে তুমি পিতৃতুল্য মনে করবে। আর সীতা আমারই মতো তোমার মাতৃতুল্য। অরণ্যে বাস হবে তোমার অযোধ্যাবাস। তুমি আনন্দ মনে যাও।"

রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃপুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি॥
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সত্যং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ॥
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাম যথাসুখম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০/৫-৬, ৯)

এমনি করে কবি সুমিত্রার অন্তরের আকাশ এত ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন যে, সেখানে আমাদের সাংসারিক সুখ দুঃখের আবিল বাতাস পৌঁছায় না। সমগ্র রামায়ণের সুর এখানে এক সুমহান্ শান্তির ও ত্যাগের উচ্চ গ্রামে বাঁধা হয়েছে।...

কিন্তু রামলক্ষ্মণের এখনও একটা বড় কর্তব্য বাকি রয়েছে।

ত্যাগ ও দানের দ্বারা নিঃস্ব না হলে বনবাসী হওয়া যায় না। তাই তাঁরা তাঁদের সর্বস্ব অকাতরে দান করে দিতে লাগলেন দেব দ্বিজ ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের মধ্যে।

বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে রাম দিলেন স্বর্ণময় অঙ্গদ কুণ্ডল কেয়ূর হেমসূত্র মণিমাল্য। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা আর তাঁর শত্রুঞ্জয় হস্তী। কৌশিক ও অগস্ত্য ঋষিকে দিলেন রজত মণি রত্ন ধন। সহস্র ধেনু ও বৃষ। বৃদ্ধ সারথি চিত্ররথকে দিলেন বহুমূল্য বস্ত্র গোধন ও অশ্ব। দাসদাসীদের চোদ্দো বৎসরের জীবন নির্বাহের উপযুক্ত অর্থ। স্বাধ্যায়ী ও বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণকুমারদের মধ্যে বিতরণ করলেন ধেনু বৃষ দধি ও দুগ্ধ। দীন দরিদ্রদের রাশিরাশি অন্ন বস্ত্র।

দানযজ্ঞ শেষ হল।

এমন সময় সামনে এলেন ত্রিজট নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ. পিঙ্গলবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহ, জীর্ণ কৌপীন মাত্র সম্বল।

—"ব্রাহ্মণ, এত বিলম্ব করে এলেন কেন? দান করার মতো একটি কপর্দকও তো আর আমার নেই। তবে অবশিষ্ট কিছু ধেনু আছে। গোষ্ঠে গিয়ে আপনার হাতের ওই দণ্ডটি যতদূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করবেন ততদূর পর্যন্ত সব ধেনু হবে আপনার।"

ব্রাহ্মণ তাঁর কটিদেশের জীর্ণশটী শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর হাতের দণ্ড ঘুবিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত দণ্ড গিয়ে পড়ল দূরে সরযূ নদীর ওপারে।

গোষ্ঠের সমস্ত ধেনু ও বৃষ লাভ করে ব্রাহ্মণ ত্রিজট আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।..

এবার তাঁরা বিদায় নিতে দশরথের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন।

সুমন্ত্র দশরথকে সংবাদ দিলেন।

দশরথ বললেন, "আমার সকল পত্নীকে এখানে ডাক। আমি দ্বারাপরিজন পরিবৃত হয়ে রামকে দেখতে চাই।"

সুমন্ত্র সকলকে ডেকে নিয়ে এলেন। শোকে বিলাপে রোরুদ্যমানা যত অন্তঃপুরচারিণী। করজোড়ে রাম সীতা লক্ষ্মণ আসছেন..

দশরথ শয্যা থেকে উঠে অতিকষ্টে কম্পিত দেহে রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।...

কয়েক পা গিয়েই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।...

সকলে হাহাকার করে উঠল।...

পরে সংজ্ঞা লাভ করে দশরথ বললেন, "রাম, আমি সত্যপাসে মোহগ্রস্ত। তাই বলছি, তুমি আমাকে বন্দি করো। আমাকে নিগ্রহ করে আজই অযোধ্যার রাজা হও। অযোধ্যায়াং ত্বমেবদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/২৬)

শুনে কৈকেয়ী প্রমাদ গুনল।

সকলের অলক্ষ্যে দশরথকে ইশারা করতে লাগল ("কৈকয্যা চোদ্যমানস্তু মিথো")। কৈকেয়ীর প্রতি এতক্ষণ পাঠকের মনে ছিল ক্রোধ, কিন্তু এই ঘৃণ্য নীচতা অসহনীয়। নীচ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মতো কৈকেয়ীকে এমন অলক্ষ্যে কুৎসিত ইশারা করতে দেখলে মনে হয় না সে কোনো দিন অযোধ্যার রানি ছিল। রামকে চোদ্দো বছরের জন্য রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল কৈকেয়ী; কিন্তু তার আগেই আপন চরিত্রে সে নিজেই চিরকালের জন্য সম্রাজ্ঞীর মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ল। পাপ এমনি করে নিজের মধ্যে শাস্তি বহন করে। দণ্ড পাওয়ার আগেই সে দণ্ডিত।

—"পিতা, আপনি দুঃখ করবেন না। আপনার সামনে সত্য ও পুণ্যের শপথ করে বলছি, আমি রাজ্য চাই না, সুখ চাই না, ঐশ্বর্য চাই না। দেবত্ব স্বর্গ এমনকী আমার জীবনও কামনা করি না। আমি কেবল আপনার সত্য রক্ষা করতে চাই। আপনাকে মিথ্যাবাদী হতে দেব না। ধর্মশাস্ত্রে বলে, পিতা দেবতাদেরও দেবতা। তাই আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে রাজ্য ঐশ্বর্য, এমনকি সীতাকেও চাই না।"

নহি মে কাঙ্ক্ষিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্।
নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্।

নৈব সর্বানিমান কামান্ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম্॥
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ।
পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্।
তদদ্য নৈবামঘ রাজ্যমব্যয়ং
ন সর্বকামান্ বসুধাং ন মৈথিলীম্।
ন চিন্তিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন
বৃণীয় সত্যং ব্রতমস্তু তে তথা॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/৪৫, ৪৭-৪৮, ৫২, ৫৮)

স্নেহবিহ্বল দশরথ তখন বললেন, "বৎস রাম, আমি তোমাকে সত্যের শপথ করে বলছি, তোমার এই বনবাস আমার অভিপ্রেত নয়। এমন হোক আমি চাইনি। কিন্তু এই কৈকেয়ী, এই গুপ্ত শত্রু, এই ভস্মাচ্ছাদিত কুলাঙ্গার আমাকে বঞ্চনা করেছে। এই কুলনাশিনীর বঞ্চনা থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করতে চাও, আমি তোমাকে নিষেধ করব না। কেবল একটি অনুরোধ, শুধু আজকের দিনটা আমার কাছে থাক। তোমাকে সকল কাম্যবস্তু দিয়ে আমি প্রাণভরে আপ্যায়িত করব।"

কিন্তু রামের মনে আছে, কৈকেয়ী বলেছিল, রাম বনে না-যাওয়া পর্যন্ত দশরথ স্নান আহার করবেন না। শুধু মনে মনে কষ্ট পাবেন। তাই রাম বললেন, "আজ না হয় ওই সব মহার্ঘ বস্তু পেলাম, কিন্তু কাল আমাকে কে দেবে? তাছাড়া আমি জননী কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আজই বনে গমন করব। অতএব আর আমার থাকা চলে না।"

সকলে তখন শেষ চেষ্টা করে কৈকেয়ীকে বোঝাতে লাগল। সুমন্ত্র অনেক করে বললেন। রাজ্যের নগরপ্রধান সিদ্ধার্থ বললেন, "মহারানি, কোন অপরাধে আপনি রামকে নির্বাসন দিতে চান? আমরা তো রামের কোনো দোষ বা কলঙ্ক দেখি না। যদি আপনি তাঁব কোনো দোষ দেখে থাকেন তাহলে সেকথা স্পষ্ট করে বলুন। বিনা প্রমাণে তাঁকে নির্বাসন দিতে পারবেন না। তাহলে অন্যায় হবে। জানবেন, যে সৎ যে নিরপরাধ, তাকে পরিত্যাগ করলে ইন্দ্রেরও মহিমা বিনষ্ট হয়। আপনি রামের অভিষেকে বাধা দেবেন না। এতে আপনার নামে রাজ্যে অপবাদ রটবে।"

ক্লান্ত কণ্ঠে দশরথ বললেন, "পাপিষ্ঠা, সকলের হিতবাক্য শুনছ না? তোমার নিজের মঙ্গলও বুঝতে পারছ না? কুৎসিত তোমার মন। ঘৃণ্য তোমার আচরণ।"

কিন্তু কৈকেয়ী নীরব।

তার মুখে একটি কথাও নেই। সে চোখের সামনে যেন থেকেও নেই। সকলের এত অনুনয় এত ধিক্কার সব যেন একটা অন্ধকার বোবা পাষাণ প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে।

রাম বিলম্ব না করে ভৃত্যদের বললেন, "বনবাসের জন্য আমার বল্কল আর খনিত্র নিয়ে এসো।"

তাড়াতাড়ি কৈকেয়ী নিজেই বল্কল এনে রামের হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, বল্কল এনেছি, পরিধান করো।"

কৈকেয়ীর যেন আর সবুর সইছে না। তবে নতুন করে তার কোনো নীচতাই আর আমাদের বিস্মিত করে না।

রাম লক্ষ্মণ রাজবেশ পরিত্যাগ করে বনবাসের বল্কল পরিধান করলেন।

সীতাও কৈকেয়ীর হাত থেকে নিলেন কুশরজ্জু আর চীরবস্ত্র। কিন্তু সীতা জানেন না কেমন করে ওই চীরবস্ত্র পরিধান করতে হয়। তিনি ওই চীরখণ্ড হাতে নিয়ে চিন্তিত লজ্জিত হয়ে বিব্রত মুখে ভীরু নয়নে তাকিয়ে থাকেন। সংকোচে রামকে অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, "এ কেমন করে পরতে হয়? কথং নু চীরং বধ্নন্তি?"

রাম এগিয়ে এসে সীতার পট্টবস্ত্রের উপরেই চীর বন্ধন করে দিলেন।

তখন হঠাৎ সেই কক্ষে ধ্বনিত হল এক বজ্রকণ্ঠ—

—"না। রাজবংশের মর্যাদা লঙ্ঘন করো না। জনকনন্দিনী ওই চীরবস্ত্র পরিধান করবেন না।"

সবাই সচকিত হয়ে তাকায়।

কুলগুরু বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নিষেধ করছেন।

স্ফুরিত জটা, রোষাগ্নিদৃষ্টি।

—"কুলকলঙ্কিনী দুর্মেধা কৈকেয়ী, তুমি তোমার মর্যাদা লঙ্ঘন করে যাচ্ছ। স্বভাব সৌজন্য হারিয়ে ফেলেছ। সীতা কেন বনে গমন করবেন? পত্নী স্বামীর আত্মাস্বরূপ। অতএব রামের অনুপস্থিতিতে সীতাই সিংহাসনে আরোহণ করবেন। আর যদি তিনি স্বামীর অনুগমন করতে চান, তাহলে অযোধ্যার সকল নরনারী তাঁদের অনুসরণ করবে। ভরত যদি দশরথের পুত্র হয়, তাহলে আমি বলছি, সে কখনও রাজত্ব গ্রহণ করবে না। চীর বল্কল ধারণ করে শত্রুঘ্নের সঙ্গে সেও বনে গমন করবে। অযোধ্যার প্রতিটি পশু পক্ষী প্রাণী রামের সঙ্গে বনে চলে যাবে। এই রাজ্য জনহীন অরণ্যে পরিণত হবে। দুঃশীলা কৈকেয়ী, তখন তুমি একা সেই শ্মশানে বসে রাজত্ব কবো। কিন্তু সীতাকে এই বল্কল পরিধান করিও না। তিনি যদি বনগমন করেন তাহলে সর্বাভরণা দেবীমূর্তিতেই গমন করবেন। তাঁকে উপযুক্ত অলংকার আভরণে সজ্জিত করো। তুমি তো কেবল রামের বনবাস চেয়েছ, তবে কুলবধূ সীতাকে অমর্যাদা করছ কেন?" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৭/২১-৩৪)

বশিষ্ঠের সঙ্গে সকলেই একবাক্যে প্রতিবাদ করে উঠলেন।

আর মুমূর্ষু দশরথ এই শেষবারের মতো বহ্নিতেজে জ্বলে উঠলেন, "কৈকেয়ী, পাপিনী, চীর ধারণ করে সীতা বনে গমন করবেন এমন নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা তো আমি করিনি। আমার প্রতিশ্রুতি অতিক্রম করলে তুমি নরকে যাবে। সীতাকে সর্বাভরণে ভূষিত করো। বাঁশের ফুল ধরলে যেমন সেই বাঁশ দগ্ধ হয়ে যায়, আমার প্রতিজ্ঞাও আজ আমাকে দগ্ধ করে দিল। তন্মা দহেদ বেণুমিবাত্মপুষ্পম্।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৮/৭)

রাম দশরথকে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন। আমার বৃদ্ধ মাতার মনে কোনো সংকীর্ণতা নেই। তিনি কখনও আপনার নিন্দা করেননি। তাঁকে আপনি সসম্মানে রাখবেন। দেখবেন, যেন পুত্রশোকে তিনি প্রাণ না হারান।"

রাজপুরীতে কান্নার রোল উঠল। ক্রন্দনের সেই করুণ স্বরে বাল্মীকি আমাদের স্মরণ

করিয়ে দিলেন, আদিকাণ্ডে নিষাদের হাতে শরাহত সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের শোক—"তাসাং সন্নাদঃ ক্রৌঞ্চীনামিব নিঃস্বনঃ" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/৪০)। বস্তুত রামায়ণের ঘটনার পর্বে অন্তরালে বারবার এমনি করে ভেসে এসেছে ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দন। পরে দশরথের চিতাগ্নি যখন প্রজ্বলিত হল তখন আবার পুরনারীগণের ক্রন্দনে কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন আদিকাণ্ডের সেই ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দন "ক্রৌঞ্চীনামিব নারীণাং নিনাদস্তত্র শুশ্রুবে" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৬/২১)

দশরথ একবার মাত্র "রাম" বলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সুমন্ত্র দ্বারে রথ নিয়ে এলেন।...

ষোলো

সত্য না ধর্ম?

মহাভারতের মূল কথা হল 'ধর্ম'—"যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"। আর রামায়ণ-এর মূল কথা হল 'সত্য'—সত্যই ঈশ্বর। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। সবকিছুর মূলে সত্য।

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৩)

রামচন্দ্র বলছেন, আমি সত্যকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করি—ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্ (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৯)। আমি সত্যকে আশ্রয় করে সত্য পালন করব; এই আমার প্রতিজ্ঞা—সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সময়ীকৃতম্ (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৬)। যদি চন্দ্র থেকে জ্যোৎস্না অপগত হয়, যদি হিমালয় থেকে হিম অপসৃত হয়, যদি সমুদ্র তটভূমি অতিক্রম করে তবুও আমি সত্যকে লঙ্ঘন করব না।"

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমাং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১১২/১৮)

রামচন্দ্র ধর্মের আগে স্থান দেন সত্যকে। যে ধর্মে সত্য নেই তাকে তিনি ধর্ম বলেই মানেন না—"নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি" (উত্তরকাণ্ড, ৫৯/(৩)/(৩৩)। এমনকী রাজধর্মের আদর্শকেও তিনি দেখেছেন, ধর্ম বলে নয়, সনাতন সত্য বলে—"সত্যমেব রাজবৃত্তং সনাতনম্" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১০)

তাহলে সত্য আর ধর্ম কি দুটি পৃথক তত্ত্ব? আমরা কি তবে একটা আদর্শগত বিরোধ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি?

রামায়ণ বলছে, না সত্যই ধর্ম। সত্য ছাড়া ধর্ম নাই। সত্য রক্ষাই ধর্ম রক্ষা। সত্য থেকে বিচ্যুত হলে ধর্মচ্যুতি ঘটল। তাই দশরথ অন্যায় অধর্ম জেনেও নিজের বিবেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সত্যরক্ষার জন্য রামকে বনবাসে পাঠালেন। আর রাম নিজেও এই পরিস্থিতিকে মনে মনে অনুমোদন করেন না, লক্ষ্মণের কাছে বিরলে মনের দুঃখ প্রকাশ করেন, তবু পাছে সত্যভ্রষ্ট হতে হয় এই ভয়ে তিনি বনবাস স্বীকার করে নিলেন। বললেন, "ক্রুদ্ধ হয়ে আমি এখনই সমগ্র অযোধ্যা এমনকী পৃথিবী পর্যন্ত অধিকার করে নিতে পারি, কিন্তু আমার সে বীরত্ব আজ বৃথা।"

একো হ্যহমযোধ্যাঞ্চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ।
তরেয়মিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ননু বীর্যমকারণম্॥
অধর্মভয়ভীতশ্চ পরলোকস্য চানঘ।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৩/২৫-২৬)

কিন্তু সত্য নিরূপণ হবে কোন মানদণ্ডে? কোন নিকষে যাচাই হবে সত্য কি?

রামচন্দ্র বলছেন, সত্য নিরুপণের কোনো স্বতন্ত্র মানদণ্ড নেই। সত্য দিয়েই সত্যের বিচার—"সত্যং সত্যেন্ সময়ীকৃতম্" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৬)। রামচন্দ্রের হাতে যে রাজদণ্ড তা প্রকৃতপক্ষে সত্যের মানদণ্ড। তিনি বলছেন, "সবকিছুর মূলে এই সত্য—সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১২)। সত্য কী তাই দিয়েই বিচার হবে ধর্ম কী?

সত্যের এই স্থির দণ্ড ধরেই রাম তাঁর জীবনে সমস্ত নীতি অনুসরণ করেছেন। সমাজ ও জীবনকে সত্যের কঠোর শাসনে বেঁধে দিতে চেয়েছেন। অকল্যাণ হোক, অমঙ্গল হোক, নিষ্ঠুরতা হোক, সত্য যদি দাবি করে, তাহলে রামের আদর্শ হল তাই করা। সত্যের দাবিতে প্রয়োজনে তিনি নিষ্ঠুর হয়েছেন, সর্বপ্রথম নিজের প্রতি, তারপর পিতা মাতা পত্নী ভ্রাতা এমনকী প্রজার প্রতিও।

শোকার্ত বৃদ্ধ পিতার মর্মন্তুদ আর্তনাদ শোনেননি। কৈকেয়ীর দাবির পিছনে ন্যায় কি অন্যায় বিচার করেননি। তাঁর শোকে পরিণামে দশরথের মৃত্যু হবে জেনেও বিচলিত হননি। কেবল পিতার সত্যরক্ষার জন্য বনবাসী হলেন।

একইভাবে পরপর ঘটল বালীবধ, সীতার পরিত্যাগ, শম্বুক হত্যা এবং লক্ষ্মণ বর্জন। রামের হৃদয় বারেবারে আর্তনাদ করে উঠেছে, তবু তাঁর হাতের সত্যের মানদণ্ড শিথিল হয়নি। নিজের শোকার্ত হৃদয় শাসন করে নিজেই নিজেকে বলেছেন, "সত্য রক্ষায় আমি বজ্রের মতো কঠিন। আমি প্রস্তুত। এষ সজ্জোঽস্মি বজ্রময়ঃ। (ভবভূতি, উত্তররামচরিতম্), "সত্যরক্ষার জন্য স্নেহ মমতা সুখ এমনকী সীতাকে পর্যন্ত যদি ত্যাগ করতে হয় তাতে আমি ব্যথিত হব না।"

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।

(ভবভূতি, উত্তররামচরিতম্, ২/৭)

বাস্তবিকই শেষ পর্যন্ত জীবনে সত্যের এই দাবি রামের কাছে বড় নিষ্ঠুর বড় করুণ হয়ে এল।

একদিন ছদ্মবেশী মহাকাল এক ঋষির রূপ ধরে এলেন রামের কাছে। তিনি গোপনে কিছু কথা বলবেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, আর কেউ সেখানে থাকবে না। কেউ যদি সেখানে আসে বা তাঁদের কথা শোনে, তাহলে তাকে বধ করতে হবে।

রাম সম্মত হলেন।

লক্ষ্মণকে বললেন, "তুমি নিজে দ্বারে পাহারা দাও। দেখো, কেউ যেন না আসে। এলে তার প্রাণদণ্ড হবে।"

লক্ষ্মণ দ্বারে পাহারা দিচ্ছেন।...

রাম ভিতরে ঋষির সঙ্গে কথা বলছেন।...

এমন সময় হঠাৎ সেখানে দুর্বাসা এসে উপস্থিত।

—"লক্ষ্মণ, আমাকে শীঘ্র রামের কাছে নিয়ে চল!" দুর্বাসা ব্যস্ত হয়ে বলেন।

—"ভগবন্, রাম এখন ব্যস্ত আছেন। কী করতে হবে আমাকে বলুন। অথবা আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" লক্ষ্মণ বলেন।

দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে অস্থির কণ্ঠে বলেন, "এই মুহূর্তে রামকে আমার সংবাদ দাও। নইলে আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারব না। যদি আর বিলম্ব করো, অভিশাপ দেব। আমার অভিশাপে তোমাদের রাজ্য তোমরা সকলে সবংশে ভস্ম হয়ে যাবে।"

লক্ষ্মণ দেখলেন মহাবিপদ।

ওদিকে রামের প্রতিজ্ঞা, ভিতরে কেউ প্রবেশ করলে তার প্রাণদণ্ড। আবার এদিকে দুর্বাসার অভিশাপ। লক্ষ্মণ ভাবলেন, বরং সকলের বিনাশ না হয়ে আমার মৃত্যু হোক।

লক্ষ্মণ গিয়ে রামকে সংবাদ দিলেন।

লক্ষ্মণকে প্রবেশ করতে দেখে রাম চমকে উঠলেন। মহাকালের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তাঁর অন্তর হাহাকার করে উঠল। দুঃখে সন্তাপে বিহুল হয়ে পড়লেন। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো রামের মুখখানি করুণ এবং ম্লান হয়ে উঠল। তিনি শোকে মাথা নিচু করে রইলেন। কথা বলতে পারলেন না।

দুঃখেন চ সুসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা তদ্‌ঘোরদর্শনম্।
অবাঙ্‌মুখো দীনমনা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥

(উত্তরকাণ্ড, ১০৫/১৭)

এ কি কঠোর পরীক্ষা!

রামকে হয় সত্যভ্রষ্ট হতে হবে, না হয় লক্ষ্মণকে বধ করতে হবে।

মহাকাল রামের শেষ জীবনে সত্যের শেষ প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত।

কী করবেন রাম?

রাম নির্বাক পাথরের মতো বসে আছেন।

ভ্রাতৃহন্তা হবেন? না কি মিথ্যাবাদী হবেন?

লক্ষ্মণ কাতর কণ্ঠে মিনতি করছেন, "রাঘব, আমাকে যদি ভালবাসেন, আমি যদি আপনার স্নেহের পাত্র হই, তাহলে নিঃসংকোচে আমাকে বধ করে সত্য রক্ষা করুন। জহি মাং নির্বিশঙ্কস্ত্বং ধর্মং বর্ধয় রাঘব।" (উত্তরকাণ্ড ১০৬/৪)

শুনে রাম আরও বিচলিত হয়ে পড়লেন।

মন্ত্রী অমাত্যদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন, "আপনারা বলুন, আমি কী করব?"

সবাই চুপ করে রইলেন। কেউ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। মন্ত্রিণঃ সর্বে সমাসত।

তখন গুরু বশিষ্ঠ রামকে বললেন, "বৎস, এমন হবে আমি জানতাম। তুমি সত্য রক্ষা কর। লক্ষ্মণকে ত্যাগ কর। সাধুগণের কাছে ত্যাগ করা আর বধ করা দুইই সমান।"

স্নেহাকুল কণ্ঠে রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন, "সৌমিত্র, ধর্মের বিপর্যয় হতে দেব না। তোমাকে আমি ত্যাগ করলাম। বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্যয়ঃ।" (উত্তরকাণ্ড, ১০৬/১৩)

সত্য কি এই জ্বলন্ত প্রশ্ন যেমন নিষ্ঠুর ভাবে রামের সামনে উপস্থিত হয়েছিল, ঠিক একই প্রশ্ন নিদারুণ সংকট নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল মহাভারতে অর্জুনের সামনে।

অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কেউ যদি তাঁর গাণ্ডীবকে অসম্মান করে তাহলে তাকে বধ করবেন। ঘটনাচক্রে এমন হল, একদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত ও আহত হয়ে যুধিষ্ঠির ক্ষোভে অভিমানে অর্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্কার দিলেন।

অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা অনুসারে খড়্গ তুলে যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত হলেন।

ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

—"একি? তুমি খড়্গ হাতে নিয়েছ কেন? কিমিদং পার্থ গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত?"

—"আমি রাজাকে বধ করব। বধিষ্যামি রাজানং।"

অর্জুনের সামনেও ওই একই সংকট। হয় প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে সত্যভ্রষ্ট হতে হবে, না হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে হবে। অর্জুন রামচন্দ্রেরই মতো সত্য রক্ষায় উদ্যত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কঠোর ভাবে ভর্ৎসনা করলেন অর্জুনকে, "তোমাকে ধিক্, তুমি নরাধম। তুমি মূর্খের মতো কাজ করতে যাচ্ছ। যে ধর্মবিভাগ জানে, সে কখনো এমন কাজ করতে পারে না।"

এই বলে তিনি অর্জুনকে শোনালেন কৌশিক মুনির গল্প। এক নদীর ধারে থাকেন কৌশিক মুনি। সর্বদা সত্য কথা বলেন। একদিন একদল ডাকাত কিছু লোককে তাড়া করে। লোকগুলো প্রাণভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। ডাকাতদল এসে কৌশিক মুনিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি সত্যবাদী, সত্য করে বলুন, ওরা কোথায় পালিয়েছে?"

কৌশিক মুনি বললেন, "ওরা ওই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে।"

তখন ডাকাতরা গিয়ে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে তাদের মেরে ফেলল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "এই কৌশিক ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানেন না। তাঁর এই সত্য কথা এখানে ঘোর পাপ সৃষ্টি করেছে।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলতে চান, সত্যকে কেবল তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করা চলে না। যত বড় সত্য হোক, আসলে অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তা আপেক্ষিক। প্রাসঙ্গিক সেই সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে, সত্য আর সত্য থাকে না। তা হয়ে পড়ে মতবাদের গোঁড়ামি, বুদ্ধির ফাঁস। কী সত্য আর কী সত্য নয় তা চিনে নেওয়া বড় কঠিন—"তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্" (মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯/৩১)।

সত্যকে দেখতে হবে, তাকে অসত্য থেকে পৃথক করতে হবে, একটা বৃহত্তর পরিদৃষ্টিতে, কল্যাণের মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ ধর্মের দিক্ থেকে।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বললেন, "তুমি কবে অবোধ বালকের মতো কি পরিস্থিতিতে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সেই অনুসারে আজ নিতান্ত মূর্খের মতো ধর্মের নামে অধর্ম করতে চলেছ।"

ত্বয়া চৈবং ব্রতং পার্থ বালনেব কৃতং পুরা।
তস্মাদধর্মসংযুক্তং মৌর্খ্যাৎ কর্ম ব্যবস্যসি॥

(মহাভারত কর্ণপর্ব ৬৯/২৭)

শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য, সত্যের জন্য সত্য বড় নয়; মিথ্যার জন্যও মিথ্যা হেয় বা নিন্দনীয় নয়;

সত্য হোক আর মিথ্যা হোক তার বিচার হবে ধর্ম দিয়ে। যা ধর্ম তাই সত্য। ধর্মই সত্যের মানদণ্ড—যতো ধর্মস্ততঃ সত্যম্" (মহাভারত শান্তিপর্ব, ১৯৯/৭০)।

মনে হতে পারে শ্রীকৃষ্ণ বুঝি রামচন্দ্রের মতো সত্যকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সত্যের উপরে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করছেন না।

রামচন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য বনবাসী হলেন। কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তির দাবিটা যে সত্যের নামে একটা কপট ছলনা একথা বুঝেও রাম সেই সত্যকেই স্বীকার করে নিলেন।

যুধিষ্ঠিরও পণরক্ষার জন্য বনবাসী হলেন। শকুনির জুয়া খেলা যে একটা জুয়াচুরি একথা জেনেও তিনি রামের মতোই ওই কপট-সত্যকে স্বীকার করে নিলেন।

রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দুজনেরই সত্যের আদর্শ এখানে এক।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যকে মানেন না। তিনি কাম্যক বনে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রথমেই বললেন, "আমি সেদিন দ্যূতসভায় উপস্থিত থাকলে ধর্মের নামে এমন অধর্ম হতে দিতাম না। প্রথমে সকলকে বুঝাবার চেষ্টা করতাম। যদি তারা না শুনত, বলপূর্বক তাদের নিগ্রহ করতাম। বাধা দিতে এলে সমস্ত সভাসদদের আমি বধ করতাম।" (মহাভারত, বনপর্ব, ১৩/১০-১৩)

দেখা যাচ্ছে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত। এক পক্ষ বলছেন, যেমনই হোক সত্যকে মানতে হবে। অপরপক্ষ বলছেন, সত্যের নাম করে যদি অধর্ম ঘটতে যায় তাহলে সেই সত্যকে মানব না।

ধর্ম আর সত্য যেন দুই বিরোধী শিবির হয়ে উঠেছে।

সত্য আর মিথ্যার মধ্যে যে ভেদরেখা সেটি বুঝি শ্রীকৃষ্ণ মুছে দিতে চান। বিশেষ করে যখন তিনি বলেন, "সত্য অনেক সময় মিথ্যা হয়ে যায়; মিথ্যা হয়ে ওঠে সত্য। তত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপানৃতং ভবেৎ।" (মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯/৩৪)

কথাটা শুনে আমরা আঁতকে উঠি না কি?

তারপর তিনি যখন আরও বলেন, "যদি দেখ, সত্য কথা বললে, অমঙ্গল হবে তাহলে চুপ করে থাকবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সত্য না বলে বরং মিথ্যা বলবে। অসত্যকেই এখানে সত্য বলে জানবে। শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্।" (মহাভারত, কর্ণপর্ব ৬৯/৬০)

শুনে আর যেন আমাদের ধৈর্য থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল সত্য-মিথ্যার পার্থক্য লোপ করে দিতে চাইছেন তাই নয়, উলটে তিনি আমাদের মিথ্যা কথা বলতে উৎসাহিত করছেন। বস্তুত তিনি যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে মিথ্যা কথাই বলিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ সত্যবাদী কৌশিক নয়, মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির।

শ্রীকৃষ্ণ কি তাহলে সত্যকে খর্ব করেছেন? সত্যের মূল্যবোধের মধ্যে কি তিনি ব্যভিচার নিয়ে আসছেন? শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে মহাভারতে ভূরিশ্রবা এই অভিযোগই এনেছিলেন।

আসলে তিনি সত্যকে খর্ব করছেন না। সত্যকে বর্জনও করছেন না। তিনি নিজেই বলছেন, "সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। ন সত্যাদ বিদ্যতে পরম্।" (মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯/৩১)

সত্য নিয়ে প্রশ্ন নয়, এখানে সমস্যা হল কাকে বলব সত্য? সত্যকে তিনি একটা মাত্রা দিয়ে গ্রহণ করছেন। সত্যের সেই মাত্রা হল ধর্ম।

যা ধর্ম তাই সত্য। অথচ রামচন্দ্র বলছেন ঠিক উলটো, যা সত্য তাই ধর্ম।

তাহলে ধর্ম কী?

রামচন্দ্র বলছেন, "ধর্ম বড় দুর্জ্ঞেয়। ধর্মকে জানা বড় কঠিন। সর্বভূতের হৃদিস্থিত অন্তরাত্মাই কেবল জানেন ধর্ম কি?"

সূক্ষ্ম পরমদুর্জ্ঞেয় সতাং ধর্মঃ প্লবঙ্গম।
হৃদিস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/১৫)

যুধিষ্ঠিরও প্রায় একই কথা বলছেন, "ধর্ম কি তা বুঝি আর না বুঝি, শুধু এইটুকু জানি, ধর্ম ক্ষুরের ধারের চেয়েও সূক্ষ্ম, আবার পর্বতের চেয়েও গরীয়ান্।"

বেদ্মি চৈবং ন বা বিদ্ম শক্যং বা বেদিতুং ন বা।
অণীয়ান্ ক্ষুরধারায়া গরীয়ানপি পর্বতাৎ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৬০/১২)

সাপের পদচিহ্নের মতোই ধর্মেই গতিপথ অদৃশ্য—"অহেরিব হি ধর্মস্য পদং" (মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৩২/২০)। গভীর জলে মাছের অদৃশ্য গতির মতো ধর্মের গতি অদৃশ্য—"ধর্মস্য গতিরন্বেষা মৎস্যস্য" (হরিবংশ, বিষ্ণু পর্ব, ২৩/১৩)।

আবার ধর্মের মতো সত্যও দুর্জ্ঞেয়। সত্যের মুখ সোনার আবরণে ঢাকা—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।

(ঈশ উপনিষদ/১৫, বৃহদারণ্যক, উপনিষদ্ ৫/১৫/১)

শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দর বলেছেন "Truth hidden by lesser truth." (*On the Veda*, 1956, p. 559)

অতএব ধর্ম ও সত্যের এই দুই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের মধ্যে মাত্রা যোজনা হবে কেমন করে? রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের এই দুই আপাত বিপ্রতীপ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

যুগে যুগে ধর্মের ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে। সত্যেরও ক্ষয় বৃদ্ধি আছে। উভয়ের মধ্যে গরিষ্ঠ কোনো সাধারণ গুণনীয়ক আছে কি? কোন মাত্রায় কোন অনুপাতে জীবনে ধর্ম ও সত্য বিভাজ্য?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবতের সমাধান সূত্রটি ধরে আমরা বুঝতে পারি, রামচন্দ্র যা বলেছেন তা যেমন সত্য, আবার শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন তাও সত্য। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো মৌলিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। আদর্শের কোনো পার্থক্য নেই। প্রভেদ কেবল প্রয়োগে বা উপযোগে।

ভাগবতে বলা হয়েছে, ধর্ম চতুষ্পাদ। তপস্যা, শুচিতা, দয়া এবং সত্য এই চারটি পদ আশ্রয় করে ধর্ম, চার যুগে বিচরণ করেন। কিন্তু যুগে যুগে ধর্মের এক-এক পদ ক্ষয় হয়ে যায়। সত্য যুগ থেকে ত্রেতা যুগে এসে ধর্মের একটি পদ—তপস্যা—লোপ পেয়ে যায়।

থাকে শুধু শুচিতা, দয়া আর সত্য। দ্বাপর যুগে আরও একটি পদ চলে যায়। তখন থাকে দয়া এবং সত্য। শেষে কলিযুগে এসে ধর্ম শুধু একপদ। ধর্ম দাঁড়িয়ে থাকেন কেবল সত্যের উপরে।

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ।
অধর্মাংশৈস্ত্রয়ো ভগ্নাঃ স্ময়-সঙ্গ-মদৈস্তব॥
ইদানীং ধর্মো পাদস্তে সত্যং নির্বর্তয়েদ্‌যতঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১/১৭/২৪-২৫)

ধর্ম থেকে এই যে একে-একে তপস্যা-শুচিতা-দয়া চলে যায় তাব কারণ মানুষের মধ্যে ক্রমে ক্রমে জেগে ওঠে ফলাফল প্রত্যাশা, বিষয় বাসনা, গর্ব ও অহংকার। তবু শেষ পর্যন্ত সত্য টিকে থাকে। সত্যের এই শেষ দেওয়ালে পিঠ রেখেই মানুষকে জীবনে সংগ্রাম করে ধর্মকে পূর্ণায়ত্ত করতে হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "কলিযুগে সত্যই তপস্যা।"

ধর্মের সব চলে গেলেও সত্য থাকে। সত্যই ধর্মের গরিষ্ঠ গুণনীয়ক। ধর্ম সত্যের মাত্রা। সত্য ধর্মের দ্যোতক। ধর্ম সত্যের বোধক। ধর্মের ছন্দে মাত্রায় সত্য ক্রিয়াশীল স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু রামচন্দ্র এই সত্যকে দেখছেন কেবল একটা স্থির দৃষ্টিতে। তাঁর কাছে সত্য নিশ্চল স্থাণু, পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ একটি মূল্যবোধ। সব কিছুর ক্ষয় আছে, হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কিন্তু রামের কাছে সত্য অক্ষয় অনাদি অনন্ত।

রামচন্দ্রের মতো শ্রীকৃষ্ণও একথা মানেন। রামায়ণ ও মহাভারত এক বাক্যে একই ভাষায় স্বীকার করছে, "সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১০ এবং মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪/৩৭)। কেননা সত্যই জগৎকে ধরে রেখেছে, "সত্যেনোত্তভিতা ভূমি" (ঋগ্বেদ, ১০/৮৫/১)।

কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে সত্য একটি আদর্শ বা ideal; শ্রীকৃষ্ণের কাছে সত্য ব্যবহারিক বা practical। সত্য হল সৃষ্টির মধ্যে ক্রিয়াশীল এক অনন্ত শক্তি—ঋতম্‌ বৃহৎ—সত্য গভীর অথচ চঞ্চল, শ্রীকৃষ্ণের নয়নের দৃষ্টির মতোই।

সৃষ্টির নানা স্তর, ভুবনের পর ভুবন, লোকের পর লোক, স্তরের পর স্তরে সত্যের গুণ ও মাত্রা, শক্তি ও ব্যাপ্তি বেড়ে চলে। এক স্তরে এক লোকে যে সত্য, অন্য স্তরে গিয়ে তা আর সেরকম থাকে না। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বৃহত্তর সত্যেব প্রকাশ হলে তা বিপর্যয় নিয়ে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢোকার মতো। সব তছনছ করে দেয়। "এমন অনেক সত্য আছে" শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "আনাড়ীর হাতে তা মারাত্মক অস্ত্রের মত।" There are many profound truths which are like weapons dangerous to the unpractised wielder." (*Thoughts and Aphorism* 1968, P. 140)

তাই পরম সত্যকে লাভ করতে হলে সত্যের এক ধামে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলে না। এক একটি ধাম অতিক্রম করে চলতে হয়—ক্ষুদ্র সত্য থেকে বৃহৎ সত্যে, অল্প থেকে ভূমায়। বেদের বরুণ দেবতা যেমন তাঁর আলোকের পদভারে সত্যের ভুবন সব দলিত করে উর্ধ্বে আরোহণ করে চলেন—স্বর্গ থেকে মহত্তম স্বর্গে। সত্যের যত মায়া (মায়া অর্চিনা) সব লঙঘন

করে চলে যান তিনি—"সমায়াঅর্চিনাপদাস্তৃণান্নাকমারুহন্নভস্তামন্যকেসমে" (ঋগ্বেদ ৮/৪১/৮)। বরুণ হলেন সত্যের সেই গুপ্ত সমুদ্র—"স সমুদ্রো অপীচ্যস্তরো দ্যামিব"।

সত্য আর অনৃত আলো-আঁধারে মেশা মধুময়ী দীপ্তিময়ী শুচিস্মিতা সেই ঋত-সমুদ্র; দুয়ের মাঝে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন বরুণ দেবতা—

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে
সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জানানাম্
মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা
আপো দেবীবিহ মামবন্তু ॥

(ঋগ্বেদ, ৭/৪৯/৩)

শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দর করে বলেছেন, "Two unknown infinities infinite potential zero and infinite plenary x" (*On the Veda*, 1956, p. 558)

শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন শুধু সত্যের *infinite x*-কে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে দেখছেন *infinite x* এবং *zero*-কে।

শ্রীকৃষ্ণের কথা হল, সত্যকে পেতে হলে বারবার সত্যকেই অতিক্রম করে যেতে হয়। কিন্তু রাম তা যাননি। তিনি লোক-সত্য, প্রচলিত সামাজিক লৌকিক সত্যকে মর্যাদা দিয়েছেন। তাকে লঙঘন করেননি। করতে চানওনি। তিনি লোকমর্যাদাকে রক্ষা করেছেন। ত্রেতা যুগের সর্বোত্তম সীমা তিনি, মর্যাদা তিনি, রামচন্দ্রকে বলা হয় মর্যাদাপুরুষোত্তম। তাই হনুমান রামচন্দ্র সম্বন্ধে বলছেন, মর্যাদানাং চ লোকস্য কর্তা স্থাপয়িতা বিভুঃ (সুন্দরকাণ্ড, ২৯/১১)।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জনার্দন। তিনি জনমতকে মর্দন করে চলে যান। শুধু প্রচলিত সত্য-মিথ্যাই নয়, ক্ষুদ্র সত্য থেকে বৃহৎ সত্যে, একের পর এক পার হয়ে যান। কোথাও আবদ্ধ হন। সত্যের এই মুক্তদৃষ্টি নিয়ে তিনি দ্বাপর ও কলিযুগের সর্বাধুনিক পুরুষ। রামচন্দ্র যুগাবতার। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।

সতেরো

পিছনে শোক, সম্মুখে শান্তি

রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে সুমন্ত্রেব রথ ছুটে চলেছে।...

রাজপথের দুই পাশে কাতারে কাতাবে উদ্‌বেল জনতা।...

পুরনারীগণেব উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন, পুরবাসীদের ব্যাকুল বিলাপ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নীরব অশ্রুপাত। শোকে দুঃখে অশ্রুতে আকুল।

জনতার ভিতর থেকে বাববার কাতর মিনতি আসছে, ''সুমন্ত্র, আস্তে আস্তে রথ চালাও। বামের মুখখানি একবার দেখতে দাও।''

সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যামি বামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০/২২)

রথের পিছনে এবং দুই পাশে জনতার প্রবল চাপ এসে পড়ছে। রথ আর চলতে পারছে না। সারথি সুমন্ত্র অসহায় বোধ করছেন।...

এমন সময় রাম পিছনে তাকিয়ে দেখেন শোকার্ত দশরথ জনতার ভিড় ঠেলে পাগলের মতো ছুটে আসছেন। তাঁর পিছনে ধৃতবৎসা ধেনুর মতো ক্রন্দন করতে করতে আসছেন কৌশল্যা। শিথিল দেহে দুই হাত প্রসারিত করে দশরথ বলছেন, ''সুমন্ত্র, রথ থামাও।''

এই করুণ দৃশ্য দেখে রাম আর সইতে পারলেন না, অস্থির কণ্ঠে বললেন, ''সুমন্ত্র শীঘ্র চল। জোরে রথ চালাও। শীঘ্রং যাহীতি সারথিম্।''

রথ তখন দ্রুতবেগে ছুটে চলল।...

দশরথ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। অবসন্ন হয়ে পথের ধূলায় বসে পড়লেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, ওই যে রামের রথ ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ দেখা যায় তিনি তাকিয়ে রইলেন। ক্রমে চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। আর দেখা গেল না।...

মন্ত্রী অমাত্যরা কাছে এসে দাঁড়ালেন। ব্যথিত হৃদয়ে তাঁরা রাজাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

কৌশল্যার হাত ধরে দীর্ণ হৃদয়ে দশরথ ঘরে ফিরছেন, স্নানান্তে শ্মশান প্রত্যাগত শবদাহকারীর মতো—''অপস্নাত ইবাবিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্''।

এমন সময় কৈকেয়ী দশবথের পাশে এসে দাঁড়াল। তাঁকে দেখেই দশরথ বলে উঠলেন, ''না, আমাকে স্পর্শ করো না। তোমার স্পর্শে পাপ। তুমি আর আমার ভার্যা নও। কেউ নও তোমার মুখ দেখতে চাই না। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মকে ত্যাগ ক

তুমি কেবল নিজের স্বার্থটুকু দেখেছ। তুমি ধর্মত্যাগী। তাই তোমাকে ত্যাগ করলাম। একদিন অগ্নি প্রদক্ষিণ করে মন্ত্র উচ্চারণ করে তোমার পাণি গ্রহণ করেছিলাম, আজ তোমার সঙ্গে ইহলোকের পরলোকের সকল সম্পর্ক আমি ত্যাগ করলাম। আর ভরত যদি রাজত্ব পেয়ে সন্তুষ্ট হয় তাহলে সেও যেন আমার শ্রাদ্ধ না করে। আমার আত্মা তার দানপিণ্ড গ্রহণ করবে না।"

কৈকেয়ী মামকাঙ্গানি মা স্প্রাক্ষীঃ পাপনিশ্চয়ে।
নহি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্যা ন চ বান্ধবী॥
কেবলার্থপরাং হি ত্বাং ত্যক্তধর্মাং ত্যজাম্যহম্।।
অগৃহ্ণাং যচ্চ তে পাণিমগ্নিং পর্যনয়ঞ্চ যৎ॥
অনুজানামি তৎ সর্বমস্মিংল্লোকে পরত্র চ॥
ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ রাজ্যং প্রাপ্যৈতদব্যয়ম্।
যন্মে স দদ্যাৎ পিত্রর্থং মা মাং তদ্দত্তমাগমৎ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৪২/৬-৯)

আমাদের, আধুনিকদের একটা ধারণা আছে যে, স্ত্রৈণ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মোহে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। রূপসী কৈকেয়ীকে প্রত্যাখ্যান করা বা ত্যাগ করার সাধ্য তাঁর ছিল না।

কিন্তু রামায়ণের ঘটনা অন্য সাক্ষ্য দেয়। দশরথ অসহায় হয়ে পড়েছিলেন স্ত্রৈণতার দোষে নয়, সত্য ও ধর্মের যে আদর্শ তাঁরা বিশ্বাস করতেন সেই ন্যায় নীতির অনুশাসনে নিরুপায় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কৈকেয়ীকে নিঃশর্ত বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অতএব প্রাণ দিয়েও সেই সত্য রক্ষা করতে হবে। দশরথ তাই করলেন। যে মুহূর্তে তিনি সত্যপাশ থেকে মুক্ত হলেন সেই মুহূর্তেই তিনি কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করলেন। বস্তুত কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার প্রথম রাত্রেই দশরথ তাকে ত্যাগ করেছিলেন। যা বলেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন আবার—"যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়াধৃতঃ। সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৪/১৪)

কণ্ঠস্বর কি তীব্র কি ভীষণ! অন্তরাত্মার গভীর থেকে যেন বজ্রপাত। কোনো কামুকের কোনো স্ত্রৈণের কণ্ঠে এমন ওজস্বান অগ্নির স্ফুরণ হয় না।

যদিও শোনা যায় দশরথের নাকি কয়েক শত ভার্যা ছিল। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৪ এবং ৩৯ সর্গের দুটি শ্লোক অনুসারে এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব শ্লোক দুটি আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখতে চাই।

বনগমনের আগে রাম লক্ষ্মণ সীতা দশরথের কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। সুমন্ত্র গিয়ে রাজাকে সংবাদ দিলেন। দশরথ বললেন, "সুমন্ত্র, আমার যেসব দারাবৃন্দ আছেন, তাঁদের এখানে ডেকে নিয়ে এসো। আমি দারা-পরিবৃত হয়ে রামকে দেখতে চাই।"

সুমন্ত্র গিয়ে অন্তঃপুরে সংবাদ দিলেন।

তখন "অর্ধসপ্তশতা" (অর্থাৎ সাড়ে-তিন শত) ধৃতব্রতা প্রমদা (রামের জন রোদন করে করে) আরক্তচক্ষু হয়ে কৌশল্যাকে বেষ্টন করে এসে উপস্থিত হলেন।

অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমাদাস্তাম্রলোচনাঃ
কৌশল্যাং পরিবার্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/১৩)

ওই সাড়ে তিন শত প্রমদাগণের মধ্যে কৈকেয়ী ছিল না। অতএব কৈকেয়ী ও কৌশল্যাকে ধরে হিসাব করলে দাঁড়ায় মোট তিন শত বাহান্ন জন দশরথের স্ত্রী। এই হিসাবটা আবার ঠিক ঠিক মিলে যায় ৩৯ সর্গে একটি শ্লোকে, সেখানে রামচন্দ্র কৌশল্যাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন, সময়োচিত কিছু নীতিবাক্য বললেন, তারপর সেখানে উপস্থিত "ত্রয়ঃ শতশতার্ধা (অর্থাৎ সাড়ে তিন শত) মাতৃগণকে দর্শন করলেন।

ত্রয়ঃ শতশতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/৩৬)

কিন্তু রামায়ণে সর্বত্র আমরা দেখি দশরথের মহিষী হিসাবে কেবল কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর নাম। তাহলে অন্তঃপুরেব এই শত শত রমণী এঁরা কারা? এঁরাও কি দশরথের বিবাহিত পত্নী? তাঁর সহধর্মিণী? তাহলে দশরথের অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞে এঁরা অংশগ্রহণ করলেন না কেন? কেবল ধর্মপত্নী কৌশল্যাই প্রধান মহিষী হিসাবে যজ্ঞের অশ্বকে মেধ্য করলেন। আর সেখানে কেবল "ভার্যাসু তিসৃষু" বলে তিন পত্নীর উল্লেখ দেখি। ওই শত শত রমণী তখন কোথায় ছিলেন? তাঁরা যজ্ঞে উপস্থিত থাকলেন না কেন?

তাছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রসাদী চরু পত্নীদের মধ্যে বন্টন করবার সময় দশরথ কেবল কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে দিলেন কেন? এঁদের দিলেন না কেন? পত্নী হলে তো যজ্ঞের প্রসাদের অধিকার এঁদেরও ছিল?

আরও কথা হল, রামায়ণে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে আহুত দেবগণ বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, "হে বিষ্ণো! দশরথের হ্রী-শ্রী কীর্তি-স্বরূপা তিনটি পত্নীর গর্ভে আপনি চারি ভাগে বিভক্ত হয়ে পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।"

অস্য ভার্যাসু তিসৃষু হ্রী-শ্রী কীর্ত্যুপমাসু চ।
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃতাত্মানং চতুর্বিধম্॥

(আদিকাণ্ড, ১৫/২০-২১)

অতএব দেখা যাচ্ছে দশরথের কেবল তিনজনই পত্নী ছিলেন।

অন্তঃপুরে এই যে শত শত রমণী এঁরা আসলে হয়তো রাজা দশরথের অনুগৃহীতা পুরবালা প্রমদাবৃন্দ। সেকালে রাজমহলে বহুশত বরস্ত্রী রাখা হত। এইসব ললনা অঙ্গনাবৃন্দ রাজমহিষীদের সখী সহচরী প্রিয়া কান্তারূপে অন্তঃপুরের শোভা বর্ধন করতেন। সম্মানে সম্ভ্রমে তাঁরা প্রায় রানিদের প্রতীপদর্শিনী। এইসব বরনারীবৃন্দের অনেকেই হয়তো রাজার অন্তঃপুরিকা বান্ধবীর মতো নর্মসহচরী ছিলেন। দশরথের একটি কথায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। তিনি কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করে বলছেন, "তোমার মুখ দেখতে চাই না। তুমি আর আমার স্ত্রী নও, বান্ধবীও নও—ন ভার্যা ন চ বান্ধবী" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪২/৬)

কিন্তু এঁরা যদি দশরথের স্ত্রী না হবেন তাহলে রাম এঁদের মাতৃবৎ দেখেছেন কেন? নিজের মায়ের মতোই এঁদের সম্মান এবং প্রণাম করেন কেন?

তার উত্তরে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ঋষি পত্নী অনসূয়াকে সীতা যা বলেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। সীতা বলছেন, "মহারাজ দশরথ একবার মাত্র যে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন (অর্থাৎ অনুরাগের চোখে দেখেছেন), ধর্মজ্ঞ পিতৃবৎসল রাম মনে কোনও অভিমান না রেখে সেই রমণীকে মাতৃবৎ মনে করেন।"

সকৃদ্ দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ।
মাতৃবদ্ বর্তনে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্মবৎ।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/৬)

এখন, যে দুটি শ্লোকের তথ্য নির্ভর করে আমরা ধারণা করে আসছি দশরথের শত শত পত্নী ছিল, সেখানেও কিন্তু সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাঁদের সম্পর্কে কেবল বলা হয়েছে "প্রমদাঃ" (২/৩৪/১৩) "মাতরঃ" (২/৩৯/৩৬)। —তাঁরা কৌশল্যাকে ঘিরে সান্ত্বনা দিতে দিতে আসছেন "কৌশল্যাং পরিবার্যাথ (২/৩৪/১৩)। তাঁরা দশরথের অনুগৃহীতা অন্তঃপুরের বরাঙ্গনাবৃন্দ এবং তাই রামচন্দ্র তাঁদের মাতৃবৎ মনে করেন—"মাতৃবৎবর্ততে" (২/১১৮/৬)।

সুমন্ত্র তাঁদের সকলকে রাজার আজ্ঞায় অন্তঃপুর থেকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন—"স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাজ্ঞয়া" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/১২)—এখানে স্ত্রী শব্দের বহুবচন দেখে আমরা যদি ধারণা করি দশরথের শত শত স্ত্রী ছিল তাহলে ভুল করা হবে। "স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ" বলতে সাধারণ অর্থে রমণীগণই বুঝতে হবে। যেমন, মন্থরা কৈকেয়ীকে বলছে,

হৃষ্টা খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৮/১২)

এখানে "রামস্য স্ত্রিয়ঃ" শব্দের বহুবচন দেখে আমরা যদি ধারণা করি রামচন্দ্রের বহু স্ত্রী ছিল, তাহলে ভুল হবে। অথচ বাচ্যার্থ কিন্তু তাই। টীকাকার রামায়ণ শিরোমণি বলছেন, এখানে সীতার আদরণীয় অর্থে বহুবচন করা হয়েছে—"সীতাবহুত্বমাদরার্থম্"। বিখ্যাত টীকাকার তিলকও বলছেন, সীতা ও সীতার সখীগণ এই অর্থেই বহুবচনে "স্ত্রিয়ঃ" শব্দ ব্যবহার হয়েছে—"বহুবচনেন সীতা সখ্যঃ" (তিলক টীকা দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ মন্থরা বলতে চায়, রাম যদি রাজা হয় তাহলে সীতা ও তার সখীদেরই আনন্দ।

মনে হয় দশরথের শত শত পত্নীত্বের অপবাদটা আসলে রামায়ণ পাঠে আমাদের অজ্ঞানতা এবং ভুল অর্থবোধের উপর গড়ে উঠেছে। ব্যাকরণের ভূত এমনি করে অনেক সময় অর্থবোধে বিপত্তি ঘটায়।...

যাই হোক, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে দশরথ কৌশল্যার কক্ষে এসে মৃতের মতো শয্যা গ্রহণ করলেন।

তাঁর দুই চোখে আঁধার। বুঝি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। শূন্য বাতাসে অন্ধের মতো কম্পিত হাতখানি তুলে বললেন, "কৌশল্যা, আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমার গায়ে হাত দাও।"

এদিকে রামের রথ ছুটে চলেছে।...

রথের পিছনে পিছনে চলেছে সমস্ত অযোধ্যাবাসীর এক বিপুল জনতা। থেকে থেকে তারা সমস্বরে ধ্বনি দিচ্ছে, "রামচন্দ্র, অযোধ্যায় ফিরে আসুন। ফিরে আসুন। অযোধ্যানিলয়ানাং...নিলয়ানাং..."

রাম সুমন্ত্রকে রথ থামাতে বললেন।

ক্ষুব্ধ প্রজারা যদি এমন করে তাঁর সঙ্গে রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে যায় তাহলে রাজ্যের অকল্যাণ হবে, এই ভেবে রথ থেকে নেমে রাম জনতার দিকে এগিয়ে গেলেন।

অশান্ত জনতা জয়ধ্বনি করে রামকে ঘিরে দাঁড়াল।

রাম তখন সস্নেহ গম্ভীর কণ্ঠে হাত তুলে বললেন, "আমার প্রিয় অযোধ্যাবাসীগণ, আমি অনুরোধ করি, আপনারা আমাকে যেমন ভালবাসেন, তার চেয়েও বেশি ভালবাসবেন ভরতকে। আপনাদের কাছে এই আমার দাবি। ভরত বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় সে প্রবীণ। রাজোচিত সকল গুণ তার আছে। বলতে গেলে সে আমার চেয়েও অধিক গুণের অধিকারী (অপি চাপি ময়া শিষ্টৈঃ)। ভরত যুবরাজ হবার যোগ্য। সে বীর, সে হৃদয়বান। আমি বিশ্বাস করি, যথাযোগ্য মর্যাদায় সে আপনাদের প্রতিপালন করবে। আমার প্রতি যদি আপনারা প্রীতি প্রদর্শন করতে চান, তাহলে আমার অনুরোধ, আপনারা সকলে অযোধ্যায় ফিরে যান। আপনারা দেখবেন, মহারাজ দশরথ যেন সন্তপ্ত না হন।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৫/৬-১০)

অযোধ্যাবাসীদের কাছে রামের এই বিদায় ভাষণ অত্যন্ত সময়োচিত এবং রামচন্দ্রের প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ভরত সম্পর্কে তিনি এমনভাবে প্রশংসা না করলে প্রজাদের মনে সংশয় বিক্ষোভ অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকত। পরিণামে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ দেখা দিত। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাম যেমন ভরতকে রাজমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন, তেমনি অযোধ্যাকেও বিশৃঙ্খলা ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করে গেলেন।

একে-একে প্রজারা তখন চোখের জল মুছতে-মুছতে নত মুখে অযোধ্যায় ফিরে যেতে লাগল।

রাম আবার রথে উঠলেন।

সুমন্ত্রকে বললেন, "চল"।

রথ চলছে।...

কিন্তু রাম দেখলেন, একদল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ফিরে যাননি। তাঁরা অগ্নিহোত্র বহন করে পিছনে পিছনে আসছেন। তাঁরা বলছেন, "হে রাম, আমাদের সকল তপস্যার অগ্নি তোমার অনুসরণ করুক। আমাদের যজ্ঞের মেঘ, তোমার মাথায় শুভ্র ছত্র ধারণ করুক। আমাদের বাজপেয় যজ্ঞের পুণ্য তোমাকে রক্ষা করুক। আমাদের যে ধর্মবুদ্ধি সর্বদা বেদকে অনুসরণ করত, আজ তারা তোমাকে অনুসরণ করুক।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এমনি করে পদব্রজে আসছেন দেখে রাম রথ থেকে নেমে পড়লেন।

শূন্য রথ আগে চলল।...

রাম লক্ষ্মণ সীতা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে হেঁটে চললেন।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

দূরে সবুজ বনানী।

অপরাহ্ন আকাশে রঙীন মেঘের মেলা।

ব্যাপ্ত চরাচরে উদার মুক্তির প্রবাহ।

পিছনে শোক, সম্মুখে শান্তি।

যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে এল।

সম্মুখে নির্জন তমসা নদী। তার শান্ত জলে আকাশের ছায়া। তটবৃক্ষে কলহংস সারস চক্রবাক। দক্ষিণ সমীরে বনমল্লিকার মিষ্ট গন্ধ। পুষ্পরেণু গন্ধমাখা সন্ধ্যার সেই শীতল বাতাসে দাঁড়িয়ে রাম বললেন, "লক্ষ্মণ বনবাসের এই প্রথম রাত্রি আমরা এই শান্ত তমসার তীরে যাপন করব।"

আঠারো

মাটির পথ—সোনার রথ

সেদিন তমসার তটে সন্ধ্যার মেঘে আকাশ ভরে উঠেছে। চারিদিকে বনজ্যোৎস্না। নদীর বুক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। ঝিরঝির করে গাছের পাতা কাঁপছে। পৃথিবীর শ্যামল বক্ষ বুঝি রাত্রির স্পর্শে হাওয়ায় হাওয়ায় উদ্‌বেল। তমসার মৌন কলস্বরে যেন তারই নিরুদ্ধ ভাষা।

উদাস মনে রাম বৃক্ষতলে বসে আছেন। অযোধ্যাবাসীর সকল দুঃখের ভার যেন রামকে গম্ভীর করে তুলেছে। পিতার দুঃখ মায়ের ব্যথা প্রজাদের শোক নির্জন সন্ধ্যার আঁধারের মতো তাঁকে আচ্ছন্ন করে ধরেছে।

কিছুটা আপন মনেই যেন লক্ষ্মণকে বলছেন, ''আমরা কত দূরে চলে এসেছি। হয়তো পিতা মাতা এখনো কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা অন্ধ না হয়ে যান। তবে মনে হয়, ভরত এসে তাঁদের সান্ত্বনা দেবে। সে বড় ধার্মিক। তার হৃদয়ে দয়া আছে। লক্ষ্মণ, তুমি আমার সঙ্গে এসে ভালই করেছ। নইলে দেখাশোনার জন্য আমাকে অন্যের সাহায্য নিতে হত। কিন্তু আজ আর কিছু ভাল লাগছে না। যদিও এই বনে অনেক ফলমূল আছে। কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। ভাবছি আজ রাতটা এই তমসার জল পান করেই কাটিয়ে দেব।''

গতকাল অভিষেকের জন্য উপবাসে ছিলেন। আজও সারাদিন কাটল অনাহারে। লক্ষ্মণ রামের মনের অবস্থা বুঝে কোনো আপত্তি করলেন না।

রাম সুমন্ত্রকে ডাকলেন।

—''সুমন্ত্র, রথের অশ্বগুলি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের ভাল করে পরিচর্যা করো।''

সুমন্ত্র রামের দয়ার্দ্র হৃদয়ের কথা জানেন। তাই এত দুঃখ ক্লান্তির মধ্যেও রাম অশ্বগুলির আহার পরিচর্যার কথা ভোলেননি। তাছাড়া এই অশ্বগুলি দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। পিতার কথা ভেবে হয়তো রাম আরও গভীর আবেগে এই অশ্বগুলিকে ভালবাসছেন। একসময় রাম বলেও ফেললেন, ''এই অশ্বগুলিকে আহার দিলেই আমি সম্মানিত বোধ করব। এরা রাজা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। এদের পরিচর্যা করলেই আমি আপ্যায়িত হব।''

এতবতাত্র ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ॥
এতে হি দয়িতা রাজ্ঞঃ পিতুর্দশরথস্য মে॥
এতৈঃ সুবিহিতৈরশ্বৈর্ভবিষ্যাম্যহমার্চিতঃ...

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/৪৫-৪৬)

রামের হৃদয়ের অবরুদ্ধ পিতৃস্নেহ বুঝি এমনি করে নিগূঢ় আবেগে এই অশ্বগুলিকে অবলম্বন করে পিতার কাছে পৌঁছাতে চায়।

সন্ধ্যা আহ্নিক করে রাম স্থিরাসনে বসে আছেন। অদূরে সুমন্ত্র অশ্বগুলিকে পরিচর্যা করছেন। এদিকে লক্ষ্মণ গাছতলায় গাছের ঝরাপাতা বিছিয়ে রামের জন্য শয্যা রচনা করছেন। খোলা আকাশের নীচেয় নদীর কূলে গাছের তলায় এই ঝরাপাতার শয্যা আজ রামের রাজশয্যা— "তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্বৃতাম্"। (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৬/১৪) এ দুঃখ নয়, বঞ্চনা নয়, এ এক জয়। রাম এই পরম জয়কে বরণ করেছেন ত্যাগ আর নম্রতা দিয়ে। এই জয়ের মহত্ত্ব অযোধ্যার রাজসুখ দিয়ে মাপা যায় না। জীবনের গভীর দুঃখ দিয়ে একে মাপতে হয়। তমসার নির্জন বুকে অন্ধকার আকাশে ওই তারকার চোখে একে দেখতে হয়।...

এদিকে অন্ধকার শোকার্ত অযোধ্যা।...

সূর্য অসময়ে অস্তগামী হল। কেউ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালল না। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্র করলেন না। ঘরে ঘরে অরন্ধন উপবাস। গাভীরাও তৃণ ভক্ষণ করছে না। তাদের ধেনুবৎসকে দুগ্ধ পান করাচ্ছে না। চারিদিকে কেমন অমঙ্গলের চিহ্ন। বাতাস রুক্ষ কর্কশ। গ্রহ নক্ষত্র প্রভাহীন। চন্দ্র নিষ্প্রভ। ত্রিশঙ্কু মঙ্গল ও বুধ চন্দ্রের দিকে বক্রী। থেকে থেকে বজ্র, উল্কাপাত, ভূমিকম্প। ভীষণ শব্দে পর্বত বিদীর্ণ হচ্ছে। অযোধ্যা কাঁপছে। পশুপক্ষীর ভয়ার্ত কলরব। (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪১/৮-২১)

ঘরে ঘরে রমণীগণ বিলাপ করছে, "বুঝি অযোধ্যার সকল পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেছে। দারুণ দুর্দিন আসছে। রামহীন অযোধ্যায় আর বেঁচে থেকে লাভ কি? তার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা ভাল। কিংবা চল, এমন জায়গায় চলে যাই, যেখানে কৈকেয়ীর নাম শুনতে হবে না।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৮/২৫-৩৬)

এমনি করে প্রজাদের ধিক্কার ক্রন্দন আর বিলাপ রাজপ্রাসাদের দশরথের বিষণ্ণ কক্ষে এসে প্রবেশ করছে। শুনে আর্ত দশরথ আরও সন্তপ্ত হয়ে অসহায় যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

পাশে কৌশল্যা বিলাপ করছেন, "মহারাজ, কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে এ আপনি কি সর্বনাশ করলেন! জলের মাছ যেমন নিজের ছানাপোনাকে খেয়ে ফেলে আপনিও তেমনি সন্তানকে মেরে ফেললেন। আপনি কি ভেবেছেন চোদ্দো বছর পর রাম ফিরে এলে ভরত তার রাজত্ব তার ধনাগার ছেড়ে দেবে? আর যদি ছেড়েও দেয়, রাম কি ভরতের উচ্ছিষ্ট রাজ্য গ্রহণ করবে? যজ্ঞের প্রসাদী দ্রব্য দিয়ে কি আবার যজ্ঞ হয়? ব্রাহ্মণ কি কারো উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে? জানবেন রাম কখনো এই অপমান সহ্য করবে না।

"আপনি শুধু রামকে নয়, আমাকেও মেরেছেন। স্ত্রীলোকের প্রথম গতি স্বামী। কিন্তু আপনি তো আমার নন। আপনি কৈকেয়ীর। স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় গতি তার পুত্র। আপনি আমার সে গতিও রাখেননি। আমার পুত্রকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। কৈকেয়ী এখন খোলস-ছাড়া সাপের মতো ফণা মেলে ঘুরে বেড়াবে। এই অযোধ্যা এই রাজত্ব এই প্রজাবর্গ সব আপনি নষ্ট করে দিলেন। কেবল সুখী করলেন আপনার কৈকেয়ী আর ভরতকে।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৬/১০-২৬)

কৌশল্যার কণ্ঠে একই সঙ্গে দুঃখ জ্বালা শোক আর ঈর্ষা। পূজার পাত্রে যেন মিশ্রিত হয়েছে মধু মদ আর বিষ। বঞ্চিতা নারীর ঈর্ষা ও জ্বালা তার রসনাকে যে কতখানি তিক্ত ও কটু করে তোলে তা আমরা কৌশল্যার কথায় মাঝে মাঝেই দেখতে পাই। কৌশল্যার খর রসনা আরো রুক্ষ হয়ে ওঠে যখন সুমন্ত্র রামকে বনবাসে রেখে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সুমিত্রা সংজ্ঞাহীন রাজাকে তুলে ধরছেন। তখন কৌশল্যা বলছেন, "অন্যায় কাজ করে কি এখন আপনি লজ্জিত হচ্ছেন? যার ভয়ে আপনি সুমন্ত্রের কাছে রামের কথা জিজ্ঞাসা করছেন না, সেই কৈকেয়ী কিন্তু এখানে নেই। আপনি নির্ভয়ে সুমন্ত্রের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।"

অদ্যোমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব।
দেব যস্যা ভয়েদ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৭/৩০-৩১)

যদিও স্বয়ং বাল্মীকি কৌশল্যাকে দেবমাতা অদিতির সঙ্গে তুলনা করেছেন (১/১৮/১২), এবং দশরথও তাঁকে বলেছেন "প্রিয়ংবদা" (২/১২/৬১) কিন্তু এই দেবী প্রতিমার ভাস্কর্যশৈলী কিছুটা স্বতন্ত্র। পাষাণ পর্বতে স্থানে স্থানে বিদীর্ণ ফাটলের মতো কৌশল্যার শোকার্ত তীক্ষ্ণ কটূক্তিগুলি ভাস্কর্যের এক রুক্ষ গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। অনেকটা আধুনিক ভাস্কর্যরীতির (Baroque style) মতো যেখানে রূপগঠনের নিখুঁত নির্মাণের চেয়ে থাকে রূপের সর্বাঙ্গ জুড়ে একটা আদিম প্রস্তরের ঘন বলয়িত গাম্ভীর্য। কৌশল্যার মূর্তি যেন তাই। পেলবতা ও কর্কশ কাঠিন্য দিয়ে বাল্মীকি এই অপূর্ব মূর্তিখানি গড়েছেন। সেই মূর্তি মহত্ত্বে যেমন দেবী, আবার ঈর্ষার তিক্ত কষায় নিয়ে তেমনি মানবী। বস্তুত বাল্মীকি কবিপ্রতিভার এ এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। একই ব্যক্তির মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের স্তর তিনি ভাঁজে-ভাঁজে দেখিয়ে দেন। নানা বিষম গুণ ও গঠনের সে এক জটিল বিন্যাস। শ্রীঅরবিন্দ তাই এর নাম দিয়েছেন, "Valmiki's complex temparament"। এই বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি রামের চরিত্রেও। ত্যাগে সংকল্পে উদার গাম্ভীর্যে রাম যেমন দেবতা, তেমনি সংশয়ে দুঃখে দুর্মনসো তিনি আবার মানব। কিন্তু রামের এই মানবত্ব তাঁর দেবত্বকে কখনো হানি করেনি। বরং আমাদের কাছে আরও নিবিড় ও নিকট করেছে।..

মনস্তাপে অবসন্ন দশরথ কৌশল্যার দুর্বচনে মৃতপ্রায় নির্জীব হয়ে পড়লেন। তাঁর দুর্বল হাত দুখানি কাঁপছে। তিনি কাতর কণ্ঠে করজোড়ে নতমস্তকে বললেন, "কৌশল্যা, আমি জোড়হাত করে মিনতি করছি। তুমি প্রসন্ন হও। তুমি তো শত্রুকেও স্নেহ করে থাক। এমন অপ্রিয় বাক্য বলে আমার দুঃখের উপরে আর দুঃখ দিও না।"

দশরথের এই আর্ত মিনতিতে কৌশল্যার চোখে জল এল। রাজার কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানি নিজের মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর চরণদুটি ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন। এমন করে বলবেন না। এতে আমার পাপ হবে। যে স্ত্রীর কাছে স্বামী এমন জোড়হাত করে ক্ষমা চায় সে কখনো কুলস্ত্রী নয়। আসলে পুত্রশোকে আমি দিশাহারা হয়েছি। শোকে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়। গুণ নষ্ট হয়। শোকের চেয়ে বড় শত্রু নেই। বরং শত্রুর হাতের প্রহার সহ্য হয় কিন্তু শোকের দাহ সহ্য হয় না।"

যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া।।
নৈষা হিসা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা।
শোকো নাশয়তেধৈর্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ।।
শক্যমাপতিতঃ সোঢুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ।
সোঢুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৬২/১২-১৩, ১৫-১৬)

—"কৌশল্যা, আমি হতভাগ্য। আমি অপরিণামদর্শী। আমি আমগাছ কেটে পলাশ গাছে জল ঢেলেছি। মানুষ শুভ অশুভ যেমন কাজ করে তেমন ফল পায়। আমি আজ আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছি।

তুমি সে কথা জানো না। তখন তোমার বিবাহ হয়নি। চঞ্চল রক্তে শিকারের উন্মাদনা। সেদিন বর্ষার রাত। সরযূ নদীতে বান ডেকেছে। ঘনবনতলে মেঘ মল্লারে অঝোরে বৃষ্টিধারা। মেঘ ডাকছে। সিক্ত কদম্বকাননে বন্য কেকার মত্ত কলরব। সেই ঘনঘোর বর্ষার রাতে অন্ধকারে আমি শিকারে বেরিয়ে পড়লাম। কোনো দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি শব্দ লক্ষ করে বাণ নিক্ষেপ করতে পারি। অন্ধকার বনে নদীর ঘাটে মনে হল যেন একটা হরিণ জল খাচ্ছে। অথবা হাতী জল খেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি যেন ঘড়ায় জল ভরার শব্দ। তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ লক্ষ করে বাণ নিক্ষেপ করলাম।

অন্ধকারে চমকে উঠলাম!

এ যে মানুষের আর্তনাদ!

ছুটে গেলাম।

দেখি জটামণ্ডিত এক তাপসকুমার—বুকে শরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। একটি জলের কলসি ছিটকে পড়ে আছে দূরে।

বিহ্বল আমি।

আমার হাত থেকে ধনুর্বাণ খসে পড়ল।..

—"আমাকে এমন করে মারল কে? আমি কার কি ক্ষতি করেছি? আমার বৃদ্ধ পিতামাতা দুজনেই অন্ধ। বনে কুটির বেঁধে তপস্যা করেন। আমি তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁদের তৃষ্ণার জল নিতে এসেছিলাম। মরণে দুঃখ নেই। কিন্তু আমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতামাতার কী হবে?"

তাপসকুমারের কথা শুনে আমি আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলাম, 'হায়, আমি ব্রহ্মহত্যা করলাম।"

তখন অতিকষ্টে সে বলল, 'তুমি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় কোরো না। আমি ব্রাহ্মণ নই। আমার পিতা বৈশ্য। শূদ্রা মাতার গর্ভে আমার জন্ম।'

আর সে কথা বলতে পারল না।

তার বুকে বাণ বিঁধে আছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমি তখন বাণটি তুলে ফেললাম।

সেই অন্ধকার বৃষ্টির রাতে বনের মধ্যে সরযূ নদীর ঘা . তাপসকুমার আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আমি তার শূন্য কলসে জল ভরে অন্ধমুনির কুটিরে গেলাম। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ডানাভাঙা স্থবির পক্ষীর মতো মুনি অধীর কণ্ঠে বললেন, 'এসেছ পুত্র? এত বিলম্ব করলে কেন? তোমার মাতা তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে। শীঘ্র এসে জল দাও। কি? কথা বলছ না কেন?'

—'ভগবন্, আমি আপনার পুত্র নই। আমার নাম দশরথ। অন্ধকারে বনের পশু মনে করে আপনার তাপস পুত্রকে আমি নিহত করেছি। আমি অতি সন্তপ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন।'

অন্ধমুনির পুত্রশোকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমার ছিল না। নদীর ঘাটে তাঁদের মৃতপুত্রর কাছে নিয়ে এলাম। মুনি আমাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'রাজা, তুমি অজ্ঞানে এই পাপ করেছ, এবং নিজে এসেই প্রথমে সংবাদ দিয়েছ, তাই তুমি এখনো জীবিত রয়েছ, তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায়নি। কিন্তু তোমাকে অভিশাপ দিলাম, আমারই মতো তোমার পুত্রশোকে মৃত্যু হবে। ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি।' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৪/৫৪)

অন্ধমুনির সেই অভিশাপ আজ ফলতে বসেছে, কৌশল্যা, আমার চোখে আঁধার, আমি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছি। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর।"

অন্ধের মতো শূন্যে হাত বাড়িয়ে দশরথ কেঁদে উঠলেন।...

তমসার তীরে তখনো রাত ভোর হয়নি। আকাশে নক্ষত্রপ্রভা। নদীর জলে রাত্রির ছায়া। পুবের আকাশে কাকজ্যোৎস্নার মতো অল্প অল্প আলো ফুটেছে। শেষ রাতের ঠান্ডা বাতাস বইছে।

রামের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি পর্ণশয্যা থেকে উঠি লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন, "অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ এখনো ঘুমিয়ে। ওঁরা কেন আমাদের সঙ্গে থেকে নিরর্থক কষ্ট পাবেন? ওঁরা ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে [illegible] বেলা চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

সুমন্ত্র তখনই রথ যোজনা করে প্রস্তুত হলেন।

রাম লক্ষ্মণ সীতা নিঃশব্দে উঠে যাত্রা করলেন।

তমসা পার হলেন।

ওপারে গিয়ে বললেন, "সুমন্ত্র, আমরা পদব্রজে যাচ্ছি। তুমি উত্তর দিকে অযোধ্যার পথে কিছুদুর রথ চালিয়ে যাও। তারপর অন্যপথে ফিরে এসো। প্রজারা জেগে উঠে যাতে রথের চাকার চিহ্ন ধরে আমাদের অনুসরণ করতে না পারে।"

সুমন্ত্র তাই করলেন।

এবার রথে উঠলেন তাঁরা।

শুভযাত্রার জন্য প্রথমে উত্তর মুখে একটু গিয়ে, পরে রথ ঘুরিয়ে বনের পথে চললেন।...

তখন ভোর হচ্ছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। সকালের ঘুম ভেঙে উঠে পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ দেখেন, রাম-লক্ষ্মণ চলে গেছেন। বৃক্ষতল শূন্য। নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে রথের চাকার চিহ্ন ধরে অনেকক্ষণ তাঁরা বৃথা ছোটাছুটি করলেন। কিন্তু রাম কোন পথে গেছেন বুঝতে পারলেন না। অগত্যা তাঁরা অযোধ্যায় ফিরে চললেন। কেউ কেউ তাঁদের

মধ্যে বললেন, "আমরা আর ফিরে যাব না। এখানেই মরব। কিংবা মহাপ্রস্থানের পথে চলে যাব। এই বনে অনেক শুকনো কাঠ আছে। আমরা চিতা জ্বেলে আত্মাহুতি দেব। তবু অযোধ্যায় ফিরব না। কোন মুখে ফিরব? লোকে জিজ্ঞাসা করলে কী বলব?"...

সকাল হয়েছে।

উত্তর কোশলের পথ ধরে রামের রথ ছুটে চলেছে।...

দুপাশে কত গ্রাম, কত বন উপবন, লোকালয় চাষের ক্ষেত। সকালের উজ্জ্বল আলোতে ছায়ায় ঘেরা পাখিডাকা গ্রামের পথে যেতে যেতে রামের মন উদাস হয়ে যায়। মাঠে গরু চরছে। চাষিরা চাষ করছে, আর কি যেন বলাবলি করছে, রামের কানে আসে, তারা বলছে, "কামুক রাজা দশরথের ধিক্। কৈকেয়ীর মতো পাপীয়সী কোথাও নেই। এমন নিষ্ঠুর অধর্ম কি মানুষে করে?" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৯/১-৫)

রথের চাকা আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ কিছু শোনা গেল না।

যেতে-যেতে তাঁরা বেদশ্রুতি গোমতী ও স্যন্দিকা নদী পার হলেন। সমৃদ্ধ জনপদের ভিতর দিয়ে এখন রথ চলেছে।...

রাম সীতাকে দেখিয়ে বলেন, "এই বিশাল জনপদখানি আমাদের পূর্বপুরুষ ইক্ষ্বাকুকে সম্রাট মনু দান করেছিলেন। ধনধান্যপূর্ণ সম্পদশালী এই দেশে সকলেই বিত্তবান দানশীল স্বাস্থ্যবান। কোনো অমঙ্গল কোনো ভয় এখানে প্রবেশ করে না। সুজলা সুফলা দুগ্ধধেনুবতী। রমণীয় চৈত্য যূপ উদ্যানশোভিত এই দেশ। এখানকার বাতাসে সর্বদা বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয়।"

এই অযোধ্যা এই কোশল রামকে মাতৃস্নেহের মতো টানে। তাই এক সময় আনমনা হয়ে বললেন, "সুমন্ত্র, আবার কবে এখানে ফিরে আসব! আবার কবে এই সরযূর পুষ্পিত কাননে বিহার কবব!"

কদাহং পুনরাগম্য সরযবাঃ পুষ্পিতে বনে।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৯/১৫)

রামের কণ্ঠে বিষাদ।

সুমন্ত্র কোনো কথা বলেন না।

হয়তো মনের ব্যথা গোপন করতে আচমকা অশ্বের লাগামে টান দিলেন।

রথ তখন আরও জোরে ছুটে চলল।...

এবার তাঁরা কোশল রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে এলেন। রথ থেকে নেমে রাম অযোধ্যার অভিমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। মাতৃভূমির কাছে শেষ বিদায় প্রার্থনা করলেন, "বিদায় অযোধ্যা! সূর্যবংশেসেবিত নগরশ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি, তোমাকে বিদায়! তোমাকে অধিষ্ঠান করে যত দেবতা আছেন, তাঁদের কাছেও আমার বিদায়! বনবাস থেকে ঋণমুক্ত হয়ে ফিরে এসে আবার যেন তোমাকে দেখতে পাই।"

আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ॥
নিবৃত্তবনবাসস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ।
পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/২-৩)

জনপদবাসীরা রামকে চিনতে পেরে দলে দলে এসে ভিড় করছে। তাদের প্রিয় রামচন্দ্র তাদেরই গ্রামের পথ দিয়ে চিরকালের [illegible] চলে যাচ্ছেন। হাতজোড় করে চোখের জলে বিদায় নিচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে বুক ফেটে যায়। তারা করুণ চোখে আর্ত মিনতি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।...

রাম তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ম্লান মুখে ব্যথাতুর দৃষ্টি। চোখে জল। ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠস্বর। তিনি ডানহাতখানি তুলে সস্নেহে বললেন, "ভাই সব! তোমরা আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছ। এখন যে যার কাজে যাও। তোমরা মনে কোনো দুঃখ রেখো না।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/৪-৫)

শোকবিহ্বল জনতা তবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।...

রাম তখন রথে উঠলেন।...

সন্ধ্যা সূর্যের মতো তিনি ক্রমশ দূরে ওই মৌন জনতার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। শুধু রথের চাকার শব্দ, অশ্বক্ষুরধ্বনি, এই ক্লান্ত বেলায় তাদের বুকে বড় বেদনার মতো বাজতে লাগল।...

কোশল ছাড়িয়ে প্রান্তর পেরিয়ে রথ চলেছে দক্ষিণে।

অদূরে ওই গঙ্গা নদী। নদীর কূলে ঋষিদের কত মনোরম আশ্রম কত দেবোদ্যান। পুণ্যতোয়া সাগরতেজসা বেণীজলযুতা দেবপদ্মিনী গঙ্গা। গম্ভীরবেগা ভৈরবনির্ঘোষা আবর্তসংকুল জলরাশির বিপুল কলোচ্ছ্বাস।

নদীর কূলে এসে রথ থামল।

রাম বললেন, "সুমন্ত্র, এই সেই নিষাদ রাজ্য শৃঙ্গবেরপুর। নদীর পাড়ে দেখ একটা বিশাল ইঙ্গুদী বৃক্ষ। রাশি-রাশি প্রবালপুষ্প ফুটে আছে। চল, ওই বৃক্ষতলে যাই। গঙ্গার কূলে আজ এখানেই আমরা রাত্রি যাপন করব।"

উনিশ

মানুষীং তনুম

রামচন্দ্র এসেছেন। তিনি গঙ্গার তীরে বৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। শুনে নিষাদরাজ গুহ তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আনন্দে ছুটে গেলেন। সঙ্গে তাঁর মন্ত্রী অমাত্য প্রচুর উপহার উপঢৌকন।

শৃঙ্গবেরপুরের প্রতিবেশী দুই বন্ধু রাষ্ট্র বিদেহ আর কোশল। উত্তরে কেকয়। এরই মধ্যবর্তী পার্বত্য উপজাতি অধ্যুষিত এই নিষাদরাজ্য। এখানকার সমস্ত নদী-জলপথে এদের একচ্ছত্র আধিপত্য। নৌশক্তিতে প্রবল। বলবান দুর্ধর্ষ। এদের রাজা গুহ। রামচন্দ্রের প্রাণতুল্য সখা। রাজা গুহ নিজেও একজন শিল্পী। স্থপতি বলে তাঁর খ্যাতি আছে—"স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ" (২/৫০/৩৩)

রামকে আলিঙ্গন করে গুহ বললেন, "আমার কি সৌভাগ্য! তোমার মতো প্রিয় অতিথি পেয়ে আমি আজ ভাগ্যবান। এ রাজ্য তোমার। আমরা তোমার ভৃত্য। তোমার আজ্ঞাবহ। আমাদের এই পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ কর। আমাদের এই রাজ্য তুমি শাসন কর।'

গুহকে আলিঙ্গন করে স্নেহগম্ভীর কণ্ঠে রাম বললেন, "গুহ, তুমি যে ভালবেসে এমন করে পদব্রজে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করছ, এতেই আমি আপ্যায়িত ও ধন্য হলাম। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি আজ বনবাসী সন্ন্যাসী। তাই তোমার দেওয়া কোনো উপহার আমি নিতে পারব না। আমার কিছুতে প্রয়োজন নেই। কেবল আমার এই অশ্বগুলি বড় শ্রান্ত। এদের জন্য কিছু আহার্যের ব্যবস্থা কর। রাজা দশরথের প্রিয় এই অশ্বগুলি তৃপ্ত হলেই আমি তৃপ্ত হব।"

গুহ তখনই শশব্যস্তে তাঁর লোকজনকে আদেশ দিলেন রথের ঘোড়াগুলিকে উপযুক্ত খাদ্য পানীয় দিয়ে পরিচর্যা করতে।...

সন্ধ্যা হয়ে এল।

গঙ্গার কূলে শান্ত জলস্রোত। শীতল বাতাসে ইঙ্গুদীবৃক্ষের প্রবালপুষ্প ঝরে পড়ছে। দিনান্তের আকাশে শ্রান্ত বলাকা উড়ে চলেছে।

সন্ধ্যা উপাসনা করে রাম স্থিরাসনে বসে আছেন। লক্ষ্মণ গঙ্গাজল নিয়ে এলেন। রাম তৃষ্ণার্ত অঞ্জলিতে সেই গঙ্গাজলটুকু পান করলেন। তারপর শ্রান্ত দেহে ভূমিতলে শয়ন করলেন। লক্ষ্মণ রামের চরণ দুটি ধুইয়ে দিলেন।

অদূরে একটি বৃক্ষমূলে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে লক্ষ্মণ বসে রাত্রি জাগরণ করতে লাগলেন। পাশে সুমন্ত্র।

গুহ বিনীতভাবে বললেন, "লক্ষ্মণ, তুমিও তো ক্লান্ত, তোমার জন্য উত্তম শয্যা রচনা করে দিই। একটু বিশ্রাম করে নাও। সুমন্ত্র আর আমি জেগে আছি। আমরাই রামচন্দ্রকে পাহারা দেব।"

শুনে লক্ষ্মণ উত্তেজিত হয়ে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, "চেয়ে দেখ, ত্রিভুবনত্রাস যক্ষরক্ষগন্ধর্ব-বিদলন সুরাসুর বিজয়ী রঘুবীর রামচন্দ্র আজ সীতা সহ এই ভূমিতে তৃণশয্যায় শুয়ে আছেন। সেখানে আমার কিসের বিশ্রাম কিসের সুখ? কিসের জীবন?"

কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লুব্ধং জীবিতাং বা সুখানি বা॥
যো না দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতং যুধি।
তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫১/৯-১০)

"মন্ত্রে তপস্যায় পরাক্রমে রাজা দশরথ যে পুত্রলাভ করেছিলেন, সর্বগুণমঙ্গল সেই রামচন্দ্র আজ নির্বাসিত। গুহ, আমার মনে হয় রাজা দশরথ আর বাঁচবেন না। পৃথিবী বিধবা হবে। সব ছারখার হয়ে যাবে। কেঁদে কেঁদে সমগ্র অযোধ্যা হয়তো এখন নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। পুত্রশোকে কাতর দশরথ এবং আমার মাতা সুমিত্রাও হয়তো আজ রাত্রেই মারা যাবেন।"

যো মন্ত্রতপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈব পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ॥
অস্মিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষোপরতং ভ্রাতর্মন্যে রাজনিবেশনম্॥
কৌশল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশাংসে যদি জীবন্তি সবে তে শর্বরীমিমাম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫১/১১-১৪)

লক্ষ্মণের কথাগুলি হৃদয় আলোড়িত করে তীব্র আবেগে উৎসারিত হতে লাগল। প্রতিটি শব্দ যেন জীবন্ত স্পন্দিত অশ্রুবাষ্পভরা। মনের ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে ব্যথায় ও আবেগে কম্পমান যেন গভীর জলরাশির বুকে উদ্‌বেলিত ঢেউ।

বাল্মীকির কবি-প্রতিভার এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্যের মধ্যে তিনি বর্ণনার চেয়ে দীর্ঘ সংলাপ সৃষ্টি করেন বেশি। এপিক গাম্ভীর্যের মধ্যে ড্রামাটিক সংঘাত আনেন। সংলাপের প্রতিটি শব্দে ভরে দেন পাত্রপাত্রীর হৃদয়ের ব্যথা, তাদের ক্ষোভ দুঃখ বেদনা, বুকের রক্ত, চোখের জল, আর ধমনীর উষ্ণ স্পন্দন। আর এই সবের স্পর্শে চরিত্রের এমন সব দুর্জ্ঞেয় দিক্ তিনি হঠাৎ হঠাৎ চকিতে উদ্‌ঘাটিত করে দেখান, যা কোনো ঘটনা দিয়ে কিংবা বর্ণনা দিয়ে কোনো কবি প্রকাশ করতে পারেন না। যেন মুখের কথা নয়, সবাই কথা বলে হৃদয় দিয়ে।

শ্রীঅরবিন্দ যথার্থ বলেছেন..."proceeding straight from the heart, the thoughts, words, reasonings come welling up from the dominant emotion of conflicting feeling of the speaker, they palpitate and are alive with the vital force from which they have sprung." (*Vyasa and Valmiki*, 1956, p. 36)

...ভগবতী নিশা ভোর হল।

কোকিল ডাকছে। নদীর কূলে বন থেকে ময়ূরের কেকাধ্বনি ভেসে আসছে।

শয্যা ত্যাগ করে রাম বললেন, "লক্ষ্মণ, আমরা এবার গঙ্গা পার হব। যাত্রার আয়োজন করো।"

গুহ একটি সুন্দর নৌকা নিয়ে এলেন ঘাটে। চর্মপেটিকায় জিনিসপত্র ভরে খড়্গ তূণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লক্ষ্মণ ও সীতা নৌকায় উঠলেন।

সুমন্ত্র রামেব কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি এখন কী করব?"

সুমন্ত্রকে দক্ষিণ হস্তে সস্নেহে স্পর্শ করে রাম বললেন, "তুমি এবার ফিরে যাও। আর আমাদের রথের প্রয়োজন হবে না। এবার আমরা পদব্রজে যাব। তোমার মতো ইক্ষ্বাকুবংশের বন্ধু আর কেউ নেই। তুমি দেখো, রাজা দশরথ যেন আমার জন্য সন্তপ্ত না হন। তাঁকে বোলো, বনবাসে এসেছি বলে আমার কোনো দুঃখ নেই। লক্ষ্মণের মনেও কোনো খেদ নেই। চোদ্দো বছর পরে শীঘ্রই তিনি আমাদের দেখতে পাবেন। মাতা কৌশল্যাকে কুশল জানিয়ে আমার প্রণাম দিও। মহারাজকে বলবে তিনি যেন সত্বর ভরতকে আনিয়ে সিংহাসনে বসান। আর ভরতকে বলবে, সে যেন কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে নিজের মায়ের মতো দেখে। তুমি ভরতের অনুগত থেকো। তাছাড়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে খুশি করবার জন্য তোমাকে যে আদেশ করবেন তুমি তা পালন করো। (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫২/২১-৩৫)

রাম যদিও ধীর শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলছেন, কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে, স্নেহের সঙ্গে সংশয়, প্রশান্তির সঙ্গে উদ্‌বেগ, ধৈর্যেব তলে নিরুদ্ধ দুশ্চিন্তা, হয়তো-বা কিছুটা দুঃখও। এই হল বাল্মীকির সংলাপ রচনার রীতি—তা যতটা epical তার চেয়ে বেশি psychological। মহাকাব্যের গম্ভীরতার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা।..

সুমন্ত্র কিছুতেই অযোধ্যায় ফিরে যেতে চান না। শূন্য বথ নিয়ে তিনি কেমন করে ফিরবেন? পথের জনতার শোকাকুল দৃষ্টির সামনে তিনি কেমন কবে দাঁড়াবেন? কৌশল্যাকেই-বা তিনি কি সান্ত্বনা দেবেন?

—"আমি তোমার সঙ্গে বনবাসী হব। তোমাকে সেবা করব। বনবাস অন্তে এই রথে করেই আবার তোমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

—"না, তা হয় না, সুমন্ত্র। তুমি ফিরে যাও। তুমি ফিরে না গেলে কৈকেয়ীর বিশ্বাস হবে না। তাঁর মনে শঙ্কা থাকবে। তিনি রাজা দশরথকে মিথ্যাবাদী মনে কববেন।"

সুমন্ত্র নীরবে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন...

গুহকে বললেন, "আমাদের এখন তপস্বীর বেশে বনে যাওয়া উচিত। তুমি বটের আঠা নিয়ে এসো। আমরা মাথায় জটা ধারণ করব।"

জটামণ্ডিত তপস্বীর বেশে রামলক্ষ্মণ গঙ্গা পার হতে লাগলেন।.

নির্মল বাতাস নদীর ঢেউয়ে নৌকা দুলছে। সাগরবাহিনী গঙ্গা কলকল্লোলে বয়ে চলেছে। মাঝগঙ্গায় গহিন জলের স্রোত। মাঝি দাঁড় টানছে। মাথার উপরে নীল আকাশে অসীম গাম্ভীর্য।

সীতা মা-গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করছেন, "ব্রহ্মলোকবিহারিণী, মকরবাহিনী গঙ্গে, ত্রিপথগামিনী পতিতপাবনী দেবী তুমি, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী, মাতঃ জনকদুহিতা সীতা আমি তোমাকে প্রণাম করি। সপ্তস্রোতা সরিতশ্রেষ্ঠা শিবজলা, মাতঃ, তুমি প্রসন্ন হও। নরোত্তম দাশরথি রাম বনবাসে চলেছেন। তুমি তাঁকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করো। চতুর্দশ বৎসর পরে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম রাজত্ব লাভ করলে, তোমার দুই পুণ্যতটে যত দেবতা আছেন, যত মুনিঋষি আছেন, তাঁদের সকলকে আমি সহস্রঘটে পূজা করব।"...

এপারে দাঁড়িয়ে সুমন্ত্র দেখছেন।

নৌকা ক্রমশ গঙ্গার ওপারে দক্ষিণ কূলে গিয়ে ভিড়ল। একে একে নামলেন লক্ষ্মণ, সীতা, রাম। তাঁরা এগিয়ে চলেছেন দূরে অস্পষ্ট ছায়ার মতো। চোখে জল আসে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। সুমন্ত্র আর দেখতে পান না। দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। কেউ নেই সেখানে। শুধু সেই মৌন বৃক্ষ আর উদাসীন হাওয়া।...

রথের অশ্বগুলি বাতাসে ঘ্রাণ নিয়ে হঠাৎ হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। শূন্য রথ নিয়ে সুমন্ত্র তখন অযোধ্যায় ফিরে চললেন।...

অজানা দেশ, অচিন পথ।

আগে লক্ষ্মণ, তারপরে সীতা, পিছনে রাম তাঁদের রক্ষা করে চলেছেন।

লোকালয়ে ছাড়িয়ে প্রান্তর পেরিয়ে রৌদ্র ছায়ায় ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারাদিন হেঁটে চলেছেন তাঁরা।

ক্রমে অপরাহ্ন হয়ে এল।

সেই ক্লান্ত বেলায় তাঁরা এসে পৌঁছালেন যমুনার উত্তরে সমৃদ্ধিশালিনী বৎসদেশে।

সবাই তাঁরা শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত।

বহুদূরে লোকালয়। পথে এক বিজন বনের ধারে বিশাল বটগাছের তলায় বসে তাঁরা বিশ্রাম করতে লাগলেন। রাম লক্ষ্মণ চারিটি মহামৃগ শিকার করে গাছের তলায় রন্ধন করে আহারের ব্যবস্থা করলেন।

ক্রমে সেই নির্জন অরণ্যে রাত্রি নামল। বনান্তরালে নিশাচর প্রাণীর নিঃশব্দ আনাগোনা। হাওয়ার মর্মর। ঝরাপাতার নিঃস্বন। রামের মন যেন সহসা দুঃখে স্মৃতিভরাতুর হয়ে ওঠে। এই বিষণ্ণ অন্ধকারে তাঁর অটল ধৈর্য আর মৌন গাম্ভীর্য যেন পাষাণের মতো নিঃশব্দে ফেটে যায়। হয়তো এই কদিন অযোধ্যার শেষ প্রতিনিধি সুমন্ত্র সঙ্গে ছিলেন, তাই রাজমর্যাদায় সচেতন রাম সংযমের কঠিন বর্মে দৃঢ়ভাবে বুকখানা বেঁধে রেখেছিলেন। আজ আর সুমন্ত্র নেই। কেউ নেই। তাই রামের অন্তরে পাষাণ চাপা দুঃখ বুঝি উদ্‌বেলিত হয়ে উঠল।

আপন মনেই রাম বললেন, "লক্ষ্মণ, রাত হল। এতক্ষণে পিতা হয়তো শোকে দুঃখে কাতর হয়ে শুয়ে আছেন। কিন্তু কৈকেয়ীর মনে খুব আনন্দ। আমার কেমন ভয় হয়, ভরতের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য কৈকেয়ী রাজা দশরথকে না প্রাণে মেরে ফেলেন। কৈকেয়ী এতক্ষণে হয়তো আমাদের মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। কি জানি, পিতা

বোধহয় আর বাঁচবেন না। আমিও বনবাসে চলে এলাম। এখন ভরতেরই তো সুদিন। ভরত একা এই বিশাল রাজ্যের রাজা হয়ে পত্নীকে নিয়ে সুখী হবে। লক্ষ্মণ, আমি বলি কি, তুমি বরং অযোধ্যায় ফিরে যাও। নীচ কৈকেয়ী পারে না এমন কোনো কাজ নেই। সে তোমার ও আমার মাকে বিষ খাইয়েও মারতে পারে। তুমি ফিরে যাও। মাতা কৌশল্যাকে রক্ষা করো। তিনি অনেক দুঃখে আমাকে পালন করেছেন। কিন্তু আমি মাকে সারা জীবন কেবল কষ্টই দিলাম। কোনো নারীর যেন আমার মতো পুত্র না হয়। আমার মায়ের শুক সারি দুটি পোষা পাখি আছে। তারাও আমার চেয়ে অনেক ভাল। দাঁড়ে বসে সারিপাখিটি বলে, 'শুক, তুমি শত্রুকে দংশন কর।' কিন্তু আমি তো মায়ের জন্য সেকথাটাও বলতে পারলাম না। লক্ষ্মণ, আমি ক্রুদ্ধ হলে অযোধ্যা কেন সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারি। কিন্তু আমার সেই বীরত্ব আজ বৃথা হল।'' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৩/৬-২৫)

বলতে বলতে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এমনি করে মলিন মুখে চোখের জলে সারা রাত জেগে বসে রইলেন রাম।

''অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ।''

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৩/২৭)

রামের কথাগুলি শোকে অশ্রুতে তপ্তনিঃশ্বাসে হৃদয় মথিত করে বেরিয়ে এসেছে—দুঃখে আবেগে নৈরাশ্যে দুর্ভাবনায়। অন্ধকার রাত্রে বিজন বনের ধারে নিঃসঙ্গ রামের এই বুকফাটা কথাগুলি তাঁর চরিত্রের এমন এক দুর্জ্ঞেয় গহন রহস্যকে প্রকাশ করে ধরেছে যা আমরা কখনো দেখিনি। পাহাড়ের কঠিন শিলার তলায় যে এমন একটা লুপ্ত স্রোত আছে তা আমরা কখনো জানতাম না। অযোধ্যার রামকে যেন এই প্রথম আমরা নতুন করে চিনলাম। বাল্মীকি রামকে কাঁদিয়ে আমাদেরও কাঁদালেন। সেই চোখের জলে আমরা যেন নতুন দৃষ্টি পেলাম। দেখলাম, রাম কেবল মহৎ নন, রাম বড় দুঃখী। দেখলাম, আমাদের আরাধ্য দেবতার চোখেও জল। এই দেবত্বকে তাই আমরা শুধু দূর থেকে পূজা করি না, বুক দিয়ে ভালবাসি। মহতের দুঃখ যে তাঁকে আরও মহৎ করে।

কুড়ি

আদিকবি

এমন দুঃখের রাত বুঝি পোহায় না। বুক চাপা অন্ধকার। সাধকের আধ্যাত্মিক রাত্রির মতো এক সাথে ভয় আর জয়ের সংঘাত। বজ্রসার ইন্দ্রধ্বজের মতো এমন যে রাম, তিনিও সাধারণ দুর্বল মানুষের মতো সাশ্রুনয়নে মলিন মুখে রাত জেগে বসে আছেন। রামকে এমন করে বিলাপ করতে আমরা দেখিনি। বীরের বুকে এমন দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনিনি। বিশ্বাস হয় না, যা তিনি কোনোদিন করেননি, এই হতাশার রাতে তাই তিনি করলেন—পিতার প্রতি নিন্দা ও তিরস্কার; কৈকেয়ীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ; ভরতের প্রতি ঈর্ষা আর সংশয়; এবং নিজের প্রতি নৈরাশ্য আর হতাশা। রামের অমেয় পৌরুষ যেন এখন ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের মতো মাটিতে লুটিয়ে আর্তনাদ করছে।...

মহাকবির সাহস দেখে বিস্মিত হতে হয়। পরিপূর্ণ দেবত্ব দিয়ে রামের যে সোনার মূর্তিখানি তিনি গড়েছেন, এই রাত্রে তাকে তিনি অনায়াসে নিক্ষেপ করলেন দুঃখের আগুনে। একটুও দ্বিধা করলেন না। ভাবলেন না, তাঁর মহাকাব্যের নায়কের মহিমা এত ম্লান হবে কিনা। বীরত্বের বুকে এতখানি দুর্বলতা দেখালে রামের চরিত্র খর্ব হবে কিনা। কবি যেন নিশ্চিন্ত। তিনি জানেন, রাম যদি খাঁটি সোনা হয় তাহলে দুঃখের আগুনে সে আরও উজ্জ্বল হবে। মানুষের দুর্বলতা তার দেবত্বের মহিমাকে আরও গভীর করবে। মহাকবি যেন এখানে অঘোরপন্থী তান্ত্রিকের মতো তাঁর নায়ককে নিয়ে এসেছেন দুঃখের এই দারুণ সাধনভূমিতে।

রামকে এই অবস্থায় দেখে লক্ষ্মণেরও বুক শুকিয়ে যায়। তিনি সকাতরে বলেন, "রাঘব, এমন করে বিলাপ করবেন না। তাহলে আমরা বিষাদে অবসন্ন হয়ে পড়ব। জলের মাছ ডাঙায় তুললে যেমন বাঁচে না, তেমনি আপনাকে কাতর দেখলে আমরা এক মুহূর্তও বাঁচব না।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৩/৩০-৩১)

কিন্তু বাল্মীকির যত সাহসই থাক, যতই তিনি অনায়াসে রামের অবচেতন মনের রাগ দুঃখ ঘৃণা ঈর্ষা দেখান না কেন, তিনি কিন্তু কখনো এই অবস্থায় রামের সামনে সীতাকে আনছেন না। নির্জনে রাম হতাশায় ভেঙে পড়ছেন, এমনকী লক্ষ্মণের কাছে নিজের মনের দুর্বলতা প্রকাশ করছেন, তাতেও কিন্তু রামের চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়নি; বরং মানবহৃদয়ের দুর্বলতার স্পর্শে তা আরও গভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মহাকাব্যের নিগূঢ় সৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম মাত্রাবোধে অত্যন্ত সচেতন বাল্মীকি। তিনি বিলক্ষণ জানেন, এই অবস্থায় রামের সামনে সীতাকে আনা যায় না। তাতে রামের চরিত্র লঘু হয়ে পড়বে। মহাকাব্য থেকে রাম তাহলে নেমে আসবেন আমাদের গ্রাম্য যাত্রার আসরে। বাল্মীকির রাম হয়ে পড়বেন ভবভূতির রাম।

তাই ওখানে সীতা রয়েছেন জেনেও কবি যেন ইচ্ছা করেই ভুলে গেলেন। সীতাকে দেখাচ্ছেন না। রামের শোক দুঃখের সাময়িক দমকা বাতাস থেকে কবি অত্যন্ত সন্তর্পণে যেন হাত দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন ওই কনক দীপশিখা সীতাকে।

এর আগেও আমরা দেখেছি, শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গার কূলে রামসীতাকে বিদায় দিয়ে সুমন্ত্র যখন ফিরে আসছেন, তখন সীতাকে সুমন্ত্রের সামনে আনছেন না। শিশুর মতো এক সরল উদাসীনতা নিয়ে কবি যেন ভুলে গেছেন সীতার কথা বলতে। কারুণ্যকে কাব্যের শ্রীকে কখনোই অত্যন্ত প্রকট করে ধরেন না বাল্মীকি। হয়তো কোথাও একটু বলে, কখনো বা কিছুই না বলে, আড়াল করে রাখেন। অথবা যেখানে বলার কথা সেখানে কিছু না বলে, অনেক পরে ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই কথাটাই নিপুণভাবে ব্যক্ত করেন। প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেন যে, তিনি ভোলেন আবার ভোলেন না। এই স্মরণ-বিস্মরণের আলো-ছায়ার মায়া দিয়ে কাব্যের আবেদনকে আরও নিবিড় করে ধরেন।

গঙ্গার কূলে বিদায় নিয়ে সুমন্ত্র যখন ফিরে গেলেন তখন সেখানে সীতার কিংবা লক্ষ্মণের কোনো কথা নেই; কিন্তু অযোধ্যায় ফিরে এলে দশরথ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুমন্ত্র, আসার সময় ওরা তোমাকে কে কি বলল?"

তখন সুমন্ত্র বলছেন, "মহারাজ, লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো, কোন অপরাধে রাম নির্বাসিত হলেন? রাজা স্বেচ্ছাচারীর মতো অত্যন্ত দুষ্কার্য করেছেন। একাজ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের ও নিন্দার কারণ হবে। আমি মহারাজের মধ্যে কোনো পিতৃত্ব দেখছি না। অহং তাবন্মহারাজ পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৮/২৬-৩১)

এবং সীতা সম্পর্কে বলছেন, "মহারাজ, তপস্বিনী জনকনন্দিনী কেবল ভূতাবিষ্টের মতো বিহ্বলচিত্তে বসেছিলেন। আমাকে তিনি কোনো কথাই বলেননি। আমি ফিরে আসছি দেখে তিনি তাঁর স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা কেঁদে উঠলেন। রাম যতক্ষণ আমাকে বিদায় দিচ্ছিলেন ততক্ষণ তপস্বিনী সীতা বারবার আমার দিকে এবং আপনার প্রেরিত রাজরথের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলেন।"

জানকী তু মহারাজ নিঃশ্বসন্তী তপস্বিনী।
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিস্মৃতা স্থিতা॥
অদৃষ্টপূর্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
তেন দুঃখেন রুদতী নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ॥
উদ্বীক্ষমাণা ভর্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা।
মমোচ সহসা বাষ্পং প্রযান্তমুপবীক্ষ্য সা॥
তথৈব রামাঽশ্রুমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ
স্থিতোঽব্রবীল্লক্ষ্মণ-বাহুপালিতঃ।
তথৈব সীতা রুদতী তপস্বিনী
নিরীক্ষতে রাজরথং তথৈব মাম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৮/৩৪-৩৭)

রোরুদ্যমানা তপস্বিনী জানকী ... ই করুণ মূর্তিখানা কবি সুমন্ত্রের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে

বর্ণনা করেননি। সৌন্দর্যের একটা সূক্ষ্ম মাত্রাবোধের উদাসীনতা দিয়ে তিনি তখন সীতাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরে সুমন্ত্রের সংলাপের মধ্যে সেই ব্যথার ছবিখানিই তিনি ফুটিয়ে তুললেন। তাই বলা চলে না আদিকবি উদাসীন। তাঁর স্মৃতি কখনো মৌন, কখনো মুখর।...

পরদিন গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সারাদিন তাঁরা পথ হাঁটলেন। অপরাহ্ন বেলায় তাঁরা এসে পৌঁছালেন গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থে।—"লক্ষ্মণ, মনে হয় আমরা প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের কাছে এসে গেছি। ওই দেখ যজ্ঞের সুগন্ধি পবিত্র ধূম উঠছে। আর ওই শোন, গঙ্গা যমুনার দুই স্রোতধারার সংঘর্ষে উত্থিত জলকলোচ্ছ্বাস। চল, আজ আমরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করি।"

এমন পরম অতিথি পেয়ে ঋষি ভরদ্বাজ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ত্রিকালদর্শী ঋষি তাঁদের নানাবিধ বন্য ফলমূল দিয়ে, অর্ঘ্য বৃষ ও পুণ্য উদক দিয়ে আপ্যায়িত করলেন।

—"কাকুস্থ রাম, আমি সব শুনেছি। আমি তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম। প্রয়াগ তীর্থের এই স্থান বড় রমণীয়। তোমরা এখানেই বনবাসের কাল সুখে অতিবাহিত করো।"

—"কিন্তু ভগবন্, এ স্থান অযোধ্যার অতি সন্নিকটে। অযোধ্যাবাসী দলে দলে এখানে আমাদের দেখতে আসবে। তাতে আশ্রমের শান্তি ও নির্জনতা বিঘ্নিত হবে। আপনি এমন কোনো নির্জন স্থান বলে দিন যেখানে আমরা নির্বিঘ্নে নিরিবিলি থাকতে পারব।"

—"তাহলে তোমরা চিত্রকূট যাও। এখান থেকে দশক্রোশ দূরে যমুনার ওপারে, মহর্ষিসেবিত শুভদর্শন পুণ্য সেই চিত্রকূট পর্বত। বহু মুনি ঋষি সহস্র সহস্র বৎসর, সেখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। সেই পর্বতের এমনই মহিমা, তার শিখরমালা দর্শন করলে মানবের চিরকল্যাণ হয়। সকল পাপ সকল মোহ থেকে মুক্তি হয়। মধু ফুল ফল বৃক্ষ সমন্বিত, বন্য হরিণ ময়ূর নিনাদিত, কিন্নরবাসিত পবিত্র চিত্রকূট। গুহাকন্দর শোভিত কোকিল কূজিত সেই বনে বনে কত নির্ঝরিণী। কণ্ঠহারের মতো প্রবাহিত মন্দাকিনী। রাম, চিত্রকূট তোমাদের বনবাসের স্থান বলে মনে করি।"

পরদিন প্রভাতে স্নেহময় পিতার মতো স্বস্ত্যয়ন ও আশীর্বাদ করে ঋষি তাঁদের বিদায় জানালেন।...

যমুনার উজানে পশ্চিম তীর ধরে হেঁটে চলেছেন তাঁরা। ছায়ানিবিড় ঘননীল কাননপথ। যমুনার নীল জলে আকাশের নীল মেঘের ছায়া।...

ভেলায় করে নদী পার হচ্ছেন।...

সীতা যমুনার জল মাথায় নিয়ে প্রার্থনা করছেন, "সূর্যতনয়া হে দেবী কালিন্দী, মা তুমি, আমাদের পার করে দাও। বনবাসব্রত যাপন করে রাম অযোধ্যায় ফিরে এলে আমি সহস্র ধেনু আর শত শত সুধাকলসে তোমায় পূজা করব।"

যমুনার এপারে এসে দেখেন, ঋষি ভরদ্বাজ যেমন বলেছিলেন, সমুন্নত সবুজ মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক বটবৃক্ষ। রক্তবর্ণ ফলে আর ঘনশ্যাম পত্রপল্লবে আকাশ আচ্ছন্ন। পদ্মরাগের সঙ্গে রাশিরাশি নীলকান্তমণির শোভা।

"রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং সপদ্মরাগঃ ফলিত বিভাতি।"

(রঘুবংশ, ১৩/৫৩)

ওই শ্যামবট প্রদক্ষিণ করে সীতা প্রণাম করলেন। "পুণ্যবান হে মহাবৃক্ষ! আমার স্বামীর ব্রত যেন সফল হয়। আমরা যেন আবার অযোধ্যায় ফিরে আসি।"

সীতা যেন মূর্তিময়ী প্রার্থনা। চলার পথে পথে গঙ্গায় যমুনায় জলে স্থলে বৃক্ষে পাদপে তিনি কেবল প্রার্থনা করে চলেছেন। ভারতের সকল পুণ্য সকল কল্যাণের সঙ্গে কবি সীতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ বলেছেন, "আমরা সকলেই সীতার সন্তান।... সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমান।" ('বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮-৯)

পথ চলায় আর কোনো ক্লান্তি নেই। অনেক পিছনে পড়ে রইল অযোধ্যা তার রাজ-ঐশ্বর্য আর দুঃখ বঞ্চনা নিয়ে। সম্মুখে এখন প্রসারিত শান্তি। নীল আকাশ, সবুজ বনানী, অসীম দিগন্ত। কত বিচিত্র তরুলতা, কত বর্ণের গন্ধপুষ্প, কত রঙের পাখির কূজন।

সীতা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন। অচেনা কোনো তরুগুল্ম, অজানা কোনো পুষ্পশালিনী লতা দেখে আনন্দে রামকে জিজ্ঞাসা করছেন, এ লতার নাম কী? এ কোন ফুল? লক্ষ্মণকে তুলে আনতে বলছেন। লক্ষ্মণ ছুটে গিয়ে পুষ্পমঞ্জরীভরা পত্রশাখা তুলে এনে সীতাকে দিচ্ছেন। বিচিত্র বালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা কত নদী নির্ঝরিণী—দেখে দেখে সীতা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—

> একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্।
> অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাঽবলা॥
> রমণীয়ান্ বহুবিধান পাদপান্ কুসুমোৎকরান্।
> সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ॥
> বিচিত্রবালুকজলাং হংস-সারসনাদিতান্।
> রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৫/২৯-৩১)

যমুনার কূলে সে রাত্রি অতিবাহিত করে তাঁরা এবার চিত্রকূটের দিকে চললেন।...

দূরে ওই চিত্রকূট পর্বত দেখা যাচ্ছে।

গর্বোৎফুল্ল বৃষরাজের মতো গম্ভীর মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে—চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ (রঘুবংশ, ১৩/৪৭)।

রাম বলছেন, "সীতা, ওই দেখ চিত্রকূট। বসন্তের রক্তপলাশে আর লাল কৃষ্ণচূড়ায় গাছে গাছে রঙের আগুন ধরেছে। অভ্রভেদী ধাতুরঞ্জিত সব শিখরমালা। রক্ত পীত নীল লোহিত মঞ্জিষ্ঠাবর্ণে শৃঙ্গগুলি মণিমুক্তার মতো ঝলমল করছে। রমণীয় এই গিরি দেখে আমার মনে রাজ্য হারানোর জন্য কোনো দুঃখ নেই। আত্মীয় পরিজন ছেড়ে দূরে এসেছি বলেও কোনো কষ্ট নেই।"

> আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্বতঃ পুষ্পিতান্নগান্।
> স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৬/৬)

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম॥
পশ্যেমমচলং ভদ্রে নানাদ্বিজগণাযুতম্॥
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্॥
কেচিদ্ রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ।
পীত-মঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৪/৩-৫)

হৃষ্টমনে তাঁরা তখন গিরিসন্নিকটে বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করলে, মহর্ষি তাঁদের সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন।...

কিন্তু এই ঋষি বাল্মীকি কে? ইনিই কি রামায়ণপ্রণেতা আদিকবি?

কিন্তু আদিকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গে এবং উত্তরকাণ্ডে আটাত্তর সর্গে আমরা জেনেছি, বাল্মীকির আশ্রম গঙ্গার অদূরে তমসার তীরে—"তদেতজাহ্নবী-তীরে ব্রহ্মর্ষীণাং তপোবনম্" (উত্তরকাণ্ড, ৪৭/১৫)। তমসা হল গঙ্গারই এক উপনদী। কিন্তু চিত্রকূটে মন্দাকিনীর তীরে তাঁর কোনো আশ্রমের কথা রামায়ণে তো নেই। তাই আর্যশাস্ত্র সংস্করণে মন্তব্য করা হয়েছে (পৃ. ৩৯৫), এই ঋষি বাল্মীকি রামায়ণের কবি বাল্মীকি নন।

অথচ অধ্যাত্মরামায়ণে আমরা দেখছি ইনিই আদিকবি বাল্মীকি। রামকে তাঁর আত্মপরিচয় দিয়ে জীবনের পূর্ববৃত্তান্ত সব বলছেন। (অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ)

বস্তুত আদিকবি তাঁর নিজের কথা রামায়ণে প্রায় কিছুই বলেননি। শুধু একবার রামকে বলেছেন, তিনি প্রচেতাব দশম পুত্র এবং বহু বৎসর তপস্যা করেছেন—

প্রচেতাসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃতা।

(উত্তরকাণ্ড, ৯৬/১৯-২০)

লক্ষ্মণও সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে ত্যাগ করে আসার সময় সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, বাল্মীকি রাজা দশরথের সখা, তিনি ব্রাহ্মণ ঋষি।

রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতূর্মে মুনিপুঙ্গবঃ॥
সখা পরমকো বিপ্র বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ।

(উত্তরকাণ্ড, ৪৭/১৬-১৭)

পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত তিনজন বাল্মীকির সন্ধান পেয়েছেন।

একজন হলেন বৈয়াকরণ বাল্মীকি।

এঁর কথা তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩০) তিন জায়গায় (৫/৩৬, ৯/৪, ১৮/৬) উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, হয়তো তিনি ব্যাকরণ লিখে থাকতে পারেন, কিন্তু রামায়ণ লিখেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয় আর একজন হলেন সুপর্ণ-বাল্মীকি। এঁর উল্লেখ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে আছে। সুপর্ণ হলেন ক্ষত্রিয় এবং যাযাবর জাতির—"কর্মণা ক্ষত্রিয়া"। এই সুপর্ণ-বাল্মীকি রামায়ণ প্রণেতা বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় একজন হলেন ভার্গব কবি।

শ্লোকাশ্চয়ং পুরা গীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৫৭/৪০)

মনে হয় ভার্গব ক্রমে কঠোরতপা ঋষিদের সাধারণ উপাধি হয়ে ওঠে। প্রচেতার পুত্র আদিকবি বাল্মীকিও ভার্গব। কেননা বরুণ আর প্রচেতা একই—"পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ" (কুমারসম্ভব, ২/১১) বলে কালিদাস বরুণকেই বুঝিয়েছেন। ভৃগুকেও বরুণের পুত্র বলা হয় (শতপথব্রাহ্মণ, ১১/৬/১/১)। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১৮/১) বলা হয়েছে, বরুণের পত্নী চর্ষণীর দুই পুত্র ভৃগু এবং বাল্মীকি—

চর্ষণী বরুণস্যাসীদ্‌যস্যাং জাতো ভৃগুঃ পুনঃ॥
বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদ্ভবৎ কিল।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৬/১৮/৪-৫)

তবে মহাভারতে রামায়ণ-প্রণেতা কবি বাল্মীকির কথা সুস্পষ্ট করে বারবার বলা হয়েছে। তাঁকে কঠোর তপস্বী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে—

অসিতো দেবলস্তাত বাল্মীকিশ্চ মহাতপাঃ।

(মহাভারত, বনপর্ব, ২০০/৪)

এই থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় প্রচেতার পুত্র তপস্বী মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি। তিনি কখনো দস্যু ছিলেন না।

অথচ একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, বাল্মীকি প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন। পরে ব্রহ্মার কৃপায় তপস্যা করে কবি ও ঋষি হন।

কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে চ্যবনের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। চ্যবন তপস্যারত অবস্থায় বল্মীকস্তূপে আবৃত হয়ে যান। বাল্মীকিও তপস্যাকালে বল্মীকে ঢাকা পড়েন। হয়তো এইজন্য কৃত্তিবাস দুইজনকে মিলিয়ে দিয়েছেন—

চ্যবন-মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর॥

*

'মরা মরা' বলিতে আইল রাম নাম।
পাইল সকল পাপের দস্যু পরিত্রাণ॥
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হতে তব নাম বাল্মীকি হইল।
বল্মীকেতে ছিলে যেই তেঁই এ বিধান।
সপ্তকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ॥

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড)

স্কন্দ পুরাণেও এই রকম একটা আখ্যান রয়েছে। বৈষ্ণব খণ্ডে বলা হয়েছে, কোনো এক ব্যাধ রাম নাম জপ করে পাপ মুক্ত হয় এবং পরে বাল্মীকি নামে যশস্বী হন।

প্রায় একই বৃত্তান্ত পাই অধ্যাত্মরামায়ণেও।

বাল্মীকি বলছেন—

অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতৈঃ সহবর্ধিতঃ।
জন্মমাত্রদ্বিজত্বং মে শূদ্রাচাররতঃ সদা।।

*

একাগ্রমনসাঽত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা।
সর্বসঙ্গাবিহীনস্য বল্মীকোঽভূন্মমোপরি।
বল্মীকাৎ সম্ভবো যস্মাদ্ দ্বিতীয় জন্ম তেঽভবৎ।

(অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬/৬১, ৭৪, ৭৭, ৭৯)

তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এও প্রায় একই রকম বলা হয়েছে—

জান যদি নাম প্রতাপু
ভয়উ সুদ্ধ কবি উল্টা জাপু।।
উলটা নামু জপত জগু জানা
বাল্মীকি ভএ ব্রহ্ম সমানা।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, দোঁহা ১৯৫)

আনন্দরামায়ণে (১৪ অধ্যায়ে) বাল্মীকির তিন জন্মের কথা বলা হয়েছে। প্রথম জন্মে ছিলেন স্তম্ভ নামে এক ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় জন্মে শূদ্রাচারী ব্যাধ। তৃতীয় জন্মে কৃণুর পুত্র, তপস্যা করে কবি বাল্মীকি হন।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বাল্মীকি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, তিনি এক সময়ে কতিপয় মুনিকে "ব্রহ্মঘ্ন" বলে তিরস্কার করেন। মুনিগণ তাঁকে অভিশাপ দেন। তখন বাল্মীকি শিবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব তাঁকে শাপমুক্ত করে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, তুমি শ্রেষ্ঠ যশ লাভ করবে। (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ১৮/৮-১০)

যাই হোক, মহৎ পুরুষের জীবন নিয়ে চিরকালই এমন কত সম্ভব অসম্ভব গল্প উপাখ্যান তৈরি হয়ে এসেছে। তা অনেক সময় এতদূর উদ্ভট ও আজগুবি হয়ে দাঁড়ায় যে, শেষ পর্যন্ত যাঁর জীবন নিয়ে এত কথা তিনি নিজেই হয়তো নিজেকে আর চিনতে পারেন না। বাল্মীকি দস্যু না তপস্বী? ঋষি না কবি? ব্যাধ না ব্রাহ্মণ? যাই হন, শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের কাছে রামায়ণের কবি—আদিকবি। এই তাঁর শাশ্বত পরিচয়।

একুশ

সোনার পাদুকা

চিত্রকূট পর্বতকাননে রামের পর্ণকুটির। চারিদিকে শান্ত বনশ্রী। আম জাম লোধ্র পিয়ালের নিবিড় ঘন ছায়া। পুষ্পিততরু কদম্ব কেতকী। ফলভারে আনত কত মধুক বিল্ব। রসাল যত পনস তিলক। মন্দাকিনীর জলে অজস্র পদ্মের শোভা। উপকূলে লোধ্ররেণু ছড়ানো ভূর্জপত্রের উত্তরচ্ছদ। মধুগন্ধে পুষ্পাসারে বিহঙ্গ বিহগে চিত্রকূট যেন কুবেরের অলকা অথবা ইন্দ্রের অমরাবতী।

সীতার হাত ধরে রাম বলছেন, ''প্রিয়ে, আমি যদি লক্ষ্মণকে নিয়ে চিরকাল এমনি করে তোমার সঙ্গে চিত্রকূটে থাকি তাহলে আমার মনে কোনো কষ্ট থাকবে না।...এই মন্দাকিনী তোমার চেয়েও সুন্দর। আর এই চিত্রকূটে বাস আমার অযোধ্যাবাসের চেয়েও সুখের।... তোমার সঙ্গে মন্দাকিনীর শীতল জলে স্নান করব। বনের মধু ও ফলমূল খেয়ে সুখে থাকব। এ জীবন ছেড়ে আমি অযোধ্যা চাই না, রাজত্বও চাই না।''...

> যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে।
> লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধর্ষ্যতি।।
>
> (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৪/১৫)
>
> দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
> অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ।।
> ...
> উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধু-মূল-ফলাশনঃ।
> নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ।।
>
> (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৫/১২, ১৭)

রাম নির্জন পর্বতের শিলাসনে বসে সীতার সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় হঠাৎ কিসের কোলাহল। সমস্ত বনভূমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বৃক্ষশাখায় পাখিরা সব ভয়ে কলরব করে আকাশে উড়তে লাগল। অরণ্যভূমি আলোড়িত করে বন্যপ্রাণীরা ভয়ে পালাতে লাগল।

রাম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, ''লক্ষ্মণ, দেখ তো, কিসের শব্দ। সারা বনভূমি এমন ভয়ার্ত হয়ে উঠল কেন? কোনো রাজা অথবা রাজপুত্র কী বনের মধ্যে শিকারে এসেছে?''

লক্ষ্মণ একটা উন্নত শালবৃক্ষে উঠে দূরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, ''পর্ণশালার আগুন নিভিয়ে দিন। সীতাদেবী, গুহার মধ্যে লুকিয়ে পড়ুন। রাঘব, আপনি কবচ ধারণ করুন। ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।''

—"সৌমিত্র, সৈন্যদলের কোলাহল শুনছি। কোন রাজার সৈন্যদল ওরা?"

—"রাঘব, দূরে ওই সেনাবাহিনীর রথের উপরে উড়ছে কবিদারধ্বজা।"

—"সে তো অযোধ্যার রাজপতাকা!"

—"ওই যে, রথের পুরোভাগে শত্রুঞ্জয় হস্তী।"

—"পিতা দশরথের প্রিয় হস্তী শত্রুঞ্জয়?"

—"হাঁ, রাঘব। রথ অশ্ব হস্তী নিয়ে সহস্র সহস্র সৈন্য আমাদের কুটিরের দিকে এগিয়ে আসছে। যার জন্য আপনার এই বনবাসের লাঞ্ছনা, সেই চিরশত্রু ভরত আসছে আমাদের বধ করতে। কিন্তু আসুক ভরত। আমি তাকে বধ করব। রাজ্যকামুক কৈকেয়ী দেখবে, তার পুত্র আজ আমার হাতে নিহত হয়েছে। কুব্জা মন্থরা আর কৈকেয়ীকেও বিনাশ করব। শত্রু ভরতকে বধ করলে কোনো পাপ হবে না। ভরতকে নিহত করে আজ আমি আমার ধনুর্বাণের ঋণ শোধ করব। শরাণাং ধনুষশ্চাহমনৃণোঽস্মিন্।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৬/১৬-৩০)

লক্ষ্মণ ক্রোধে উত্তেজিত।..

যদিও রাম-লক্ষ্মণ অভিন্ন হৃদয়---সুখে দুঃখে নিত্য সঙ্গী। দুজনের মধ্যে যেন একটা সূক্ষ্ম মৃণালতন্তুর ব্যবধানও নেই। কিন্তু দুজনের স্বভাব বৈশিষ্ট্য কত আলাদা। লক্ষ্মণের কণ্ঠস্বর রামের মতো গম্ভীর হলেও তাতে রয়েছে একটা ক্রুদ্ধ উদ্ধত ব্যক্তিত্বের ঝাঁজ। একটা একরোখা ভাব। লক্ষ্মণ আবেগে চালিত হন। হৃদয় তাঁর আগে কথা বলে। মেধার বুদ্ধি আসে পরে। অথবা হয়তো আসেও না। কিন্তু রাম গম্ভীর সমুদ্র। রামের ভাবাবেগ সংহত শাসিত নিয়ন্ত্রিত। রাশটানা ঘোড়ার মতো, তাতে তীব্র গতি আছে কিন্তু নেই কোনো উদ্ভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা। রাম যখন কথা বলেন, মনে হয় যেন নির্মোহ অন্তরাত্মা কথা বলছে।

রাম শান্ত কণ্ঠে আদেশ করলেন, "সৌমিত্র, বৃক্ষ থেকে নেমে এসো। ভরত যদি আসে তাহলে আমাদের অস্ত্রের কি প্রয়োজন? রাজত্বের জন্য ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? রাজত্ব তো তুচ্ছ। জানবে, ভরত শত্রুঘ্ন আর তুমি, ছাড়া আমার জীবনে অন্য কোনো সুখ নেই। তোমাদের ছেড়ে আমার সকল সুখে আগুন লাগুক।"

যদ্ বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্ন বাপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৭/৮)

—"আমার মনে হয় ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমাকে দেখতে আসছে। তার মনে কোনো শত্রুভাব আছে আমি বিশ্বাস করি না। সে কি কোনো দিন তোমার কোনো অনিষ্ট করেছে? তবে আজ কেন এসব কথা ভাবছ? তুমি ভরতকে কোনো নিষ্ঠুর কথা বলবে না। বললে তা আমাকেই বলা হবে।

"আর রাজত্বের জন্যই যদি এমন কথা বলে থাক, তাহলে আমি ভরতকে বলব, তুমি লক্ষ্মণকেই রাজত্ব দিয়ে দাও। আমি বললে সে নিশ্চয়ই সম্মত হবে।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৭/৯-২০)

রামের এই ভর্ৎসনায় লক্ষ্মণ লজ্জায় সংকুচিত হয়ে একেবারে নিজের মধ্যে মিশে গেলেন (প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া)। লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "তাহলে বোধ হয় পিতা নিজে আপনাকে দেখতে আসছেন।"

—"হয়তো তাই। আমাদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে বোধহয় পিতা স্বয়ং আসছেন। আমি না গেলেও অন্তত সীতাকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। পিতার প্রিয় হস্তী ও অশ্ব দুটি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বথেব উপরে তাঁর সেই লোকবিখ্যাত শুভ্র রাজচ্ছত্র কই? তবে কি?... আমার মনে সংশয় হচ্ছে।"

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় রামের বুকখানি যেন শূন্য হয়ে যায়।...

এমন সময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে ভরত রামের চরণদুটি ধরে কেঁদে উঠলেন। শোকে দুঃখে শীর্ণ দেহ। শ্রান্ত ঘর্মাক্ত বিবর্ণ মুখ। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ভরত শুধু বললেন, "আর্য"—

রাম প্রথমে চিনতে পারলেন না। কতকাল তিনি তাঁর এই প্রবাসী ভাইকে দেখেননি। শত্রুঘ্ন প্রণাম করছে। তাঁর পিছনে সুমন্ত্র। ওই তো, দুই চোখে দৃষ্টির আশীর্বাদ নিয়ে অগ্নিশিখার মতো দাঁড়িয়ে আছেন গুরুদেব বশিষ্ঠ। তাঁর পাশে অশ্রুমুখী বিষাদমূর্তি কৌশল্যা ও সুমিত্রা। আর সবার পিছনে শীতের ম্লান ছায়ার মতো লজ্জিত করুণমুখে দাঁড়িয়ে কৈকেয়ী।

রাম আবিষ্ট বিহ্বল।...

তাঁর দুই চোখে জল।...

তিনি আকুল বক্ষে ভরতকে আলিঙ্গন করে বললেন, "ভরত, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার! এমন বিবর্ণ মলিন কৃশ হয়ে গেছ কেন? আমি তো তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম। কিন্তু তোমার এই বেশ কেন? কৃষ্ণাজিন জটাধারী সন্ন্যাসীর মতো কেন এসেছ?"

অশ্রু-আকুল কণ্ঠে ভরত বললেন, "আর্য, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, পিতৃতুল্য। আপনার চরণে মাথা রেখে মিনতি করছি, হতভাগ্য আমি, আপনার এই ভ্রাতা এই শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হন। আমার মাতা মহাপাপ করেছেন। তিনি নরকগামী হবেন। তাঁরই প্ররোচনায় পিতা আপনাকে নির্বাসিত করে দুষ্কর্ম করেছেন। সেই অনুতাপে পুত্রশোকে পিতা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমার বিধবা মাতৃগণ, অযোধ্যার সকল প্রজা ও মন্ত্রীমণ্ডলী সবাই এসেছেন আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আপনি প্রসন্ন হযে রাজপদে অভিষিক্ত হন। আপনি অগ্রজ, ধর্মানুসারে আপনিই অযোধ্যার রাজা। আমরা আপনার অনুগত সেবক মাত্র।"

পিতৃশোকে মুহ্যমান রাম পাথর মূর্তির মতো বসে রইলেন। কেবল তাঁর দুই চোখে অবিরল অশ্রুধারা।..

বুকের মধ্যে শোকের সমুদ্র নিথর করে রাম বললেন, "ভরত, তুমি মাতৃনিন্দা করো না। পিতা মাতার কর্মের দোষ দেখতে নেই। পুত্রের প্রতি পিতা যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। তুমি আমি দুজনেই পিতৃবাক্যে সত্যবদ্ধ। আমি যেমন পিতার বাক্য লঙঘন করতে পারি না, তুমিও পারো না। জানবে, পিতার আদেশ, সিংহাসন এবং বনবাস আমরা যদি সুপুত্র হই, তবে তার অন্যথা তুমিও করতে পার না, আমিও কবতে পারি না। তুমি ধর্মজ্ঞ, পিতা মাতার প্রতি গৌরব প্রদর্শন কর।"

যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসংকৃতে।
তাবদ্ ধর্মকৃতং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০১/২১)

তখন পিতার জলতর্পণ করার জন্য শোকার্ত রাম মন্দাকিনীর দিকে চললেন। সুমন্ত্র তাঁর হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। সীতার হাতে একখণ্ড নূতন চীরবস্ত্র। লক্ষ্মণের হাতে কুশ ও তিলকল্ক।

মন্দাকিনীর ঘাটে দক্ষিণমুখে দাঁড়িয়ে অঞ্জলিভরে জল নিয়ে রাম বললেন, "নরশ্রেষ্ঠ পিতা, আমার এই উদকাঞ্জলি গ্রহণ করুন। এই নির্মল জল পিতৃলোকে অক্ষয় হোক।"

স্নান করে কূলে এসে রাম আস্তীর্ণ কুশের উপরে তিলকল্ক মিশ্রিত ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড দান করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মহারাজ, বনের এই ইঙ্গুদীফলই এখন আমাদের একমাত্র আহার। মানুষ নিজে যা আহার করে, পরলোকে পিতৃগণ ও দেবগণও তাই আহার করেন।"

তর্পণ ও পিণ্ডদান করে রাম সীতা ভ্রাতৃগণের সঙ্গে কুটিরে ফিরে এলেন।

পরদিন আবার সকলে রামকে ঘিরে সমবেত হলেন।

ভরত সকাতরে রামকে বললেন, "পিতা যে রাজ্য আমাকে দিয়ে গেছেন, আমি আপনাকে তা প্রদান করছি। আপনি অযোধ্যার সিংহাসন গ্রহণ করুন। আমার মায়ের অপবাদ মোচন করুন। পরলোকগত পিতার মনস্তাপ দূর করে শান্তি দিন। আমাদের সকলের প্রতি দয়া করুন।"

—"না, ভরত। তা হয় না। পিতা নেই, কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখো। তুমি রাজা হও। দুঃখ করো না, আমিও তো রাজা। তুমি অযোধ্যার মানুষের রাজা, আর আমি এই দণ্ডকারণ্যের শ্যামবনানীর অধিরাজ। তোমার মাথার উপরে শুভ্র রাজচ্ছত্র, আর আমার মাথার উপরেও এই সবুজ অরণ্যের স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপ।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭/১৭-১৮)

এমন সময় দশরথের পুরোহিত মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতম ঋষি জাবালি বললেন, "রাম, সমগ্র অযোধ্যা তোমার জন্য একবেণীধরা শোকাতুরা নারীর ন্যায় অপেক্ষা করছে। তুমি রাজত্ব গ্রহণ কর। পুরুষার্থভোগে উদাসীন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করো না। তোমার এই পিতৃসত্য পালনের যুক্তি আমি বুঝি না। একটা নিরর্থক আদর্শকে আঁকড়ে রয়েছ। ভেবে দেখো, কে কার পিতা? মানুষ একা জন্মায়, একা মরে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী এই সব সম্পর্ক নেহাত একটা মনগড়া লৌকিক সংস্কার মাত্র। পৃথিবীতে কে কার? আজ আছি, কাল নেই। মনে করো তুমি এক দূরের পথিক, গ্রামের পথে যেতে যেতে পথের ধারে একটা কুঁড়ে ঘরের মাটির দাওয়ায় রাতটা কাটালে। পরদিন সকালে উঠে আবার চলে গেলে। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও তেমনি দুই দণ্ডের সম্পর্ক। এর মূল্য কি? যদি বল, পিতা হলেন জন্মদাতা। কিন্তু সে তো একটা জৈবিক ব্যাপার। পিতা মাতা নিমিত্ত কারণ। মাতৃগর্ভে শুক্র ও শোণিত উপাদান কারণ। সুতরাং তাদের প্রতি তোমার কিসের দায়িত্ব? শ্রাদ্ধ দান যজ্ঞ পূজা এসবের কি প্রয়োজন? শুধু সময় আর সামগ্রীর অপচয়। ইহলোক ছাড়া পরলোক বলে কিছু নেই। সত্য ধর্ম তপস্যা এসব নিছক শাস্ত্রকথা। কিছু চতুর মেধাবী ব্যক্তি লোক ঠকাবার জন্য এই সব শাস্ত্র লিখেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষবাদী বুদ্ধিমানের মতো তুমি ভরতের অনুরোধ রাখো। রাজত্ব গ্রহণ করো।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৮ সর্গ)

ঋষি জাবালির কথা শুনে আশ্চর্য হতে হয়। এ যেন আধুনিক কালের কোনো নাস্তিক ভোগবাদী hedonist-এর কথা। ঘোর কলিযুগে মানুষের চিন্তার গতি যে কোন দিকে যেতে

পারে, জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যে কীভাবে বেঁকে যেতে পারে, তাই যেন সত্যদ্রষ্টা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কতকাল আগে তা লিখে গেছেন। অবশ্য অনেকে মনে করেন, জাবালির উপাখ্যান রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত। কেননা তাঁরা বলেন, রামচন্দ্র জাবালিকে নাস্তিক বুদ্ধ মতাবলম্বী চোর বলে তিরস্কার করেছেন, "যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি" (২/১০৯/৩৪)। কিন্তু রামায়ণ রচিত হয়েছিল বুদ্ধের জন্মের অনেক আগে। অতএব এই অংশ পরবর্তী কালের সংযোজন। তবে এমন কথাও বলা যায় যে, 'বুদ্ধ' একটি উপাধি, যেমন 'ভার্গব' 'জনক' এক একটি উপাধি। বিশেষ বিশেষ সিদ্ধ মুনি ঋষিকে তাঁদের উপলব্ধি ও তপস্যার কঠোরতা নির্দেশ করতে কাউকে বলা হত 'বুদ্ধ' কাউকে-বা 'ভার্গব'। যেমন, রাজর্ষিপ্রতিম রাজাকে সাধারণভাবে 'জনক' বলা হত। সেকালে অনেক রাজারই নাম ছিল জনক, অনেক ঋষিকেও ভার্গব বলা হত। তেমনি অনেকেই 'বুদ্ধ' হয়েছেন। রামের তিরস্কারে উদ্দিষ্ট যে বুদ্ধ তিনি হয়তো আমাদের শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধ নন!

যাই হোক, জাবালির কথা শুনে রামের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আপনি আমার প্রিয়কামনায় যেসব কথা বলেছেন তা ন্যায়ের মতো শোনালেও আসলে তা অন্যায়, অকার্য, অকর্তব্য। আমি যদি অধর্ম কার্য করি তাহলে লোকনিন্দিত স্বর্গভ্রষ্ট হব। সত্যই ধর্মের মূল। সত্যই ঈশ্বর। সত্যেই জগৎ ধরা আছে। বেদশাস্ত্র সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই আমি পিতৃসত্য ভঙ্গ করতে পারব না। আপনার মতো একজন বেদবিদ্বেষী নাস্তিককে পুরোহিত ও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করে পিতা দশরথ অন্যায় করেছেন।"

রামকে ক্রুদ্ধ দেখে বশিষ্ঠ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "রাম, জাবালি নাস্তিক নন। তিনি শুধু তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার জন্যই ওসব বলেছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব চিরবিখ্যাত। রঘুবংশে চিরকাল জ্যেষ্ঠই রাজা হয়ে থাকেন। তুমি থাকতে কনিষ্ঠ ভরতের অভিষেক হতে পাবে না। তুমি তোমার কুলধর্ম নষ্ট করো না। আমি তোমার আচার্য গুরু পিতৃতুল্য, আমার কথা রাখলে তোমার কল্যাণ হবে। রাজ্যের প্রজাপরিষদ মন্ত্রী অমাত্য জ্ঞাতি সকলের অনুরোধ রক্ষা কর।"

স তেহং পিতুরাচার্যস্তব চৈব পরন্তপ।
মম ত্বং বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্॥
ইমা হি তে পরিষদো জ্ঞাতয়শ্চ নৃপাস্তথা।
এষু তাত চরন্ ধর্মং নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১১১/৪-৫)

রাম তবুও সম্মত হচ্ছেন না দেখে, ভরত সকলকে স্তম্ভিত করে বললেন, "সুমন্ত্র, এই অঙ্গনে কুশ বিছিয়ে দাও। আমি অনশন করে আমরণ এই কুটির দ্বারে বসে থাকব। রাম যদি সম্মত না হন, তাহলে এখানেই আমি মৃত্যু বরণ করব।"

সুমন্ত্র রামের দিকে তাকালেন। রাম ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। তখন সুমন্ত্র বিলম্ব করতে লাগলেন। তাই ভরত নিজেই মাটিতে কুশ বিছিয়ে মৃত্যুপণ করে প্রায়োপবেশনে বসলেন।

রাম বিচলিত হয়ে বললেন, "ভরত, এ কি করছ? আমি তোমার কি করেছি যে আমার কুটিরদ্বারে তুমি অনশন করে উপবেশন করে থাকবে? ওঠ, এই ভয়ংকর ব্রত ত্যাগ কর। এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।"

ভরত তবু উঠলেন না।

সমবেত জনপদবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনারা কেন রামকে অনুরোধ করছেন না? সকলে নীরব হয়ে আছেন কেন?"

—"আমরা কি বলব বুঝতে পারছি না। আপনার বক্তব্য যথার্থ। আবার রামচন্দ্রের সংকল্পও যথার্থ। আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারছি না।"

পুরবাসীদের কথা শুনে রাম বললেন, "এইসব সুহৃদগণের কথা শোন। প্রায়োপবেশনের সংকল্প ত্যাগ করো। ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাকে স্পর্শ করে এই জল আচমন করো।"

ভরত তখন জলস্পর্শ করে কুশাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সকলের দিকে তাকিয়ে কাতর ভাবে বললেন, "মন্ত্রী, অমাত্য ও প্রজাগণ, আপনারা সকলে শুনুন, আমি রাজা হতে চাইনি। আমার জননীকেও কোনো পরামর্শ দিইনি। রামের বনবাসেও আমার সম্মতি নেই। তবু যদি বনবাস করলে পিতৃসত্য পালন হয়, তাহলে আমিই চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হব।"

রাম বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা জীবিত অবস্থায় যে বিধান করে গেছেন, তার অন্যথা আমিও করতে পারি না, ভরতও করতে পারে না। সত্য অলঙ্ঘনীয়। সত্যের কোনো বিকল্প নেই। তা হবে নিন্দনীয় কপটতা।"

—"কিন্তু আর্য, এই বিশাল রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনে আমার উৎসাহ নেই। তাছাড়া সমস্ত প্রজা আপনারই অপেক্ষা করছে। তাই আমি অনরোধ করি, আপনি অন্য কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সিংহাসনের দায়িত্ব দিন।"

স্নেহবিহ্বল রাম ভরতকে আলিঙ্গন করে বললেন, "ভরত, তুমি বুদ্ধিমান, বিনয়ী। রাজ্যশাসনে তুমিই সুযোগ্য। মন্ত্রী অমাত্যদের পরামর্শ ও সাহায্য নিয়ে তুমি রাজকার্য পরিচালনা করো। তুমি মাতা কৈকেয়ীর প্রতি পুত্রের যোগ্য ব্যবহার কোরো। তিনি ইচ্ছা করে অথবা লোভের বশে এমন করেছেন মনে ভেবো না। কখনো তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ো না। আমার ও সীতার শপথ রইল।"

> কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
> ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ॥
> মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরুতাং প্রতি।
> ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন।
>
> (অযোধ্যাকাণ্ড, ১১২/১৯, ২৭-২৮)

এমনি করে রাম ভরতের মনের গ্লানি মুছে দিলেন।

ভরত রামের চরণ ধরে বললেন, "আর্য, এই হেমভূষিত পাদুকায় আপনার চরণ রাখুন। এই পাদুকা সর্বলোকের কল্যাণ ও মঙ্গল বিধান করবে। এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ। এই পাদুকায় রাজ্যভার অর্পণ করে, জটাচীরধারী সন্ন্যাসী হয়ে কেবল ফলমূল আহার করে, নগরের বাহিরে আপনার জন্য চতুর্দশ বৎসর অপেক্ষা করব। যেদিন চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হবে সেদিন আপনাকে যদি না দেখি তাহলে অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

রাম ভরতকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিয়ে বললেন, "তথেতি। বেশ, তাই হবে।"

হস্তীপৃষ্ঠে রামের পাদুকা স্থাপন করে ভরত ফিরে চলেছেন।

রাম অটল হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চোখে জল, মুখে স্মিত হাসি।

বাইশ

মরা থেকে রাম

রামের পাদুকা বহন করে ভরতের রথ স্নিগ্ধ গম্ভীর রবে অযোধ্যায় প্রবেশ করল। কিন্তু চারিদিকে এক অভিশপ্ত নির্জনতা। অযোধ্যা অন্ধকার। রাজপথে কোনো লোকজন নেই। সমস্ত গৃহবাট রুদ্ধ। একটা অশুভ বিভীষিকাব মতো কেবল শৃগাল আর পেচকের নিঃশব্দ আনাগোনা। নিরানন্দ নিষ্প্রভ নগরী যেন শূন্য যজ্ঞবেদী। অথবা ভগ্নপানপাত্রের মতো শ্রীহীন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। রামহীন অযোধ্যায় আর কোনো গৌরব নেই।

তাই বিষণ্ণ ভরত মাতৃগণকে রাজভবনে রেখে রথ ঘুরিয়ে নিয়ে অযোধ্যার অদূরে পূর্বদিকে নন্দিগ্রামে চললেন।

নন্দিগ্রামে উপস্থিত হয়ে রামের সোনার পাদুকা সিংহাসনে অভিষেক করে স্থাপন করলেন। বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীগণকে বললেন, "অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র। এই পাদুকা তাঁর প্রতিনিধি। আমি তাঁর সেবক ও কিংকর মাত্র। এই পাদুকার উপরে ছত্র ধারণ করে আমি তাঁরই আগমনের অপেক্ষায় থাকব। যেদিন তিনি ফিরে আসবেন, তাঁর চরণে এই পাদুকা পবিয়ে দিয়ে তাঁকে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করে আমি গতপাপ হব।"

জটাবল্কলধারী সন্ন্যাসী ভরত একবেলা মাত্র ফলমূল আহার করেন। রাজকার্যের সকল বিষয় এবং রাজাকে প্রদত্ত সম্মান উপঢৌকন সব ওই পাদুকায় নিবেদন করেন।

অযোধ্যার রাজসিংহাসন নিয়ে যে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, ভরত তার শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি দিয়ে তার আশ্চর্য সমাধান করলেন। ওই জটিল সমস্যার ভিতর থেকে বাল্মীকি রামায়ণে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিধানে এক অপূর্ব গরিমা ও মহিমা স্থাপন করলেন। এ কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব। রাজনৈতিক সমস্যাকে ভারতবর্ষ তার অন্তরের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে সমাধান করেছে। ভারতের জাতীয় জীবনের ন্যায় ও নীতির এক জীবন্ত মানুষী মূর্তি হলেন ভরত। শ্রী অরবিন্দ যথার্থই বলেছেন, ..."Bharata the living human image of its ethical ideals; it has fashioned much of what is best and sweetest in the national character..." (*The Foundations of Indian Culture*, 1959, p. 332) তাই ভরতকে বলা হয় বিষ্ণুর হাতের জয়শঙ্খ। শঙ্খাবতার ভরত। (অধ্যাত্মরামায়ণ, ৩/২/১৬)

এদিকে চিত্রকূট থেকে ভরতকে বিদায় দেওয়ার পর রাম দেখলেন, তপোবনের ঋষিদের মধ্যে কেমন যেন একটা শঙ্কাকুল ভাব। তাঁরা রামকে দেখলেই সসম্ভ্রমে দূরে সরে যান। পরস্পর কি যেন সব আলোচনা করেন। তাঁদের চোখে মুখে উদ্‌বেগ আর ঔৎসুক্য। চলাফেরায় সন্ত্রস্ত ভাব।

তাই রাম এক বৃদ্ধ তপস্বীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবন্, আমরা কি এখানে আপনাদের কোনো অসুবিধা করছি?"

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না না, বৎস, তা নয়। তবে তোমার জন্যই আমরা ভীত ও চিন্তিত হয়ে উঠেছি। এই জনস্থানে রাক্ষসের উপদ্রব হয়েছে। রাবণের ভ্রাতা রাক্ষস খর এই অঞ্চলে থাকে। তারা তপস্বীদের নানাভাবে উৎপীড়ন করছে। অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপ করে ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করছে। সুযোগ পেলে নিরীহদের হত্যা করছে। তোমার উপরেও তাদের আক্রোশ আছে। তাই আমরা স্থির করেছি, আর এখানে থাকব না। দূরে অশ্বমুনির আশ্রমে চলে যাব। তোমাদেরও সেখানে চলে যাওয়া উচিত।"

এই বলে একদিন চিত্রকূট থেকে ঋষিরা সব চলে গেলেন। রাম লক্ষ্মণেরও আর এখানে থাকতে ভাল লাগল না। তাছাড়া ভরতের সৈন্যসামন্ত এসে এই শান্ত আশ্রমকে কেমন যেন তছনছ করে দিয়ে গেছে।

চিত্রকূট ত্যাগ করে রাম প্রথমে অত্রিমুনির আশ্রমে গেলেন। ঋষির স্নেহে আতিথ্যে তাঁরা একরাত্রি বাস করলেন। ঋষিপত্নী অনসূয়া সীতাকে অনেক আদর যত্ন করলেন। দিব্যবস্ত্রে গন্ধে মাল্যে অনুলেপনে ভূষিতা করলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁরা অত্রিমুনির আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে দণ্ডকারণ্যের গভীর বনে প্রবেশ করলেন। সূর্য যেন ঘনমেঘের আড়ালে অন্তর্হিত হল—প্রবিবেশ সূর্য ইবাভ্রমণ্ডলম্।

রামায়ণের কাহিনি এবার অরণ্যের ভয়াল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। একটা আতঙ্কিত রহস্যময়তা। একদিকে ঋষিদের তপস্যা তেজ ও ব্রাহ্মীশ্রী, তাঁদের আশ্রমমণ্ডলের শান্তি ও সমাহিতি; অপরদিকে সেসব ঘিরে ঘনিয়ে এসেছে ঘোর যত ভীতি ও বিভীষিকা, শঙ্কা ও সন্ত্রাস। বেদমন্ত্রের ওঙ্কার ধ্বনিকে বিঘ্নিত করে, আতঙ্কিত বনভূমিকে কাঁপিয়ে, মাঝে মাঝেই উঠছে রাক্ষসের হুংকার। রামায়ণ কাহিনিতে এক নূতন মাত্রা যোজনা করলেন কবি।

এই মহারণ্য, তার ভীতিকর অন্ধকার, সেই অন্ধকারের ভিতরে আবার কত বিভৎসতার সঞ্চার, সব মিলে যেন প্রতীকী হয়ে উঠেছে। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে আমরাও যেন অন্তর্জগতের এক নিরন্ধ্র প্রাণলোকের মধ্যে প্রবেশ করি।

এখন থেকে আমাদের চলার পথে পায়ে পায়ে কেবল অন্ধকার গহ্বর, বিক্ষিপ্ত যত মৃত্যুর করোটি কঙ্কাল। রাক্ষসসমাকুল এই দণ্ডাকারণ্য হল সাধকের আধ্যাত্মিক সাধনভূমি। যেখানে দেবতা ও দানব, ঋষি ও রাক্ষস একত্র বাস করে।

> The human godhead with star-gazer eyes
> Lives still in one house with the primal beast.
>
> (Sri Aurobindo, *Savitri,* VII, 6)

অরণ্যের আধ্যাত্মিক অর্থ অন্তর্জীবন। 'অর' এবং 'ণ্য' স্বর্গপথের দুই সীমা। দুর্গম সেই আধ্যাত্মিক অরণ্য মোহ-অন্ধকারে আবৃত। শোক হর্ষের শীত গ্রীষ্মে, সেখানে কত সুখ-দুঃখের বিচিত্র ফুল ফুটে আছে। তার মধ্যে আবার বিচরণ করছে যত সরীসৃপের মতো লোভ আর ব্যাধি। কাম আর ক্রোধের রাক্ষসরিপু। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বের সাতাশ অধ্যায়ে রয়েছে তার বিচিত্র বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিও কি তারই নির্জন মর্মর?"

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা,
সে বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্য স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।

('প্রভাত সংগীত', ''হৃদয়-অরণ্য'')

আখ্যানের মধ্যে তত্ত্ব. রূপেব মধ্যে রূপকের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এসব অলীক, না প্রতীক?

অত্রিমুনির আশ্রমের তাপসগণ রামকে দূর থেকে বনের পথ দেখিয়ে বলছেন, ''ওই মহারণ্যে যেসব তপস্বীরা অশুচি বা অসাবধানে থাকেন, রাক্ষসেরা নানা রূপ ধরে তাঁদের ভক্ষণ করে।''

বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে বালাশ্চ রুধিরাশনাঃ॥
উচ্ছিষ্টং বা প্রদত্তং বা তাপসং ব্রহ্মচারিণম্।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৯/১৯-২০)

বাল্মীকির এই ইঙ্গিতকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অধ্যাত্মরামায়ণে। মুনিগণ রামকে বলছেন, ''রাক্ষসেরা ঋষিদের তপস্যার ত্রুটি বা ছিদ্র অন্বেষণ করে ফেরে। যেসব তপস্বীর চিত্ত সমাহিত নয়, কিংবা যাঁদের চিত্তে কোনো অপবিত্রতা আছে, রাক্ষসেরা তাঁদের খুঁজে খুঁজে গ্রাস করে ফেলে।''

রাক্ষসৈর্ভক্ষিতানীশ প্রমত্তানাং সমাধিতঃ।
অপ্রাযত্যং মুনীনাং তে পশ্যন্তোহনুচরন্তি হি॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ, ৩/২/২১)

তপস্যার ত্রুটি ধরে বিনাশ করবার জন্য যেমন রয়েছে সব রাক্ষসের ভয় তেমনি আবার সাধনার আসন থেকে টলিয়ে দেবার জন্য, তপঃপ্রভাব খর্ব করবার জন্য, রয়েছে দেবতাদের কত মুগ্ধকর প্রলোভন। আমরা দেখেছি দণ্ডকারণ্যের সেই মাণ্ডকর্ণি ঋষি, যিনি রাক্ষসের ভয়কে জয় করেছিলেন ঠিকই কিন্তু বদ্ধ হয়েছিলেন দেবতার প্রলোভনে পঞ্চ অপ্সরার নৃত্যগীতমুখর পঞ্চমায়ার জালে। (অরণ্যকাণ্ড, ১১/১-১৯)

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করতেই রাম দেখলেন, সামনে এক ভয়াল মূর্তি। ওই মহারণ্যের সবখানি বিভৎসতা যেন রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিকট সে রাক্ষস মূর্তি। যেম একটা অন্ধকার পাহাড়। গুহার মতো দুই চোখ। বিশাল উদার। নরকের মতো বিস্ফারিত মুখ। পরনে রক্তচর্বিমাখা বাঘের ছাল। হাতের লৌহশূলে বন্যপশু ও গজমুণ্ড বিদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে সেই নরখাদক পিশাচ। যবরাক্ষসের পুত্র, এর নাম বিরাধ। তার মাতার নাম শতহ্রদা পৃথিবী।

কবি বলেছেন, এই বিরাধ পূর্বে ছিল তুম্বুরু নামে এক রূপবান গন্ধর্ব। তপস্যায় ব্রহ্মার বর লাভ করেছিল, কেউ তাকে অস্ত্র দিয়ে বধ করতে পারবে না। এই তুম্বুরু একদা স্বর্গের অপ্সরা রম্ভার প্রেমে আসক্ত হয়। প্রণয়বিহ্বল হয়ে সে একদিন গন্ধর্বরাজ কুবেরের সভায়

উপস্থিত হতে বিলম্ব করে। কুবের তাকে অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত তুম্বুরু হয়ে যায় নরখাদক রাক্ষস। শেষে অনেক অনুনয় করলে কুবের প্রসন্ন হয়ে বললেন, দাশরথি রাম তোমাকে যুদ্ধে বধ করলে তুমি আবার স্বর্গের গন্ধর্বলোকে ফিরে আসবে।

অধ্যাত্মরামায়ণে আবার বলা হয়েছে, বিরাধ ছিল বিমলপ্রকাশ নামে এক বিদ্যাধর গন্ধর্ব। দুর্বাসা অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়ে রাক্ষসে পরিণত করেন।

"বিদ্যাধরোঽহং বিমলপ্রকাশঃ।
দুর্বাসসাঽকারণকোপমূর্তিনা শপ্তঃ"...

(অধ্যাত্মরামায়ণ, ৩/১/৩৭)

এইসব আখ্যানের অদ্ভুত ভয়ানক সব বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখি না কি, মানুষের অবচেতনের অন্ধকারে বিচরণ করছে কত অভিশপ্ত বিদ্যাধর? কোনো অস্ত্র দিয়ে যাদের ছিন্ন করা যায় না। মনের অন্ধকার পাতাল গহ্বরে প্রেতিনীর মতো কত এলোকেশী অয়োমুখী রাক্ষসী বিভীষিকা ছড়ায়, এরা সব প্রেত, না সংকেত? এসব মুখ, না মুখোশ?

বিরাধ যেমন অভিশপ্ত বিদ্যাধর, তেমনি কবন্ধ রাক্ষসও ছিল দনুর পুত্র, অপূর্ব রূপবান এক কিংপুরুষ, সূর্যের মতো তেজ, ইন্দ্রের মতো বীর্য, এবং চন্দ্রের মতো রূপকান্তি। (অরণ্যকাণ্ড, ৭১/১-২) ব্রহ্মা যার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দীর্ঘায়ু করেন।

কিন্তু সেও একদিন ঋষি স্থূলশিরার অভিশাপে তার কন্দর্পকান্তি রূপ হারিয়ে হয়ে পড়ল বিকটমূর্তি রাক্ষস। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে হল কবন্ধ। মুণ্ডহীন সেই কবন্ধের বুকের উপরে আগুনের মতো ধকধক করে জ্বলছে কেবল একটি চোখ। যোজনপ্রমাণ দুটি দীর্ঘ লোমশ বাহু দিয়ে বনের জীবজন্তুকে ধরে ধরে খায়।..

রামায়ণের এই কবন্ধ রাক্ষসকে বৈদিক ঋষিরাও দেখেছেন, সে যেন এক বিকট অন্ধকার মূর্তি পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে, মুণ্ডহীন বিভৎস এক ভয়—"স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ" (ঋগ্বেদ ১/৩২/৫) ইন্দ্র বজ্র দিয়ে এই কবন্ধের বাহু দুটি ছিন্ন করে তাকে বিনাশ করেন—"অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন" (ঋগ্বেদ ১/৩২/৫)। রামচন্দ্রও প্রথমে এই দৈত্যের বাহু দুটি ছিন্ন করে পরে তাকে বিনাশ করেন।

রাম এইসব বিভীষিকার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেন—বিরাধ কবন্ধ অয়োমুখী ত্রিশিরা অকম্পন খরদূষণ; আর ভ্রমণ করে চলেছেন একের পর এক ঋষিদের আশ্রম—অত্রি শরভঙ্গ সুতীক্ষ্ণ মাণ্ডকর্ণি অগস্ত্য। রহস্যাচ্ছন্ন অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলে গেছে যেন দুইটি পথ—দেবতা ও দানবের, ঋষি ও রাক্ষসের। এক পথে ভীতিকর পাপের ধূমেল অন্ধকার, শঙ্কা আতঙ্ক ত্রাস; আর এক পথে জ্যোৎস্নালোকিত পুণ্যের স্নিগ্ধ শান্তি, ধীর প্রসন্ন স্থিরতা।

আবার এই রাক্ষসেরাই কিন্তু রামকে চিনিয়ে দিচ্ছে ঋষিদের আশ্রমের পথ। বলে দিচ্ছে শত্রুজয়ের উপায় ও ইঙ্গিত। বিরাধ বলছে, রাম, তুমি এই পথে শরভঙ্গমুনির আশ্রমে যাও। মুনি তোমায় সাহায্য করবেন। বলছে, রাম, তুমি এই পথে ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের কাছে যাও। সুগ্রীব তোমাকে সাহায্য করবে। তুমি মতঙ্গমুনির আশ্রমে গুহাবাসিনী শবরীর কাছে যাও। শবরী তোমায় বলে দেবে সীতা কোথায়।

এমনি করে আলো ও অন্ধকার দুই পথ পরস্পর জড়িয়ে গেছে। সৃষ্টি করেছে একটা

জটিল যুক্তবেণী। শুধু তাই নয়, যা কুৎসিত বিভৎস ভয়াল, রাম তাদের জয় করছেন, একে একে তারা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি লাভ করছে। রাক্ষস বিরাধ আর কবন্ধের বিকট রূপ দেখে আমরা আঁতকে উঠেছিলাম, কিন্তু তারা একে একে ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নরক তার মুখোশ খুলে স্বর্গের মুখকান্তি দেখিয়ে দিল।

কবন্ধ হল—

"ভাস্বরো বিরজাম্বর। প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন।"

(অরণ্যকাণ্ড, ৭২/৫-৬)

বিরাধ হল—

"সুন্দরাকৃতির্বিভ্রাজমানো বিমলাম্বরাবৃতঃ"।

(অধ্যাত্মরামায়ণ, ৩/১/৩৫)

মনে হয় আমাদের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে একটা কবন্ধ। সাধনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমন বিকট শূন্যতা, একটা অন্ধকার গহ্বর দেখা যায়—

A formless Dread with shapeless endless wings
Filling the universe with its dangerous breath,
A denser darkness than the Night could bear,

(Sri Aurobindo, *Savitri*, VII 6)

আবার আত্মকৃত সেই অন্ধকারকে রূপান্তরিত করে জেগে ওঠে নির্মল জ্যোতিঃপ্রকাশ— "দগ্ধাত্মকৃত্যহতকৃত্যমহন্ কবন্ধম্" (শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ১০/১২)।

সমগ্র দণ্ডকারণ্য যেন এমনি একটা নিরুদ্ধ তপস্যার রাত্রির মতো থমথম করছে। যেন সে এক নিষাদকন্যা শবরী।

মতঙ্গমুনির আশ্রম বর্ণনায় বাল্মীকি বলেছেন, সে এক গুহ্য আশ্রম—"আশ্রমস্থানমতুলম্ গুহ্যম্" (৩/৭৩/২৮)। সেখানে তপঃক্লিষ্ট ঋষিদের শ্রমক্লান্ত দেহ থেকে বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম ঝরে পড়ে। আর সেই স্বেদবিন্দু মাটিতে পড়ে থরে-থরে বিচিত্রবর্ণ ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। তিলক করঞ্জপুষ্প আর কত রাশি রাশি নীলপদ্ম। সেই দিব্যপুষ্প সব কখনো ম্লান হয় না। কখনো শুকিয়ে ঝরে পড়ে না।

উৎপলানি চ ফুল্লানি পঙ্কজানি চ রাঘব।
ন তানি কশ্চিন্মাল্যানি তত্রারোপয়িতা নরঃ॥
ন চ বৈ ম্লানতাং যান্তি ন চ শীর্যন্তি রাঘব।
মতঙ্গশিষ্যাস্তত্রাসন্ ঋষয়ঃ সুসমাহিতাঃ॥
তেষাং ভারাভিতপ্তানাং বন্যমাহরতাং গুরোঃ।
যে প্রপেতুর্মহীং তূর্ণং শরীরাৎ স্বেদবিন্দবঃ॥
তানি মাল্যানি জাতানি মুনীনাং তপসা সদা।
স্বেদবিন্দুসমুত্থানি ন বিনশ্যন্তি রাঘব॥

(অরণ্যকাণ্ড, ৭৩/২২-২৫)

এই যে অরণ্যপর্বত, গুহা, পুষ্পকানন, এসব ঋষিদের তপোমূর্তি। তাঁদের তপস্যা দিয়ে গড়া। স্বয়ং ব্রহ্মা এদের সৃষ্টি করেছেন—"উদারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্বকালেঽভিনির্মিতঃ" (অরণ্যকাণ্ড, ৭৩/৩২)। এই পর্বতের শীর্ষে ধার্মিকের তপস্বীর সকল স্বপ্ন সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি কোনো অধার্মিক পাপকর্মা এই পর্বতে আসে তাহলে রাক্ষসের দল তাদের পীড়ন করে।

শয়ানঃ পুরুষো রাম তস্য শৈলস্য মূর্ধনি।
য স্বপ্নং লভতে চিত্তং তৎপ্রবুদ্ধোঽধিগচ্ছতি॥
যস্ত্বেনং বিষমাচারঃ পাপকর্মাধিরোহতি।
তত্রৈব প্রহরন্ত্যেনং সুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ॥

(অরণ্যকাণ্ড, ৭৩/৩৩-৩৪)

এরই নিভৃত গুহায় লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ত তপস্যা করেন "তপঃ সিদ্ধা শবরী"। (৩/৭৪/৬)। চীর কৃষ্ণাজিন জটাধারিণী—"তত্ত্বেন প্রভাবং তে মহাত্মনাম্" (৩/৭৪/১৯)। শেষ পর্যন্ত রামের সঙ্গে শবরীর দেখা হল। যেন দণ্ডকারণ্যের অরণ্য-আত্মা উদ্ধার পেল।

অতএব এই দণ্ডকারণ্যকে এবার যেন আমরা চিনতে পারছি। এখানকার ঋষি ও রাক্ষস, ধর্ম ও অধর্ম, যেন আলো-আঁধারের মতো একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ। "ধর্মঃ পুরস্তেঽধর্মশ্চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ (অধ্যাত্মরামায়ণ, ৩/৯/৪৩); সাধনার এ যেন এক ঊর্ধ্বমূল অধঃশিরা গতি। ভারতের পৌরাণিক dialectics।

কবন্ধ রাক্ষস, আবার দিব্যজ্ঞানী অর্থবেত্তা—"বিজ্ঞান হি মহদ্দ্রষ্টং" (৩/৭১/৩০), "বাক্যমন্বর্থমর্থজ্ঞ" (৩/৭৩/১)। নরখাদক বিরাধ ভক্তশ্রেষ্ঠ পরমজ্ঞানী—"জ্ঞানবতাং বরঃ"..."ভক্তিসম্পন্নঃ পরম্" (অধ্যাত্মরামায়ণ, ৩/১/৪৩-৪৪)। শূদ্রা শবরীও সিদ্ধতপা ধর্মাত্মা (৩/৭৪/১০, ১৮)।

সব যেন একই মন্ত্রের অক্ষর-ব্যত্যয়।

মরা থেকেই রাম।

তেইশ

রাক্ষসী প্রেম

রাম অগস্ত্য মুনির আশ্রমে এসে তাঁকে দর্শন করলেন। মুনি তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে সস্নেহ আশীর্বাদে বললেন, "তোমাদের আগমনে আমার আশ্রম আজ অলংকৃত হল। কল্যাণী সীতা স্বর্গের দেবী। অরুন্ধতীর মতো শুচিশুদ্ধ পরম পবিত্র। রাম, তুমি কখনো তাঁকে কষ্ট দিও না। সীতা যাতে মনে সুখী হয় তাই করো। যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু।"

অগস্ত্যের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ও নির্দেশ মতো তাঁরা পঞ্চবটীতে এলেন। পথে দেখা হল গৃধ্ররাজ জটায়ুর সাথে। রাম তাঁকে রাক্ষস মনে করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি?"

—"বৎস, আমি কশ্যপ মুনির পৌত্র। আমার নাম জটায়ু। আমি তোমার পিতা দশরথের বন্ধু। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতি। বিষ্ণুবাহন গরুড় আমার খুল্লতাত। পঞ্চবটীতে আমি তোমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করব।"

রাম তখন পিতৃতুল্য জ্ঞানে জটায়ুকে সম্মান করলেন।...

তারপর পঞ্চবটীতে তাঁরা পর্ণকুটীর বেঁধে বাস করতে লাগলেন।

স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। আশ্রমের নিকটে এক পদ্ম সরোবর। চারিদিকে পুষ্পিত কানন। শাল তাল তমালের বন। কেতকী পলাশ চন্দনতরু। স্বর্ণপুষ্পের লতামঞ্জরী। বনের মধ্যে হরিণ চরছে। বিচিত্র কলাপে ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রঙের পাখি। গাছের সবুজ পাতায় পাতায় সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে। কাছেই এক পাহাড়। তার শৈলশিখরে ধাতুপ্রস্তরে তাম্র রজতের আভা। অদূরে গোদাবরী নদী শান্ত প্রবাহে বয়ে চলেছে। রৌদ্রকিরণে তার জলস্রোত যেন আলোকের ধারা। তার শীতল জলে পদ্মের গন্ধ। গোদাবরীর দুই তীরে কত কুসুমিত বৃক্ষ। নদীর কূলে আকাশে ডানা মেলে উড়ছে কত শ্বেতহংস সারস চক্রবাক।...

রাম-সীতা সেই পঞ্চবটীতে সুখে বাস করতে লাগলেন।

দিন যায়।..

ক্রমে শরৎকাল গিয়ে হেমন্ত এল।

রামচন্দ্রের প্রিয় হেমন্ত ঋতু।

সূর্য এখন দক্ষিণায়নে। জলের স্পর্শ শীতল। হৈমন্তিকা ধরিত্রী শস্যশালিনী। দূরে সব জনপদগৃহে নবান্নের উৎসব। মাঠে মাঠে স্বর্ণ শস্যভার। যব গোধূম আর পাকা ধানের কনকমঞ্জরী শিশিরে ভিজে সোনার রোদে ঝলমল করছে। অরণ্য কানন শীতে ঘন কুয়াশা। রাত্রে হিমেল হাওয়া। জ্যোৎস্নারাতে হিমানীবাষ্পমণ্ডিত চন্দ্রমণ্ডল তুষারমলিনা। প্রকৃতির এই

ম্লান পাণ্ডুর সুষমাকে বাল্মীকি এখানে আশ্চর্য নিপুণ শিল্পীর মতো মিলিয়ে ধরেছেন সীতার সৌন্দর্যমলিন মুখচ্ছবির সঙ্গে—

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে॥

(অরণ্যকাণ্ড, ১৬/১৩-১৪)

প্রভাতে গোদাবরীর জলে স্নান করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম আশ্রমে ফিরে এলেন। সিক্ত বল্কল বৃক্ষশাখায় মেলে দিয়ে, পূজাহ্নিক করে পর্ণশালায় বসে লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

এমন সময় সেখানে কোথা থেকে এল এক রাক্ষসী। কুরূপা বৃদ্ধা লম্বোদরী তাম্রকেশী কর্কশভাষী সেই রাক্ষসী কামার্ত দৃষ্টিতে রামের দিকে তাকিয়ে রইল।

—"ত্বং কাসি কস্য বা? কি পরিচয়? এখানে কেন এসেছ? দেখে রাক্ষসী মনে হচ্ছে? রাম জিজ্ঞাসা করেন।

—"আমি কামরূপিণী রাক্ষসী। আমার নাম শূর্পণখা। রাক্ষস রাবণের নাম শুনেছ? আমি তার ভগ্নী। মহাবল কুম্ভকর্ণ, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা খর ও দূষণ আমার ভাই। আমি তোমাকে দেখে মোহিত হয়েছি। মনে মনে তোমাকেই পতিত্বে বরণ করেছি। তুমি সীতাকে নিয়ে কী করবে? ওই কুশ্রী মানবী তোমার যোগ্য নয়। তুমি আমার স্বামী হও। আমি ওদের ভক্ষণ করে ফেলব। তখন তুমি আর আমি এই দণ্ডকারণ্যে ইচ্ছামত ভ্রমণ করব।"

শুনে রাম হো হো করে হেসে উঠলেন। কামপাশে আবদ্ধ রাক্ষসীর উৎকট দশা দেখে পরিহাস করে বললেন, "কিন্তু আমি তো বিবাহিত। ইনি আমার প্রিয় পত্নী। তোমার মতো রমণীর সপত্নী থাকা অত্যন্ত দুঃখের হবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র প্রিয়দর্শন। ইনি অবিবাহিত। রূপে তোমারই যোগ্য। তুমি এঁকেই বিবাহ করো।"

শূর্পণখা তখন রামকে ছেড়ে লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করে বলল, "তোমার মতো রূপবান পুরুষ আমারই যোগ্য।"

রামের কৌতুক দেখে লক্ষ্মণও তাকে পরিহাস করে বললেন, "সুন্দরী, আমি অগ্রজের দাস। তুমি আমাকে বিবাহ করে দাসী হইতে যাবে কেন? বরং তুমি রামের কনিষ্ঠা পত্নী হও। উনি তাহলে ওই বিরূপা বৃদ্ধা ভার্যাকে ত্যাগ করে তোমাকেই ভজনা করবেন। তোমার মতো এমন সুন্দরী রাক্ষসী ভার্যা পেলে কে আর মানবী রমণীকে ভালবাসে?"

কামুক রাক্ষসী লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝতে পারল না।

সে তখন রামের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি ওই কৃশোদরী মানবী স্ত্রীকে ত্যাগ করে আমাকে নাও। নইলে এই মুহূর্তে আমি ওকে হত্যা করব।" এই বলে ক্রুদ্ধ রাক্ষসী বিকট মূর্তি ধরে জ্বলন্ত উল্কার মতো সীতাকে ধরতে গেল।

রাম তখন সিংহের গর্জনে শূর্পণখাকে বাধা দিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, "সৌমিত্র, এইসব

ক্রূর অনার্য রাক্ষসের সঙ্গে পরিহাস করা উচিত নয়। দেখ তো, সীতা কেমন ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে কাঁপছেন। তুমি এই কামুক রাক্ষসীর রূপ বিকৃত করে দাও।''

লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে তখন শূর্পণখার নাশাকর্ণ ছেদন করলেন। রক্তাক্ত মুখে বিকট আর্তনাদ করতে করতে রাক্ষসী বনেব মধ্যে পালিয়ে গেল।

ঘোর অশনিসম্পাতের মতো রাক্ষসপুরীতে গিয়ে আছড়ে পড়ল শূর্পণখা। বিষভুজঙ্গিনীর মতো মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল। দেখে ছুটে এল খর দূষণ আর অগণিত রাক্ষসের দল।

—''কে তোমার এমন দুর্দশা করেছে?''

—''এই বনের মধ্যে সন্ন্যাসীর বেশে থাকে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই। তাদের সঙ্গে আছে এক যুবতী স্ত্রী। তার নিমিত্ত ওরা আমাকে এমন হাল করেছে। আমি প্রতিহিংসা চাই। ওই তিন জনের উষ্ণ রক্ত পান করব।''

সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দোজন মহাবল রাক্ষসকে ডেকে খর আজ্ঞা দিল, ''এই বনে এক নারীর সঙ্গে দুইজন মানুষ এসেছে। তাদের বধ করে নিয়ে এসো। আমার ভগ্নী তাদের রক্ত পান করবে।''

দানবেরা ছুটে গেল রামের আশ্রমে।

ধনুর্বাণে টংকার দিয়ে বললেন, ''কী চাও তোমরা পাপাত্মা রাক্ষস? তোমরা ঋষিদের উৎপীড়ন করো। তোমাদের বধ করাই পুণ্য।''

উদ্যতশূল যমদূতের মতো হুংকার দিয়ে উঠল রাক্ষসেরা।

রামের জ্বলন্ত বাণে মৃত্যু ঝলসে উঠল।...

মুহূর্তে নিহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল নিশাচরেবা।...

এবপর চোদ্দো হাজার রাক্ষসসৈন্য নিয়ে খব দূষণ ও ত্রিশিরা রামকে আক্রমণ করল।

কালো মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। অগ্নি উল্কা শিলাবৃষ্টি। অসময়ে রক্তসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সূর্যমণ্ডলে অঙ্গার-চক্র। তাতে শ্যাম-লোহিত আভা। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলে উঠল। রক্তমেঘে কবন্ধ ধূমকেতু। দিক্‌দাহ শিবাধ্বনি, রাক্ষসদের পক্ষে যত অমঙ্গলচিহ্ন।...

ত্রিশিরা ও দূষণ নিহত হল।...

খর রাক্ষসের স্বর্ণধ্বজা ভেঙে পড়ল।...

অগস্ত্যের দেওয়া বৈষ্ণবধনু হাতে অটল পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন রাম। তাঁর মন্ত্রপূত শরে অগ্নিবর্ষণ করছে। কাতারে কাতারে লুটিয়ে পড়ছে বাক্ষসকুল।

রাম ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মদত্ত নিক্ষেপ কবলেন।

বিদীর্ণ পর্বতের মতো খরের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল।

আকাশে তখন পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। দেবদুন্দুভি বেজে উঠল।...

জনস্থানের রাক্ষসকুল ধ্বংস হয়েছে এই বার্তা নিয়ে নিশাচর অকম্পন ছুটে গেল লঙ্কায় রাবণের কাছে।

দুঃসংবাদ শুনে ত্রিকূট পর্বতে রাবণের দম্ভচূড়া কেঁপে উঠল।...

স্বর্ণসিংহাসনে বসে আছেন লঙ্কেশ্বর রাজা দশানন। যার প্রতাপে সমুদ্র স্তব্ধ, বায়ু স্থির, সূর্য ম্লান।

নৈনং সূর্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে॥

(আদিপর্ব, ১৫/১০)

আসীনং সূর্যসঙ্কাশে কাঞ্চনে পরমাসনে।..
দেবাসুরবিমর্দেষু বজ্রাশনিকৃতব্রণম্।...
বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম্।
লব্ধবৈদুর্যসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।..
বিষ্ণুচক্রনিপাতৈশ্চ... আহতাঙ্গৈ... দেবপ্রহরণৈস্তদা...
প্রাপ্তযজ্ঞহরং দুষ্টং ব্রহ্মঘ্নং ক্রূরকারিণম্।
কর্কশং... সর্বলোকভয়াবহম্।

(অরণ্যকাণ্ড, ৩২/৫-২১)

ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষণম্.. পীতেনোত্তরবাসসা।...

(সুন্দরকাণ্ড, ১০/২৭)

সংবীতং রক্তবাসনা
সন্ধ্যাতপেন সঞ্ছন্নং মেঘরাশিমিবাম্বরে।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৪০/৬)

নীলমেঘমণ্ডলের মতো বিশাল দেহে তার বৈদুর্যমণির কান্তি। রাজোচিত লক্ষ্মণযুক্ত প্রশস্ত বক্ষ। ইন্দ্রধ্বজের মতো ভুজযুগলে কনক অঙ্গদ, রক্তচন্দনের অনুলেপন। দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে তার দেহে বিষ্ণুচক্র, বজ্রপ্রহার ও নানা অস্ত্রের আঘাতচিহ্ন। ক্ষৌম রক্তবসন। পীতবর্ণ উত্তরীয়। সন্ধ্যায় রক্তরাগ রঞ্জিত নীল মেঘের মতো রাবণ সিংহাসনে বসে আছে। সুরগণের উৎপীড়ক ধর্মদ্রোহী যজ্ঞবিঘ্নকারী। ক্রূর কর্কশ দাম্ভিক রাবণ।

বাল্মীকি এখানে তাঁর সঞ্চিত সমস্ত রঙের বর্ণভৃঙ্গার যেন নিঃশেষ করে এঁকেছেন এই ভয়ংকর সুন্দর মূর্তি রাবণকে।

যাকে প্রথম দেখে রামচন্দ্র পর্যন্ত চমকিত হয়ে বিভীষণকে বলেছিলেন, "অহো, কি তেজস্বী এই রাক্ষসরাজ। কোনো দেবতা অথবা দানবের দেহ এমন জ্যোতির্ময় হয় না। রাবণ যেন দুষ্প্রেক্ষ্য সূর্যের মতো জ্বলন্ত প্রভান্বিত।"

অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি রাবণঃ।
ন ব্যক্তং লক্ষয়ে হ্যস্য রূপং তেজঃসমাবৃতম্॥
দেবদানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ।
যাদৃশং রাক্ষসেন্দ্রস্য বপুরেতদ্ বিরাজতে॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৫৯/২৬-২৮)

অকম্পন ও শূর্পণখার কথা শুনে রাবণ বহ্নিমান পর্বতের মতো জ্বলে উঠল। কামে ক্রোধে প্রতিহিংসায় অস্থির হুংকার দিয়ে বলল, "সেনাপতি প্রহস্ত, রথ প্রস্তুত করো।"

চব্বিশ

সীতাহরণ—ছায়া না কায়া?

প্রভাতে পঞ্চবটীর পুষ্পকাননে সীতা পুষ্পচয়ন করছেন। মলয় পবনে তরুলতায় শিশিরের ঘ্রাণ। থরে থরে ফুটে আছে বনদীপ, রাগপুষ্প, অশোক, কর্ণিকার।...

এদিকে আশ্রমের অদূরে কদলীবনে অন্ধকার বিভীষিকার মতো রাবণের ছায়া। ষড়যন্ত্র করে মারীচকে জোর করে ভয় দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। যেন সে মায়ামৃগের রূপ ধরে রাম লক্ষ্মণকে আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যায়।...

পুষ্পবনে সীতা যেন মূর্তিমতী উষা। নবারুণরাগে পুষ্পগন্ধে সর্বাঙ্গে তাঁর স্বর্গীয় আভা।

হঠাৎ দেখেন কাননের মধ্যে বিচরণ করছে এক আশ্চর্য সুন্দর মণিচিত্রিত হরিণ। তার গায়ের রং মধুকপুষ্প ও পদ্মকেশরের মতো সোনার বরণ। তাতে বিন্দু বিন্দু রূপালী শোভা। শৃঙ্গ দুটি যেন রত্ন দিয়ে গড়া। সুঠাম পায়ের খুরগুলিতে বৈদুর্যমণির দ্যুতি। রত্ননীলার মতো দুই নেত্র। ক্ষীণ অথচ দৃঢ় তার জঙ্ঘা। ইন্দ্রধনুবর্ণ তার পুচ্ছ। রক্তবদনে বিদ্যুতের জিহ্বা। কর্ণ দুটি যেন নীলোৎপল আর নীলমণি। উন্নত গ্রীবা। উচকিত গতি।

মণিপ্রবরশৃঙ্গাগ্রঃ সিতাসিতমুখাকৃতিঃ।
রক্তপদ্মোৎপলমুখঃ ইন্দ্রনীলোৎপলশ্রবাঃ॥
কিঞ্চিদভ্যুন্নতগ্রীব ইন্দ্রনীলনিভোদরঃ।
মধূকনিভপার্শ্বশ্চ কঞ্জকিঞ্জল্কসন্নিভঃ॥
বৈদূর্যসঙ্কাশখুরস্তনুজঙ্ঘঃ সুসংহতঃ।
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণেন পুচ্ছেনোর্ধ্বং বিরাজিতঃ॥
মনোহরস্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈঃ কৃতঃ।
ক্ষণেন রাক্ষসো জাতো মৃগঃ পরমশোভনঃ॥

(অরণ্যকাণ্ড, ৪২/১৬-১৯)

কদলীবন থেকে তৃণ গুল্ম খেতে খেতে হরিণটি কর্ণিকার বনের দিকে চলেছে। ঘুরছে ফিরছে! এই স্থির এই চঞ্চল। বনের অন্যান্য হরিণদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। বনের যত মৃগ তাকে দেখে কাছে যায়, কিন্তু গা শুঁকেই পালায়। বনের প্রাণী যে রাক্ষসের গন্ধ চেনে।

স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে সীতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওই আশ্চর্য হরিণের দিকে!

—"আর্যপুত্র, শীঘ্র এখানে আসুন। আগচ্ছাগচ্ছ বৈ রাজপুত্র।"

সীতার আনন্দিত ডাক শুনে রাম-লক্ষ্মণ এসে হরিণটিকে দেখেন।

কিন্তু লক্ষ্মণ সন্দিগ্ধ হয়ে বলেন, "রাঘব আমার মনে হয়, এ বনের হরিণ নয়। এ রাক্ষসী মায়া। রাক্ষস মারীচ নিশ্চয় মায়ামৃগের রূপ ধরে এসেছে। এ তারই কপট মায়া, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ।"

সীতা লক্ষ্মণের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "আর্যপুত্র, এই সুন্দর হরিণ আমার মন কেড়ে নিয়েছে। তুমি ওকে ধরে আনো। আমি ওকে নিয়ে খেলা করব। বনবাসের পরে আবার যখন আমরা অযোধ্যায় ফিরে যাব তখন ওই হরিণ রাজভবনের শোভা বর্ধন করবে। ভরতেরা সবাই দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

রামও হরিণটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। লক্ষ্মণকে বললেন, "সৌমিত্র, হরিণটা ভারি চমৎকার। কুবেরের চৈত্ররথ কাননেও এমনটি নেই। তাছাড়া সীতার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়েছে। এমন আশ্চর্য হরিণ দেখে কে না মুগ্ধ হয়! তুমি কুটিরে থেকে সাবধানে সীতাকে রক্ষা করো। আমি এখনই মৃগটিকে ধরে আনছি। আর তোমার কথা মতো যদি ওটা রাক্ষস মারীচ হয়, তাহলে তাকে বধ করাও আমার কর্তব্য।" এই বলে ধনুর্বাণ আর খড়্গ নিয়ে রাম হরিণের দিকে ধাবিত হলেন।

ক্ষিপ্র গতিতে হরিণ বনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। রামও দ্রুতগতিতে তার পশ্চাতে অনুসরণ করছেন। অরণ্যের ঘন পত্রপল্লবের আড়ালে বারবার চকিতে দেখা দিয়ে পলকে অদৃশ্য হচ্ছে ওই মায়ামৃগ। সবুজ বনে যেন সোনালী আর রূপালী ঝিলিক। অপরূপ এক মায়াময় দৃষ্টিবিভ্রম।

এমনি করে অনেকক্ষণ অনুসরণ করতে করতে রাম আশ্রম থেকে গভীর বনে বহুদূর চলে এসেছেন। শেষে ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে মৃগটিকে বধ করবেন বলে স্থির করলেন। রাম প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র বাণ নিক্ষেপ করলেন। সর্পতুল্য সেই জ্বলন্ত বাণ গিয়ে মৃগরূপী মারীচের বক্ষ ভেদ করল।

রাক্ষস তখন নিজরূপ ধারণ করে বিকট আর্তনাদ করে উঠল। মৃত্যুকালে সে রাবণের কথামতো রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে চিৎকার করে উঠল, "হা সীতা—হা লক্ষ্মণ"। মায়াবী রাক্ষসের সেই চিৎকারে বনভূমি কাঁপতে লাগল। সেই আর্ত প্রতিধ্বনি বনের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল,—"হা সীতা—হা লক্ষ্মণ"।...

রাক্ষস মারীচের রক্তাক্ত ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহ দেখে রাম বুঝলেন লক্ষ্মণের আশঙ্কাই সত্য। এসব রাক্ষসের ছলনা। রামের কণ্ঠস্বর নকল করে রাক্ষসের ওই কপট চিৎকার শুনে না জানি সীতা ও লক্ষ্মণ এতক্ষণে কত অস্থির হয়ে উঠেছেন, এই ভেবে রাম দুর্ভাবনায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে ফিরে চললেন।...

এদিকে রামের আর্ত চিৎকার শুনে সীতা আতঙ্কে চমকে উঠলেন।

—"লক্ষ্মণ, ওই শোন, বনের মধ্যে রাঘব অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে আর্ত চিৎকার করছেন। তুমি শীঘ্র যাও। তাঁকে রক্ষা করো।"

সীতা ব্যাকুল দিশেহারা হয়ে বারবার লক্ষ্মণকে বলতে লাগলেন, "লক্ষ্মণ, শুনতে পাচ্ছ না? বনের মধ্যে তোমার ভ্রাতা আক্রান্ত হয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছেন? তুমি যাও।"

কিন্তু লক্ষ্মণ অবিচলিত, স্থির। তিনি জানেন রামের কখনো বিপদ হতে পারে না। আর সীতাকে একা রেখে তিনি যেতেও পারেন না। রামের আদেশ তাঁকে রক্ষা করা।

বাল্মীকি এমনি করে বারেবারে কাব্যের মধ্যে নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেন। এবং ঘটনার সেই আকস্মিক উৎকণ্ঠা আর সংঘাতের মধ্যে তিনি প্রত্যেক চরিত্রের মর্ম ছিঁড়ে দেখিয়ে দেন, তাদের অন্তরের বিষম দিকগুলি। তিনি যেন বলতে চান, নিথর পাষাণও আঘাতে আঘাতে স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করে। স্থির জলের তলায় আছে কত ঘূর্ণিপাক। প্রদীপের তলায়ও থাকে কত বিষণ্ণ আঁধার। সেই রহস্য-আঁধারের মধ্যে সহসা ঘটে যায় কত কিছু, যা সত্য নয় অথচ সত্য। এক এক করে কবি সেসব দেখিয়ে দেন। আমরা কেবল বিস্মিত হই, বিচলিত হই, স্বীকার করতে চাই না, অথচ অস্বীকার করতেও পারি না। আমরা হতবাক্ হয়ে দেখি, লক্ষ্মণ কখনও পিতাকে কখনও বা ভাই ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত। ধর্মশীলা এমন যে কৌশল্যা তিনিও মৃতপ্রায় পতিকে লাঞ্ছনায় ধিক্কারে জর্জরিত করেন। দশরথ সন্দেহ করেন তাঁর নিষ্পাপ পুত্র ভরতকে। আবার রামচন্দ্রও দুঃখে হতাশায় ধৈর্য হারান, কামুক স্ত্রৈণ বলে ধিক্কার দেন তাঁর দেবতুল্য স্নেহময় পিতাকে। এমনকী সর্বজ্ঞ ঋষি ভরদ্বাজও ভুল করে অন্যায় সন্দেহ করেন নিরপরাধ ভরতকে।

বাল্মীকি তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রকেই অস্বাভাবিকভাবে সুসঙ্গত করে সাজিয়ে ধরেন না। তিনি জীবনের সবটা দেখিয়ে দেন। তার মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে, আত্মখণ্ডন আছে, দুর্বলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সব থেকেও, অথবা বলা যায়, এত সব আছে বলেই, রামায়ণের প্রতিটি চরিত্র এমন জীবন্ত সুন্দর মহান। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়, "সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়।" ('রবীন্দ্ররচনাবলী', ১৪ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫১৪)

লক্ষ্মণের এই নিরুদ্বেগ ভাব দেখে সীতার অন্তর ক্রোধে ক্ষোভে উদবেল হয়ে উঠল। তীব্র ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললেন, "সৌমিত্রে, তুমি মিত্রবেশী শত্রু। তাই রামের বিপদে এমন নির্বিকার থাকতে পারছ। ভাইয়ের প্রতি তোমার কোনো স্নেহ নেই। মনে হয় আমাকে পাওয়ার জন্যই তুমি রামের বিপদ কামনা করছ।"

> সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ।।
> যস্ত্বস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে।
> ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে।।

(অরণ্যকাণ্ড, ৪৫/৫-৬)

অপমানিত লক্ষ্মণ তবু আহতকণ্ঠে সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "দেবী, এমন কথা আপনার বলা উচিত নয়। পৃথিবীতে দেব দানব গন্ধর্ব পিশাচ এমন কেউ নেই যে রামকে পরাস্ত করতে পারে। যা শুনেছেন তা রামের কণ্ঠস্বর নয়। ওই আর্তরব কোনো রাক্ষসের মায়া। আপনি উতলা হবেন না। রাম আমাকে আপনার প্রহরায় রেখে গেছেন। এ অবস্থায় আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারি না।"

সীতা আরও উত্তেজিত হয়ে কঠোর ভাষায় বললেন, "বুঝেছি, রামের বিপদই তোমার কাম্য। তাই এই সব স্তোক বাক্য বলছ। সৎমায়ের ছেলে গুপ্তশত্রু, তোমার ক্রূর মনে যে

এত পাপ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী! আমাকে পাওয়ার কুমতলবে তুমি আমাদের সঙ্গে বনে এসেছ। হয়তো বা ভরত তোমাকে পাঠিয়েছে। তুমি ভরতের গুপ্তচর। কিন্তু বলে রাখছি, তোমার বা ভরতের মতলব সিদ্ধ হবে না। ইন্দীবরশ্যাম রামচন্দ্রকে পতিরূপে পেয়ে আমি কোন পাপে নীচ জনকে কামনা করব? ইহলোকে আমি রাম ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচব না। আমি তোমার সামনেই প্রাণত্যাগ করব। সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামাসংশযম্।''

সীতার এই কুৎসিত তিরস্কারে লক্ষ্মণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, তবু হাতজোড় করে বিনীত কণ্ঠে বললেন, ''আপনি আমার দেবতাতুল্য, তাই আপনার এই কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আপনার তিক্ত কথাগুলি তপ্ত শলাকার মতো আমার শ্রবণ বিদ্ধ করছে। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই। তারা চপল নির্দয় জ্ঞানশূন্য। তারা আত্মীয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। সমস্ত বনপ্রকৃতি সাক্ষী, দেবতারাও শুনলেন, আমার সঙ্গত কথার উত্তরে আপনি কি কঠোর বাক্য বলেছেন। আমি গুরু রামচন্দ্রের আদেশ পালন করছিলাম মাত্র। অথচ আপনি স্ত্রীসুলভ দুষ্টস্বভাবে আমাকে অন্যায় সন্দেহ করলেন। আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি আপনার সর্বনাশ আসন্ন। ধিক্ আপনাকে, আমি রামের কাছে চললাম। বনের দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন। রক্ষন্তু ত্বাং সমগ্রা বনদেবতাঃ।''

সীতাকে প্রণাম করে লক্ষ্মণ কশাহত অশ্বের মতো দ্রুত প্রস্থান করলেন।

আর সীতা একাকিনী পর্ণশালায় বসে কাঁদতে লাগলেন।...

সীতার দিকে যেন তাকানো যায় না! তাঁর মর্মন্তুদ শোকের চেয়েও শোকাবহ যেন তিনি নিজে। নারীত্বের মর্যাদা থেকে সাময়িক ভ্রষ্ট তিনি যেন এক সাধারণ নারী।

লক্ষ্মণ যাওয়ার সময় ধনুক দিয়ে সীতার কুটিরের চারিদিকে একটা গণ্ডিরেখা টেনে দিয়ে গেলেন। যাতে ওই রক্ষাগণ্ডি পেরিয়ে কোনো বিঘ্ন না প্রবেশ করে। যদিও এই বৃত্তান্ত বাল্মীকি রামায়ণে নেই। আছে ভাবার্থ রামায়ণে, (৬/১৫), আনন্দরামায়ণে (১-৭-৯৮), রামচরিতমানসে (৬-৩৬-২), এবং বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে—

গণ্ডি দিয়া বেড়িলেক লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥

লক্ষ্মণের এই গণ্ডি বড় সুন্দর এক কবিত্বের ব্যঞ্জনা। কিন্তু সেই গণ্ডি অতিক্রম করার আগেই কি সীতা আরও একটা সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদার গণ্ডি অতিক্রম করেননি? লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তি ও কুৎসিত তিরস্কারের ভিতর দিয়ে সীতা যেন তাঁর আপন চরিত্রের মর্যাদাই লঙ্ঘন করেছেন। বাল্মীকি ইঙ্গিতে যেন তাই বলতে চান, চারিদিকে ঘোর অমঙ্গলের দুর্নিমিত্ত সব দেখা দিতে লাগল—''নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি'' (অরণ্যকাণ্ড, ৪৫/৩৪)।

ঠিক এই অমঙ্গলের মুহূর্তেই মূর্তিমান কালসন্ধ্যার মতো কুটির দ্বারে এসে উপস্থিত হল এক আগন্তুক। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশ। গৈরিকবসন। মস্তকে শিখা। ছত্র ও পাদুকাধারী। বাম স্কন্ধে যষ্ঠি ও কমণ্ডলু। মুখে বেদমন্ত্র, কিন্তু রক্তলোচনে কামাতুর দৃষ্টি। কামলুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে সীতাকে। রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভা পীতকৌশেয়বাসিনী কমললোচনা পদ্মিনী সীতা যেন শতদলবাসিনী লক্ষ্মী।

বাল্মীকির কবিত্বের শক্তি ও সাহস দেখে বিস্মিত হতে হয়। ছদ্মবেশী রাবণের কামাতুর পাপদৃষ্টির সামনে তিনি সীতার অঙ্গের স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও যৌবনশ্রী অনাবৃত করে দেখাচ্ছেন।

কাঞ্চনে কজ্জলে লিপ্ত সে এক অনুপম কবিত্বমাধুরী। যেন নরকের অন্ধকার দৃষ্টির সামনে স্বর্গের মহিমা উদ্ঘাটিত করে ধরছেন—

সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব।
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে॥
বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্‌ভিতৌ॥
পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তে পয়োধরৌ॥
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।

(অরণ্যকাণ্ড, ৪৬/১৮-২১)

দ্বারে ব্রাহ্মণ অতিথি সন্ন্যাসী এই মনে করে সীতা ছদ্মবেশী রাবণকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আপ্যায়ন করে বসালেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মনে মনে কি যেন একটা ভয় তাঁকে শঙ্কিত করে তুলল। তিনি বারবার বনের দিকে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু রাম লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন না। নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ মহদ্বনং নৈব তু রাম লক্ষ্মণৌ।

এক সময় সীতা জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি কে? আপনার নাম কী?"

রাবণের যেন আর ধৈর্য ধরে না। তার মন অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে, "সুন্দরী আমি ত্রিভুবনত্রাস রাক্ষসরাজ রাবণ। সমুদ্রবেষ্টিত পর্বতধৃত সোনার লঙ্কা আমার রাজ্য। আমার অনেক উত্তমা স্ত্রী আছে। কিন্তু পদ্মিনী, তোমাকে দেখার পর আর তাদের প্রতি আমার অনুরাগ নেই। বিলাসিনী, তুমি আমার প্রধান মহিষী হও। রাজ্যহারা বনবাসী ভিখারি রামকে নিয়ে তুমি কী করবে? সে তোমার যোগ্য নয়। তার চেয়ে তুমি আমার সঙ্গে চলো। লঙ্কার রাজরানি হবে। পাঁচ হাজার সুন্দরী দাসী তোমার সেবা করবে।"

যজ্ঞের হোমাগ্নির মতো সতীত্বের বহ্নিতেজে জ্বলে উঠলেন সীতা। তাঁর লক্ষ্মী কমলামূর্তির মধ্যে জেগে উঠেছেন শক্তিরূপিণী রুদ্রাণী। নারীর প্রকৃতি যদিও কোমল কিন্তু তার অন্তর্লীন গভীরতার মধ্যে আজ এক দুর্জয় শক্তি—যাকে ভারতবর্ষ চিরকাল সিংহবাহিনী মহাশক্তিরূপে পূজা করে এসেছে।

সীতা সেই আত্মতেজে গর্জন করে উঠলেন, "সিংহীং মাম্। আমি মৃগেন্দ্র কেশরিণী। আর রাক্ষস, তুমি নীচ শৃগাল। শৃগাল হয়ে সিংহীকে কামনা করতে এসেছ? সূর্যের জ্বলন্ত প্রভা কি কেউ স্পর্শ করতে পারে? তুমিও আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। মহাসমুদ্রের মতো গম্ভীর, মহেন্দ্র পর্বতের মতো মহীয়ান রামচন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী আমি। নীচ রাক্ষস, আকাশের চন্দ্র সূর্য হাত দিয়ে ধরতে চাও? রামচন্দ্রের সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করো? সিংহে আর শৃগালে, গরুড়ে আর কাকে, চন্দনে আর পঙ্কের তুলনা? তুচ্ছ মাছি যেমন ঘৃত ভোজন করে জীর্ণ করতে পারে না, মরে যায়, তেমনি রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে হরণ করলে তোমারও সেই দশা হবে।" (অরণ্যকাণ্ড, ৪৭/৩৭-৪৮)

ক্রুদ্ধ রাবণ তখন হস্ত নিষ্পীড়িত করে স্বমূর্তি ধারণ করল। মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বিরাট দেহ। পরিধানে রক্তবাস। সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার।

রাবণ বাম হস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে তাঁর উরুদ্বয় ধারণ করে কামার্ত পন্নগের মতো নিয়ে চলল তার রথে। পাশবদ্ধ বিহঙ্গীর মতো সীতা ছটফট করতে লাগলেন।...

বৃদ্ধ জটায়ু ছুটে এলেন।

প্রাণপণ যুদ্ধ করে রাবণকে বাধা দিতে লাগলেন।

কিন্তু রাবণ জটায়ুকে পরাভূত ও মৃতপ্রায় করে মাটিতে নিক্ষেপ করল।

রাবণের রথ এবার আকাশে উঠল।

সীতার উদ্ভ্রান্ত করুণ বিলাপে সমস্ত বনভূমি মুহ্যমান হয়ে পড়ল, "হে রাম, হে লক্ষ্মণ, রক্ষা করো। হে জনস্থানের পুষ্পিত কর্ণিকার তরু, হে বনদেবতাগণ, হে গোদাবরী নদী, হে অরণ্য মৃগ পক্ষী, তোমরা রামকে জানিয়ে আমাকে বাঁচাও।"

নারীধর্ষণের এমন নির্মম ঘটনা কবি অবলীলাক্রমে বলে চলেছেন। কিন্তু রসের দিক থেকে কোথাও একটু নিচু পর্দায় নেমে যায়নি। অথবা ভয়ংকর বা বিভৎস রসে আবিল হয়েও ওঠেনি। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর কবিদের হাতে যা হয়ে পড়তে পারত কুৎসিত বা অশ্লীল। যে পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত ভয় পেয়েছেন। পাছে রসাভাস ঘটে তাই সীতাহরণের এই ভয়ংকর ঘটনাকে কালিদাস মাত্র অর্ধশ্লোকে কোনোরকমে নম-নম করে সেরেছেন। কামার্ত রাক্ষস রাবণের কোলে বিস্রস্তবাসা সীতাকে তুলে দিয়ে তার বর্ণনা করতে সাহস করেননি। নিতান্ত সাংবাদিকের মতো এখানে কালিদাস অল্পকথায় পাশ কাটিয়ে গেছেন—"জহার সীতাং পক্ষীন্দ্র-প্রয়াস-ক্ষণবিঘ্নিতঃ" (রঘুবংশ, ১২/৫৩)।

পক্ষান্তরে বাল্মীকির বর্ণনা এখানে উদ্দাম বর্ণোচ্ছল বিপুল। সমস্ত চরাচর ভয়ংকর লজ্জায় অন্ধকার হয়ে গেল—"জগৎসর্বমমর্যাদাং তমসান্ধেন সংবৃতম্" (অরণ্যকাণ্ড, ৫২/৯)। বাতাস স্তব্ধ। সূর্যমণ্ডল নিষ্প্রভ। এইভাবে বর্ণের পর বর্ণ, ছবির পর ছবি, ধ্বনির পর ধ্বনি। আলোতে অন্ধকারে, আগুনে সোনায়, নীলে লোহিতে পীতে, এমনকী সীতার অঙ্গের-উত্তাপে-উষ্ণ অলংকারের শিঞ্জনে যে বিহ্বলতা সৃষ্টি করা হয়েছে এক কথায় তা অনবদ্য। শব্দে বর্ণে চিত্রে এক পবিত্রতা, ভাবের এক সমুচ্চতা নিয়ে কবিত্বের এক বিশিষ্ট গরিমা লাভ করেছে।

একেই বলে প্রতিভার স্পর্শ—

তপ্তাভরণবর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী।
ররাজ রাজপুত্রী তু বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা॥
উদ্ধুতেন চ বস্ত্রেণ তস্যাঃ পীতেন রাবণং।
অধিকং পরিবভ্রাজ গিরির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা॥
তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাস্তাম্রাণি সুরভীণি চ।
পদ্মপত্রাণি বৈদেহ্যা অভ্যকীর্যন্ত রাবণম্॥
তস্যাঃ কৌশেয়মুদ্ধুতমাকাশে কনকপ্রভম্।
বভৌ চাদিত্যরাগেণ তাম্রমভ্রমিবাতপে॥

*

সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্।
শুশুভে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা॥

তস্যাঃস্তনান্তরাদ্‌ভ্রষ্টো হারস্তারাধিপদ্যুতিঃ।
বৈদেহ্যা নিপতন্ ভাতি গঙ্গেব গগনচ্যুতা॥
(অরণ্যকাণ্ড, ৫২/১৪-১৭, ২৩, ৩৩)

এমনি করে রাবণ সীতাকে কেশাকর্ষণ করে ক্রোড়ে তুলে রথে আকাশমার্গে গমন করছে। সীতার অঙ্গের মাল্য ও অলংকার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। (ক্লিষ্টমাল্যাভরণং)। তাঁর ললাটের সিন্দূরতিলক বিস্রস্ত হয়ে মুছে গেছে (বিপ্রমৃষ্ট বিশেষকাম্)। জানকীর পীতকৌশেয় বসন রাবণের বুকের উপর দিয়ে হাওয়ায় উড়ছে। সূর্যের কিরণ লেগে সেই পীত বসন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। রাবণকে দেখে মনে হচ্ছে যেন দাবানল বেষ্টিত এক পর্বত (গিরির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা) রাবণের অঙ্কে রক্তপল্লবের মতো সীতা যেন নীল হস্তীর বুকে সোনার কাঞ্চী (কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা) মেঘমালার মধ্যে যেন স্ফুরন্ত বিদ্যুৎ। সীতার স্তনযুগলের মধ্য থেকে অগ্নিবর্ণ চন্দ্রহার স্খলিত হয়ে ঝনন্ শব্দে পতিত হতে লাগল স্বর্গ থেকে আপতিত গঙ্গার মতো (গঙ্গেব গগনচ্যুতা)। দিবসে উদিত চন্দ্রের মতো (দিবাচন্দ্র ইবোদিত) সীতা অত্যন্ত ম্লান বিবর্ণ হয়ে ভীত কণ্ঠে কেবল কাঁদতে কাঁদতে ডাকছেন—"হা রাম, হা লক্ষ্মণ, আমাকে উদ্ধার করো।"

বাল্মীকি যেন এখানে শ্লোকের পর শ্লোকে চিত্রে বর্ণে আকাশপটে রঙের ইন্দ্রধনু রচনা করছেন। তাঁর ভাবুক মনটা নাট্যকারের, চোখদুটি চিত্রকরের আর লেখনী মহাকবির। সমগ্র বর্ণনা শুনতে শুনতে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তাতে ভয় নয়, ঘৃণা নয়, অব্যক্ত বেদনার মধ্যে জাগে এক স্তম্ভিত বিস্ময়। এই ভাব আমাদের মনে স্থায়ী করার জন্য কবি সুচারুভাবে আরও একটি ছবি দেখিয়ে দিলেন :

সমস্ত চরাচর যখন ব্যথিত, মহর্ষিগণ যখন বিমর্ষ, তখন স্বর্গ থেকে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে এই ভয়াবহ দৃশ্য অবলোক করে হৃষ্টচিত্তে বললেন, "যাক্, দেবকার্য সিদ্ধ হল। কৃতং কার্যমিতি ব্যাজহার পিতামহঃ প্রহৃষ্টা।" (অরণ্যকাণ্ড, ৫২/১১)

কিন্তু কবিত্বের দিক থেকে যত সুন্দরই হোক, এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা যাই বলুন, ভক্তের হৃদয় তবু সান্ত্বনা পায় না। ভক্তের কাছে সীতা পরমা প্রকৃতি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, দেবী ভগবতী। সেই দেবীকে অমন স্খলিতবসনা করে, কামুক রাক্ষসের কলুষ হস্ত সীতার দুই উরু বেষ্টন করে কোলে তুলে নিয়ে চলেছে—এ দৃশ্য মর্মান্তিক। তাই পরবর্তীকালের একাধিক রামকথা সাহিত্যে বলা হয়েছে, না, রাবণ সীতাকে হরণ করেনি। হরণ করেছে সীতার এক মায়াময় ছায়ামূর্তি মাত্র! সীতার অঙ্গে রাক্ষসের পাপস্পর্শ পড়েনি।

যেমন গ্রীক সাহিত্যে পরবর্তীকালে হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যের কাহিনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেখানে বলা হয়েছে, হেলেন প্যারিসের সঙ্গে স্বেচ্ছায় পালিয়ে যাননি। প্যারিস হেলেনের এক ছায়ামূর্তি (Eidolon) শুধু সঙ্গে নিয়ে যায়। ট্রয় যুদ্ধের পরে হেলেন আবার তাঁর স্বামী মেনেলাসকে প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (প্রকৃতি খণ্ড, ১৪/৪৮-৫৫) বলা হয়েছে, সীতা হরণের আগে স্বয়ং অগ্নিদেব ব্রাহ্মণের বেশে, রামের কাছে এসে বললেন, আমি ব্রাহ্মণবেশী অগ্নি, দেবতারা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। রাবণ সীতাকে হরণ করতে আসছে। তাই আমি সীতাকে

নিয়ে যাব। আর তোমার কাছে রেখে যাব মায়াময় এক ছায়া সীতা। রাবণবধের পরে অগ্নিপরীক্ষার সময় আমি সীতাকে আবার ফিরিয়ে দেব। রাম সম্মত হলেন। অগ্নির সঙ্গে সীতা চলে গেলেন। রামের কুটিরে রইলেন অগ্নিপ্রদত্ত এক মায়াময় সীতা। রাবণ সেই মায়াসীতা হরণ করে মাত্র।

কূর্মপুরাণে (উত্তর বিভাগ, ৩৪ অধ্যায়ে) আবার একটু অন্যরকম বলা হয়েছে। রাবণ এলে সীতা তার হীন অভিপ্রায় বুঝে তাড়াতাড়ি কুটিরের ভিতরে চলে যান এবং গার্হপত্য অগ্নির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন—"জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যম্"। অগ্নি তখন সীতাকে গ্রহণ করে বাইরে এক মায়াময় সীতা রেখে দেন। রাবণ সেই মায়াসীতা হরণ করে নিয়ে যায়।

দেবীভাগবতেও (তৃতীয় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়ে) অনেকটা এই রকম কাহিনি।

অধ্যাত্মরামায়ণে (অরণ্যকাণ্ড, ৭ম সর্গে) পাই আর এক বর্ণনা। সর্বজ্ঞ রাম জানতেন যে রাবণ ও মারীচ ষড়যন্ত্র করে সীতাকে হরণ করতে আসছে। তাই রাম একদিন সীতাকে ডেকে একান্তে বললেন, "রাবণ আসছে, তুমি বাইরে তোমার ছায়ামূর্তি রেখে নিজে অগ্নির আশ্রয়ে এক বৎসর অপেক্ষা করো—মায়াসীতাং বহিঃস্থাপ্য স্বযমন্তর্দ্ধেঽনলে।"

আনন্দরামায়ণে (সারকাণ্ড, ৭ম্ সর্গে) আছে আবার আর এক বৃত্তান্ত। সীতা সত্ত্ব রজঃ তম তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। সত্ত্বরূপে সীতা রামের বাম অঙ্গে লীন হলেন। রজঃ রূপে বিলীন হলেন অগ্নিতে। আর তমঃ রূপে রইলেন পঞ্চবটী বনে। রাবণ কেবল সীতার ওই তমোময়ী ছায়ামূর্তিটি হরণ করে।

সীতে ত্বং ত্রিবিধা ভূত্বা রজোরূপা বসানলে।
বামাঙ্গে মে সত্ত্বরূপা বস ছায়া তমোময়ী॥
পঞ্চবট্যাং দশাস্যস্য মোহনার্থ বাসাত্র বৈ॥

(আনন্দরামায়ণ, সারকাণ্ড, ৭/৬৭-৬৮)

এইসব বিভিন্ন পুরাণে ভাগবতে এবং অন্যান্য রামায়ণে যে মায়াসীতার কল্পনা করা হয়েছে তার উৎস ও সূত্র বোধকরি বাল্মীকির মূল রামায়ণেই রয়েছে।

বাল্মীকির রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে আমরা দেখি রাম লক্ষ্মণ ও বানর সেনার সামনে ইন্দ্রজিৎ এক মায়াসীতা নির্মাণ করে তাঁকে রথে স্থাপন করে নিয়ে চলেছে। ইন্দ্রজিতের রথে সেই একবেণীধরা শোকাতুরা অশ্রুবিধুরা উপবাসক্লিষ্টা মলিন একবস্ত্রা বিষাদমূর্তি সীতাকে দেখে হনুমান বিহ্বল হয়ে পড়লেন। যদিও আগেই হনুমান অশোক বনে সীতাকে দেখেছেন। কিন্তু তিনিও এই মায়াসীতাকে মায়া বলে চিনতে পারেননি।

ইন্দ্রজিত্তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।

*

স দদর্শ হতানন্দাং সীতামিন্দ্রজিতো রথে।
একবেণীধরাং দীনামুপবাসকৃশাননাম্॥
পরিক্লিষ্টৈকবসনামমৃজং রাঘবপ্রিয়াম্।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮১/৫, ৯-১০)

ইন্দ্রজিৎ তখন সেই মায়াসীতার কেশাকর্ষণ করে খড়্গ দিয়ে শিরচ্ছেদ করে বলল, "এই দেখ, রামপ্রিয়া সীতাকে আমি বধ করলাম। তোমাদের যুদ্ধের সকল প্রয়াস আজ নিষ্ফল হল।"

ময়া রামস্য পশ্যেমাং প্রিয়াং শস্ত্রনিষূদিতাম্
এষা বিশস্তা বৈদেহী নিষ্ফলো বঃ পরিশ্রমঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮১/৩১)

তখন ওই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বানরসেনাগণ হাহাকার করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

তাছাড়া রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে যখন লঙ্কার রাক্ষসপুরীতে তুলেছে তখন কবি বর্ণনা করছেন—নিদধে রাবণঃ সীতাং মায়ামিবাসুরীম্। অরণ্যকাণ্ড, ৫৪/১৪)

রাবণ ময়দানব নির্মিত আসুরী মায়াপুরীতে সীতাকে নিয়ে গেল। সে কী তবে রাক্ষসী মায়াপুরীতে মায়াসীতা? রামায়ণের প্রসিদ্ধ টীকাকার তিলক বলেছেন, আসুরী মায়াপুরীর উল্লেখের ভিতর দিয়ে ইঙ্গিতে ধ্বনিত হয়েছে মায়াসীতার কথা—"মায়ামিবাসুরীমিত্যনেন মায়ারূপৈবৈষা সীতা যা লঙ্কামাগতেতি ধ্বনিতম্"।

সে যাই হোক, সীতাকে রাক্ষস স্পর্শ করুক আর নাই করুক, সীতা জন্ম থেকেই চিরপবিত্র। তীর্থের জল আর অগ্নির মতোই চিরবিশুদ্ধা। সীতার কল্যাণে সমগ্র পৃথিবী পবিত্র—"ত্বয়া জগন্তী পুণ্যাদি"—তাঁকে আর অন্য কোনো ভাবে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ বলেছেন, "পবিত্র? সীতা পবিত্রতা স্বয়ং। সীতা পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত। ভারতবর্ষের যাহা কিছু কল্যাণকর বিশুদ্ধ ও পবিত্র সীতা বলিতে তাহাই বুঝায়, নারীর মধ্যে নারীত্ব বলিতে যাহা বুঝায়—সীতা তাহাই।" ('বাণী ও রচনা', ১০ম্ খণ্ড, পৃ. ২০৬-০৭) তাই সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনে জনক রাজা উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "কে এই অগ্নি? যে আমার কন্যাকে বিশুদ্ধ করার স্পর্দ্ধা করে"? (উত্তররামচরিতম্, ৪/১১)

পঁচিশ

মানবের সহায় মাগে দেবতা

সীতার বিরহে রামের বুকখানি যেন শূন্য হয়ে গেছে। তাঁর আর্ত হৃদয়ে বেদনার যে তীব্র ঝংকার উঠেছে সেই করুণ কম্পনে আকাশ বাতাস কাঁপছে। তাঁর অন্তর যেন অন্ধকারে ভাঙা মন্দিরের মতো বিষণ্ণতায় ভরা। কিন্তু তাঁর পদ্মপলাশ আঁখি দুটিতে অশ্রু নেই, আছে শোকের বিরহের দীপ্তি। তিনি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখেন, এই অরণ্য আকাশ বাতাস, মেঘ পর্বত যেন সীতার নিবিড় প্রেমের মতো স্নেহের চোখে তাকিয়ে আছে। পদ্মের গন্ধমাখা এই বাতাস যেন সীতার সুরভিত নিঃশ্বাসের মতো মনোহর--"নিঃশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১/৭২)। এই পম্পা সবোবরের স্বচ্ছ জলে যেন তাঁর প্রিয়ার মুখের ছায়া ভাসে।

শোকের দুঃখের মুহূর্তে এমনি করে রামায়ণে বারবার প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চলখানি বিছিয়ে ধরা হয়েছে মায়ের সান্ত্বনার মতো। শোকই যে শ্লোক একথা বাল্মীকি আমাদের বারেবারে বুঝিয়ে দেন। রামের হৃদয়-দীর্ণ করা শোকের উপরে কবি তাই প্রকৃতির শান্তি ও সান্ত্বনার সৌন্দর্যধারা বর্ষণ করছেন।

—"সৌমিত্র, ওই দেখ পুষ্প-আকুল মলয় পর্বতের কানন বিতান। মেঘের বর্ষাধারার মতো অলস সমীরণে থরে থরে ঝরে পড়ছে গন্ধপুষ্পের ডালি। কুসুমে অনিলে যেন নন্দনের ক্রীড়া। শিলাপ্রস্তরে আকীর্ণ প্রসুন। নবপল্লবে পুলকিত শাখা। শ্যাম তরুতলে ঝরা ফুলের রাশি। ভ্রমরগুঞ্জনে মুখর হিন্দোলিত বায়ু। পর্বতকন্দরে তার অস্ফুট সুরনিনাদ। কোকিলের কুহরিত তানে উল্লাসে হিল্লোলে স্পন্দিত বনপাদপ।"

পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব॥
প্রস্তরেষু রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্॥
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ॥
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মাতুশ্চলিতঃ স্থানৈঃ ষট্পদৈরনুগীয়তে॥
মত্তকোকিলসন্নাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব বানিলঃ॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১/১১-১৫)

রাম বিহ্বল কণ্ঠে বলে চলেন, "লক্ষ্মণ, বসন্তের এই গন্ধেভরা দিন আজ আমার কাছে নিষ্ফল। যদি এখন সীতার দেখা পেতাম, যদি এই শ্যাম দুর্বাকোমল রমণীয় স্থানে সীতার সঙ্গে বিহার করতে পারতাম, তাহলে অযোধ্যা এমনকী ইন্দ্রত্বও চাইতাম না। আর কিছু ভাবতাম না। আর কিছুই চাইতাম না।

যদি দৃশ্যতে সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি।
স্পৃহয়েয়ং ন শক্রায় নাযোধ্যায়ৈ রঘূত্তম॥
নয়েবং রমণীয়েষু শাদ্বলেষু তয়া সহ।
রমতো মে ভবেচ্চিন্তা না স্পৃহান্যেষু বা ভবেৎ॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১/৯৫-৯৬)

রামের প্রেমিক হৃদয়খানি যেন এখানে এই একটি দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।... অন্যমনস্কের মতো রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতের সৌন্দর্য শোভা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন।..

এদিকে দূর থেকে তাদের দেখে গুহাপর্বতে দাঁড়িয়ে সুগ্রীব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে উঠলেন। সভয়ে বললেন, "অমাত্যগণ, ওই দেখ, অস্ত্রধারী দুজন কারা আসছে। ওরা নিশ্চয়ই বালীর গুপ্তচর। আমাকে বধ করতে আসছে।"

সুগ্রীব ভয় পেয়েছেন দেখে হনুমান তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আপনি বিচলিত হবেন না। মতঙ্গমুনির অভিশাপ আছে। সুতরাং এই ঋষ্যমূক পর্বতে বালী কখনো আসতে পারবে না। আপনি নির্ভয় হন।"

—"কিন্তু বালী যদি তার কোনো মিত্র কিংবা অনুচর পাঠায়? তুমি বরং ছদ্মবেশে গিয়ে ওই আগন্তুকদের পরিচয় জেনে এসো। ওদের কথাবার্তা হাবভাব ভাল করে লক্ষ করবে।"

হনুমান তখন সন্ন্যাসীর বেশে রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা দেবকান্তি। সর্বাঙ্গে রাজকীয় গরিমা প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ আপনারা জটামণ্ডল চীরবল্কলধারী হয়ে কঠোরতপা ব্রহ্মচারীর মতো এই নির্জন অরণ্যে কেন বিচরণ করছেন? আপনাদের দৃষ্টিতে সিংহের বিক্রম। বৃষস্কন্ধ বীরের মতো মন্থর গতি। কিন্তু নিঃশ্বাসে যেন শোকের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। হস্তে শরাসন, কোষমুক্ত খড়্গ। আপনাদের দেখে অরণ্যপ্রাণী সব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আপনারা মানুষ কিন্তু দেবতার মতো দেখতে। দেবলোক থেকে এখানে কেন আগমন করেছেন? এই পর্বতে সুগ্রীব নামে এক ধার্মিক বানরপতি আছেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বড় দুঃখে এই অরণ্যে বিচরণ করছেন। তাঁরই আদেশে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী পবনাত্মজ হনুমান।"

হনুমানের এই বিনীত বচনে রাম অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। লক্ষ্মণকে বললেন, "যে সুগ্রীবের সঙ্গে আমরা সখ্য স্থাপন করতে চাই ইনি তাঁরই মন্ত্রী। এর বাক্য শুনে মনে হয়, ইনি ঋক্ সাম যজুর্বেদে সুপণ্ডিত। স্বরাক্ষর নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বাক্‌পটু। ইনি নিশ্চয়ই বিশেষভাবে ব্যাকরণ অধিগত করেছেন। কথার মধ্যে একটিও অপশব্দ নেই। নির্ভুল সুললিত উচ্চারণ। সুমিত কণ্ঠ। মিতবাক্। এঁর বাক্য দ্রুত নয়, আবার বিলম্বিতও নয়। শান্ত মধ্যম স্বরে কথা বলেন। কথা বলার সময় চোখে মুখে ললাটে এবং অবয়বে কোনো বিকার দেখলাম

না। এঁর কথা শুনলে মনে আনন্দ হয়। লক্ষ্মণ, তুমি এঁর সঙ্গে আলাপ করো।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩/২৬-৩৫)

তখন লক্ষ্মণ এগিয়ে গিয়ে বললেন, "হে বিদ্বান্, আমরা বানররাজ সুগ্রীবের গুণাবলী জানি। আমরা তাঁরই অন্বেষণ করছি।"

রামের আদেশে লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, "পুণ্যে দানে যজ্ঞে যশে বীরত্বে যিনি সকল প্রাণীর আশ্রয়, সেই রঘুনাথ রামচন্দ্র আজ সুগ্রীবের সাহায্যপ্রার্থী।"

হনুমান বললেন, "সুগ্রীবের পরম সৌভাগ্য। বালী তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে। তাঁর পত্নীকেও হরণ করেছে। তিনি দুঃখিত ভীত ও অসহায়। আপনাদের মতো বলবান সহায় হলে তাঁর মঙ্গল হবে। আর সীতা অন্বেষণে আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।"

শুনে লক্ষ্মণ রামকে বললেন, পবননন্দন হনুমানের কথায় মনে হচ্ছে, আমাদের এখানে আসার ফলে সুগ্রীব এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই কার্যসিদ্ধি হবে। হনুমানের কথা এবং তাঁর মুখের প্রসন্ন ভাব দেখে মনে হয় তিনি মিথ্যা কথা বলছেন না।"

প্রসন্নমুখবর্ণশ্চ ব্যক্তং হৃষ্টশ্চ ভাষতে।
নানৃতং বক্ষ্যতে বীরো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৪/৩২)

হনুমান তখন রাম-লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে গেলেন। হনুমানের উদ্যোগে অগ্নিসাক্ষী করে, মন্ত্র উচ্চারণ ও শপথ বাক্য পাঠ করে, রাম ও সুগ্রীব মিত্রতা স্থাপন করলেন।

—"আপনাদের বন্ধুরূপে পেলাম। এবার দেবতারা নিশ্চয় আমাকে কৃপা করবেন। আমি রাজ্য থেকে বিতাড়িত। আবার পত্নীও অপহৃত। আমি বালীর ভয়ে ভীত। আমাকে অভয় দান করুন। এই অগ্নি প্রদক্ষিণ করে আপনার অভয়হস্ত দান করুন।" সুগ্রীব বলে।

রাম তখন স্মিত হাস্যে সুগ্রীবের হস্ত ধারণ করে করমর্দন করলেন। তাঁকে আলিঙ্গন করে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমার ভার্যাপহারী বালীকে আমি বিনাশ করব। বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্যাপহারিণম্।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫/২৬)

এমনি করে রাম কিষ্কিন্ধার রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। আর্যাবর্ত থেকে দূরে দক্ষিণে এই কিষ্কিন্ধা দেশ। ভিন্ন তার ভাষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

মাল্যবান ও ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বতের ভিতর দিয়ে এক খরস্রোতা গিরিনদী বয়ে চলেছে। ওই নদীবেগশালিনী গিরিবর্ত্মে শক্তিশালী এক পার্বত্য উপজাতির রাজ্য এই কিষ্কিন্ধা। তাদের সমাজ সংস্কৃতি ও লোকব্যবহার স্বতন্ত্র। তবে তাদের উপরে আর্য-সভ্যতার প্রভাব এসে পড়েছে। তারা সংস্কৃত শিক্ষা করে। বেদ অধ্যয়ন এবং বৈদিক মন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠান পালন করে।

আমরা দেখি হনুমান অগ্নিচয়ন করছেন। মন্ত্র উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আর্যদের মতো অগ্নিপূজা করছেন। "জনয়ামাস পাবকম্। দীপ্যমানং ততো বহ্নিং পুষ্পৈরভ্যর্চ্য সৎকৃতম্" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫/১৪)।

বালীকেও দেখি সমুদ্রতীরে নিত্য সান্ধ্য উপাসনা করতে—"বালিনংদৃষ্ট্বা সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্" (উত্তরকাণ্ড, ৩৪/১২)।

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক হল বৈদিক শাস্ত্রবিধি অনুসারে, পুরোহিতের মন্ত্রে ও গন্ধমাল্য অভিসিঞ্চনে—

শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষি-বিহিতেন চ।

*

অভ্যষিঞ্চত সুগ্রীবং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৬/৩৪, ৩৬)

বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পন্ন হল বৈদিক বিধি অনুসারেই—

ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্ত্বা সোঽপসব্যং চকার হ।

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৫/৫০)

তাছাড়া হনুমানকে তো 'সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ'' (৪/৫৪/৫) বলা হয়েছে। রাম তাঁর বিদ্যাবত্তা ও আচার ব্যবহার দেখে বিলক্ষণ বিস্মিত হয়েছিলেন। (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩/২৮-২৯)

রামায়ণের দাক্ষিণাত্য পাঠে হনুমানের অধিত বিদ্যার একটা তালিকাও দেওয়া আছে। তাতে বলা হয়েছে, সূত্র (অষ্টাধ্যায়ী), বৃত্তি (সূত্রবৃত্তি), অর্থপদ (বার্তিক), মহার্থ (মহাভাষ্য) এবং ছন্দ্রশাস্ত্রেও হনুমান অদ্বিতীয় বিশারদ ছিলেন। তাঁকে ''নব্যব্যাকরণবেত্তা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বাল্মীকিও বলেছেন, হনুমান হলেন, ''নিশ্চিতার্থোঽর্থতত্ত্বজ্ঞঃ কালধর্ম বিশেষবিৎ'' (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৯/৬)।

তাছাড়া, তারার পিতা সুষেণ ছিলেন একজন ধন্বন্তরী রাজবৈদ্য। রাবণের শক্তিশেলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে লক্ষ্মণকে তো তিনিই বাঁচিয়েছিলেন। বাল্মীকি তাঁকে ''মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণঃ'' (যুদ্ধকাণ্ড, ১০১/২৯) বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আয়ুর্বৈদিক ঔষধ বিশল্যকরণী, সাবর্ণকরণী, সঞ্জীবকরণী, সন্ধানকরণী, ইত্যাদি ভেষজের নাম আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে কিষ্কিন্ধার শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি ছিল।

আবার সুগ্রীবের অন্যতম মন্ত্রী নল ছিলেন একজন যন্ত্রবিৎ বাস্তুকার অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার। বানর সেনার সাহায্যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদ্রবন্ধন করে সেতু নির্মাণ করেন। বড় বড় পাথরের চাঁই পাহাড় থেকে কেটে নিয়ে এসে সেই সেতু নির্মাণ করা হয়। এই কাজে উন্নত ধরনের যন্ত্রও ব্যবহার করা হয়েছিল। রামায়ণে তার স্পষ্ট বর্ণনা আছে—

হস্তিমাত্রাণ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ২২/৬০)

তাছাড়া কিষ্কিন্ধার রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে নগরবিন্যাস, পৌর ও স্থাপত্যবিদ্যার এক চরম নিদর্শন ফুটে উঠেছে। কিষ্কিন্ধার সভ্যতা ও ঐশ্বর্য যে কত উন্নত ছিল তা এ থেকেই বোঝা যায়।

লক্ষ্মণ যেতে যেতে দেখছেন, রত্নময় সুরম্য হর্ম্য ও প্রাসাদ। সোনার তোরণ। পুষ্পিত কানন। চন্দন ও অগুরুগন্ধে সুবাসিত ছায়াশীতল পথ। চারিদিকে স্বর্ণ রৌপ্য মাণিক্যের ছটা।

ধনধান্যে ভরা গন্ধ মাল্যে অলংকৃত গৃহে গৃহে রূপযৌবন গর্বিতা সুন্দরী রমণী। নৃত্য গীত আনন্দে উচ্ছল।

স তাং রত্নময়ীং দিব্যাং শ্রীমান্ পুষ্পিতকাননাম্।
রম্যাং রত্নসমাকীর্ণাং দদর্শ মহতীং গুহাম্॥
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নোপশোভিতাম্।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতাম্॥

*

পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশানি গন্ধমাল্যযুতানি চ।
প্রভুতধনধান্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ॥

*

দিব্যমাল্যাবৃতং শুভ্রং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্॥

*

প্রবিশন্নেব সততং সুশ্রাব মধুরস্বনম্।
তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরাম্॥
বহ্বীশ্চ বিবিধাকারা রূপযৌবনগর্বিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুগ্রীবভবনে দদর্শ স মহাবলাঃ।

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৩/৪-৫, ১৩, ১৭, ২১-২২)

তাছাড়া তারার সৌন্দর্য ও বিদ্যাবত্তার তো তুলনাই নেই। অত্যন্ত সুন্দরী বিদুষী সংগীত নৃত্য নিপুণা তারা এতই বুদ্ধিমতী ছিলেন যে তিনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরের কথা বুঝতে পারতেন। মহাভারতে তারাকে তাই বলা হয়েছে, "সর্বভূতরুতজ্ঞা" (বনপর্ব, ২৮০/১৯)।

কিষ্কিন্ধার ধনরত্ন ঐশ্বর্য, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে অভাব ছিল না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ সমাজজীবন হয়তো নৈতিক ও ব্যবহারিক দিক্ থেকে কিছুটা শিথিল বিশৃঙ্খল অনিয়ন্ত্রিত ছিল। মদ্যপান ও নারী আসক্তি ছিল তাদের একটা উৎকট ব্যসন। লক্ষ্মণ যেতে যেতে সারা পথে কেবল মদের গন্ধ পেয়েছেন—মৈরেয়াণাং মধুনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৩/৭)। তাছাড়া স্ত্রীঘটিত ব্যাপার নিয়েই তো বালীর সঙ্গে মায়াবী অসুরের শত্রুতা বাধে।

আবার রাজা হয়ে প্রথমেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী মাতৃসমা তারাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করতে সুগ্রীবের সংকোচ হয়নি। বালীও প্রতিশোধ নিতে কনিষ্ঠভ্রাতার পত্নী কন্যাসমা রুমাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, আর্যদের তুলনায় তাদের সামাজিক নৈতিক জীবনের মান কতটা নিচু ছিল। সেজন্য তাঁরা নিজেরাও নিজেদের বেশ হেয় মনে করত।

অন্তঃপুরে সুরা ও নারী নিয়ে মত্ত সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণ যাতে ক্রুদ্ধ না হন সেজন্য তারা বলছেন, "কামাসক্ত হয়ে মহাতপা বিশ্বামিত্র পর্যন্ত যদি কালাকাল জ্ঞান ভুলে যান তাহলে আমাদের মতো হেয় লোকের আর কথা কি!"

স হি প্রাপ্তং ন জানীতে কালং কালবিদাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ কিং পুনর্যঃ পৃথগ্‌জনঃ॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৫/৮)

তারা এখানে নিজেদের "পৃথগ্‌জনঃ" বলে উল্লেখ করেছেন। অমরকোষে "পৃথগ্‌জনঃ" শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে, হীন মূর্খ নীচ জাতীয় লোক।

তারা নিজেও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে টলছেন। লজ্জা ভুলে প্রগলভ হয়ে উঠেছেন—"সা পানয়োগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা... উবাচ তারা প্রণয়প্রগলভং" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৩/৪০)।

আবার দূর থেকে রাম লক্ষ্মণকে প্রথম দেখে সুগ্রীব যখন অত্যন্ত অস্থির ও ভীত হয়ে পড়লেন, তখন হনুমান তাঁকে বলছেন, "আপনি বানরোচিত চপলতা প্রকাশ করছেন। আপনার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। মতি স্থির করতে পারছেন না।"

লক্ষ্মণও একবার তাই ক্রুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবকে তিরস্কার করেছিলেন, "তুমি অনার্য কৃতঘ্ন মিথ্যাবাদী বানর। অনার্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৪/১৩)

তবু শিক্ষায় কর্মদক্ষতায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিষ্কিন্ধা যে একটা সঙ্ঘবদ্ধ বলিষ্ঠ জাতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনার্য হলেও তাদের নিতান্ত মনুষ্যেতর বন্য প্রাণী মনে করা ঠিক হবে না।

যদিও রামায়ণ পাঠ করে সাধারণ পাঠকের মনে এমন ধারণা হয় যে, সুগ্রীব, হনুমান, নল, নীল এরা হল সব লাঙ্গুলধারী সাধারণ বানর। জাম্ববান ঋক্ষজাতি অর্থাৎ ভল্লুক। জটায়ু সম্পাতি হল গৃধ্র অর্থাৎ পক্ষীবিশেষ। যত সব আজগুবি অপ্রাকৃত উদ্ভটকল্পনা।

কিন্তু আদিকবি বাল্মীকি ভারতীয় জীবন ও ইতিহাসকে, তার সকল কথা গাথা কল্পশুদ্ধিকে এক গভীরতর আধ্যাত্মিক সত্যের আলোতে তুলে ধরেছেন। ভারতের সমগ্র জাতি, তার ধর্ম ও আদর্শকে বলিষ্ঠ কল্পনায় গল্পে কাহিনিতে বিধৃত করেছেন। তার রূপ ও গঠনে এনেছেন একটা বিরাটত্ব। আমাদের ক্ষুদ্র সীমিত দৃষ্টির কাছে তা মনে হতে পারে যেন অলৌকিক। রামায়ণে তাই মিথ (myth) ও মিথলজি (mythology) আলাদা করে যায় না। রূপ আর রূপক এখানে অভিন্ন।

কবিকল্পনা এখানে এমন একটা ব্যাপ্তি লাভ করেছে, যার মধ্যে মানুষের সমাজে ও জীবনে, নিত্য যে ভাল ও মন্দ, দেব ও দানবের সংগ্রাম চলেছে, তাই বিশালকায় হয়ে রূপ নিয়েছে। রাক্ষস রাবণের বিকট আসুরিকতাকে, তার দশদিকে বিস্তৃত প্রভাব ও দৃষ্টিকে, দশ মাথা দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে। কাহিনি বা legend এখানে symbol বা প্রতীক হয়ে উঠেছে। কার্তবীর্য অর্জুনের অপরিসীম শারীরিক ভুজবলকে সহস্রবাহু করে দেখানো হয়েছে। প্রাচীন ভারতের এই হল প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য। বেদ থেকে আরম্ভ করে পুরাণ পর্যন্ত গল্প বলার ভঙ্গিটি এমনই প্রতীকধর্মী। ভারতীয় ঋষিগণ কেবল বাইরের চেহারাটাই দেখেন না, তাঁরা একই সঙ্গে ভিতর ও বাহিরের আধ্যাত্মিক রূপ ও শক্তিকে ব্যক্ত করেন। সেসব হল আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতিফলিত আলেখ্যপ্রতিমা।

তাঁরা এমনি করে সত্যের সাক্ষাৎ দৃষ্টি দিয়ে দেবতাদের স্বরূপকেও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের মহিমাময় রূপ যা লৌকিক নয় অথচ সত্যের চেয়েও সত্য। প্রত্যক্ষের

চেয়েও প্রত্যক্ষ। একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, সত্যই কি তৃতীয় নয়ন নেই? দশভূজা দুর্গা কী দশপ্রহরণধারিণী দশদিক্ ব্যাপ্ত মহাশক্তির ধ্যানমূর্তি নয়?

রামায়ণে শিল্পরূপ গঠনেও তেমনি রয়েছে বাল্মীকির আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিরই সৃজনপ্রতিভা। লৌকিক-অলৌকিকে মেশা এই গঠনরীতি সম্বন্ধে শ্রী অরবিন্দ বড় সুন্দর করে বলেছেন, The Itihasa was an ancient historical or legendary tradition turned to creative use as a significant mythus or tale expressive of some spiritual or religious or ethical or ideal meaning and thus formative of the mind of the people." (*The Foundations of Indian Culture, 1959, p. 326)*

এইসব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত চরিত্রগুলি একই সঙ্গে ভারতীয় জীবনের নীতি আদর্শ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার রূপকথা এবং কাহিনি—"mythus or tale"।

প্রাচীন ভারতের আর্যেতর জাতিরা সকলে একসময় তাদের উপাস্য দেবতা বা দেবতার বাহনের চিহ্নকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করত। সেই চিহ্ন বা totem দিয়েই সেসব জাতির পরিচয় দেওয়া হতো। কিষ্কিন্ধার এই যত বানর ঋক্ষ বা গৃধ্র আসলে হয়তো তাদের জাতীয় প্রতীকচিহ্ন বা টোটেম। বানরের লাঙ্গুল, ভল্লুকের চর্ম বা পক্ষীর পালক তারা নিজেদের জাতীয় পোশাক বা পোশাকের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করত। এই চিহ্নকে তারা মনে করত অত্যন্ত পবিত্র জাতীয় ভূষণ। তারা নিজেরাও এই প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে একাত্ম বোধ করত।

সতীশচন্দ্র দে তাঁর 'রামায়ণের প্রকৃত কথা' গ্রন্থে এবং রামদাস তাঁর *Aboriginal Tribes of Ramayana : Man in India, Vol-V,* গ্রন্থে বলেছেন, এখনো নাকি অন্ধ্রের ভিজিয়ানাগ্রামের আদিবাসীরা বানরের লেজের মতো কৃত্রিম লাঙ্গুল পোশাক হিসাবে ব্যবহার করে। তিনি মন্তব্য করেছেন, "...a certian class of foresters existed in the Ramayana age, who wore the tail as ornament (Bhusan : ভূষণ) as a totem (চিহ্ন) of the tribes." (উদ্ধৃতি : আনন্দময় মুখোপাধ্যায়ের 'রামায়ণ-যুগে ভারত সভ্যতা', ১৯৭৪, পৃ. ১২৯)।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও এমন ভল্লুক হরিণ ও নেকড়ের চিহ্নধারী সব জাতির কথা শোনা যায়। ফ্রেজার সাহেব তাঁর *Golden Bough* গ্রন্থে তাদের পরিচয় দিয়েছেন "Bear clan", "Deer clan", "Wolf clan" বলে।

পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের মধ্যে এইসব টোটেমের প্রভাব যে কতখানি সে সম্বন্ধে নৃতত্ত্বের গবেষণায় বলা হয়েছে—

"Men may identify themselves with their totems or mark themselves as this or that totem, by wearing the hide or the plumage of the bird or the beast or by putting on a mask resembling its face." *(Encyclopaedia Britannica*, 13th Edn, Vol. 27, 'On Totemism')

তাহলে কিষ্কিন্ধার এইসব বানর ঋক্ষ ও গৃধ্র জাতি হয়তো আসলে এমনি সব টোটেমধারী মানুষ। তাদের জাতীয় প্রতীক চিহ্নকেই বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যের রূপকল্পনায় প্রমূর্ত করে ধরেছেন। যা একই সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের ভাষায় মিথ্ এবং ইতিহাস।

ছাব্বিশ

রামের যশ অপযশ

সুগ্রীব তাঁর সকল দুঃখের কথা রামকে বলছেন। ঋক্ষরাজার পুত্র বালী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বালীর শৌর্যবীর্যে ত্রিভুবন বিজয়ী রাক্ষস রাবণ পর্যন্ত পরাভূত। রাবণ ভীত হয়ে বালীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছে। কিষ্কিন্ধার পরাক্রান্ত রাজা বালী। হেমগিরির মতো তার বিশাল দেহ। লোহিত লোচন, দীর্ঘবাহু, কপাট বক্ষ। বিজয়লক্ষ্মী বিরাজিত ইন্দ্রমালা ভূষিত কণ্ঠ। ইন্দ্রতুল্য তার তেজ ও বীরত্ব। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। প্রভাতসূর্যের মতো প্রদীপ্ত আনন। দংস্ট্রাকরাল বদন।

হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্।	(উত্তরকাণ্ড, ৩৪/১২)
বালী স কনকপ্রভঃ	(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৫/৩)
শক্রদত্তা বরা মালা কাঞ্চনী রত্নভূষিতা	(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/৫)
উদারা শ্রীঃ স্থিতা হ্যস্যাং	(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২২/১৬)
ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হরিলোচনম্।।	(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/১১)
দ্রংস্ট্রাকরালস্ত	(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৫/৪)

মহাকায় মহিষাসুর, যাব ভয়ে সমুদ্র ভীত, শৈলরাজ হিমালয় পর্যন্ত সন্ত্রস্ত, সেই দুন্দুভি রাক্ষসকে বালী মল্লযুদ্ধে নিহত করে। দুন্দুভির রক্তাক্ত মৃতদেহকে সে উৎক্ষিপ্ত করে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়। কিন্তু রাক্ষসের সেই দেহ থেকে রক্ত ছিটকে গিয়ে পড়ে মতঙ্গমুনির আশ্রমে। আশ্রম দূষিত হয়েছে দেখে মতঙ্গমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, বালী যেন কখনো তাঁর আশ্রমে না আসে। আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে এলেও তাব মৃত্যু হবে। সেই থেকে মুনির অভিশাপের ভয়ে বালী কখনো ঋষ্যমূক পর্বতের কাছেও আসে না।

তবে বালী খুব স্নেহপ্রবণ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে সে পিতাব মতোই ভালবাসত। সুগ্রীবও তার অনুগত ছিল। কিন্তু হঠাৎ সব যেন কি হয়ে গেল।

স্ত্রীঘটিত কোনো ব্যাপার নিয়ে বালীর সঙ্গে মায়াবী অসুরের বিরোধ বাধে। দুন্দুভি রাক্ষসের পুত্র মায়াবী অত্যন্ত তেজস্বী অসুর। অন্যত্র বলা হয়েছে, সে নাকি ময়দানবের পুত্র, মন্দোদরীর ভাই (উত্তরকাণ্ড, ১২/১৩)। যাই হোক, একদিন জ্যোৎস্নারাতে মায়াবী অসুর এসে হানা দিল কিষ্কিন্ধার রাজপ্রাসাদের দ্বারে। বালী ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে গেল যুদ্ধ করতে। কারো নিষেধ শুনল না। সুগ্রীবও সাহায্য করতে বালীর অনুসরণ করল।

বালীকে কালান্তক যমের মতো সংহারমূর্তি নিয়ে ছুটে আসতে দেখে, মায়াবী অসুর ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি এক তৃণাবৃত দুর্গম মাটিব গুহার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বালীও তখন সেই

অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। যাওয়ার আগে সুগ্রীবকে বলল, "আমি যতক্ষণ অসুরকে বধ করে ফিরে না আসি ততক্ষণ তুমি সাবধানে এই গুহামুখে অপেক্ষা কর।"

—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

—"না। তুমি ভিতরে যাবে না। আমার চরণের দিব্যি রইল। শপথ রইল। এখানে অপেক্ষা কর।"

সুগ্রীব অপেক্ষা করে রইলেন।...

এক বৎসর হয়ে গেল।

বালী তবু ফিবে আসে না।

সুগ্রীবের দুশ্চিন্তা হল।

আরও কিছুদিন যায়...

একদিন হঠাৎ দেখা গেল, গহ্বরের ভিতর থেকে তাজা রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। অসুরের গর্জনে গুহাগহ্বব কাঁপছে। কিন্তু বালীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল না।

—'হে রাম, আমি তখন অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে ভাবলাম বালী নিশ্চয় অসুরের হাতে নিহত হয়েছে। তাই ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিলাম। তারপর শোকার্তচিত্তে বালীর জন্য তর্পণ করে কিষ্কিন্ধায় ফিরে এলাম। আমি এই ঘটনার কথা গোপন করেছিলাম; কিন্তু মন্ত্রীরা সব জানতে পেরে সকলে এসে আমাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।"

শান্ত গম্ভীর মুখে রাম শুনছেন সুগ্রীবের কথা।

—"একদিন হঠাৎ দেখি, বালী ফিরে এসেছে। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে নেমে আমার মাথার মুকুট দিয়ে তার চরণস্পর্শ করে বললাম, 'ভাগ্যবলে শত্রু নিধন করে তুমি ফিরে এসেছ। এই সিংহাসন এই রাজছত্র তোমার। তুমি গ্রহণ করো। আমি তোমার আশ্রিত দাস। আমি রাজা হতে চাইনি। তোমাকে মৃত মনে করে মন্ত্রীরা জোর করে আমাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।' কিন্তু আমার কথা বালী বিশ্বাস করল না। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে সে বলল, 'ধিক্ তোকে'। তারপর মন্ত্রীদের ডেকে বলল, 'সুগ্রীবকে আমি গুহার মুখে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কিন্তু সে নিষ্ঠুর। বিশ্বাসঘাতক। আমার স্নেহভালবাসার কথা ভুলে গিয়ে সিংহাসনের লোভে সে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে এখানে এসে রাজা হয়ে বসেছে।' এই বলে বালী আমাকে এক বস্ত্রে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিল। আমার পত্নীকেও হরণ করে নিল। সেই থেকে প্রাণের ভয়ে আমি বনে বনে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি। মতঙ্গমুনির অভিশাপে বালী কখনো এই ঋষ্যমূক পর্বতে আসবে না, তাই শেষে এই পর্বতে আশ্রয় নিয়েছি। বিনা অপরাধে আজ আমি বিপন্ন।"

রাম করুণাকুল নেত্রে সহানুভূতির কণ্ঠে বললেন, "আমার নিজের দুঃখ দিয়েই আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। তোমার ভার্যা অপহরণকারী দুশ্চরিত্র বালী যতক্ষণ আমার ক্রুদ্ধদৃষ্টির সামনে না পড়ছে ততক্ষণই সে বেঁচে আছে।

যাবত্ত্বং নহি পশ্যেয়ং তব ভার্যাপহারিণম্।
তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চরিত্রদূষকঃ॥
আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মগ্নস্ত্বং শোকসাগরে।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১০/৩৩-৩৪)

হর্ষ ও পৌরুষবর্ধনকারী রামের কণ্ঠস্বরে দিকসব কম্পিত হয়ে উঠল।

এইমাত্র রাম যা শুনলেন তাতে বালীর প্রতি তাঁর ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর ধর্ম রুচি এবং বিবেক বোধে আঘাত লেগেছে। পরিস্থিতি বিচার না করে নিরপরাধ ভ্রাতাকে এমনি করে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা?' তার চেয়েও জঘন্য হল কন্যাসমা ভ্রাতৃবধূকে অপহরণ করা? রাম তাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু সুগ্রীব সব সত্য কথা বলেননি। একটা গুরুতর ব্যাপার রামের কাছে গোপন করে গেছেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন সেই কথাটি বললে হয়তো রামের সহানুভূতি তিনি পাবেন না। শুনলে বালীর পরিবর্তে সুগ্রীবের উপরেই রাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন।

বস্তুত যে অপরাধের দণ্ড দিতে রাম বালীকে বধ করেছিলেন, "তুমি রাজার মতো আচরণ করোনি। কামাচারী হয়ে ধর্মের পীড়াদক অত্যন্ত নিন্দিত কাজ করেছ"—

ত্বং তু সংক্লিষ্টধর্মশ্চ কর্মণা চ বিগর্হিতঃ।
কামতন্ত্রপ্রধানশ্চ ন স্থিতো রাজবর্ত্মনি।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৮/১২)

রামের যুক্তি অনুসারে তাহলে সুগ্রীবেরও বধদণ্ড হওয়া উচিত। কারণ রাম ওই সঙ্গেই বলেছেন, "পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিদ্যাদাতা এই তিন জনকে পিতার ন্যায় মনে করবে।"

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথিবর্তিনঃ॥

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৮/১৩)

সুগ্রীব শুধু যে বালীকে অনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে রেখে রাজ্যাধিকার করেছিলেন তাই নয় সেই সঙ্গেই প্রথমেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী মাতৃসমা তারাকে নিজের শয্যাসঙ্গিনী করে নিয়েছিলেন। এবং তারা নিজেও তাঁর স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার অপেক্ষা করেননি। মন্ত্রীদের অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণ করা যদি অন্যায় না-ও হয়. কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীর প্রতি কামাসক্ত হওয়া অত্যন্ত গর্হিত। সুগ্রীবের এই আচরণের কোনো উত্তর নেই। তাই কৌশলে সুগ্রীব এই কথাটি রামের কাছে গোপন করে গিয়েছেন। এবং বালী বধ না হওয়া পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তা রামকে বলেননি।

বালী ফিরে এসে দেখল, শুধু সিংহাসন অধিকার করাই নয়, তার প্রিয়তমা পত্নীকে নিয়ে তারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘৃণ্য সহবাসে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই অসহ্য লজ্জা আর অপমানে বালীর বীর হৃদয় একেবারে ক্রোধে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধে

বালী এ নিয়ে একটা কথাও বলেনি। 'তোকে ধিক্' শুধু এই একটি কথায় সে তার মর্মগ্লানিকে প্রকাশ করেছে।

কিন্তু সুগ্রীবের এই কামুক আচরণে সারা কিষ্কিন্ধা রাজ্যে একটা চাপা ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। বিশেষ করে বালীর পুত্র অঙ্গদ সুগ্রীবকে কোনোদিনই ক্ষমা করেনি। শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের মতোই অঙ্গদের মন চিরকাল তার পিতৃহন্তা মাতৃ-আসক্ত এই শিথিলচরিত্র পিতৃব্যের প্রতি একটা ঘৃণা ও আক্রোশ পোষণ করেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে অঙ্গদ একবার তার মনের কথা বলেও ফেলেছে, "আমি সুগ্রীবের মধ্যে কোনো বীরত্ব ধৈর্য সরলতা বা পবিত্রতা দেখি না। সে পাপী কৃতঘ্ন স্মৃতিভ্রংশ চঞ্চলচিত্ত। কোনো সৎ ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।"

স্থৈর্যমাত্ম-মনঃশৌচমানৃশংসমথার্জবম্।
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্যঞ্চ সুগ্রীবে নোপপদ্যতে॥

*

তস্মিন পাপে কৃতঘ্নে তু স্মৃতিভিন্নে চলাত্মনি।
আর্যঃ কো বিশ্বসেজ্জাতু তৎকুলীনো বিশেষতঃ॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫৫/২, ৭)

তাই অঙ্গদের নেতৃত্বে সমগ্র বানর-সেনার মধ্যে একবার অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে অঙ্গদ বানরসেনাকে সম্বোধন করে বলেছিল, "জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী মাতৃতুল্য। যে দুরাত্মা কামনার বসে সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করে তাকে আমরা ধার্মিক বলব কেমন করে?"

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্।
ধর্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ॥
কথং স ধর্ম জানীতে যেন ভ্রাতা দুরাত্মনা।

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫৫/৩-৪)

বানরসেনাগণও একবাক্যে অঙ্গদকে সমর্থন করে চিৎকার করে উঠেছিল, "হাঁ, হাঁ, সুগ্রীবের স্বভাব অত্যন্ত কঠোর—তীক্ষ্ণ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫৫/২১) সকলে তারা সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর প্রশংসা করতে লাগল—"সুগ্রীবং চৈব নিন্দন্তঃ প্রশংসন্তশ্চ বালিনম্" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫৫/১৮)।

শেষ পর্যন্ত হনুমান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের সেই ধূমায়িত বিদ্রোহ প্রশমিত করেন।

এমন ভ্রাতাকে বালী তার অন্তঃপুরে রাখতে পারে না, তাই তাকে নির্বাসিত করেছিল। কিন্তু নির্বাসিত করার সময় বালীর কণ্ঠে কোনো ক্রোধ ছিল না। আহত হৃদয়ের চাপা দুঃখে বালী শুধু বলেছিল, "তোমাকে মারব না। তুমি চলে যাও। ন ত্বাং জিঘাংসামি চরেতি।"...(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৪/৮) সেই সঙ্গে হয়তো সুগ্রীবকে উপযুক্ত মর্মপীড়া দেওয়ার জন্যই বালী সাময়িক ক্ষোভে উত্তেজনায় রুমাকে রাজপ্রাসাদে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু রুমার প্রতি বালীর যে কোনো লালসা বা হীনপ্রবৃত্তি ছিল এমন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না।

বরং সে সুগ্রীবকে আশৈশব পিতৃস্নেহে লালন পালন করেছে। নির্বাসন দেওয়ার পরেও সুগ্রীবকে সে বারবার স্নেহ ও ক্ষমা করেই এসেছে।

সন্তপ্ত হয়ে সুগ্রীব সেকথা পরে স্বীকার করেছে, "আমি তাঁর প্রতি সব সময় ক্রোধভাব কামভাম ও বানরভাব প্রকাশ করতাম, কিন্তু তিনি সর্বদা আমার প্রতি ভ্রাতৃভাব আর্যভাব ধর্মভাব রক্ষা করতেন।"

ভ্রাতৃত্বমার্যভাবশ্চ ধর্মশ্চানেন রক্ষিতঃ।
ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৪/১২)

সুগ্রীব বাববার যুদ্ধের আস্ফালন কবে এলে বালী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিযে নিরস্ত করেছে, "যাও, এমন আর কোরো না। সান্ত্বয়িত্বা ত্বনেনোক্তা ন পুনঃ কর্তুমর্হসি।' (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৪/১১)।

বালীর এই স্নেহ ও ক্ষমা, সাহস ও তেজ, সর্বোপরি তার এই মৌন আত্মমর্যাদাবোধ আমাদের বিস্মিত করে।

হয়তো বালীর হৃদয়ের গভীরে আরও কোনো ব্যথা ছিল। সে ব্যথা বলাও যায় না, সহাও যায় না। তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো তার মর্ম বিদ্ধ করে রেখেছিল একটা নিভৃত বেদনা, একটা গোপন লজ্জা। যা ভিতরে ভিতরে তার পৌরুষ ও বীরত্বকে ক্ষয় করে দিয়েছে।

প্রথম থেকেই তারা কি সুগ্রীবকে ভালবাসত? তাদের মধ্যে ছিল কি কোনো গোপন প্রণয়? নইলে স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়েই কেমন করে সে সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হল? তারা যদি সম্মত না হত সুগ্রীবের সাধ্য কি তাকে গ্রহণ করে? সমস্ত কিষ্কিন্ধা রাজ্য সুগ্রীবকে বাধা দিত। বাধা দিত বীরপুত্র অঙ্গদ। মনে মনে বালী এই সব ভেবেছে। আর ঈর্ষায় শঙ্কায় তার মন গুমরে গুমরে উঠেছে। বালীর মনের এই দুঃখের আভাস বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে দিয়েছেন, "পর্যশঙ্কততামীর্ষঃ সুগ্রীবগতমনসাম্" (মহাভারত, বনপর্ব, ২৮০/২৫)। এই একটি কথায় বেদব্যাস যেন বালীর হৃদয়ের গোপন ক্ষতস্থানটি দেখিয়ে দিচ্ছেন।

গভীর রাতে সুগ্রীব যখন দ্বিতীয়বার এসে যুদ্ধের আস্ফালন করতে লাগল, তখন তারা ভয়ে বিহ্বল হয়ে বালীকে বুকে জড়িয়ে ধরে মিনতি করে বলতে লাগলেন, "তুমি ক্রোধ সংবরণ করো। সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কর্মদক্ষ। নিশ্চয় সে এবার কোনো বলবান সহায় নিয়ে যুদ্ধে এসেছে। অঙ্গদ গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়েছে, সুগ্রীব দশরথের পুত্র রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছে। আমার কথা শোন। রাগ কোরো না। সুগ্রীবকে তুমি ক্ষমা করো। সে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাকে তো তোমার স্নেহ করা উচিত। কাছেই থাক আর দূরেই থাক, তার চেয়ে বড় বন্ধু তোমার আর কেউ নেই। তাকে আদর করে ঘরে নাও। সুগ্রীবকে যুবরাজ করে সম্মানিত করো।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৫/২২-২৯)

কথাগুলি তারা বালীর মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে বলেছিলেন। কিন্তু বালীর মন আগে থেকেই সন্দেহে বিষিয়ে ছিল। সে ভাবল, তারা সুগ্রীবে আসক্ত, সুগ্রীবকে সে বাঁচাতে চায়, তাই এত আকুলতা। বিশেষ করে তারার মুখে সুগ্রীবের রূপ-গুণ-বুদ্ধির প্রশংসা শুনে সে

অন্তরে জ্বলে উঠল। বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার প্রতি তোমার অনেক ভক্তি ভালবাসা দেখানো হয়েছে। এখন ফিরে যাও।"

নিবর্তস্ব সহ স্ত্রীভিঃ কথং ভূয়োঽনুগচ্ছসি।
সৌহৃদং দর্শিতং তাবন্ময়ি ভক্তিস্ত্বয়া কৃতা॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৬/৬)

যেতে যেতে বালী আরও বলল, "তোমার ভয় নেই, আমি সুগ্রীবের দর্প চূর্ণ করব মাত্র, তাকে প্রাণে মারব না।"

দর্পংচাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিযোক্ষ্যতে।

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৬/৭)

কথাগুলিতে বীরত্বের দম্ভ নেই, শুধু আছে এক বঞ্চিত প্রেমিকের আহত অভিমানের করুণ আর্তনাদ।...

প্রথমবারে প্রহার জর্জরিত হয়ে সুগ্রীব ফিরে গিয়ে অভিমানে রামকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমাকে কেন এমন করে বৃথা লাঞ্ছিত হতে দিলে? বালীকে বধ করবে বলে কথা দিয়েছিলে। কিন্তু তুমি সে কথা রাখলে না। যদি জানতাম তুমি বালীকে বধ করবে না, তাহলে আমিও যেতাম না।"

রাম বললেন, "সুগ্রীব ক্রোধ ত্যাগ করো। আমার কথা শোনো। তোমরা দুজনে চেহারায় বেশভূষায় আকারে প্রকারে অবিকল এক রকম। তোমাকে আলাদা করে চিনতে পারিনি। আমার নিক্ষিপ্ত বাণে পাছে তুমি নিহত হও, মিত্রবধের ভয়ে আমি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিনি। তোমাকে চিনতে পারি এমন কোনো চিহ্ন ধারণ করে নির্ভয়ে আবার গিয়ে যুদ্ধ করো। এবার দেখবে বালী আমার শরাঘাতে নিহত হয়েছে।"

লক্ষ্মণ তখন সুগ্রীবের গলায় অভিজ্ঞান হিসাবে গজপুষ্পীলতার একটা মালা পরিয়ে দিলেন।

আশ্বস্ত ও নির্ভয় হয়ে সুগ্রীব আবার এলেন কিষ্কিন্ধায়।

সুগ্রীবের গর্জনে আস্ফালনে ক্রুদ্ধ বালী তখন পদভারে মেদিনী কম্পিত করে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল।

কিন্তু বালীর আক্রমণে সুগ্রীব ক্রমে হীনবল নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। দিশাহারা হয়ে রক্তাক্ত দেহে অসহায় দৃষ্টিতে বারবার রামের দিকে তাকাতে লাগলেন। সুগ্রীবকে অমন অবসন্ন দেখে রাম বালীর বক্ষ লক্ষ করে তাঁর প্রদীপ্ত অশনিতুল্য বজ্রবাণ নিক্ষেপ করলেন।

সেই পূর্ণিমা রাতে ইন্দ্রধ্বজের মতো ইন্দ্রপুত্র বালীর দেহ তখন বাণবিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হল। পৃথিবী যেন চন্দ্রহীন আকাশমণ্ডলের মতো শ্রীহীন হয়ে পড়ল—"নষ্টচন্দ্রমিব ব্যোম ন ব্যরাজত মেদিনী" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/৩)।

বলা হয় রামের জীবনের একটা বড় কলঙ্ক নাকি এই বালী বধ। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত বীরকে অমন করে বৃক্ষের অন্তরাল থেকে লুকিয়ে বাণ মেরে হত্যা করা? একি রামের মতো ত্রিভুবনবিজয়ী বীরের পক্ষে শোভা পায়? এ তো নিতান্ত ভীরুতা। একে যুদ্ধ না বলে বলা উচিত গুপ্তহত্যা। এ তো বালীর মৃত্যু নয়, এ যেন রঘুবীর রামচন্দ্রের যশ গৌরবের

অপমৃত্যু। মর্যাদাপুরুষোত্তম যে রাম তিনি এমন অমর্যাদাকর কাজ করলেন কী করে? বালী বধ করে রাম আমাদের সকলকে একটা বিষম নৈতিক প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বিস্মিত মর্মাহত আমরা ক্ষুব্ধ প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকি তাঁরই দিকে। আমাদের দুঃখ যতটা না বালীর জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি রামের জন্য। সত্যবাদী রাম এমন মিথ্যার আশ্রয় নিলেন কেমন করে?

মনে পড়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির যখন মিথ্যা কথা বলে দ্রোণবধ করতে সাহায্য করলেন, তখন গুরুভক্ত অর্জুন ক্রোধে ক্ষোভে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন, "বালীবধেব জন্য রামচন্দ্রের যেমন অকীর্তি হয়েছে, দ্রোণবধের জন্য আপনারও তেমনি ত্রিলোকে চিরকলঙ্ক থেকে যাবে।"

চিরং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥
রামে বালীবধাদ্ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে।

(মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১৯৬/৩৫-৩৬)

যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা ভাষণ, আর রামের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ—সর্বকালের মানুষের মনে তীব্র এক নৈতিক প্রশ্নের সংকট সৃষ্টি করেছে।

মুমূর্ষু বালী যখন তীব্র ভাষায় রামকে প্রশ্ন করে, তখন মনে হয় সে প্রশ্ন যেন আমাদেরও, "কাকুৎস্থ রাম, লোকে বলে, এবং আমিও বিশ্বাস করি, মহান্ রাজবংশে তোমার জন্ম। তুমি তেজস্বী বীর্যবান ধর্মব্রতচারী কালজ্ঞ। শম দম ক্ষমা, ধর্ম দণ্ড ধৃতি, রাজোচিত গুণে ও আভিজাত্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। তুমি আমাকে অসতর্ক অবস্থায় কেন বধ করলে? সাধু সমাজে এই গর্হিত কাজের জন্য কি জবাব দেবে? তুমি দুরাত্মা ধর্মধ্বজী অধার্মিক। তুমি তৃণাচ্ছাদিত অন্ধকূপ; তুমি ক্ষুদ্র নীচ শঠ ও প্রতারক। তুমি কি করে মহাত্মা দশরথের পুত্র হলে?"

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ॥
সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যেতৎ সর্বভূতানি কথয়ন্তি যশোভুবি॥
দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥

*

ন মামন্যেন সংরব্ধং প্রমত্তং বেদ্ধুমর্হসি।
ইতি তে বুদ্ধিরুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব॥
স ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্মিকম্।
সত্যং বেশধরং পাপং প্রচ্ছন্নমিব পাবকম্।
নাহং ত্বামভিজানাসি ধর্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্॥

*

হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্॥
শঠো নৈষ্কৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশিতমানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাত পাপো মহাত্মনা॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/১৭-১৯, ২১-২৩, ৩৫, ৪৩)

শুনে রাম ধীর শান্ত কণ্ঠে বালীকে উত্তর দিলেন, "তুমি ধর্ম অর্থ কাম ও সদাচার সম্বন্ধে কিছুই জানো না। তাই অজ্ঞান বালকের মতো আমাকে নিন্দা করছ। তোমাকে বধ করে আমার ক্রোধও হয়নি, মনস্তাপও হয়নি।"

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সময়ং চাপি লৌকিকম্।
ন মে তত্র মনস্তাপো ন মন্যুর্হরিপুঙ্গব।

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/৪, ৩৭)

রামের এই শান্ত অটল নির্মোহ ভাব দেখে এবং তাঁর ধীর স্থির কথাগুলি শুনে আমরা থমকে যাই। মনে হয় তিনি সমস্ত ব্যাপারটা অন্য এক মানদণ্ডে বিচার করেছেন। তা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি রহস্যপূর্ণ। রামের বাণের চেয়ে তাঁর এই বাণী যেন আরও বেশি ক্ষিপ্র অনির্দেশ্য ও অলক্ষ্যসঞ্চারী। ধর্ম অনেক সময় এমন জটিল ও দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে। আকাশ দিয়ে পাখি উড়ে গেলে যেমন তার গমনপথের কোনো চিহ্ন থাকে না, তেমনি ধর্মের গতিও অনেক সময় দুর্নিরীক্ষ্য।

রাম যখন ধীর কণ্ঠে বললেন, "তোমাকে বধ করবার সময় আমার দুঃখও হয়নি, ক্রোধও হয়নি", তখন আমরা শুনে হকচকিয়ে যাই। আমরা তো ভেবেছিলাম, রাম নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, অর্থাৎ সীতা উদ্ধারে বানরসেনার সাহায্য পাওয়ার জন্য বালীকে অন্যায়ভাবে বধ করেছেন এবং তাও করেছেন আড়াল থেকে লুকিয়ে কিন্তু এই ধারণা অমূলক।

সৈন্যবলের সাহায্যই যদি রামের প্রয়োজন ছিল তাহলে তিনি তুচ্ছ বানরসেনার উপর নির্ভর করতেন না। সীতা হরণের সংবাদ শুনে ভরত তো ইতিমধ্যে অযোধ্যার সমস্ত সৈন্য, এমনকী সমগ্র আর্যাবর্তের রাজা ও রাজশক্তিকে একত্রিত করেছিলেন লঙ্কা অভিযানের জন্য। ক্ষুদ্র কিষ্কিন্ধার তুলনায় ভরতের সংগৃহীত সেই বিরাট সামরিক শক্তি যে কি বিপুল, বাল্মীকি তার পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ অক্ষৌহিণী সেনার সমর-পদভারে বসুন্ধরা সেদিন কম্পিত হয়ে উঠেছিল—

গজ-বাজিসহস্রৌঘৈঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্॥
অক্ষৌহিণ্যো হি তত্রাসন রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ।

(উত্তরকাণ্ড, ৩৯/১-২)

কিন্তু এই বিপুল সামরিক সাহায্য রামের প্রয়োজন হয়নি। সমবেত রাজারা তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্" (উত্তরকাণ্ড, ৩৯/৪)। সুতরাং স্বার্থবুদ্ধিতে রাম একাজ করেননি।

আসলে সংঘাতটা স্বার্থের নয়। ভাবাবেগেরও নয়। এমনকী ন্যায়-অন্যায়েরও নয়। এখানে বালীকে উপলক্ষ করে সংঘাত বেধেছে ক্ষুদ্র ধর্মের সঙ্গে বৃহৎ ধর্মের।

যদিও স্বভাবধর্মে বালী তেমন রাক্ষসপ্রকৃতির না হলেও সে রাক্ষস রাবণের বন্ধু ও মিত্র। রাবণের আসুরিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখন সমগ্র দক্ষিণভারত জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সে এক আবিল প্রাণের কামার্ত ভোগসর্বস্ব ক্রূর জিঘাংসাপ্রমত্ত জীবনধারা। সেখানে শিল্প ঐশ্বর্য যতই থাক তা ছিল দানবের আত্মভুক স্ফীতকায় অহংকার। রাবণ যার প্রতীক। বালীর জীবন ও রাজত্বও ছিল এই ধারারই অনুবর্তী।

কিন্তু রামের আদর্শ হল এই আসুরিক স্বৈরতন্ত্র, তার পাশব প্রাণ, তার আত্মসার বিকট অহংকারকে ধ্বংস করে সেখানে সত্য ধর্ম ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ও সামঞ্জস্যের এক সুশৃঙ্খল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা করা। রাক্ষসী প্রাণের বুভুক্ষার পরিবর্তে সাত্ত্বিক মনের ঔদার্য ও মহিমার প্রতিষ্ঠা করা—যাকে বলা হয়েছে "রামরাজ্য"।

এই কারণেই রাম দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসদের নিধন করলেন, ঋষিদের তপস্যার ক্ষেত্রকে নির্বিঘ্ন করলেন। আর সেই কারণেই বধ হল বালী।

এমনি করে সমাজে বৃহৎ ধর্ম এসে ক্ষুদ্র ধর্মকে লোপ করে দেয়। এখানে তাই ব্যক্তিগত ক্রোধ বা মনস্তাপের প্রশ্ন নেই। একটা বৃহৎ সামগ্রিক ধর্মের দৃষ্টি দিয়ে রাজার আচরণ ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়। সেখানে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ রাখা চলে না। রাজার কর্মকে চালিত করে ধর্ম। তাই রাজাও স্বাধীন নন। সেইজন্য রামচন্দ্র বলেছেন, "আমি স্বাধীন নই—তাই রাজাও স্বাধীন নন। আমি যা করেছি তা ধর্মতঃ পরিকল্পিতঃ।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/৩৫)

ধর্মের এই সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে রাজার কোনো একটি আচরণকে তাই ভাল না মন্দ, দোষ না গুণ, সদয় না নিষ্ঠুর, এইভাবে বিচাব করা যায় না। দীক্ষাকালে বিশ্বামিত্র তাই অনেক আগেই রামকে বলেছিলেন, "ধর্ম রক্ষায় রাজার কর্মে কোনো দোষ-গুণ পাপ-পুণ্য স্পর্শ করে না। দেখতে হবে তিনি ধর্মবোধে কর্তব্যচালিত হয়ে করেছেন কিনা।"

নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং বক্ষতা সদা॥
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অধর্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে॥

(আদিকাণ্ড, ২৫/১৮-১৯)

যে সার্মগ্রিক আদর্শ ও ধর্মের ভিত্তিতে বাল্মীকি তাঁর রামচরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁকে যে ব্যক্তিত্ব ও বীরত্ব, যশ ও গৌরব দান করেছেন, সেই বিরাটের পটভূমিতেই রামকে বিচার করতে হবে। নইলে আবেগপ্রবণ আধুনিক মনের অপরিসর নৈতিক দৃষ্টি নিয়ে মহাকাব্যের নায়কের এক একটি কাজকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে গেলে বিচারে ভারসাম্য থাকে না। চরিত্রের প্রধান উজ্জ্বল বলিষ্ঠ রেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়। আর ক্ষুদ্র ন্যূনতম রেখাগুলি বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। সমগ্র মুখাকৃতিটা আর দেখা যায় না। আধুনিক অণুবীক্ষণ

দৃষ্টিতে, এবং তার ব্যবচ্ছেদকারী বিশ্লেষণের ছুরিতে, প্রথমেই যেটা হারিয়ে যায় তা হল, চরিত্রের প্রাণ, তার সামগ্রিক মহিমা ও তাৎপর্য। এইভাবে দেখলে শ্রীকৃষ্ণকে মনে হবে এক লম্পট, কুটিল ও কপট। তেমনি সমস্ত পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে একিলিসকে মনে হবে যেন ক্রুদ্ধ দম্ভোন্মত্ত এক বর্বর। আর ওডিসিকে মনে হবে নিষ্ঠুর ধূর্ত এক পিশাচ।

তাই এখানে আলাদা করে বালী আর সুগ্রীব, কে ভাল আর কে মন্দ সে বিচার অবান্তর। বালী যে নিহত হয়েছে সেটাও বড় কথা নয়। কেননা যুদ্ধে জয় পরাজয় তো আছেই।

আমাদের মানবীয় মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন হয় শুধু এই কথা ভেবে, রাম কেন অমন করে লুকিয়ে বালীকে বধ করলেন? তাহলে একমাত্র প্রশ্ন দাঁড়ায়, রামচন্দ্র প্রচ্ছন্ন থেকেছিলেন? নাকি প্রকাশ্যে এসে সম্মুখ যুদ্ধে বালীকে নিহত করেছিলেন? রামায়ণের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য কি বলে?

একেবারে আদিকাণ্ডে প্রথম সর্গেই বলা হয়েছে, সুগ্রীব রামকে সঙ্গে নিয়ে কিষ্কিন্ধায় গেলেন। বালী গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বালী যুদ্ধ করতে উদ্যত হল। রাম একটি শরাঘাতে তাকে নিহত করলেন। রাম বালীকে যুদ্ধে নিহত করে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিলেন।

কিষ্কিন্ধাদ্ রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা॥
ততোঽগর্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ॥
ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ হত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবমেব তদ্ রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥

(আদিকাণ্ড, ১/৬৭-৬৮, ৭০)

এখানে বলা হয়েছে, রাম বালীকে যুদ্ধ করেই নিহত করেছেন। "হত্বা বালিনমাহবে" কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

রাম সুগ্রীবকে বলেছেন, "তুমি বালীকে দেখিয়ে দাও। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এক বাণে তাকে নিহত করব। একেনাহং প্রমোক্ষ্যামি বাণমোক্ষেণ সংযুগে।"

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৪/১১) এখানেও "সংযুগে" কথাটি লক্ষ করবার।

তাছাড়া বালীবধের প্রধান সাক্ষ্য বালীর মন্ত্রী ও সেনাগণ। বালী নিহত হলে তার পত্নী তারা বানরসেনাদের জিজ্ঞাসা করছেন, " তোমরা ভয়ে এমন করে পলায়ন করছ কেন?"

ভীত সেনাদল তারাকে বলছে, "আপনার পুত্র অঙ্গদ এখনো জীবিত। আগে তার জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করুন। রাম সাক্ষাৎ শমনের মতো এসে বালীকে পরাভূত করেছেন। বালী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অজস্র শিলা ও বৃক্ষ সব বিদীর্ণ করে রাম বজ্রবাণে তাকে নিহত করেছেন।"

জীবপুত্রে নিবর্তস্ব পুত্রং রক্ষস্ব চাঙ্গদম্।
অন্তকো রামরূপেণ হত্বা নয়তি বালিম্।
ক্ষিপ্তান্ বৃক্ষান্ সমাবিধ্য বিপুলাশ্চ তথা শিলাঃ।
বালী বজ্রমৈর্বাণৈর্বজ্রেণেব নিপাতিতঃ॥

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৯/১১-১২)

তাহলে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, বালী রামের বিরুদ্ধে অজস্র অস্ত্র শিলা বৃক্ষ নিক্ষেপ করেছে। তার সেই সব নিক্ষিপ্ত অস্ত্র রাম "সমাবিধ্য" করেছেন অর্থাৎ বিদীর্ণ করেছেন। রাম তাহলে বালীর দৃষ্টির আড়ালে ছিলেন না। বালীর সামনে সম্মুখযুদ্ধেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বালী ও রাম উভয়ের মধ্যে সরাসরিই যুদ্ধ হয়েছিল।

হনুমানও দুই জায়গায় দুইবার পরিষ্কার বলেছেন যে, রাম যুদ্ধ করেই বালীকে বধ করেছেন।

প্রথমবার হনুমান বলছেন সীতাকে—

কিষ্কিন্ধাং সমুপাগম্য বালী যুদ্ধে নিপাতিতঃ॥
ততো নিহত্য তরসা রামো বালিনমাহবে।

(সুন্দরকাণ্ড, ৩৫/৫১-৫২)

দ্বিতীয়বার হনুমান বলছেন ভরতকে,—"রামঃ স্ববাহুবীর্যেণ... বালিনং সমরে হত্বা মহাকায়ং মহাবলম্।" (যুদ্ধকাণ্ড, ১২৬/৩৮) রাম নিজের বাহুবলে প্রকাশ্য যুদ্ধেই বালীকে বধ করেছেন।

মহাভারতেও দেখা যায়, রাম প্রতিজ্ঞা করছেন, তিনি বালীকে যুদ্ধ করেই নিহত করবেন—

প্রতিযজ্ঞে চ কাকুৎস্থ সমরে বালিনো বধম্।

(মহাভারত, বনপর্ব, ২৬৪/১৪)

তবে কিষ্কিন্ধার প্রচলিত যুদ্ধরীতি হল পরস্পর বাহুযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ। যুদ্ধে তারা প্রস্তর শিলা বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার করত না। রাম কিষ্কিন্ধার যুদ্ধরীতি অনুসরণ করেননি। তিনি ধনুর্বাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। বালীর কাছে তা অধর্মযুদ্ধ মনে হতে পারে। তার অভিযোগ, "অধর্মেণ ত্বয়াহহং নিহতো রণে" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/৫২)। কিন্তু রামের কাছে স্বভাবতই এ যুক্তি অর্থহীন।

তাছাড়া বালীর কণ্ঠে ছিল ইন্দ্রপ্রদত্ত দিব্য রত্নমালা। সে মালার এমনই মাহাত্ম্য যে, যুদ্ধে বালীর প্রতিপক্ষ যেই আসুক, ওই দিব্য মালা বালীর শত্রু তেজ ও বল হরণ করে তাকে পরাজিত করবে। অতএব যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, রাম সামনে না এসে প্রচ্ছন্ন থেকে বালীকে বধ করেছিলেন, তাহলে সেটা অবস্থা বিশেষে যুদ্ধের একটা কৌশল মাত্র। শত্রুর আক্রমণ ও প্রভাব থেকে নিজেকে আচ্ছাদন কবে যুদ্ধ করা সর্বকালের যুদ্ধরীতি। আধুনিক কালেও যুদ্ধে এই রীতিই চলে আসছে। এর মধ্যে অন্যায়ও নেই, অধর্মও নেই।

সাতাশ

একটি তৃণ যেন বজ্রের প্রাচীর

অশোক বন। রাবণের প্রমোদকানন। ছায়ানিবিড় পত্রঘন শ্যামল বনবীথি। পুষ্পলতামঞ্জরী ঘেরা স্নিগ্ধ পদ্মিনী সরোবর। তার কূলে মণিময় বেদি। সোনার সোপান। আকাশ লাল করে থরে থরে ফুটে আছে রক্তপলাশ অশোক কিংশুক। পুষ্পগন্ধে ভরা মলয় পবন। শাল তাল তমালের বন। চম্বক উদ্দালক নাগকেশরের গন্ধরেণু ছড়ানো কাঞ্চনময় কত বৃক্ষবাটিকা। মত্তময়ূরের কেকা। বিহগ কাকলি। ভ্রমর গুঞ্জন। আর কোকিলের কুহরিত তান। বিশ্বকর্মা নির্মিত মনোরম এই উদ্যান সুখে সৌন্দর্যে স্বর্গেব নন্দন কাননের চেয়েও সুন্দর। পুষ্পোদ্যানের মাঝখানে বিশাল কাঞ্চনতরু তুল্য এক শিংশপা বৃক্ষ। তার নীলাঞ্জন পত্রশাখায় অগ্নিশিখার মতো রাশি-রাশি সুবর্ণপুষ্প। বৃক্ষমূলে সোনার বেদিকা।

সেই বেদিতলে বসে আছেন একবেণীধরা শোকাতুরা সীতা। উপবাসে ক্লিষ্ট তনু। ছিন্ন মলিন বসন। অশ্রুমুখী ম্লান এক বিষাদমূর্তি। প্রতিপদের ক্ষীণ মলিন চন্দ্রলেখার মতো। যেন দুঃখব্রতচারিণী এক তাপসী। অথবা ধূমাচ্ছন্ন এক অগ্নিশিখা। দেখে মনে হয় যেন এক নিষ্ফল আশা, বিঘ্নিত সিদ্ধি, অনাদৃত শ্রদ্ধা, অথবা মিথ্যা অপবাদে লাঞ্ছিত কীর্তি। তাঁর চারিদিকে পাহারা দিচ্ছে কুরূপা রাক্ষসীর দল, যে- কুক্কুর বেষ্টিত হরিণী, অথবা নিপীড়িতা রোহিণীর মতো দুঃখাতুরা সীতা।

উপবাসকৃশাং দীনাং নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ।
দদর্শ শুক্লাপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্॥
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্।
পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ॥
পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা।
সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম॥
পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাঙ্গারকেণেব পীড়িতামিব রোহিণীম্।
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেব চ।
শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যদুঃখপরায়ণাম্॥
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্।
স্বগণেন মৃগীং হী নাং শ্বগণেনাবৃতামিব॥

*

ত্বাং স্মৃতীমিব সন্ধিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব॥
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্তিং নিপতিতামিব॥

(সুন্দরকাণ্ড, ১৫/১৯-২৪, ৩৩-৩৪)

সীতার এই ছিন্নবাস খিন্নশরীর দীনার্ত মলিন শোকধ্যানপরা মূর্তিখানি যেন কবির হৃদয় আর সাধকের সাধনা দিয়ে গড়া। দুঃখের তপস্যার গভীর থেকে উঠে আসা এক তীব্র আর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আকুল হয়ে বলতেন, "মা, আমাকে সীতার মতো করে দাও। একেবারে সব ভুল—দেহ ভুল, যোনি, হাত, পা, স্তন—কোন দিকে হুঁস নেই। কেবল এক চিন্তা—কোথায় রাম?"...('শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', আনন্দ, ১৯৮৩, পৃ. ৬৪৪)

সীতাকে ঘিরে বসে ছিল যেসব চেড়ীরাক্ষসী তারা সব শশব্যস্ত হয়ে উঠল।

রাবণ আসছে।

তীব্র মদের গন্ধ। আরক্ত চক্ষু। নেশাতুর দৃষ্টিতে দর্প আর কাম। সঙ্গে রয়েছে একদল রূপসী কামিনী। নিদ্রামদালস তাদের আঁখি। বিগলিত অঙ্গরাগ। স্বেদজলে বিবর্ণ অঙ্গের কুসুম। তাদের কারো হাতে সোনার প্রদীপ, স্বর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধি জল। কেউ ধরেছে মণিময় পানপাত্রে ফেনিল সুধা। কারো হাত তালবৃন্ত অথবা স্বর্ণদণ্ড রাজচ্ছত্র। উগ্রতেজা রাবণের অঙ্গে সোনার অলংকার। অমৃতফেনতুল্য বস্ত্র। স্খলিত তার মাল্য ও বসন। (সুন্দরকাণ্ড, ১৮ সর্গ)

রাবণকে আসতে দেখে সীতা ভয়ে ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। ত্রাসে শঙ্কায় দিশাহারা হয়ে তিনি দুই ঊরু দিয়ে উদর আর দুই হাতে স্তনযুগল আচ্ছাদন করে কেঁদে উঠলেন।

ঊরুভ্যামুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাঞ্চ পয়োধরৌ।
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী॥

(সুন্দরকাণ্ড, ১৯/৩)

কামুক দৃষ্টিতে রাবণ দেখছে সীতাকে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের সামনে যেন অসহায় বনের হরিণ। দেখছে, যেন সমুদ্রে নিমজ্জমান একখানি নৌকা। ধূলিপঙ্কে মলিন একটি ছিন্ন পদ্মফুল। কৃষ্ণপক্ষের নিশার মতো অন্ধকার। যেন সন্ধ্যার আঁধারে পথ হারিয়ে একাকিনী একটি বালিকা কাঁদছে। যেন সে এক অবসন্ন কীর্তি। অবমানিত শ্রদ্ধা। পরিক্ষীণা প্রজ্ঞা। প্রতিহত আশা। .. আদিকবি তাঁর অসাধারণ বাক্‌প্রতিমা দিয়ে সীতার করুণ মূর্তিখানি এঁকে তুলছেন। সীতা যেন এক নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ড; অথবা উল্কাপাতে প্রজ্জ্বলিত দিগঙ্গন। এক বিনষ্ট পূজা। অপমৃষ্ট যজ্ঞবেদি। (সুন্দরকাণ্ড, ১৯/৪-১৬)

উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ
পরিক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্পাহারাং তপোধনম্।

(সুন্দরকাণ্ড, ১৯/২০)

রাবণের কণ্ঠে তখন প্রণয়, "বিশালাক্ষী, আমাকে দেখে অমন করে তোমার স্তনযুগল আবৃত করলে কেন? ভয় করো না। আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি সুন্দরী শোভনা। সর্বলোকমনোহরা। তোমার রূপের কোনো তুলনা নেই। আমি তোমাকেই কামনা করি। তুমি আমার মান রাখো। তোমার যৌবন বৃথা যেতে দিও না। আমাকে গ্রহণ করে তুমি অতুলনীয় সুখ ও ঐশ্বর্য লাভ করো। সেই শ্রীহীন হৃতগৌরব কৌপিনধারী ভিক্ষুক বনবাসী রামকে নিয়ে তুমি কী করবে? সে হয়তো এখন কোথায় কোন অরণ্যে অনাহারে ভূমিতলে শুয়ে আছে। হয়তো বেঁচে আছে কি নেই। সেই রাম আর কোনোদিন তোমাকে দেখতে পাবে না।"

কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা॥
নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ।
ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা॥
নহি বৈদেহী রামস্ত্বাং দ্রষ্টুং বাপ্যুপলভ্যতে।

(সুন্দরকাণ্ড, ২০/২৫-২৭)

রাবণের কথা শুনে সীতার বুকখানা হু হু করে ওঠে। সতীত্বের তেজে ঝলসে ওঠে তাঁর চক্ষু। একগাছি তৃণ রাবণের সামনে রেখে ব্যবধান সৃষ্টি করে বললেন, "পাপী, তুমি আমাকে কামনা কোরো না। নিজের ভার্যায় মন দাও। পাপাত্মা যেমন সিদ্ধিলাভ করে না, তেমনি তুমিও আমাকে পাবে না।"

রাবণের দিকে ঘৃণায় পিছন ফিরে সীতা বলতে লাগলেন, "নিশাচার, জানবে, আমি সতী সাধ্বী পরস্ত্রী। আমাকে অমর্যাদা করলে তোমার সর্বনাশ হবে। যদি বাঁচার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে সসম্মানে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও। রামের আশ্রয় নাও। নইলে হয়তো যমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারো, বজ্রাঘাত থেকে রক্ষা পেতে পারো, কিন্তু রামের হাতে তোমার নিস্তার নেই। ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র তোমাকে বধ করবেন। ইন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষের মতো রামের ধনুষ্টংকার তুমি অচিরেই শুনতে পাবে।" (সুন্দরকাণ্ড, ২১/২৪)

রাবণের গতিরোধ করে সীতা সামনে একটি তৃণের ব্যবধান রেখেছেন। সতীত্বের তেজে বজ্রপ্রাচীরের চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য সেই তৃণের ব্যবধান। রাক্ষস রাবণ তা অতিক্রম করতে পারল না। বাল্মীকির কবিত্বের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সীতা রাবণকে বলছেন, "দশানন, তোমাকে ভস্ম করার মতো সতীত্বের তেজ আমার আছে—"তৃণমেকমুপাদয় দিব্যাস্ত্রেণাভিযোজ্যতৎ"। (অধ্যাত্মরামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ৩/৫৭)।

রাক্ষস তো দূরের কথা, দেবতারাও সেই তুচ্ছ তৃণটি দগ্ধ করতে পারেন না। দেবতাদের সামনে ব্রহ্ম একগাছি তৃণ রেখে বলেছিলেন, একে দগ্ধ করো তো দেখি, "তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।" (কেনোপনিষদ, ৩/৬) দেবতারা সর্বশক্তি দিয়েও তা পারেননি। তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

তেমনি সতীর এই তৃণাদপি ব্যবধানটুকু মহাপাপ কখনো লঙ্ঘন করতে পারে না.

রাবণ তাই ফিরে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, মৈথিলী, কি বলব, আমি কামার্ত, তাই তোমার এই তিরস্কার সহ্য করলাম। নইলে তোমাকে বধ করতাম। আমি এক বৎসর অপেক্ষা করব বলেছিলাম। তার

আর মাত্র দুই মাস বাকি। সুতবাং আর দুই মাস আমি অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি তুমি আমার অঙ্কশায়িনী না হও, তাহলে তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড করে পাচকেরা আমার প্রাতরাশ তৈরি করবে।''

কামে ক্রোধে গর্জন করে রাবণ চেড়ীরাক্ষসীদের বলল, ''এই তোরা যেমন করে পারিস, এর মন ভোলাবার চেষ্টা কর।''

রাবণ চলে গেল।

রাক্ষসীরা তখন নানাভাবে সীতাকে ভয় ও প্রলোভন দেখাতে লাগল।

সীতার চোখে জল। কম্পিত ওষ্ঠে শুধু বাম নাম।...

হঠাৎ সেই শিংশপা বৃক্ষের পত্রান্তরাল থেকে এক মধুর গম্ভীর স্বর ভেসে এল—

জয়তু রঘুনাথ দাশরথি রামচন্দ্র।
বিদ্যাব্রতস্নাত ত্রিভুবনগুরু,
নীলোৎপলদ্যুতি রামচন্দ্র।
দুঃখহারী প্রসন্নধী,
ঘনচিৎপ্রকাশম্।
কুন্দ-ইন্দু-সম দেহ,
সত্যধর্ম জ্ঞানবিগ্রহ।
কীর্তিভূতাম্,
দয়ালু স্মৃতিকামধেনু।
সুখ-দুঃখ মন্থনধন।
রামনাম মণিদীপ,
জযতু রামচন্দ্র।

আকাশবাণীর মতো রামের এই গুণগাথা শুনে সীতা আনন্দে উতলা হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন।

তখন বৃক্ষশাখা থেকে হনুমান নেমে এসে সীতাকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, ''আমি হনুমান, শ্রীরামচন্দ্রেব দাস। বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী। আমি রামচন্দ্রের বার্তা নিয়ে এসেছি। তিনি কুশলে আছেন।''

তাঁকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করে সীতা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকেন।

—''আমাকে সন্দেহ করবেন না। বিশ্বাস করুন। এই দেখুন, বামচন্দ্র প্রদত্ত তাঁর অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়।''

হনুমান সীতাকে একে একে সব কথা বললেন। দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ রাক্ষস বধ। মৃত্যুকালে তার ভবিষ্যৎ বাণী। সেই অনুসারে রাম-লক্ষ্মণেব ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন। সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা। সীতার হরণকালে তাঁর অঙ্গ থেকে যেসব বস্ত্র অলংকার স্খলিত হয়ে পড়ে, সুগ্রীব ও হনুমান তা সংগ্রহ করে রাখেন, সেসব এনে রামকে প্রদর্শন। বালীবধ এবং সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজত্ব দান। সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে সুগ্রীবের বানরসেনা প্রেরণ। বিন্ধ্যপর্বতে জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতির কাছে দশানন রাবণ ও লঙ্কার পথের সংবাদ। শেষ পর্যন্ত কেমন

করে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পার হয়ে লঙ্কায় এসে সীতার সন্ধান পেলেন, হনুমান সেসব জানিয়ে বললেন, "দেবি, আপনি শোক করবেন না। আপনি যে এখানে আছেন রাজীবলোচন রাম তা জানেন না। আমার কাছে আপনার সংবাদ পেয়ে শীঘ্রই তিনি তাঁর মহতী সেনা নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করবেন। রাবণকে সবংশে নিহত করে, ইন্দ্র যেমন শচীকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনিও তেমনি আপনাকে উদ্ধার করবেন। আপনার শোকে আপনার চিন্তায় সতত তিনি ব্যথিত ও বিহ্বল হয়ে আছেন। নিত্যংধ্যানপরো রামো নিত্যং শোকপরায়ণঃ।"

পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রসন্ন মুখে সীতা বললেন, "তোমার কথাগুলি বিষমিশ্রিত অমৃতের মতো। রাম আমাব জন্য অনন্যমনা হয়ে আছেন এসংবাদ আমার কাছে অমৃত তুল্য। কিন্তু তিনি শোকার্ত হয়ে দুঃখ পাচ্ছেন এ সংবাদ আমার কাছে বিষবৎ। কবে তিনি লঙ্কা জয় করবেন। কবে আমার স্বামী এসে আমাকে দেখবেন। কদা দ্রক্ষ্যতি মাং পতিঃ।"

অধীর কণ্ঠে সীতা বলতে থাকেন, "বাবণ এক বৎসব অপেক্ষা করবে বলেছিল। এখন দশম মাস চলছে। আর মাত্র দুই মাস আমি জীবিত থাকব। তুমি গিয়ে রামকে ত্বরা করতে বল। সরমার কাছে শুনেছি, তার স্বামী বিভীষণ আমার মুক্তির জন্য রাবণকে অনেক অনুরোধ কবেছে। কিন্তু রাবণ গ্রাহ্য কবেনি। বিভীষণেব কন্যা কলা এসে গোপনে গোপনে আমাকে সংবাদ দিয়ে যায়। শুনেছি, রাবণের উপর নলকুবেরের অভিশাপ আছে। রাবণ কোনো নারীকে আর ধর্ষণ কবতে পারবে না। করলে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। লঙ্কার রাজসভায় রাবণের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র বিদ্বান বুদ্ধিমান অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস আছে। সে রাবণকে উপদেশ দিয়ে বলেছে, আমাকে মুক্তি না দিলে রামের হাতে রাক্ষস কুল ধ্বংস হবে। তবু বাবণ তাব হিতোপদেশ শোনেনি। আমি আত্মহত্যা কবতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ত্রিজটা আমকে সান্ত্বনা দিযে নিবারণ করেছে। সে স্বপ্ন দেখছে, রামের হাতে রাবণ বধ হবে। রাক্ষসপুবী ধ্বংস হবে। বাম এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। আমি সেই আশায় বুক বেঁধে আছি।"

—"দেবী, যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। রাম নাম উচ্চারণ করতে যেটুকু সময় লাগে তাবই মধ্যে আমি আকাশ পথে আপনাকে রামের সমীপে নিয়ে যাব। অগ্নি যেমন হব্য আহুতি বহন করে ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যান, আমি তেমনি আপনাকে রামেব কাছে নিয়ে যাব।

সীতা বললেন, "তোমার প্রজ্ঞা ও বল, তোমাব তেজ ও গতি আমি বুঝতে পারি, তোমার যে সামর্থ্য আছে তাও জানি। কিন্তু বাক্ষসরা তোমাকে আক্রমণ করবে। তুমি একাকী, নিরস্ত্র। তবু যদি জয়ী হও তাহলেও রামের যশোহানি হবে। তাব চেয়ে যদি রাম স্বয়ং এসে রাবণকে বধ করেন, রাক্ষসকুল ধ্বংস করেন, এবং আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে।"

যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥

(সুন্দরকাণ্ড, ৩৭/৬৪)

হনুমান বললেন, "দেবি, আপনি যথার্থ বলেছেন। আমি ফিরে গিয়ে রামকে সংবাদ দেব।

যাতে আমার কথা তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁকে দেখাতে পারি, এমন কোনো অভিজ্ঞান আমাকে দিন।"

সীতা বললেন, "পবননন্দন, তুমি গিয়ে রামকে একদিনের একটা ঘটনার কথা বলো। তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন। চিত্রকূটে একদিন আমি তাঁর সঙ্গে জলবিহার করে ক্লান্ত দেহে সিক্ত বসনে রামের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন একটা বায়স এসে আমার অনাবৃত স্তনে তার চঞ্চু দিয়ে ক্ষত করে দেয়। রাম ক্রুদ্ধ হয়ে সেই দুষ্ট বায়সকে দেখলেন। সে ছিল কাকের ছদ্মবেশে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। রাম তার দিকে মন্ত্রপূত একটি তৃণ ব্রহ্মাস্ত্র রূপে নিক্ষেপ করলেন। কাকটি তখন প্রাণভয়ে সর্বলোক ভ্রমণ করল। রামের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তাকে ধাবিত করে চলল। মহর্ষিগণ এমনকী ইন্দ্র পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে পারলেন না। তখন সে নিরুপায় হয়ে ফিরে এসে রামের শরণাপন্ন হল। রাম কৃপা করে তার প্রাণ রক্ষা করলেন। কিন্তু অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র সেই কাকের ডান চোখটি নষ্ট করে দিল।"

এই বলে সীতা হনুমানের হাতে তুলে দিলেন তাঁর দিব্য চূড়ামণি। বললেন, "রাঘবকে আমার এই অভিজ্ঞানটি দিও। আমার বিবাহের সময় আমার মায়ের এই চূড়ামণি, পিতা যৌতুক হিসাবে রাজা দশরথকে দিয়েছিলেন। এই দিব্য চূড়ামণি দেখলেই রাম একসঙ্গে আমার, আমার জননীর এবং রাজা দশরথের কথা মনে করবেন।"

হনুমান তখন বিদায় নিয়ে সীতাকে প্রণাম করলেন।

সীতা বললেন, "তোমার যাত্রা শুভ হোক। সকলকে আমার কুশল জানিয়ে রামকে বলো, তিনি যেন শীঘ্র এসে আমাকে এই দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করেন। তারয়তি রাঘবঃ।"

আঠাশ

কুলায় কালপুরুষ

রাবণের মন্ত্রণাসভা। অপমানে ক্ষোভে রাবণ লজ্জায় অধোমুখ হয়ে বসে আছে। পাশে সেনাপতি প্রহস্ত ও মহাপার্শ্ব ক্রোধে উত্তেজনায় কঠোর। সভার মধ্যে ক্রুদ্ধ আরক্ত চক্ষু দিয়ে দর্পিত ভঙ্গিতে বসে দুর্মুখ নিকুম্ভ বজ্রদংস্ট্র। এক পাশে কনক আসনে বসে আছেন বিষণ্ণমুখ করুণদৃষ্টি যুবরাজ বিভীষণ। মেঘবর্ণ দেহ। ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন শান্ত তাঁর ব্যক্তিত্ব। সমস্ত সভায় একটা রুদ্ধশ্বাস নিথর স্তব্ধতা।

হঠাৎ সভাকক্ষ কম্পিত করে হুঙ্কার দিয়ে রাবণ বলে উঠল, "দুর্ভেদ্য লঙ্কাপুরী, দুর্জয় রাক্ষসকুল। মানুষ তো দূরের কথা, দেবতাদেরও সাধ্য নেই লঙ্কায় প্রবেশ করে। আমি লঙ্কেশ্বর রাবণ, যমের যম, কালের কাল, মৃত্যুরও মৃত্যু আমি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেমন করে একটা তুচ্ছ বানর সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করল, সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, শেষে একা নিরস্ত্র সে সমস্ত লঙ্কায় নগরপ্রাকার ধ্বংস বিধ্বস্ত করে দিয়ে চলে গেল। তখন কোথায় ছিল রাক্ষসের বীরত্ব? আপনারা কি সব মৃত?"

রাবণকে আশ্বস্ত করে প্রহস্ত বলল, "মহারাজ, আমরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত নিশ্চিত হয়ে অসতর্ক ছিলাম। তাই একটা তুচ্ছ বানর এসে আমাদের অনবধানতার সুযোগ নিয়ে এমন প্রতারিত করে গেল। কিন্তু দেবতা দানব গন্ধর্ব বিজয়ী রাক্ষস বীর আমরা, অনুমতি করুন, এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী বানরশূন্য করে দিই।"

—"সেনাপতি প্রহস্ত, তার আগে একটা জরুরি পরামর্শের জন্য আমি আপনাদের ডেকেছি। সকলে একমত হয়ে স্থির নীতি অনুসরণ করে চলা হল উত্তম। অথবা ভিন্ন মত হলেও শেষে ঐক্যমতে পৌঁছান হল মধ্যম। আর দোষগুণের বিচার না করে অবিবেচকের মতো কোনো কাজ করতে যাওয়া অধম। তাই আমি আপনাদের সকলের পরামর্শ চাই। আমি মনে করি, যেমন করেই হোক, যখন একটা বানর লঙ্কায় প্রবেশ করেছে, তখন অচিরেই রাম তার বানরসেনা নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করবে। সমুদ্র তার পথে বাধা নয়। রাম তার আপন তেজে হয় সমুদ্রকে শোষণ করবে, না হয় লঙ্ঘন করে চলে আসবে। সেক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এখন আপনারা বলুন, আমার কি করা উচিত?"

সভার মধ্যে একজন উঠে বলল, "মহারাজ, শত্রুর বলাবল না জেনে মন্ত্রণা করাটা নির্বোধের কাজ। তবে আপনি এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনি সর্বজয়ী। পাতালের নাগলোক আপনি জয় করেছেন। স্বয়ং মহেশ্বরের সখা কৈলাসশিখরবাসী কুবেরকেও আপনি পরাস্ত করেছেন। তার পুষ্পক বিমান আহরণ করে এনেছেন। ময়দানব আপনার প্রতাপে

ভীত। সে তার কন্যা মন্দোদরীকে আপনার পত্নীরূপে দান করে সন্ধি করেছে। দানবরাজ মধুও আপনার বশীভূত। দানবীয় মায়াবিদ্যায় আপনি সিদ্ধ। দেবতা বরুণের পুত্রগণ আপনার কাছে পরাস্ত। আপনি দেবলোক যমলোক জয় করেছেন। আপনি মৃত্যুকেও অতিক্রম করেছেন। তাছাড়া আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎ যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে লঙ্কায় বন্দি করে নিয়ে এসেছিলেন। যিনি যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করে মহেশ্বরের বর লাভ করেছেন। সুতরাং আপনার পক্ষে রামের মতো একটা ক্ষুদ্র মানবকে পরাজিত করা এমন কি কঠিন কাজ?''

তখন ক্রুদ্ধ দুর্মুখ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''একটা তুচ্ছ বানর এসে আমাদের সকলকে অপমান করে গেল, এ অসহ্য। আমি এখনই সেই বানরকে বধ করব।''

বজ্রদংষ্ট্র হাতের রক্তমাখা গদা ঘুরিয়ে আস্ফালন করে বলল, ''রাম লক্ষ্মণকে জীবিত রেখে একটা ক্ষুদ্র বানরকে মেরে কি লাভ? তোমরা থাক, আমি একাই রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বধ করে আসি।''

শুনে কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ সদম্ভে উঠে বলল, ''না, আর কারো প্রয়োজন নেই, আমি একাই রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুমানকে বধ করব। সমস্ত বানরসেনা ধ্বংস করব।''

নিরেট অন্ধকার থেকে খোদাই করা যেন দম্ভমূর্তি সব গর্জন করছে একে একে—বিরূপাক্ষ ধূম্রাক্ষ যজ্ঞকোপ মহোদর অগ্নিকেতু ইন্দ্রজিৎ এবং আরও অনেকে।

এমন সময় সকলকে নীরব করে ধীর শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন বিভীষণ। রাবণের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন, ''মহারাজ, আমি আপনার ভ্রাতা, আমি যা বলব তা আপনার এবং রাক্ষসকুলের মঙ্গলের জন্য। যা ন্যায়সম্মত এবং হিতকর আমি তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, হে তাত, নীতিশাস্ত্রে বলে, সাম দান এবং ভেদ এই তিন উপায়ে যে কার্যসিদ্ধি হয় তার জন্যই বিক্রম প্রদর্শন করা উচিত। যে শত্রু অসাবধান, অন্যের দ্বারা আক্রান্ত, কিংবা দৈববশে বিপন্ন, অবস্থা বুঝে কেবল তাকেই আক্রমণ করা উচিত। কিন্তু রাম তো তেমন শত্রু নন। রাম প্রমাদহীন বলবান জিতক্রোধ দুর্ধর্ষ এবং দৈবসহায়। কোন সাহসে আপনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন? কে ভেবেছিল হনুমান এই দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পার হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করবে? তাদের বহু সৈন্য আছে এবং তারা পরাক্রমী। শত্রুর ক্ষমতা ও বলকে এমন করে উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

''মহারাজ, আপনি আমার কথা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করুন। ভেবে দেখুন, রামের কি অপরাধ? যার জন্য আপনি তাঁর পত্নীকে অপহরণ করে এনেছেন? যদি বলেন রাম খরকে নিহত করেছে, কিন্তু খর ছিল অত্যাচারী। সেই প্রথমে রামকে আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। এই কারণে যদি আপনি সীতাকে হরণ করে থাকেন, তাহলে আমি অনুরোধ করি, আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। রাম ধর্মাত্মা, পরাক্রমশালী, অনর্থক তার সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত হবে না। সীতাকে ফিরিয়ে না দিলে এই সোনার লঙ্কা, এই সমস্ত রাক্ষসকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। মহারাজ, আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন। শ্রেয় ও যশস্কর ধর্মের আশ্রয় নিন। ভজস্ব ধর্মং রীতিকীর্তিবর্ধনম্। (যুদ্ধকাণ্ড, ৯ম সর্গ)

রাবণ নীরবে শুনল। কোনো উত্তর দিল না। তারপর গম্ভীর মুখে সিংহাসন থেকে উঠে ধীরে ধীরে সে অন্তঃপুরে চলে গেল।

তার মন্থর গমন পথের দিকে সানুনয় দৃষ্টিতে হাত জোড় করে ব্যর্থ মনে দাঁড়িয়ে রইলেন বিভীষণ।...

পরদিন প্রভাতে বিভীষণ আবার গেলেন রাবণের ভবনে। শঙ্খতূর্য নিনাদিত তপ্তকাঞ্চন নির্মিত দেবগন্ধর্ব ভবনতুল্য রাবণের সুরম্য প্রাসাদ। ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। প্রদীপ্ত কনক আসনে বসে রাবণ।

বিভীষণকে আসতে দেখে রাবণের ললাট কুঞ্চিত হল। মুখের ভাব চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল।

বিভীষণ রাবণকে প্রণাম করলেন।

নীরবে পাশের আসন দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে রাবণ উৎসুক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—"মহারাজ, কাল সন্ধ্যায় মন্ত্রণাসভায় আমার সব কথা আপনাকে বলা হয়নি। মনে হয় আপনার ভয়ে মন্ত্রীরা আপনাকে উচিত পরামর্শ দিচ্ছে না। কিন্তু যা হিতকর এবং মঙ্গলকর আপনাকে আমার তাই বলা উচিত বলে মনে করি। আমার কথায় আপনি দোষ নেবেন না। আপনি সীতাকে অপহরণ করে আনবার পর থেকেই সমস্ত লঙ্কায় নানা দুর্নিমিত্ত দেখা দিয়েছে। মন্ত্রপূত হোমাগ্নি আর তেমন করে জ্বলে না। কেবল ধূম আর স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। অগ্নিহোত্র বেদঅধ্যয়নগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সর্পসরীসৃপ বিচরণ করছে। হব্যদ্রব্যের উপরে পিপীলিকা ঘুরছে। গাভীরা দুগ্ধহীন। হস্তীদের আর মদস্রাব নেই। অশ্বগণ ক্ষুধার্তের মতো চেয়ে আছে। সমস্ত প্রাণীকুল অস্থির আর্ত হয়ে পড়েছে। চারিদিকে কাকের কর্কশ রব। রাজপ্রাসাদের চূড়ায় দলে দলে শকুন উড়ে এসে বসছে। চারিদিকে ঘোর অমঙ্গল ও বজ্রপতনের শব্দ। মহারাজ, আপনি রামের হাতে সীতাকে ফিরিয়ে দিন। এই অমঙ্গল আর সর্বনাশের থেকে লঙ্কাকে রক্ষা করুন।"

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাবণ বলল, "বিভীষণ, তুমি যাও। আমি কোথাও কোনো ভয়ের কারণ দেখছি না। জেনে রাখো, রাম আর কোনোদিন সীতাকে পাবে না। যদি স্বর্গের সকল দেবতারা এবং স্বয়ং ইন্দ্র রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও জানবে, আমি লঙ্কেশ্বর রাবণ অপরাজেয়। বৃথা বাক্যব্যয় করো না, যাও।"

বিভীষণ তখন নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

রাবণ অস্থির চিত্তে উঠে পায়চারী করতে লাগল। গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট তার মুখ। রাবণের জীবনে স্বস্তি নেই। অহরহ একটা তীব্র জ্বালা তাকে দগ্ধ করে। কবি এখানে অল্প দুটি কথায় রাবণের পাপতাপক্লিষ্ট অন্তরের ছবিটি দেখিয়ে দিচ্ছেন। রাবণ বুঝতে পারছে তার সুহৃদ বন্ধুগণ তাকে অসম্মানের চোখে দেখছে। কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ তাকে হীন ভাবছে। তাই অপমানে আত্মগ্লানিতে ক্লিষ্ট রাবণ কৃশ হয়ে পড়ছে। তার উপরে সীতার প্রতি তার তীব্র কামের আগুন তাকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করে চলেছে।

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ।
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১/১)

এমনি করেই পাপের অন্ধকার বুকে এসে বিদ্ধ করে আলোকের অলক্ষ্য তীক্ষ্ণ রেখা।...

বিভীষণ চলে যেতেই রাবণ অস্থির কণ্ঠে হুংকার দিয়ে বলল, "প্রতিহারী, রাজদূতকে সংবাদ দিয়ে বলো, জনে জনে রাষ্ট্র করে দিক, এখনই সকলেই যেন রাজসভায় উপস্থিত হয়।"

মুহূর্তেব মধ্যে চারিদিকে তূর্যধ্বনি বেজে উঠল।

রথে অশ্বে রাজপথ মুখরিত।...

অস্ত্রে আয়ুধে সজ্জিত হয়ে অসংখ্য রাক্ষস কোলাহল করতে করতে চলেছে রাজসভার দিকে।

সুবর্ণরঞ্জিত স্ফটিকশোভিত বৈদূর্যময় রাবণের রাজসভা। মণি-মুক্তা-জালে অলংকৃত। মাল্য গন্ধ অগুরু চন্দনে সভাকক্ষ আমোদিত। মৃগচর্ম আচ্ছাদিত পরমাসনে উপবিষ্ট রাবণ। বজ্রহস্ত ইন্দ্রের ন্যায় সে আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল—"বসূণামিব বজ্রহস্তঃ"।

সভাকে সম্বোধন করে রাবণ বলল, "সভাসদ্‌গণ, রাষ্ট্রে যখন ধর্ম অর্থ কামের সংকট দেখা দেয় তখন আপনারাই হিতাহিত বিচার করে থাকেন। আপনাদের পরামর্শে কোনো কর্ম বিফল হয় না। আপনাদের সহায় পেয়ে আমি সমৃদ্ধ। তাই কোনো কাজ করতে গেলে আমি প্রথমেই আপনাদের সমর্থন নিয়ে থাকি। বীরশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন, তাই এতদিন তাঁকে জানাতে পারিনি। এখন তিনি জাগ্রত হয়েছেন। আপনাদের সকলকে আজ বলছি, দণ্ডকারণ্য থেকে রামের প্রিয় মহিষী সীতাকে আমি নিয়ে এসেছি। ত্রিভুবনে সীতার মতো সুন্দরী আমি দেখিনি। কাম আমার চিত্তকে কলুষিত করেছেন। ওই সুবর্ণপ্রতিমা সীতার জন্য আমি দুঃসহ অনঙ্গতাপে পীড়িত। কিন্তু সেই অলসগামিনী আমার অঙ্কশায়িনী হতে সম্মত নয়।"

কপটবাক্যে পটু রাবণ একটু থেকে সকলের দিকে তাকিয়ে সভার সমর্থন পাওয়ার আশায় মিথ্যা করে বলল, "তবে মনোরমা সীতা রামের জন্য প্রতীক্ষা করবে বলে আমার কাছে এক বৎসর সময় চেয়েছে। আমিও সেই সুন্দরীর বাক্য মেনে নিয়েছি। কিন্তু কামের প্রতীক্ষায় আমি শ্রান্ত অশ্বের মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার মনে হয়, রাম লক্ষ্মণ তাদের বানরসেনা নিয়ে আমাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তারা দুস্তর সাগর পার হবে কী করে? তবু কিছুই বলা যায় না। আপনারা বিবেচনা করে কর্তব্য স্থির করুন। যাতে সীতাকে ফিরিয়ে দিতে না হয়, আর দশরথের দুই পুত্র যাতে নিহত হয়।"

রাবণের কথা শেষ হলে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "সীতা হরণের আগে আমাদের যখন কিছু জানাওনি, এখন আর পরামর্শ করে লাভ কি? পরিণাম চিন্তা না করে তুমি অতিশয় অন্যায় দুষ্কর্ম করেছ। যে ন্যায়সঙ্গত কাজ করে তাকে কখনো অনুতাপ করতে হয় না। তোমার এই অনাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, অপবিত্র যজ্ঞে দূষিত হব্যের মতো কেবল পাপ সৃষ্টি করেছে। বিষমিশ্রিত খাদ্যের মতো রাম যে এখনো তোমার প্রাণ হরণ করেনি তা তুমি ভাগ্য বলে মনে করবে। যাইহোক, তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, তুমি অন্যায় করলেও তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

কুম্ভকর্ণের পর এবার বিভীষণ উঠে বললেন, "মহারাজ, সীতা কালভুজঙ্গিনী। তাঁকে যদি ধরে রাখেন আপনার সর্বনাশ হবে। লঙ্কা আক্রমণ করবার আগেই রামের হাতে আপনি সীতাকে ফিরিয়ে দিন। কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ মহাপার্শ্ব মহোদর এমন কোনো বীব নেই যে রামের সামনে দাঁড়াতে পারে। যদি সূর্য ও বায়ুর শরণাপন্ন হন, যদি ইন্দ্র ও যমও আপনাকে রক্ষা করেন, যদি আকাশে বা পাতালে গিয়েও আশ্রয় নেন, তবু রামের হাত থেকে নিস্তার পাবেন না।"

সেনাপতি প্রহস্ত তখন বাধা দিয়ে বলল, "আপনি এসব কী বলছেন? আমবা দেব গন্ধর্ব বিজয়ী। স্বর্গ থেকে পাতাল—দেবলোক থেকে নাগলোক পর্যন্ত আমরা জয় করেছি। দেবতাদের আমরা ভয় করি না। সেখানে রাম তো একটা তুচ্ছ মনুষ্য। তাকে এত ভয় কিসের?"

—"প্রহস্ত, তুমি রামের বীরত্ব জান না তাই অহংকার করছ। ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই যে রামের তেজ সহ্য করতে পারে। রাবণ উগ্র প্রকৃতির, সে অবিবেচক। তোমরা মিত্রবেশী শত্রু হয়ে তাকে কেবল বিনাশের পথে চালিত করছ। সর্বনাশের কালসর্প সহস্র ফণা নিয়ে রাবণকে পিযে ধরেছে। তোমরা তার সুহৃদ, তাকে উদ্ধার করো। রাবণ এখন ভূতাবিষ্ট, প্রয়োজন হলে তাকে বলপূর্বক পীড়ন করে বিপদমুক্ত করো। রামের সঙ্গে শত্রুতা করে রাবণ পাতালে ডুবে মরতে চলেছে, তোমরা শীঘ্র তাকে উদ্ধার করো। প্রহস্ত, তুমি মন্ত্রী, মন্ত্রীর কাজ রাজার হিতাহিত বিচার করে তাকে উচিত পরামর্শ দেওয়া।"

বিভীষণকে বাধা দিয়ে এবার ইন্দ্রজিৎ উঠে বলল, "কনিষ্ঠ তাত, আপনি ভীত ব্যক্তির মতো অর্থহীন প্রলাপ বকছেন। রাক্ষসকুলে যে জন্মগ্রহণ করেনি সেও এমন ভীরুর মতো কথা বলে না। আমাদের বংশে একমাত্র আপনারই দেখছি কোনো বল বীর্য বা তেজ নেই। রাম লক্ষ্মণকে বধ করতে একটা সাধারণ রাক্ষসই যথেষ্ট। আপনি কাপুরুষের মতো অনর্থক ভয় দেখাচ্ছেন। আপনি কি জানেন না, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছি? আমার ভয়ে দেবতারা তখন পালিয়ে গিয়েছিল। আমি ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন করি। দেবদৈত্যের দর্পহারী আমি ইন্দ্রজিৎ। সামান্য মানুষ রাম লক্ষ্মণকে আমি ভয় করব কেন?"

বিভীষণ ভর্ৎসনা করে বলল, 'ইন্দ্রজিৎ, তুমি মূর্খ অর্বাচিন দুর্মতি বালক মাত্র। হিতাহিত জ্ঞানহীন অপরিণত তোমার বুদ্ধি। কে তোমাকে এই সভায় প্রবেশের অধিকার দিয়েছে? তুমি রাবণের পুত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি তার শত্রু। তাই রামের হাতে রাবণের বিনাশের কথা শুনেও তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে তা অনুমোদন করছ।"

ক্রোধে গর্জন করে তখন রাবণ বলল, "শত্রু অথবা কুপিত সর্পের সঙ্গে তবু বাস করা যায়, কিন্তু বিভীষণ, তোমার মতো শত্রুসেবী কপট মিত্রের সঙ্গে কখনো বাস করা যায় না। তুমি জ্ঞাতিশত্রু কুলাঙ্গার। জ্ঞাতিরা যে কি ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণ পরশ্রীকাতর হয় তা আমি জানি। আত্মীয়ের গৌরব যশ ও শ্রীবৃদ্ধি তাদের সহ্য হয় না। তলেতলে তারা অপমান ও পরাভবের চেষ্টা করে। বন্ধনপাশ হাতে নিয়ে একদল মানুষকে আসতে দেখে পদ্মবনের হস্তীরা তাই বলেছিল, ওসব বন্ধনপাশ অস্ত্রশস্ত্র বা আগুন দেখে আমরা ভয় পাই না। কিন্তু ভয় করি আমাদের স্বার্থপর জ্ঞাতিদের। লোভের বশবর্তী হয়ে একটি হাতী একদল বন্যহস্তীকে

মানুষের হাতে ধরিয়ে দেয়—ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ (যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/৭)। ব্রাহ্মণের যেমন তপস্যা, তেমনি গাভীতে দুগ্ধ, নারীতে চপলতা, আর জ্ঞাতিগণের মধ্যে ভয় ও স্বার্থপরতা স্বতঃসিদ্ধ।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/৯)

বিভীষণ, তুমি ভ্রাতৃস্নেহহীন অনার্য। কাশফুলে যেমন মধু থাকে না তেমনি তোমার হৃদয়ে সৌহার্দ্য নেই। কুলকলঙ্ক রাক্ষস, তোমাকে ধিক্! তুমি যা বলছ তা আর কেউ বললে এই মুহূর্তে তাকে বধ করতাম।"

অপমানিত বিভীষণ তখন সভা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "রাজন, আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য। কিন্তু আপনি ধর্মভ্রষ্ট, ভ্রান্ত। কালপাশে বদ্ধ আপনি। আপনার গৃহে আগুন লেগেছে তা বুঝতেও পারছেন না। তাই আপনার মঙ্গলের জন্য হিতবাক্য বলেছি। আপনার তা সহ্য হল না। অসংযমী কামী পুরুষ কখনো কারো হিতবাক্য গ্রহণ করে না। কিন্তু আপনি অগ্রজ, আমার গুরু, আপনার শুভকামনায় যা বলেছি সেজন্য ক্ষমা করবেন। আপনার মঙ্গল হোক। আমি চলে যাচ্ছি।"

বিভীষণ সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আরও চারজন অমাত্য, রাবণের মাতামহ মাল্যবানের পুত্র অনল অনিল হর ও সম্পাতি প্রতিবাদ করে সভা ছেড়ে চলে গেল।

দেখা যাচ্ছে স্বৈরাচারী রাবণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রতিবাদ লঙ্কার মধ্যে যথেষ্ট সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বিভীষণ ছাড়াও রাবণকে প্রকাশ্যে তিরস্কার ও ধিক্কার জানিয়েছে কুম্ভকর্ণ (যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/১-৪)। রাবণের আচরণের প্রতিবাদ করে তাকে সুপথে আনতে চেয়েছে রাজসভার প্রবীণ মন্ত্রী অবিন্ধ্য (যুদ্ধকাণ্ড, ৩৪/২০, ২৩)। প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত রাবণকে প্রথমেই বলেছিল, "সীতাকে ফিরিয়ে দিন তাহলে মঙ্গল হবে, প্রদানেন তু সীতায়াঃ শ্রেয়ো ব্যবসিতং ময়া।" (যুদ্ধকাণ্ড, ৫৭/১৪)। সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছে মাতামহ মাল্যবান্ (যুদ্ধকাণ্ড, ৩৫/১০)। রাবণের জননী নিকষাও তাকে নিবৃত্ত হতে অনেক অনুরোধ করেছে (যুদ্ধকাণ্ড, ৩৪/২০, ২৩)। সেনাপতি অকম্পন রাবণের মুখের উপরে বলেছে, "পাপী যেমন স্বর্গে বাস করতে পারে না, তেমনি আপনিও রামকে পরাস্ত করতে পারবেন না। নহি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে ত্বয়া। রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাপজনৈরিব" (অরণ্যকাণ্ড, ৩১/২৭)। মন্ত্রী অতিকায় বিভীষণকে সমর্থন করেছিল। প্রতিবাদ করেছিলেন মন্দোদরী এবং তিনি নিজে দুইবার রাজসভা ডেকে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে সন্ধির প্রস্তাব পাশ করাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাছাড়া বিভীষণের পত্নী সরমা, তার কন্যা কলা এবং দাসীদের মধ্যে ত্রিজটা এবং প্রচ্ছন্নভাবে আরও অনেকে রাবণের ঘোর অত্যাচারের বিপক্ষে ছিল। লঙ্কার অধিবাসী সকলে এবং রাজপ্রাসাদের ভৃত্যগণ পর্যন্ত রাবণের অধর্ম আচরণে মনে মনে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল (যুদ্ধকাণ্ড, ৩৪/২৮)।

কিন্তু রাবণ তাদের সেই সব অনুরোধ উপরোধ প্রতিবাদ উপেক্ষা করেছে। বারবার সদম্ভে বলেছে, "আমি ভাঙব তবু নত হব না—দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং নমেয়ন্তু কস্যচিৎ" (যুদ্ধকাণ্ড,

৩৬/১১)। কিন্তু রাবণ জানে না, তার কুলায় কালপুরুষ—মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে প্রহর গুনছে।

যাইহোক, বিভীষণ যখন সভা ছেড়ে চলে গেলেন তখন সেখানে একটা চাপা উত্তেজনা থমথম করতে লাগল।

মহাপার্শ্ব রাবণকে বলল, "মহারাজ, এত বিতণ্ডায় কাজ কি? আপনি স্বয়ং ঈশ্বর। আপনার আবার ঈশ্বর কে? শত্রুর মস্তকে চরণ রেখে আপনি সীতাকে বলপূর্বক ভোগ করুন। বৃথা তার সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছেন কেন?"

শুনে রাবণ হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "মহাপার্শ্ব, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তুমি জানো না, এ ব্যাপারে আমি অসহায়, শাপগ্রস্ত। শোন তবে বলি, এক সময় স্বর্গের অপ্সরী বরুণের কন্যা পুঞ্জিকাস্থলীকে আমি বলপূর্বক ধর্ষণ করি। অপ্সরা কেঁদে গিয়ে ব্রহ্মাকে জানায়। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দেন, আজ থেকে তুমি যদি কোনো নারীকে বলপূর্বক গমন কর তাহলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

> অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
> তদা তে শতধা মূর্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১৩/১৪)

মহাপার্শ্ব, তাই আমি ব্রহ্মার অভিশাপের ভয়ে সীতাকে জোর করে আমার অঙ্কশায়িনী করতে পারছি না।"

বেলাভূমি যেমন এক অদৃশ্য শাসনে সমুদ্রের উদ্দামতাকে প্রতিহত করে রাখে, তেমনি রাবণের শিরে সদা উদ্যত এই অভিশাপ তাকে সীতাধর্ষণ থেকে নিরস্ত করেছে। মহাকাব্যের অন্তরের পবিত্রতা যাতে কলুষিত না হয় তাই বাল্মীকি প্রথম থেকেই রাবণের উন্মাদ কামের ভয়ংকর বেগকে এক বজ্রগ্রন্থি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। হিংস্র পশু যেমন বাঁধা থাকে লোহার শিকলে। পাপের ভিতরে এমনি করে থাকে তার প্রচ্ছন্ন দণ্ড। যার অমোঘ শাসন তাকে সীমিত করে এবং ভিতরে ভিতরে চূর্ণ করে দেয়।

রাবণের শিরে এই ব্রহ্মদণ্ডের মতো বারবার নেমে এসেছে এক একটি অভিশাপ। বস্তুত এগুলি তার স্বকৃত পাপের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি। বিষের যেমন বিষক্রিয়া তেমনি পাপকর্মের দৈবপ্রতিষেধ হল অভিশাপ।

এক। ঋষি ও দেবকন্যাদের অভিশাপ। রাবণ ঋষি ও দেবকন্যাদের অপহরণ করে নিয়ে আসে। তখন তাঁরা অভিশাপ দিয়েছিলেন, "পরস্ত্রী অপহরণকারী রাক্ষস, কোনো স্ত্রীর নিমিত্ত তোর একদিন বিনাশ হবে।" (উত্তরকাণ্ড, ২৪/২০-২১)

দুই। বেদবতীর অভিশাপ। বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী চিরকুমারী হয়ে তপস্যা করছিলেন। কামার্ত রাবণ সেই তপস্বিনীকে ধর্ষণ করতে যায়। বেদবতী তখন অনলে আত্মবিসর্জন দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি অযোনিজা কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করে রাবণের মৃত্যুর কারণ হবেন। (উত্তরকাণ্ড, ১৭ সর্গ)

তিন। নলকুবেরের অভিশাপ। স্বর্গের অপ্সরী রম্ভা কুবেরের পুত্র নলকে ভালবাসে। একদিন জ্যোৎস্না রাতে রম্ভা প্রসাধন করে নলের কাছে অভিসারে চলেছেন।

রাবণ দেখে কামার্ত হয়ে তাঁকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে। নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দেন, ভবিষ্যতে অন্য কোনো নারীকে রাবণ যদি বলপূর্বক ধর্ষণ করে তবে তার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (উত্তরকাণ্ড, ২৬ সর্গ)

চার। রাজা অনরণ্যের অভিশাপ। অযোধ্যার রাজা অনরণ্য রাবণকে অভিশাপ দেন, ইক্ষ্বাকুবংশের রাম তোমাকে বধ করবেন। (উত্তরকাণ্ড, ১৯ সর্গ)

পাঁচ। নন্দীশ্বরের অভিশাপ। মহাদেবের দ্বিতীয় শরীর নন্দীশ্বর। তাঁর মুখাবয়ব বানরের মতো দেখে রাবণ উপহাস করে। নন্দী তখন রাবণকে অভিশাপ দেন, আমার মতো রূপ ও তেজ বিশিষ্ট বানরগণ তোমাকে সবংশ নিহত করবে। (উত্তরকাণ্ড, ১৬ সর্গ)

ছয়। মহাদেবের অভিশাপ। দেবতাদের প্রার্থনায় মহাদেব রাবণের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিয়ে বলেন, কোনো নারীব নিমিত্ত রাবণ সবংশে ধ্বংস হবে—"উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা"। (যুদ্ধকাণ্ড, ৯৪/৩৫)

এইসব অভিশাপ যেন সীতার ধর্ম ও শুচিতাকে ঘিরে বাল্মীকির এক রক্ষাগণ্ডি। রাবণ যাতে সীতার পবিত্রতাকে কোনোমতেই অতিক্রম করতে না পারে সেদিকে ছিল কবির সজাগ দৃষ্টি। এমনি করে পাপ তার নিজের ও নিজের পরিবেশের ভিতর থেকেই নিত্য বাধা পায়। পাপের বিরুদ্ধে ধর্মের এই স্বয়ংক্রিয় বাধাই ধর্মের শাশ্বত শক্তির পরিচয়। হনুমান যখন লঙ্কায় প্রবেশ করলেন তখন লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হনুমানের পথ ছেড়ে দিলেন। পাপপুরী অরক্ষিত অনাবৃত হয়ে পড়ল। কবি বলতে চান, পাপ কখনো দুর্ভেদ্য নয়। তার রক্ষাবেষ্টনী চিরকালই ভঙ্গুর।

উনত্রিশ

লঙ্কা অবরোধ

রামের সেনাশিবিরে হঠাৎ দারুণ উত্তেজনা।

সুগ্রীব বিচলিত হয়ে বললেন, "শিবিরে শত্রু প্রবেশ করেছে। এখনই ওদের বধ করা উচিত। শত্রুকে বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় রাবণ ষড়যন্ত্র করে পাঠিয়েছে। ওরা আমাদের ভিতরে এসে ভেদ সৃষ্টি করতে পারে। যুদ্ধের গোপনীয় খবর জেনে নিতে পারে। কিংবা সুযোগ পেয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে আমাদের হত্যা করতে পারে। আমার মতে এখনই ওদের বধ করা উচিত।"

রাম শান্তকণ্ঠে হনুমানকে বললেন, "সুগ্রীবের কথা শুনলে, এখন তোমাদের কার কি মত বল।"

অঙ্গদ বললেন, "মহারাজ, সুগ্রীব যথার্থ বলেছেন। বিভীষণ শত্রুর কাছ থেকে আসছে। সুতরাং সে বিশ্বাসের পাত্র নয়। তাকে সন্দেহ করাই উচিত। অর্থ অনর্থ বিচার করে আমাদের চলা কর্তব্য।"

শরভ বললেন, "বিভীষণের প্রকৃত মতলব কি গুপ্তচর দিয়ে পরীক্ষা করে জানা দরকার।"

জাম্ববান বললেন, "বিভীষণ শত্রুর কাছ থেকে অসময়ে অস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং তাকে সন্দেহ করা উচিত।"

এবার বাগ্মী ও বিবেচক মৈন্দ বললেন, "মহারাজ, মিষ্টবাক্যে তার সঙ্গে কথা বলে বুদ্ধি করে জেনে নিতে হবে বিভীষণের উদ্দেশ্য ভাল না মন্দ।"

রাম এবার হনুমানের দিকে তাকালেন।

হনুমান বললেন, "মহারাজ, আপনার সচিবেরা যা বললেন তা আমি সমর্থন করি না। কার্যক্ষেত্রে আচরণ দেখে মানুষের দোষগুণের বিচার সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে সে অবসর নেই। বিভীষণ অসময়ে অস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন বলেও আমি মনে করি না। রাবণের উৎপীড়নে বিচলিত হয়ে আপনার বিক্রমের কথা বিবেচনা করে, নিজের স্বার্থ ও মঙ্গল ভেবেই বিভীষণ এখানে এসেছেন: তাঁকে গুপ্তচর দিয়ে প্রশ্ন করানো হলে বরং তিনি অযথা শঙ্কিত হয়ে উঠবেন। যদি মিত্রভাব নিয়ে এসে থাকেন তাহলে তাঁর মন বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবে। তাছাড়া প্রশ্ন করে কি মানুষের মনের ভাব জানা যায়? আমি তার হাবভাব কথাবলা ভাল করে লক্ষ করেছি। মানুষ বাইরে যতই ভান করুক; তার ভিতরের মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়বেই। কিন্তু বিভীষণের সরল বাক্য, প্রসন্ন মুখ, সুস্থির নিঃসংকোচ ভাব দেখে আমার মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি।"

শুনে সুগ্রীব অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "সে ভাল হোক আর মন্দ হোক তা আমাদের দেখার দরকার নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি বিপদের সময় নিজের ভাইকে ত্যাগ করে তাকে বিশ্বাস কি?"

তখন রাম প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "সুগ্রীব খুব ভাল কথা বলেছেন। শাস্ত্র ও গুরুসেবা ছাড়া এমন বাক্য কেউ বলতে পারে না। কিন্তু জানবে, রাজাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধের আরও অনেক লৌকিক প্রত্যক্ষ ও সূক্ষ্ম সব কারণ থাকে। বিপদের সময় রাজারা প্রথমেই ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদের সন্দেহ করে থাকেন। সুগ্রীব মনে রেখো, সকলেই ভরতের মতো ভাই আর তোমার মতো বন্ধু হয় না। তুমি বিভীষণকে সসম্মানে নিয়ে এসো। কেউ যদি আমার শরণাগত হয়, তাকে আমি সর্বতোভাবে অভয় দান করি। এই আমার ব্রত।"

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১৮/৩৩)

সুগ্রীবের সঙ্গে বিদ্যুৎকান্তি বিভীষণের প্রবেশ।

—"রঘুনন্দন, আমি রাবণের ভাই বিভীষণ। রাবণ আমাকে অপমান করেছেন। তাই আমি আমার আত্মীয় স্বজন ধনসম্পত্তি ও দেশ ত্যাগ করে আপনার শরণাগত হয়েছি।"

—"বিভীষণ, আমি রাবণকে সবংশে বধ করে তোমাকে লঙ্কার অধীশ্বর করব। আমার তিন ভাইয়ের শপথ নিয়ে বলছি, রাবণকে বধ না করে আমি অযোধ্যায় ফিরব না।"

অহত্বা বাবণং সংখ্যে সপুত্র-জন-বান্ধবম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১৯/২১)

—"লঙ্কাবিজয়ে আমিও আপনাকে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করব।"

—"লক্ষ্মণ, সমুদ্রের পবিত্র বারি নিয়ে এসো। আমি এখনই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষসরাজপদে অভিষিক্ত করব।"

বিভীষণের মস্তকে রাম পুণ্য অভিষেক বারি সিঞ্চন করলেন।

বানরসেনার মধ্যে তখন হর্ষধ্বনি হতে লাগল।...

রাম এমনি করে সকলকে অবাক করে গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নেন চকিত বিদ্যুতের মতো। চিন্তা নয়, ভাবনা নয়, সংশয় নয়। তাঁর দিব্য অন্তর্দৃষ্টি পলকে সত্যকে দর্শন করে। আর সেই মতো তিনি কর্মে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাই হনুমান রামচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন, "সময় ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অভ্রান্ত ও নিপুণ। কী কাজ করতে হবে এবং কী উপায়েই বা তা করতে হবে সে সম্বন্ধে তার বিচার অব্যর্থ। তাই রামের সিদ্ধান্ত এমন ক্ষিপ্র এবং এমন সফল।"

দেশকালোপপন্নঞ্চ কার্যং কার্যবিদাং বর।
সফলং কুরুতে ক্ষিপ্রং প্রয়োগেণাভিসংহিতম্॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১৭/৬৫)

রামের সিদ্ধান্তের এই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা দেখে আমরা কখনো বিস্মিত এবং অভিভূত, আবার

কখনো-বা হয়তো ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। বুঝতে না পারলেও হয়তো অনুভব করা যায়, তার মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটা পরম জ্ঞানের গুপ্ত রহস্য। কবি ভবভূতি তাই রাম সম্বন্ধে বলেছেন, "ব্রহ্মকোশস্য গোপায়িতা" (উত্তররামচরিতম্, ৬/২০)। তাঁর বন্ধু ও সচিবেরা যেখানে যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে বিচার ও ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন, সেখানে রাম অত্যন্ত ক্ষিপ্র। তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে না।

যাইহোক, এখন রামের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, কেমন করে তিনি এই দুস্তর সাগর পার হবেন।

বিভীষণ পরামর্শ দিলেন, "আপনি সমুদ্রের শরণ নিন। ইক্ষ্বাকুবংশের সগর রাজার পুত্রগণ সাগর খনন করেছিলেন। সাগর নিশ্চয়ই সেই কৃতজ্ঞতা স্মরণ করে আপনাকে সাহায্য করবে।"

লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

রাম তখন সাগরতীরে কুশাসন বিছিয়ে সমুদ্রের আরাধনা করতে লাগলেন। সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট রাম যেন তপস্যার এক স্থির অগ্নিশিখা—রামো বেদ্যামিব হুতাশনঃ।...

এদিকে সেনাশিবিরে আবার কোলাহল...

—"গুপ্তচর, গুপ্তচর, শত্রুর গুপ্তচর ধরা পড়েছে।"

ধৃত গুপ্তচরকে প্রহার করতে করতে রামের সামনে এনে হাজির করলেন সুগ্রীব।

—"মহারাজ, এই গুপ্তচর রাবণের বার্তা নিয়ে গোপনে আমার কাছে এসেছিল।"

—"গুপ্তচর কী বলতে চায়?"

—"রাবণ একে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, সুগ্রীব তোমাকে আমি ভ্রাতার মতো স্নেহ করি। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। সুগ্রীব, তুমি ধীমান, তুমি কেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ? আমি রামের ভার্যাকে অপহরণ করেছি, তাতে তোমার কি? তুমি রামকে ত্যাগ করে সসৈন্যে কিষ্কিন্ধায় ফিরে যাও।"

শুনে বানর সেনারা গুপ্তচরকে প্রহার করতে থাকে।

দেখে দয়ার্দ্রহৃদয় রাম বললেন, "ওকে মেরো না। মাবধিষ্টেতি"।

সুগ্রীব বললেন, "চর, তুমি রাবণকে গিয়ে বলবে, সে আমার বন্ধু নয়, শত্রু। আমরা তাকে সবংশে বধ করব। লঙ্কা ছারখার করে দেব। ত্রিভুবনে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

অঙ্গদ বললেন, "মহারাজ, এ দূত নয়, গুপ্তচর। আমাদের অনেক গুপ্ত সংবাদ জেনে নিয়েছে। একে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। বন্দি করুন।"

মৃত্যুভয়ে ভীত গুপ্তচরের দিকে তাকিয়ে তখন রাম বললেন, "দূত অবধ্য। একে ছেড়ে দাও। মুচ্যতাং দূত আগতঃ।"

রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে সমুদ্রকে আরাধনা করছেন।

তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল।

কিন্তু অকূল জলরাশি নিয়ে সমুদ্র নিথর নিরুত্তর।

শেষে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "লক্ষ্মণ, সমুদ্র আমার আরাধনায় সাড়া দিল না। যারা অহংকারী গর্বিত ও ধৃষ্ট তারা শান্ত ও নম্র ব্যবহারকে দুর্বলতা বলে মনে করে। দণ্ডদাতাকেই তারা সম্মান করে। তাই কেবল সামগুণের দ্বারা জগতে কীর্তি ও যশ লাভ করা হয় না। লক্ষ্মণ, আমার ধনুর্বাণ নিয়ে এসো, ব্রহ্মাস্ত্র হেনে আমি সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেব।"

রামের ক্রুদ্ধ নয়নে তখন প্রলয় অগ্নি জ্বলে উঠল।...

রামেব ধনুষ্টংকারে সমুদ্র পাতাল বিদীর্ণ হয়ে আলোড়িত হতে লাগল। আকাশ অন্ধকার। ঝড়ঝঞ্ঝায় পৃথিবী কাঁপছে। পর্বত টলছে। চন্দ্র সূর্য কক্ষচ্যুত হয়ে তির্যক গতিতে ঘুরছে। বজ্র উল্কাপাতে অন্তরীক্ষ দগ্ধ হচ্ছে। সমস্ত বরুণলোক আর্তনাদ করছে। ঘূর্ণমান সাগরবক্ষে ধূম আর অগ্নিশিখা। মৎস্য মকর সর্প উরগ জল থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে।...

তখন জলরাশি ভেদ করে উদয়াচল থেকে সমুদ্র স্বয়ং মূর্তিমান হয়ে রামের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন।

স্নিগ্ধবর্ণ বৈদুর্যকান্তি সেই মূর্তি। মকরবেষ্টিত তপ্তকাঞ্চন ভূষিত অঙ্গ। রত্নহার রক্তাম্বরধারী। মস্তকে সর্বপুষ্পময়ী দিব্য কিরীটীমালা।

সিন্ধুদেবতা রামকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আকাশ অগ্নি বায়ু পৃথিবী ও সমুদ্র এই পঞ্চ মহাভূত আপন আপন স্বধর্মে স্থিত। তাদের বিচলিত করলে সৃষ্টি লয় হয়ে যায়। আমি মহাসমুদ্র স্বভাবতই অগাধ ও অপার। আমার ধর্মকে আমি স্তম্ভিত করতে পারি না। তবে তোমার পথে আমি বাধা হব না। তোমার সেনানীর মধ্যে বিশ্বকর্মার পুত্র নল আমার উপর দিয়ে সেতু নির্মাণ করবে। আমি সেই সেতু বক্ষে ধারণ করব।"

এই বলে সমুদ্রদেবতা অন্তর্হিত হলেন।

তখন দেখতে দেখতে পাযাণ পর্বত উৎপাটন করে বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রে সেতু নির্মিত হল। দশ যোজন বিস্তৃত শত যোজন দীর্ঘ নলনির্মিত সেই আশ্চর্য সেতু মহাকাশে ছায়াপথের মতো শোভা পেতে লাগল।

স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ২২/৭৪)

তখন হনুমানের স্কন্ধে রাম আর অঙ্গদের স্কন্ধে লক্ষ্মণকে নিয়ে বানর সেনাগণ তুমুল কোলাহলে জয়যাত্রা করে সাগর পার হয়ে গেল।...

সমুদ্র পার হয়ে রাম লঙ্কার উত্তর কূলে সুবেল পর্বতের সানুদেশে তাঁর বিপুল সেনা সন্নিবেশ করলেন।

বিভীষণ ছদ্মবেশে রাবণের যুদ্ধের প্রস্তুতি জেনে এসে রামকে বললেন, "মহারাজ, লঙ্কার পূর্বদ্বারে প্রহস্ত তার সৈন্য নিয়ে ব্যূহ রচনা করেছে। পশ্চিমে ইন্দ্রজিৎ, দক্ষিণে মহোদর আর মহাপার্শ্ব। লঙ্কার অভ্যন্তরে আছে বিরূপাক্ষ। আর উত্তর দ্বারে স্বয়ং রাবণ।"

রাম বললেন, "উত্তম। আমাদেরও আক্রমণ ব্যূহ প্রস্তুত কর। পূর্বদ্বারে প্রহস্তের সঙ্গে যুদ্ধ করবে সেনাপতি নীল, মৈন্দ আর দ্বিবিদ। পশ্চিম দ্বারে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করবেন হনুমান। দক্ষিণে সসৈন্য হানা দেবে অঙ্গদ, তার সঙ্গে থাকবে ঋষভ, গজ, গবয় এবং গবাক্ষ। লঙ্কার

অভ্যন্তরে ব্যূহভেদ করবে সুগ্রীব জাম্ববান আর বিভীষণ। আর লক্ষ্মণ এবং আমি রাবণের সম্মুখীন হব উত্তরদ্বারে। সেনাবাহিনীর পুরোভাগে থাকব আমি আর লক্ষ্মণ। মধ্যভাগে নীল ও অঙ্গদ। বাহিনীর দক্ষিণে ও বামে থাকবে ঋষভ আর গন্ধমাদন।"

রাম যুদ্ধের মন্ত্রণা করছেন, এমন সময় শিবির দ্বারের দিকে তাকিয়ে বিভীষণ চমকে উঠলেন, "ও কে? কে তোমরা?"

ছুটে গিয়ে দুটি বানরকে ধরে ফেললেন বিভীষণ।

—"মহারাজ, এরা বানর নয়। শত্রুর গুপ্তচর। আমি এদের চিনতে পেরেছি। এরা রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ। বানরেব ছদ্মবেশে আমাদের যুদ্ধের সংবাদ জেনে নিতে এসেছে।"

ধৃত গুপ্তচর দুজন রামের সামনে মৃত্যুভয়ে থরথর করে কাঁপছে, "রঘুনন্দন, আমরা রাবণের আদেশে গোপনে আপনার সৈন্যবলের সংবাদ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা নিরুপায় আজ্ঞাবহ মাত্র। রাবণের কথা না শুনলে মৃত্যু। আবার শুনলেও মৃত্যু।"

রাম মৃদু হেসে বললেন, "যদি এখনো তোমাদের জানতে ও দেখতে কিছু বাকি থাকে তাহলে বলো, বিভীষণ তোমাদের সব দেখিয়ে দেবেন। তোমরা শত্রুর গুপ্তচর অতএব বধযোগ্য। তবু তোমাদের আমি ক্ষমা করলাম। রাবণকে গিয়ে বলবে, তার শক্তি সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দেখায়। আগামীকাল প্রভাতে আমি লঙ্কা আক্রমণ করব। বিভীষণ, আপনি এদের ছেড়ে দিন।"

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় দুই রাক্ষস তখন রামকে প্রণাম করে বলল, "ধর্মবৎসল হে রাঘব, আপনার জয় হোক।"

এদিকে প্রাসাদশিখর থেকে রাবণ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরে সুবেল পর্বতে রামের সেনাসমাবেশের দিকে। সমস্ত পর্বত বৈলাভূমি হরিত ও পিঙ্গল বর্ণের কোটি কোটি বানবসেনায় সমাচ্ছন্ন। সোনার লঙ্কার উত্তর প্রান্তজুড়ে যেন অগ্নির লোহিত আভা ছড়িয়ে পড়েছে। তাম্র পীত রজত ছটায় দূরদিগন্ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে—"তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরকর্মণঃ" (যুদ্ধকাণ্ড, ২৭/২)।

রাবণ অস্থির হয়ে প্রাসাদশিখরে পায়চারী করছে। এমন সময় শুক ও সারণ ত্রস্তপদে প্রবেশ করে বলল, "মহারাজ, লঙ্কার বন উপবন নদনদী সমুদ্র পর্বত অগণিত বানরসেনায় ছেয়ে গেছে। তাদের তুমুল গর্জনে লঙ্কাপুরী কাঁপছে। রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সঙ্গে বিভীষণ যোগ দিয়েছে। বিভীষণ আমাদের চিনতে পেরে বন্দি করে বধ করতে যায়। কিন্তু ধর্মাত্মা রাম আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। মহারাজ, আমার মনে হয়, সর্বশাস্ত্রকুশল প্রবল পরাক্রম রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং তাঁদের দুর্জয় বাহিনী ত্রিলোকে অপরাজেয়। রামের তেজ ও বীর্য দেখে মনে হল, তিনি একাই লঙ্কা ধ্বংস করতে পারেন। মহারাজ, এখনো সময় আছে, যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে আপনি রামের হাতে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করুন।"

রাবণ হুংকার দিয়ে বলল, "দুর্বল ভীরু কাপুরুষ। শত্রুর স্তাবক, পাপাত্মা কৃতঘ্ন অধম।

মন্ত্রী হয়ে তোমরা রাজার কাছে শত্রুর প্রশংসা করো? এত বড় স্পর্ধা? তোমাদের প্রাণের ভয় নেই? আমার সামনে থেকে দূর হও।"

শুক ও সারণ সভয়ে প্রস্থান করল।

—"মহোদর, শীঘ্র গুপ্তচর শার্দূলকে পাঠিয়ে শত্রু শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ করো।"

—"যে আজ্ঞা মহারাজ।"

—"আর শোন, মায়াবিদ্ রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে ডাক। তাকে বল, মহারাজ তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।"

বিদ্যুজ্জিহ্বের সঙ্গে রাবণ অনেকক্ষণ গোপনে পরামর্শ করল। মনে হয় রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় অপেক্ষা সীতার মন জয় করাটাই যেন রাবণের এখন প্রধান লক্ষ্য।...

অশোকবনে সীতা। শোকার্ত বিষণ্ণ মলিন। করুণ চোখে তাঁর অশ্রুর ধারা। দুঃখসমাহিত উদাস দৃষ্টি। তন্ময় বিহ্বল হয়ে বুঝি রামের মুখচন্দ্র ধ্যান করছেন। হঠাৎ চমকে ওঠেন। দেখে সম্মুখে রাবণ..

—"মৈথিলি, ভদ্রে, আমি তোমার মন তুষ্ট করতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি শুধু আমাকে অপমান করেছ। যার কথা ভেবে তোমার এত গর্ব সেই খরহন্তা রাম নিহত হয়েছে। বৃথা আর মৃত স্বামীর কথা ভেবে কি হবে? এখন তুমি আমার ভার্যা হও।"

সীতা বজ্রাহত, স্তম্ভিত। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

—"গতকাল সন্ধ্যায় লঙ্কা পার হয়ে রাম উত্তর উপকূলে তার সেনা সমাবেশ করেছিল। মধ্যরাতে তারা সবাই যখন পরিশ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত, তখন আমার সেনাপতি প্রহস্ত তার বিপুল সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে। রাম তখন নিদ্রিত ছিল। প্রহস্ত তার শিরচ্ছেদ করেছে। বিভীষণ ও লক্ষ্মণ প্রথমে পলায়ন করে। পরে রাক্ষসসেনার হাতে বন্দি হয়েছে। সুগ্রীব হনুমান জাম্ববান নিহত। অঙ্গদ মৈন্দ ও দ্বিবিদ আহত হয়ে মৃতপ্রায়। সমস্ত বানরসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছে।"

এই বলে রাবণ আদেশ করল, "এই, কে আছিস. বিদ্যুজ্জিহ্বকে এখানে ডাক। রণক্ষেত্র থেকে সেই রামের ছিন্নমুণ্ড ও ধনুর্বাণ নিয়ে এসেছে।"

বিদ্যুজ্জিহ্ব এসে মূর্ছিতপ্রায় সীতার সামনে ছিন্নমুণ্ড ও ধনুর্বাণ রেখে গেল।

সীতার অনাহারক্লিষ্ট শোকার্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। পা টলছে। চোখের দৃষ্টিতে আঁধার। দেখছেন, ঠিক সেই চোখ, সেই মুখ, সেই বর্ণ, সেই অত্যুজ্জ্বল ললাটে মঙ্গলচূড়ামণি।

সীতা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।...

লঙ্কার চতুর্দিকে তখন প্রচণ্ড কোলাহল। যুদ্ধের দামামা। বানর সেনাদের দুর্জয় রণহুংকার।..

এমন সময় সেখানে ব্যস্ত হয়ে এক প্রতিহারীর প্রবেশ।

—"মহারাজ, সেনাপতি প্রহস্ত তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী নিয়ে দ্বারে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

—"এই অসময়ে কী প্রয়োজন?"

—"ক্ষমা করবেন, মহারাজ, সেনাপতির বার্তা, যুদ্ধের অত্যন্ত জরুরি কার্যে এখনই আপনার মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন।"

রাবণ তখন অশোকবন ত্যাগ করে শশব্যস্তে প্রস্থান করল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সীতার সামনে থেকে সেই মায়ামুণ্ড আর ধনুর্বাণ অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সীতা বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এ কি সত্য, স্বপ্ন, না মায়া?

বিভীষণের পত্নী সরমা এসে তখন সীতার চোখের জল মুছিয়ে সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "প্রিয় সখী, তুমি শোক করো না। ত্রিলোকের আশ্রয় রঘুনন্দন রাম জীবিত আছেন। তিনি নিহত হননি। এসমস্তই রাবণের মিথ্যা মায়া যাদুবিদ্যা। তুমি শোক করো না। রাম সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করেছেন। ওই শোন যুদ্ধের কোলাহল। মেঘ গর্জনের মতো ভেরীবাদ্য বেজে উঠেছে। রাক্ষসকুল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিপদের বার্তা পেয়ে রাবণ তাই ব্যস্ত হয়ে এখান থেকে চলে গেল। সীতা, ভাগ্যদেবী তোমার উপরে প্রসন্ন হয়েছেন। আর দেবি নেই, ইন্দ্র যেমন স্বর্গলক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন, তেমনি অচিরেই রামচন্দ্র রাক্ষসকুল বিনাশ করে তোমাকে উদ্ধার করবেন। শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার মতো তুমি শীঘ্রই রামচন্দ্রকে দর্শন করে আনন্দিত হবে।"

ত্রিশ

যুদ্ধের গান্ধর্বসংগীত

লঙ্কা অবরোধ করে চতুর্দিকে বানরসেনা সজ্জিত। তাদের রণহুংকারে আকাশ কম্পিত। সমুদ্র ক্ষোভিত। রামের আদেশে সকল দুর্গদ্বারে তারা একসঙ্গে আক্রমণ হানল—

"জয়, রঘুনাথ রামচন্দ্রের জয়।"

"জয়, লক্ষ্মণের জয়।"

"জয়, সুগ্রীবের জয়।"

বড় বড় বৃক্ষ গিরিপর্বত উৎপাটন করে, সমস্ত তোরণপ্রাকার ভেঙে, নগরের পরিখা সব ভরাট করে দিল।

তখন অগণিত রাক্ষস বিকট চিৎকারে যুদ্ধ করতে লাগল।

শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গের ঘোর বাদ্য। রক্তিম ধূলিপটলে আকাশ সমাচ্ছন্ন। গদা শক্তি শূল হস্তে রাক্ষসের মরণহুংকার। রথের ঘর্ঘর, অশ্বের হ্রেষা আর হস্তীর বৃংহণ। কোলাহল চিৎকার আর্তনাদ। সেই প্রলয়নিনাদে সমুদ্র দুলছে। পৃথিবী টলছে। বাল্মীকি এখানে ধ্বংস আর মৃত্যু নিয়ে মহাযুদ্ধের এক ভয়ংকর মহাসংগীত ধ্বনিত করে তুলেছেন তাঁর ছন্দবীণার অগ্নিঝংকারে। ধর্ম-অধর্মের ঘোর সংঘাতে সমুদ্ভূত সেই ভীষণ গান্ধর্বসংগীত।

> ধনুর্জ্যা-তন্ত্রিমধুরং হিক্কাতালসমন্বিতম্।
> মন্দস্তনিতগীতং তদ্ যুদ্ধগান্ধর্বমাবভৌ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৫২/২৪)

> রথনেমিস্বনস্তত্র ধনুষশ্চাপি ঘোরবৎ।
> শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গানাং বভূবঃ তুমুলঃ স্বনঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৫৩/২২)

তুমুল যুদ্ধ বেধেছে।

নিহত রাক্ষসের রক্তে মৃত্যুর নদী।

নিকুম্ভকে আক্রমণ করেছেন অগ্নিপুত্র নীল। ওদিকে জম্বুমালীর সঙ্গে হনুমান, বিদ্যুন্মালীর সঙ্গে সুষেণ, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে অঙ্গদ, আর প্রঘসের সঙ্গে সুগ্রীব। লক্ষ্মণের শরাঘাতে নিপীড়িত রাবণপুত্র বিরূপাক্ষ।

ছিন্নবাহু ছিন্নশির রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ছে অগণিত রাক্ষসসৈন্য। সমস্ত রণভূমিতে কবন্ধ প্রেত আর পিশাচের বিভীষিকা।

হঠাৎ লক্ষ্মণের বাণে নিহত হল বিরূপাক্ষ।

রামসেনার মধ্যে তখন তুমুল জয়ধ্বনি।

পরক্ষণেই হনুমান বধ করলেন জম্বুমালীকে। সুগ্রীব এক শিলার আঘাতে চূর্ণ করলেন প্রঘসকে। তাই দেখে ইন্দ্রজিৎ ছুটে এসে প্রচণ্ড রোষে অঙ্গদের বক্ষে গদাঘাত করল। প্রতপন নলকে আক্রমণ করেছে। নল আহত। তার সর্বাঙ্গে রক্তধারা। হঠাৎ অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের হাত থেকে গদা কেড়ে নিয়ে রথ চূর্ণ করে অশ্ব ও সারথিকে বধ করলেন। আর নল এক লম্ফে গিয়ে প্রতপনের দুই চক্ষু উৎপাটন করে নিলেন। অঙ্গদের হাতে পরাজিত ইন্দ্রজিৎ তখন মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

রাক্ষসেরা পরাজিত। তারা পলায়ন করছে। রণহুংকারে তাদের বিতাড়িত করে ফিরছে বানবসেনা—

"জয়, রঘুনাথ রামচন্দ্রের জয়।"

হতবল হয়ে রাক্ষসেবা তখন সূর্যাস্তের অপেক্ষা করতে লাগল। কেননা নিশাকালে নিশাচর রাক্ষসদের বলবৃদ্ধি হয়। ঋগ্বেদে তাই বলা হয়েছে, রাক্ষসেরা হল সব "তমোবৃধঃ" (ঋ. ৭/১০৪/১) অর্থাৎ তাবা অন্ধকারে তামসী নিশ্চেতনার তিমিরে বর্ধিত হয়।

সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। শূন্য রণক্ষেত্রে তখন শ্মশানের নীরবতা। কেবল সমুদ্রে উতরোল হাওয়া আর নিশাচর পাখির ডানার শব্দ। থেকে থেকে শৃগাল আর শকুনের চিৎকার। দূরে হতমান লঙ্কাব রাজপ্রাসাদ রহস্যময় আতঙ্কে স্তব্ধ।...

হঠাৎ সেই তিমিরতল ভেদ করে রাক্ষসদের ভয়াল হুংকার উঠল। রাত্রির তামসী-অন্ধকার পান করে সহসা তারা যেন সব বলবান হয়ে উঠেছে। যেন এক-একটি কৃষ্ণকায় নিশাপর্বত। তাদের হাতের তীক্ষ্ণ শূল আব শাণিত অস্ত্রের ঝিলিকে রাত্রির আকাশ চমকে উঠছে। যুদ্ধের নিনাদে প্রতিধ্বনিত ত্রিকূট পর্বত যেন মূর্ত বিভীষিকা।...

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কে বানর আর কে রাক্ষস নির্ণয় করার উপায় নেই। চারিদিকে কেবল হুংকার আর আর্তনাদ। মৃতের স্তূপ আর রক্তকর্দম। তার মধ্যে শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গের গম্ভীর বাদ্য। যেন উত্তাল প্রলয় সমুদ্র।

ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করছে। তার প্রবল শরবর্ষণে বানর সেনা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। অন্তরিক্ষ থেকে ইন্দ্রজিৎ দম্ভে দর্পে আস্ফালন করে রাম লক্ষ্মণকে বলছে, "এবার তোমাদের যমালয়ে পাঠাব। আমি যখন অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করি, তখন তোমরা তো দূরের কথা, স্বয়ং ইন্দ্রও আমাকে দেখতে পায় না।"

অগ্নিবৃষ্টির মতো রাম লক্ষ্মণের উপরে বাণবর্ষণ হতে লাগল। সর্বাঙ্গ শরাহত রক্তাপ্লুত দেহে রাম লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন যেন পুষ্পিত দুটি পলাশ বৃক্ষ। অসংখ্য বাণ তাঁদের বক্ষস্থল বিদ্ধ করছে।

অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিতের মুহুর্মুহু গর্জন আর অট্টহাসি।

রামচন্দ্রের শরীর অবসন্ন। মুষ্টি শিথিল। হস্ত থেকে ধনুর্বাণ স্খলিত হয়ে পড়ল। এক সময় তিনি ইন্দ্রধ্বজের মতো কম্পিত দেহে বীরশয়ানে শায়িত হলেন। লক্ষ্মণও আহত। তিনিও অবসন্ন হয়ে জীবনের আশা ত্যাগ করলেন।

তাঁদের ঘিরে বানরগণ শোকাকুল হয়ে রোদন করতে লাগল।

রাক্ষসদের উল্লসিত করে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থেকে বলল, "খরহন্তা মহাশত্রু রাম লক্ষ্মণকে আমি নিহত করেছি। যার জন্য, আমার পিতা দুশ্চিন্তায় উদ্‌বেগে শয্যাস্পর্শ করেন না, বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেন, যার জন্য সমস্ত লঙ্কা আজ ভয়ে বর্ষার নদীর মতো আকুল হয়ে উঠেছে, সেই অনর্থকে আমি নাশ করেছি। শরতের মেঘের মতো শত্রুর সমস্ত বিক্রম আজ নিষ্ফল।"

বিজয় উল্লাসে ইন্দ্রজিৎ লঙ্কায় প্রবেশ করল।

রাবণের আলোকিত রাজপ্রাসাদ তখন উৎসবমুখর।

স্ফটিক পাত্রে ফেনিল সুরা হাতে নিয়ে রাবণ সহর্ষে বলল, "লঙ্কার সর্বত্র রাম লক্ষ্মণ বধের সংবাদ ঘোষণা করে দাও। পুষ্পক বিমানে করে সীতাকে রণক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে দেখাও। ইন্দ্রজিতের হাতে রাম লক্ষ্মণ নিহত হয়েছে। এখন আমার কাছে আসা ছাড়া সীতার আর কোনো গতি নেই।"

লঙ্কাপুরীতে উৎসব চলছে।

এদিকে নির্জন রণক্ষেত্র অন্ধকার।

বীরশয়ানে শায়িত রাম লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে হনুমান সুগ্রীব শোকে বিহ্বল। নীল দ্বিবিদ অঙ্গদ সকলে ক্রন্দন করছে। সমস্ত বানরসেনা মুহ্যমান।

তখন শোকাকুল সুগ্রীবকে বিভীষণ বললেন, "হে বীর, ভীত হয়ো না। চোখের জল মোছো। এখন বিচলিত হবার সময় নয়। সংকটকালে এমন বিহ্বলতা বিপদ নিয়ে আসে। যুদ্ধে সর্বদা জয়লাভ হয় না। রাম যতক্ষণ সংজ্ঞা লাভ না করেন ততক্ষণ তাঁকে রক্ষা করো। তাঁর চেতনা ফিরে এলেই আমাদের বিপদ দূর হবে। দেখো, সৈন্যদের মধ্যে ভয় উপস্থিত হয়েছে। তারা ভীত হয়ে পরস্পর কানে কানে কি যেন বলছে তুমি গিয়ে ওদের আশ্বস্ত করো। রামের কিছু হয়নি। যাঁরা সত্যধর্মপরায়ণ তাঁদের মৃত্যু নেই—সত্যধর্মাভিরক্তানাং নাস্তি মৃত্যুকৃতং ভয়ম্।" (যুদ্ধকাণ্ড, ৪৬/৩৩)

এই বলে বিভীষণ মন্ত্রপূত জলে সুগ্রীবের মুখ মার্জনা করে দিলেন।

অন্ধকার আকাশে ধবলপক্ষ রাজহংসের মতো ভেসে এল পুষ্পক বিমান। রাবণের আদেশ, সীতা নিজের চোখে দেখে নিঃসন্দেহে হোক যে, রাম লক্ষ্মণ নিহত।...

চোখের জলে সীতার দৃষ্টি অন্ধ। ত্রিজটা তাঁকে অশ্রু মুছিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। সীতা দেখলেন, কাতারে কাতারে বানরসেনা নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। রাক্ষসেরা উল্লাস করছে।

তাদের উপর দিয়ে পুষ্পক বিমান অন্ধকারে উড়ছে।

হঠাৎ সীতা চমকে উঠে দেখলেন, শরশয্যায় শায়িত রাম লক্ষ্মণ। তাঁদের বর্ম কবচ বিদীর্ণ। হস্ত থেকে বিচ্যুত ধনুর্বাণ। সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ। সংজ্ঞাহীন নিষ্পন্দ দেহে ভূতলে পড়ে আছেন।...

বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন সীতা। বিলাপ করে বলতে লাগলেন, "মহর্ষিগণ সকলে আমাকে কল্যাণী সম্রাজ্ঞী পুত্রবতী সৌভাগ্যলক্ষ্মী বলে কত আশীর্বাদ করেছেন, তাঁরা সকলে আজ মিথ্যাবাদী হলেন। আমার অঙ্গের যত শুভলক্ষ্মণ, আমার সকল ধর্ম ও সতীত্ব আজ মিথ্যা হয়ে গেল। আমার ইন্দ্রতুল্য স্বামী সামান্য রাক্ষসের হাতে নিহত হলেন। তাঁর সকল ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ফল হল কেমন করে?"

শোকে মূর্ছিতপ্রায় সীতাকে আশ্বস্ত করে ত্রিজটা বলল, "দেবী, বিলাপ করো না। তোমাকে আমি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলিনি। আজও বলব না। রাম-লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। দেখো তাঁদের সুন্দর মুখশ্রী কেমন অম্লান রয়েছে। তাঁদের ঘিরে যোদ্ধারা এখনো সংগ্রামে উৎসুক। নিশ্চয় তাঁরা জীবিত আছেন। তাছাড়া জানবে, এই দিব্য পুষ্পক বিমান কোনো বিধবাকে বহন করে না। রাম যদি জীবিত না থাকতেন তাহলে এই বিমান কখনোই তোমাকে বহন করত না।

ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামতঃ।
দিব্যং ত্বাং ধারয়েন্নেদং যদ্যেতৌ গতজীবিতৌ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৪৮/২৫)

নিশ্চয় রাম লক্ষ্মণ বেঁচে আছেন। তবে মনে হয়, তাঁরা সাময়িক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন মাত্র। তুমি শোক কোরো না। রাম লক্ষ্মণের মৃত্যু হতে পারে না—নাদ্য শক্যমজীবিতম্।"

ত্রিজটার কথা শুনে সীতা দুই হাত কপালে তুলে রামের উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রণাম করে বললেন, "তুমি যা বললে তাই যেন সত্যি হয়, এবমস্ত্বিতি।"

পুষ্পক বিমান তখন অশোকবনে ফিরে গেল।...

অচৈতন্য রাম লক্ষ্মণ শরশয্যায় শায়িত। সুগ্রীব হনুমান অঙ্গদ বিভীষণ সকলে উদ্‌বিগ্ন। হতাশ বিশৃঙ্খল বানরসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করছে। জাম্ববান তাদের সাহস দিয়ে ফিরিয়ে আনছেন।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ সুষেণ বললেন, "আমি এক দিব্য মহৌষধির সন্ধান জানি। যেখানে অমৃত মন্থন হয়েছিল সেই ক্ষিরোদ সাগরের কূলে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুটি পর্বত আছে। সেই পর্বতে সঞ্জীবনী ও বিশল্যকরণী নামে দিব্য ওষধি পাওয়া যায়। যার সাহায্যে দেবগুরু বৃহস্পতি যুদ্ধে আহত দেবতাদের সঞ্জীবিত করে তুলতেন। সম্পাতি ও পনসকে সেখানে পাঠান। কিংবা হনুমান সব জানেন। তিনি গিয়ে সংগ্রহ করে আনতে পারবেন।"

কথা হচ্ছে, এমন সময় প্রবল বেগে ঝড় উঠল। আকাশ চিরে মেঘ বিদ্যুতের ঘনঘটা। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। লঙ্কার যত সর্প ও জলজন্তু ভয়ে সাগরজলে নিমজ্জিত হল।

তখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো দিব্য বিহঙ্গবহ্নি বিষ্ণুবাহন গরুড় তাঁর স্বর্ণপক্ষ বিস্তার করে সেখানে আবির্ভূত হলেন। এতক্ষণ ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস মায়ায় যেসব বিষনাগ রাম-লক্ষ্মণকে মরণপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিল, গরুড়ের আগমনে তারা তৎক্ষণাৎ ভয়ে অপসৃত হয়ে গেল।...

দিব্য মাল্যবস্ত্রধারী অপূর্বশোভন গরুড় রাম-লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করলেন। পরম প্রীতির সঙ্গে তাঁদের আলিঙ্গন করে বললেন, "তোমরা আমার প্রাণতুল্য সখা। দেবলোক থেকে সংবাদ পেয়ে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। সাবধান, রাক্ষসেরা বড় অবিশ্বাসী। তারা খল কপট ও কূটযোদ্ধা। কিন্তু সরলতাই তোমাদের বল ও শক্তি। ধর্মজ্ঞ রাঘব, আমি তোমাকে জানি, তুমি শত্রুকেও ভালবাস।"

প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ।
শূরাণাং শুদ্ধভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্॥
তন্ন বিশ্বসনীয়ং বো রাক্ষসানাং রণাজিরে।
এতেনৈবোপমানেন নিত্যং জিহ্মা হি রাক্ষসাঃ॥

*

সখে রাঘব ধর্মজ্ঞ রিপুণামপি বৎসল।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৫০/৫৩-৫৪, ৫৬)

এই বলে সকলকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে গরুড় অন্তর্ধান করলেন।

যদিও মহাভারতে বলা হয়েছে, রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন, গরুড় নয়, স্বয়ং বিভীষণ। বিভীষণ তাঁর প্রজ্ঞাস্ত্র হেনে ইন্দ্রজিতের মারণ অস্ত্রে ছিন্ন করে দেন—"কৃতকর্মা বিভীষণঃ বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রবোধিতৌ।" (মহাভারত, বনপর্ব, ২৮৯/৫)

যাইহোক, রাম-লক্ষ্মণকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত হতে দেখে বানরসেনাগণ প্রবল বিক্রমে আবার সিংহনাদ করতে লাগল।

যুদ্ধ ভেরী বেজে উঠল।

সেই বজ্রনিনাদে রাবণের প্রাসাদ কেঁপে উঠল।

রাবণ শঙ্কিত হয়ে মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করল, "একি? শত্রুরা এমন আনন্দধ্বনি করছে কেন? তাদের এমন ভয়ানক গর্জন তো আগে শুনিনি!"

—"মহারাজ, নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রাম-লক্ষ্মণ আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।"

শুনে রাবণ ক্রোধে ভয়ে উদ্‌বেগে বিবর্ণ হয়ে গেল ("চিন্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোঽভবৎ"—৬/৫১/১৪)। সর্পের মতো অগ্নিনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "ইন্দ্রজিতের অস্ত্র নিষ্ফল হল। শত্রুর গর্জন বড় ভীতিকর। মনে হয় কেবল সেনাবলে আর যুদ্ধজয় সম্ভব নয়।"

রাবণ ভীত হয়ে পড়েছে। তার মনোবল চূর্ণ। ভিতরে ভিতরে সে তার রাক্ষস অবয়বকে পাহাড়ের মতো অটল রেখে ক্রোধে হুংকার দিয়ে বলল, "সেনাপতি ধূম্রাক্ষ, যাও, যুদ্ধ করো।"

ধূম্রাক্ষ ভীষণ অট্টনাদে যুদ্ধ যাত্রা করল। তার সঙ্গে গদা শূল মুষল হস্তে ঘোরদর্শন অসংখ্য রাক্ষস। তাদের মাথার উপরে তখন কাক আর শকুনের চিৎকার। আকাশ অন্ধকার করে বজ্রঅশনিপাত। প্রতিকূল রুক্ষ বাতাস। ধূলিকঙ্কর আর রক্তবৃষ্টি। কবন্ধ প্রেতের আর্তনাদ। সেই ঘোর অমঙ্গল আর দুর্নিমিত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধূম্রাক্ষ ভয়ে থমকে দাঁড়াল। পিছনে তার রাক্ষসসেনারাও ভীত হয়ে পড়ল।

এমন সময় দুর্জয় বিক্রমে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বানরসেনা। বড় বড় শিলা প্রস্তর বৃক্ষের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রাক্ষসেরা। হনুমান প্রকাণ্ড একটা পাথর নিক্ষেপ করে ধূম্রাক্ষের রথ চূর্ণ করে দিলেন। তখন লৌহমুষল হাতে ধূম্রাক্ষ হনুমানকে আক্রমণ করল। সেই আঘাত সামলে নিয়ে হনুমান আবার একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করে ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করে দিলেন। নিহত ধূম্রাক্ষ আর্তনাদ করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

বিজয় উল্লাসে বানরসেনারা জয়ধ্বনি করতে লাগল, "জয়, রঘুপতি রামচন্দ্রের জয়"।

ধূম্রাক্ষের পতন শুনে ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ চিৎকার করে বলল, "সেনাপতি বজ্রদংষ্ট্র, যাও, প্রতিশোধ নাও।"

গর্জমান ধ্বংসের মতো অন্ধকার মূর্তি রাক্ষসেরা সব আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

শিলার আঘাতে বজ্রদ্রংষ্ট্রের রথ চূর্ণ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন অঙ্গদ। বজ্রদংষ্ট্র তখন এক বিশাল খড়্গ দিয়ে অঙ্গদকে আঘাত করল। আচমকা সেই আঘাতে রক্তাক্ত দেহে অঙ্গদ মাটিতে নতজানু হয়ে পড়ে গেলেন। বিপন্ন মুহ্যমান অঙ্গদ। বানরসেনারা শঙ্কিত। খড়্গ তুলে ওই বজ্রদংষ্ট্র আবার এগিয়ে আসছে। দেখে রামের সেনারা হায়হায় করে উঠল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে অঙ্গদ দণ্ডাহত কুপিত সর্পের মতো উঠে দাঁড়ালেন। খড়্গ দিয়ে শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। ছিন্নশির রক্তাক্ত দেহে নিহত বজ্রদংষ্ট্র লুটিয়ে পড়ল।

অঙ্গদকে ঘিরে বানরসেনা তখন তুমুল হর্ষে ইন্দ্রগৌরবে তাঁকে অভিনন্দিত করতে লাগল।

রাবণ বিচলিত ও বিহ্বল। তার আর সেই দর্প নেই। হুংকার নেই। ম্রিয়মাণ কণ্ঠে হাতজোড় করে বলল, "প্রহস্ত, এখন আমাদের একমাত্র ভরসা, রাক্ষসবীর সেনাপতি অকম্পন। যার ভয়ে দেবতারাও কম্পিত। সেই বীর অকম্পনকে এবার যুদ্ধে পাঠাও।"

সোনার রথে অকম্পন ক্রূর নিনাদে যুদ্ধ যাত্রা করল।...

ভয়ংকর সেই যুদ্ধ।...

চারিদিকে ধূলি উড়ছে।

কোলাহলে আর্তনাদে অস্ত্রের ঝনঝনায় বাতাস শিউরে উঠছে। অসংখ্য মৃতদেহ। রক্তপঙ্কে মৃত্যুর বিভীষিকা।

পরাজিত হয়ে বানরসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল। তখন অটল পর্বতের মতো হনুমান এসে সামনে দাঁড়ালেন। শোণিতাক্ত কলেবর মহাবীর হনুমান, অধূমক বহ্নির মতো দীপ্যমান। তিনি এক বিশাল শিলা উৎপাটন করে নিক্ষেপ করলেন। অর্ধচন্দ্র বাণে অকম্পন তা খণ্ড খণ্ড করে দিল। তখন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে এক বৃহৎ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উৎপাটন করে হনুমান সবেগে নিক্ষেপ করলেন। সেই আঘাতে অকম্পনের মস্তক চূর্ণ হয়ে গেল।

হনুমানের সেই ভীষণ সংহারী মূর্তি দেখে রাক্ষসেরা প্রাণভয়ে বারবার পিছনের দিকে তাকাতে তাকাতে পালাতে লাগল।

বিজয়ী হনুমানকে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ সকলে এসে অভিনন্দিত করলেন।

এদিকে হতগর্ব উদ্‌ভ্রান্ত রাবণ বিমর্ষ হয়ে বলল, "প্রহস্ত, লঙ্কা আজ বিপন্ন। একমাত্র আমি কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ আর তুমি তাকে রক্ষা করতে পারো। প্রথমে তুমিই শত্রুকে ধ্বংস করো।"

—"মহারাজ, আপনাকে আগেই বলেছিলাম, সীতাকে রামের হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই মঙ্গল। নইলে ঘোর যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু এখন আর কোনো প্রতিকার নেই। এতকাল আপনার কাছে অনেক দান মান সম্মান পেয়েছি। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাই আপনার হিতকার্য অবশ্যই করব। আপনি দেখবেন, কেমন করে আমি যুদ্ধে প্রাণ দিই।"

প্রহস্ত তখন গজসমাকুল ব্যূহবদ্ধ বিপুল সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করল।...

রণভেরী বেজে উঠল।

ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো উদ্‌বেল রণভূমি। রক্তে লাল মরণনদী তরঙ্গ-উথল। সেই রক্তের স্রোতে মৎস্য মকরের মতো ভাসছে যত ছিন্নশির। মৃতের আলুলায়িত কেশপাশ যেন ভাসমান শৈবাল। তার মধ্যে উড়ছে যত রক্তচক্ষু গৃধ্র ও কঙ্ক, নদীর বুকে যেন হংস ও সারস। ভয়ংকরী মৃত্যুর সেই কল্লোলিনী রূপ দেখে ভীরুর মন আঁতকে ওঠে।

> শোণিতৌঘমহাতোয়াং যমসাগরগামিনীম্।
> ভিন্নকায়শিরোমীনামঙ্গাবয়বশাদ্বলাম্।
> গধ্র-হংসবরাকীর্ণাং কঙ্ক সারসসেবিতাম্।
> মেদফেনসমাকীর্ণামাবর্তস্তনিতনিঃস্বনাম্॥
> তাং কাপুরুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৫৮/২৯-৩২)

প্রহস্তের প্রধান চার সচিব নরান্তক কুম্ভহনু মহানাদ ও সমুন্নত পরপর নিহত হল। ওদিকে নীলের আক্রমণে প্রহস্ত বিচলিত। তার ধনু ছিন্ন, রথ ও অশ্ব বিনষ্ট, ভগ্নরথ থেকে নেমে প্রহস্ত তখন মুষল হস্তে যুদ্ধ করতে লাগল। মুষলের আঘাতে নীলের ললাট দিয়ে রক্ত ঝরছে। রুধিরাপ্লুত আহত নীল তখন একটা প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করে প্রহস্তের মস্তক চূর্ণ করে দিলেন।

রাক্ষসেরা বিতাড়িত হয়ে লঙ্কাপুরীতে পালিয়ে গেল।

ক্রোধে শোকে ব্যাকুল হয়ে রাবণ বলল, "না, আর এই শত্রুকে অবজ্ঞা করা চলে না। আমি যুদ্ধে যাব। দাবানল যেমন অরণ্যকে দগ্ধ করে তেমনি করে আমি রাম লক্ষ্মণকে দগ্ধ করব।"

ঘোর রণবাদ্য বেজে উঠল।...

যুদ্ধক্ষেত্রে বিভীষণ রামকে বললেন, "মহারাজ, ওই দেখুন ভীমকায় রক্তবদন হস্তী আরূঢ় রাক্ষস অতিকায়। তার পাশে সিংহধ্বজ রথে দীপ্তধনু কুমার ইন্দ্রজিৎ। আর বৃষরাজের উপর উপবিষ্ট শাণিতশূল চন্দ্রকান্তি ওই ত্রিশিরা। তার অদূরে নাগকেতু কৃষ্ণকায় কপাটবক্ষ কুম্ভ ও পিশাচ। তাদের মাঝখানে ভূতগণবেষ্টিত রুদ্রের মতো সূর্যপ্রভ ওই রাক্ষসরাজ রাবণ।"

রাম বললেন, "অহো, রাক্ষসরাজ বড় তেজসম্পন্ন। এমন আদিত্যতুল্য তেজ কোনো দেবতা বা দানবের দেখিনি। আর আমার ক্রোধবর্ষণ করে প্রতিশোধ গ্রহণের দিন।"

সুগ্রীব রাবণকে আক্রমণ করলেন, "বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর বাণে রাবণ সুগ্রীবের দেহ

বিদীর্ণ করল। সুগ্রীব আর্তনাদ করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাকে ধরাশায়ী দেখে সুষেণ নল গয় ও গবাক্ষ একসঙ্গে আক্রমণ করলেন। কিন্তু রাবণের শরাঘাতে তাঁরা আহত ও বিতাড়িত হয়ে পিছিয়ে গেলেন।

কাতারে কাতারে বানরসেনা নিহত হচ্ছে। তখন হনুমান রাবণের সম্মুখে এসে গর্জন করে বললেন, "রাক্ষস, এই দেখ আমার দক্ষিণ হস্ত। এই হস্তে আমি তোমার প্রাণ হরণ করব। ব্রহ্মার বরে তুমি দেবতা ও দানবের অবধ্য হলেও জানবে বানরগণ থেকে তোমার ভয় আছে।"

রাবণ হনুমানের বক্ষে সশব্দে এক চপেটাঘাত করল; হনুমান বিচলিত হলেন। পরক্ষণেই ভীমবিক্রমে রাবণের বক্ষে হানলেন এক মুষ্টাঘাত। সেই আঘাতে রাবণ ভূকম্পে বিচলিত পর্বতের মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

হনুমানকে সাহায্য করতে নীল এসে রাবণকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু রাবণের অগ্নিবাণে নীল অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

রাবণ এবার সরোষে অগ্রসর হল লক্ষ্মণের দিকে। ব্রহ্মবাণে লক্ষ্মণের ললাট বিদ্ধ করল। লক্ষ্মণ তবু অটল। অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে রাবণকে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। রাবণেব ধনু ছিন্ন করে তিন বাণে তার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। ক্রুদ্ধ রাবণ তখন ব্রহ্মার শক্তিপূত মহাস্ত্র নিক্ষেপ করল। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অচৈতন্য লক্ষ্মণকে বন্দি করে লঙ্কায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে দেখে হঠাৎ ঝড়ের মতো এলেন হনুমান। রাবণের বক্ষে এক বজ্রমুষ্টিপ্রহার করলেন। রাবণ তৎক্ষণাৎ ঘূর্ণিত দেহে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। তার চোখমুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে!...

হনুমান আহত লক্ষ্মণকে শীঘ্র রামের কাছে নিয়ে গেলেন। একটু পরে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

হনুমান রামকে বললেন, "গরুড়পৃষ্ঠে বিষ্ণুর ন্যায় তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করে যুদ্ধ করো।"

চক্রধারী বিষ্ণুর মতো তখন রাম রাবণের সম্মুখে এসে বললেন, "রাক্ষস শার্দুল, দাঁড়াও, আজ তোমার রক্ষা নেই, তুমি লক্ষ্মণকে আহত করেছ। আজ তোমাকে সবংশে নিধন করব।"

রাম তাঁর দিব্য ধনুতে টংকার দিলেন।

রাবণ হনুমানকে পীড়িত করতে লাগল। তখন ইন্দ্র যেমন মরুপর্বতকে বিদীর্ণ করেছিলেন, তেমনি রাম তাঁর বজ্রবাণে রাবণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন।

রাবণ ক্রমশ হতবল শিথিল হয়ে কাঁপতে লাগল। তার হাত থেকে ধনু স্খলিত হয়ে পড়ল।

রাম অর্ধচন্দ্র বাণে রাবণের কিরীট ছেদন করলেন।

পরাজিত রাবণ ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষ দেহে বিবশ হয়ে পড়ল।

রাম বললেন, "রাক্ষসরাজ, তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও মুমূর্ষু। আমি রণক্লান্ত শত্রুকে বধ করি না। যাও, লঙ্কায় ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। পরে আবার পূর্ণোদ্যমে ফিরে এসো। তখন শক্তির পরীক্ষা হবে।"

নিশ্চিত জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে শত্রুর প্রতি রামের এই ক্ষমা আমাদের বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে। রামের শৌর্যের চেয়ে তাঁর এই ঔদার্য আরও মহৎ। পৃথিবীর সকল মহাকাব্যের নায়কই বীর, কিন্তু রামের মতো এমন ধীর ও উদার কেউ নন।

রাবণ অশ্বসারথিহীন ছিন্নধনু ভগ্নকিরীট লাঞ্ছিতকীর্তি। রক্তাক্ত দেহে হতমান নতমুখে সে তখন লঙ্কায় ফিরে গেল।

একত্রিশ

রাবণের আকার ও বিকার

রাবণ চরিত্রের ভিতরে আদিকবি মধু আর গরল, অমৃত আর হলাহল একসঙ্গে ঢেলে মন্থন করেছেন। পাপে-পুণ্যে মেশা সে এক বিষামৃতকুম্ভ। এত পাপের মধ্যে এতখানি মহিমা, এমন বিরোধের বৈপরীত্যের সমাহাব আর কোথাও নেই। সোনার থালায় যেন দানবের ভোগ। যেন এক তীব্র মাদক বিষ।

রাবণকে প্রথমে দেখে হনুমান তো রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, "কি আশ্চর্য মহৎ রূপ, মহৎ ধৈর্য, মহৎ পরাক্রম, সর্বলক্ষণযুক্ত কি আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের প্রভা!"

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥

(সুন্দরকাণ্ড, ৪৯/১৭)

"যদি তার চরিত্রে এমন উৎকট পাপ প্রবল হয়ে না উঠত তাহলে সে ইন্দ্রের মতো স্বর্গের দেবতাদের রাজা হতে পারত।"

যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥

(সুন্দরকাণ্ড, ৪৯/১৮)

রামচন্দ্রও রাবণকে প্রথমে দেখে বিস্মিত হয়ে যান, "এমন সূর্যপ্রভ তেজপুঞ্জরূপ কোনো দেবতা অথবা দানবের হয় না।

আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি রাবণঃ।
ন ব্যক্তং লক্ষয়ে হ্যস্য রূপং তেজঃসমাবৃতম্॥
দেব-দানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৫৯/২৭-২৮)

কবি বাল্মীকিও রাবণের বর্ণনা দিতে বলেছেন, সে যেন "সোনার বেদিতে ঘৃতাগ্নি সমুজ্জ্বল যজ্ঞাগ্নির মতো—রুক্মবেদিগতং প্রাজ্যং জ্বলন্ত মিব পাবকম্।" (অরণ্যকাণ্ড, ৩২/৫)। রাবণকে কবি "মহাত্মা" পর্যন্ত বলেছেন—"স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা" (যুদ্ধকাণ্ড, ৫৯/৩৩)। তাকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট স্বয়ং ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করেছেন—"স্বয়ম্ভুবং ইবাসনস্থম্" (যুদ্ধকাণ্ড, ৬২/৪)। হনুমানও বলেছেন, "কৃতবান্ মহাত্মা লঙ্কেশ্বরঃ" (সুন্দরকাণ্ড, ৯/৭৩)।

বস্তুত রাবণকে দেখে যেমন আমাদের ভয় হয়, তেমনি তার বিপুল মহিমা ও গুণরাশি দেখে বিস্ময় জাগে।

প্রথমত রাবণ একজন বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিত্য সে বেদমন্ত্র পাঠ ও অগ্নিহোত্র করে। একদিন প্রভাতে বিভীষণ রাবণের কাছে গিয়েছেন, আমরা দেখি, রাবণ তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাবৃত হয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করছে (যুদ্ধকাণ্ড, ১০/৮-১০)। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়েও দেখি চিতায় সজ্জিত করে দেওয়া হয়েছে তার যত যজ্ঞের উপাচার—অরণি, মুষল, উলূখল, অগ্নিহোত্রপাত্র, ইত্যাদি (যুদ্ধকাণ্ড, ১১১/১১৫-১৬)।

বিভীষণ বলেছেন, "রাবণ বেদান্তবিদ্ অগ্নিহোত্রী মহাতপস্বী, যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদনে শূরশ্রেষ্ঠ।"

এষোঽহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০৯/২৩)

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর শোকাহত রাবণ যখন খড়্গ নিয়ে সীতাকে বধ করতে ছুটে যাচ্ছে, তখন তার মন্ত্রী সুপার্শ্ব তাকে নিবৃত্ত করে বলছে, "আপনি যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করেছেন, গুরুগৃহ থেকে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেছেন, নিয়মানুসারে সমাবর্তন করে স্নাতক হয়েছেন, আপনি কর্মজ্ঞ, আপনি কেন নারীহত্যা করতে যাচ্ছেন?"

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বরঃ।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৯২/৬৪)

বিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মপরিনিষ্ঠিতঃ
অনেকগুণসম্পন্নঃ—(অধ্যাত্মরামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১০/৬৬-৬৭)

বলরাম দাস কৃত রামায়ণে বলা হয়েছে, রাবণ বৈদিকমন্ত্র সম্পাদন করে বেদের এক নতুন শাখা প্রবর্তন করেন।

ড. যোগীরাজ বসু লিখেছেন, "মল্লারি, দৈবজ্ঞ, সূর্যপণ্ডিত প্রভৃতি বেদশাস্ত্র নিষ্ণাত পণ্ডিতদের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ভারতবর্ষে রাবণ নামে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। হল (Hall) নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইতিমধ্যে ঋগ্বেদের উপর রাবণভাষ্যের যে যে অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।... জনশ্রুতি মতে যজুর্বেদের উপরও রাবণ ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। তিনি ঋক্সংহিতার একটি পদপাঠও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু মাত্র সপ্তম অষ্টকের পদপাঠের কতিপয় পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। বহুস্থানে তিনি প্রচলিত পদপাঠ পরিহার করিয়া নিজের সম্মত পদপাঠ দিয়াছেন। উদ্গীথ এবং দুর্গাচার্য রাবণকৃত পদপাঠ সমর্থন করিয়াছেন।

"প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের বহু বেদবিদ্বান মনে করেন ঋক্সংহিতা ও যজুঃসংহিতার উপর রাবণের সমগ্র ভাষ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে অধ্যাত্মভাবনিষ্ঠ বহু সূক্তের অর্থোদ্ধার সহজ হইবে।" ('বেদের পরিচয়', ১৯৮০, পৃ. ১৪৮)

যদিও এই বেদভাষ্যকার রাবণ আর রামায়ণের লঙ্কেশ্বর রাবণ এক ব্যক্তি কিনা এ

নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়নি। তবে লঙ্কায় যে বেদপাঠ, যাগযজ্ঞ, মন্দিরে-মন্দিরে হোম আরতি হত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হনুমান পেয়েছিলেন লঙ্কায় প্রথম রাতে প্রবেশ করেই।

স্বামী অপূর্বানন্দ তার "দিব্য রামায়ণ"-এ (৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩০৬) বলেছেন, "তিনি (রাবণ) একজন বিশিষ্ট বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন। সংহিতা পাঠ, পদ পাঠ, ক্রম পাঠ, মালা পাঠ, জটা পাঠ, ঘন পাঠ, রথ পাঠ ইত্যাদি দশ প্রকার বেদ পাঠ তিনি জানতেন এবং সেই জন্যই তার নাম দশানন বা দশ মুখ। আমরা শুনেছি যে রাবণ রচিত 'পদপাঠ' ও ঋগ্বেদের ভাষ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে। তিনি বিশিষ্ট বেদজ্ঞ ছিলেন এবং কারো মতে বেদবিভাগ প্রথম রাবণই করেন। রাবণ রচিত বৈশেষিক ভাষ্যের উদ্ধৃতি কোনো কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায়।"

রাবণ ও রাক্ষসগণের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার যে অভাব ছিল না, একথা স্বয়ং রামচন্দ্রও স্বীকার করেছেন—"রাক্ষসঃ পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি" (যুদ্ধকাণ্ড, ১৮/১৩)।

ব্রহ্মপুরাণে (১৪৩ অধ্যায়ে) বলা হয়েছে, ব্রহ্মা রাবণকে এক অষ্টোত্তরশতশিবনাম মন্ত্র প্রদান করেন। রাবণ রচিত বহু শিবস্তোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মাদ্রাজ ক্যাটলগের ১০৯১৩ এবং ১১১৪১-৪৪ নম্বর স্তোত্রগুলি যে রাবণ রচিত শিবস্তোত্র একথা ড. কামিল বুল্কে তার গ্রন্থে পরিষ্কার বলেছেন। (দ্রষ্টব্য : 'রামকথা', তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৪৩)

রাবণ যে অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল তার উল্লেখ আছে স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বর খণ্ড, ৮ম্ অধ্যায়) এবং পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ২৬৯ অধ্যায়), রাবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে বর দান করেন। এবং তাঁর চন্দ্রহাস নামে দীপ্ত খড়্গ দান করেন।

সত্যোপাখ্যানে (উত্তরার্ধ, ৩য় সর্গ) রাবণমন্ত্রী প্রহস্ত বলছে, শিবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই রাবণ জনকের রাজসভায় হরধনু ভঙ্গের প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি।

পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড, ১১২ অধ্যায়ে) শুক্রাচার্য বলছেন, লঙ্কার প্রবেশদ্বারে 'দারুপঞ্চবক্ত্র' বিচ্ছিন্ন না করলে রাবণ বধ হবে না—"এতেন বিচ্ছিন্নেন রাবণো হন্যতে"— এই কথা শুনে রাম বাণ নিক্ষেপ করে ওই পঞ্চবক্ত্র নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। ওই দারুপঞ্চবক্ত্র হল রুদ্রের প্রতীক। কাঠের নির্মিত কীর্তিমুখ। [দ্রষ্টব্য : পুরাণম্ (বারাণসী) দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৯৭-১০৬]

কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দেখি, পার্বতী শিবকে বলছেন, তাঁর ভক্ত রাবণকে রক্ষা করতে—

ধনে-প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে আছ হে স্থির বুঝিতে না পারি॥
আপনার মাথা কেটে আপনার করে।
দুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে॥
আর কোন সেবক লইবে তব ছায়া।
সেবক রাবণে তব নাহি কিছু দয়া॥

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, "হরপার্বতী কোঁদল")

দশাবতার চবিত ও রঘুবংশে (১০/৪১) বলা হয়েছে, রাবণ ঘোর তপস্যা করে একে একে তার নয়টি মাথা কেটে শিবের চরণে আহুতি দেয়।

বাল্মীকি রামায়ণে বিভীষণ তাই বলছেন, "রাবণ তপস্যায় ও শৌর্যে এক বিরাট মহীরুহ—স্তপোবলঃ শৌর্যনিবদ্ধমূলঃ রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ"—(যুদ্ধকাণ্ড, ১০৯/৯)

"উৎসাহে পরাক্রম সে এক জ্বলন্ত অর্চি। নিঃশ্বাসে ধূম। বাহুবলে অগ্নির দাহিকাশক্তি। রাবণ প্রতাপবান এক মহাহুতাশন।"

পবাক্রমোৎসাহবিজৃম্ভিতার্চি
নিঃশ্বাসধূম স্ববলপ্রতাপঃ।
প্রতাপবান্ রাক্ষসাগ্নি"...

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০৯/১১)

কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, এমন যে বেদজ্ঞ রাবণ তাব এই আশ্চর্য তেজ বীবত্ব শ্রুতি মেধা তপস্যা সত্ত্বেও এত নীচ এত হীন এত পাপাশয় হয়ে উঠল কেমন করে? এত গুণ ও মহিমার মধ্যে এমন বিকার ও বিকৃতি প্রবেশ করল কী করে?

বস্তুত চরিত্রের সকল গুণ ও গৌরবের যে আশ্রয, যে স্থিতি, যে মূল ভিত্তি, রাবণের সেই স্বভাবের গঠনপ্রকৃতিতেই রয়েছে কোথাও একটা ভয়ানক দোষ বা বিকার। দূষিত পাত্রে দুগ্ধ বাখলে তা যেমন কেটে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি রাবণের সকল গুণ ও ধর্ম তার জন্মগত আসুরিক স্বভাবদোষে এমন বিপরীত উৎকট হয়ে উঠেছিল।

নইলে স্বাধ্যায় তপস্যা তো দেবতারও আছে, অসুরেরও আছে। বরং দেবতার চেয়ে অসুরের তপস্যা অনেক বেশি। তবু গুণের দিক থেকে স্বভাবতই দেবতা হলেন দেবতা, আর অসুর অসুব।

যেমন একই গুরুর কাছে একই বিদ্যা লাভ করেছিলেন ইন্দ্র এবং বিরোচন। কিন্তু অসুর বিরোচনের স্বভাবদোষে সেই দৈবী বিদ্যা হযে গেল বিপবীত। বিরোচনেব সেই বিকৃত বিদ্যাকে প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন, "আসুরী উপনিষদ"। এই বিদ্যা যে অনুসরণ করবে সে বিনষ্ট হবে—"তে পরাভবিষ্যন্তীতি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮/৮/৪)।

স্বভাবের ধারা, জীবনের নিয়তি, অন্তরাত্মার গতি স্থির হয়ে যায় জন্ম থেকেই। রাবণের আর দোষ কি! তার মাতা রাক্ষস সুমালির কন্যা কৈকসী। পিতার ইচ্ছায় কৈকসী মনে মনে কামভাব নিয়ে বিশ্রবা মুনির কাছে যায়। তখন ভরসন্ধ্যা, তপস্বীর অগ্নিহোত্রের সময়। মুনি ধ্যানযোগে তার মনের বাসনা বুঝতে পেরে বললেন, "ভদ্রে, এই দারুণ বেলায় অসময়ে তুমি কামাসক্ত হয়ে মত্ত মাতঙ্গিনীর মতো আমার কাছে এসেছ, তাই তোমার পুত্র হবে নিদারুণ স্বভাব ক্রূরকর্মা ভয়ংকর রাক্ষস।"

সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি।
দারুণায়াস্তু বেলায়াং যস্মাত্ত্বং মামুপস্থিতা॥
শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি।
দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্।
প্রসবিষ্যসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রূরকর্মণঃ॥

(উত্তরকাণ্ড, ৯/২২-২৪)

কৈকসী শুধু যে দারুণ বেলায় কামার্ত হয়ে এসেছিল তাই নয়, তার মনে ছিল আরও একটা গোপন ঈর্ষা। ঈর্ষা তার সপত্নিপুত্র বৈশ্রবণের প্রতি। রূপে গুণে ধর্মে বৈশ্রবণ তখন দেবতা। সে ধনপতি কুবের। সুরলোকের দিক্‌পাল। পুষ্পক বিমানে স্বর্গে বিহার করে।

কৈকসী একদিন রাবণকে বলল, "তোমার ভাই বৈশ্রবণকে দেখ, কি তার তেজ ও বিক্রম। তার তুলনায় তুমি কি?"

মাতার এই তিরস্কারে রাবণের মনে এল তীব্র ক্ষোভ আর দুঃখ। ("অমর্ষমতুলং লেভে"—৭/৯/৪৪)। সে প্রতিজ্ঞা করল, "মা, তোমার মন থেকে এই মনস্তাপ দূর করে দাও। আমি শপথ করে বলছি, শৌর্যে পরাক্রমে আমি ভ্রাতা বৈশ্রবণের তুল্য কিংবা অধিক হব।"

সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোঽধিকোঽপি বা।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্‌গতম॥

(উত্তরকাণ্ড, ৯/৪৫)

এমনি করে করে রাক্ষসী কাম আর আসূর্যা ঈর্ষার মধ্যেই রাবণের জন্ম। তবু সে ভ্রাতা বৈশ্রবণের সঙ্গে প্রথমে কোনো শত্রুতা করতে চায়নি।

রাবণ কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার বর লাভ করেছে। ত্রিভুবনে দেব দানব গন্ধর্বের কাছে সে অজেয়। তাই শুনে মাতামহ সুমালি এসে তাকে উত্তেজিত করল, "লঙ্কা থেকে বৈশ্রবণকে বিতাড়িত করো। আমাদের রাক্ষসকুলের হৃতরাজ্য উদ্ধার করো।"

রাবণ বলল, "ধনেশ্বর কুবের আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, গুরুজন। তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করা উচিত হবে না।"

বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।

(উত্তরকাণ্ড, ১১/১১)

তখন প্রহস্ত নানাভাবে রাবণকে উত্তেজিত করে তার গর্ব ও অহংকারকে স্ফীত করে তুলল।

শেষে একদিন রাবণ প্রহস্তকে দূত করে বৈশ্রবণের কাছে পাঠাল। দাবি করল, "লঙ্কারাজ্য আমাদের দিয়ে দাও।"

শুনে কুবের বলল, "বেশ তো, বড় ভাইয়ের সম্পত্তিতে ছোট ভাইয়ের সমান অধিকার। তোমরাও লঙ্কায় এসে থাকো।"

এই বলে কুবের গেলেন পিতা বিশ্রবার কাছে। বিশ্রবা মুনি বললেন, "হাঁ, দশগ্রীব আমার কাছেও এসেছিল। আমি তার প্রস্তাব শুনে ভর্ৎসনা করেছি। বলেছি, এমন করলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্মতি। আমার শাপে সে ক্রূর রাক্ষস প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে। তারপরে ব্রহ্মার বর লাভ করে সে আরও মদমত্ত হয়ে উঠেছে। সে কাউকেই সম্মান করে না। তাই তোমাকে বলছি, বৎস, দুষ্টের থেকে দূরে থাকাই উচিত। তুমি লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে গিয়ে বাস করো।" (উত্তরকাণ্ড, ১২/৩৮-৪৫)

তবু কুবের কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের প্রতি স্নেহপ্রবণই ছিলেন। যখন রাবণের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্যোগ করছেন, এই সংবাদ পেয়ে কুবের দূত পাঠিয়ে রাবণকে সাবধান করে দেন। কিন্তু উদ্ধত রাবণ কুবেরের প্রেরিত দূতকে

হত্যা করে। কুবেরকে আক্রমণ করে তাঁর পুষ্পক বিমান অপহরণ করে নেয়। কুবেরের ভ্রাতৃহিতৈষণার প্রতিদানে রাবণের এই আচরণ রাক্ষসোচিতই বটে।

এইভাবে ক্রমে রাবণ ভ্রাতৃবিরোধ থেকে দৈববিরোধে উগ্রচণ্ড হয়ে উঠল। কৈকসীর রাক্ষসী কাম, আসুরী ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতর মাতৃভর্ৎসনা রাবণকে পরিণামে এমন দুর্মদ ও ঈর্ষান্ধ করে তুলল। তার রাক্ষস স্বভাবের মধ্যে বিষ সঞ্চারিত হল।

তার স্বাধ্যায় তপস্যাও আর অবিকৃত থাকল না। তার কাছে বেদ অধ্যয়ন যাগযজ্ঞ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিনিশ্চয়ে অধ্যাত্মজীবনের লক্ষ্য হয়ে রইল না। যজ্ঞ তার কাছে শুধু ইষ্টপূর্তি। বেদ আর তার কাছে সত্য ও ধর্ম নয়, বেদ হল তার কাছে কাম। রাবণের জীবনে বেদ হয়ে গেল "আসুরী উপনিষদ্"।

বেদজ্ঞ রাবণের এই বিকারের দিক্‌টা কবি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন কুম্ভকর্ণের সঙ্গে রাবণের কথোপকথনে।

কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলছে, "ধর্ম অর্থ কাম এই তিনের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ। তাই অর্থ ও কামকে উপেক্ষা করে ধর্মের সেবা করা উচিত। একথা আমি জ্ঞানীদের কাছে শুনেছি। কিন্তু যে রাজা একথা বোঝেন না, কিংবা বুঝেও বুঝতে চান না, তার সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যর্থ।"

ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজমাত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/১০)

"যে রাজা পশুবুদ্ধিসম্পন্ন, যার সঙ্গে মিলেছে যত সব অনভিজ্ঞ মন্ত্রী, সে কখনো শাস্ত্রের অর্থ বোঝে না। তার বাক্য শুধু প্রগলভ ধৃষ্টতা।"

অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান পুরুষাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগলভ্যাদ্ বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিস্বভ্যন্তরীকৃতাঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/১৪)

কুম্ভকর্ণের এই কথার উত্তরে রাবণের মন্ত্রী মহোদর তখন উঠে দাঁড়িয়ে রাবণের জীবনাদর্শ কি তার ব্যাখ্যা করতে লাগল। বেদকে শাস্ত্রকে রাবণ কী চোখে দেখেছে, কী আদর্শে তা গ্রহণ করেছে, তার শাস্ত্রজ্ঞানের সেই উৎকট বিকার এখানে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

মহোদর বলছে, "রাজা নীতি অনীতি জানেন না এমন নয়! তুমি নির্লজ্জ বালকের মতো কথা বলছ। তোমার বুদ্ধি সাধারণ মানুষের মতো। ধর্ম অর্থ কামের তত্ত্ব তোমার বোঝার শক্তি নেই। অববোদ্ধুং স্বভাবেন নহি লক্ষণমস্তি তান্।" (যুদ্ধকাণ্ড, ৬৪/১-৬)

"রাজা কামরূপী পুরুষার্থকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আর শুধু কর্ম দিয়েই কামনা চরিতার্থ হয়। তাঁর এই মত আমরাও সমর্থন করি।"

কর্মাণ্যপি তু কল্যাণি লভতে কামমাস্থিতঃ।
তব ক্লৃপ্তমিদং রাজ্ঞা হৃদি কার্যং মতঞ্চ নঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৬৪/৯-১০)

"নিষ্কাম ধর্ম, চিত্তশুদ্ধি, মোক্ষলাভ এসব ইহজীবনে সদ্য সদ্য লাভ হয় না। তার জন্য

পরলোকের অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু কর্ম ও কাম আশুফলপ্রদ। তার জন্য কালান্তর বা লোকান্তরের অপেক্ষা করতে হয় না। অতএব কামই শ্রেষ্ঠ। জীবনে সুখভোগই পরম। সুখের সাধনভূত যে ত্রিবর্গ তার প্রযোজক হল কর্ম। এবং কামই কর্মের লক্ষ্য।" (যুদ্ধকাণ্ড, ৬৪/৭-৮)

মহোদরের এই বক্তৃতা বাবণ এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে কুম্ভকর্ণকে বলল, "তুমি মাননীয় গুরু ও আচার্যেব মতো আমাকে অত কি উপদেশ দিচ্ছ? এত বাক্যশ্রমে কাজ কি? স্বীকার করছি, আমি ভুল করে মোহেব বশে, গায়ের জোরে তোমাদের উপদেশ গ্রহণ করিনি। কিন্তু সেকথা বারবার বলে লাভ কি? যা হবার তা হয়ে গেছে, সেজন্য দুঃখ করে কি হবে। এখন যা করণীয় তাই করো। আমার দুনীর্তিজনিত দোষ তুমি নিজের বিক্রমে সংশোধন করে নাও। আমার প্রতি যদি তোমাব স্নেহ থাকে তাহলে আমার বিপদ নিবারণ কবো। অসহায় বিপন্ন স্বজনকে যে সাহায্য করে সেই তো বন্ধু।" (যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/২৩-২৮)

রাবণের এই অসহায় করুণ আবেদনে কুম্ভকর্ণ স্নেহে আকুল হয়ে বলল, "রাজা, দুঃখ করো না। শান্ত হও। আমি বেঁচে থাকতে তোমায় পরিতাপ করতে হবে না। আজই আমি যুদ্ধযাত্রা করে লঙ্কার বিপদ দূর করব। তোমার শত্রু নাশ করব। জানবে আমি ক্রুদ্ধ হলে দেবতারা ধবাশায়ী হয়। ইন্দ্র যম অগ্নি বায়ু সকলকে বিতাড়িত করব। আমি সমুদ্র পান করব। দেবেন্দ্র বধ করব। সূর্য নক্ষত্রসহ সমস্ত আকাশমণ্ডল ভূপাতিত করব।"।

আদিত্যং পাতযিষ্যামি সনক্ষত্রং মহীতলে।
শতক্রতুং বধিষ্যামি পাস্যামি বরুণালয়ম॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/৫৪)

তখন রাবণ কুম্ভকর্ণকে আলিঙ্গন করে নিজের হাতে তাকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দিল। রত্নমণিহার, কেয়ূর, কুণ্ডল, অঙ্গদ অঙ্গুরীয়, কটিসূত্র আর কনককবচে ভূষিত কুম্ভকর্ণ যেন সন্ধ্যার মেঘরঞ্জিত গিবিরাজ—"ররাজ ~ন্ধ্যাভ্রসংবীত ইবাদ্রিরাজঃ"।

রাবণকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করে শঙ্খদুন্দুভিধ্বনিতে সমাদৃত হয়ে কুম্ভকর্ণ তখন যুদ্ধযাত্রা কবল। তাঁর পিছনে শত শাণিত শূল, মুষল খড়্গ কুঠার ভিন্দিপাল নিয়ে অসংখ্য রাক্ষস। কুম্ভকর্ণের ক্রুব নিনাদে সমুদ্র প্রতিধ্বনিত, পর্বত কম্পিত। দিবাভাগে সূর্য নিষ্প্রভ। রক্তমেঘে অশুভ ছায়া। কুম্ভকর্ণের হস্তধৃত শূলের উপবে হঠাৎ শকুনি এসে পতিত হল। চাবিদিকে তার অমঙ্গল শিবাধ্বনি।.

শূলপাণি ভীমাক্ষ মহাবল কুম্ভকর্ণ চলেছে। যেন সর্বসংহারকারী প্রলয়রূপী মহাকাল। জ্বলন্ত গ্রহের মতো তার দুই চক্ষু। বিদ্যুৎজড়িত মেঘের ন্যায় তার বর্ণ। মুকুটধারী পর্বতাকার বিরাট শরীর। প্রদীপ্ত সূর্যের মতো তেজ। তাকে দেখেই দলে দলে বানরসেনারা পলায়ন কবতে লাগল।

রামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আকাশের ভয়ংকর কেতুর মতো মূর্তিমান ও কে? রাক্ষস না অসুর? আমি এমন প্রাণী কোনোদিন দেখিনি। ন ময়ৈবংবিধং ভূতং দৃষ্টপূর্বং কদাচন।"

—"মহারাজ ইনি দেবেন্দ্রবিজয়ী মহাশূর কুম্ভকর্ণ। একে দেখেই বানরসেনারা ভয়ে

পালাচ্ছে। সৈন্যদের আশ্বস্ত করবার জন্য শীঘ্র প্রচার করে দিন, ও রাক্ষস নয়, ও একটা বিভীষিকা, যন্ত্রদানব মাত্র।"

তখন অঙ্গদ চিৎকার করে ঘোষণা করতে লাগল, "বীব সেনাপতিগণ, তোমরা ভয় পেয়ে পলায়ন কোরো না। ফিরে এসো। ভয় নেই। ও বাক্ষস নয়। ওর যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। ও একটা যন্ত্রদানব। একটা বিকট বিভীষিকা। নিবর্তধ্বং.. নালং যুদ্ধায বৈ রক্ষো মহতীয়ং বিভীষিকা।"

সুগ্রীব একটা পর্বত উত্তোলন করে কুম্ভকর্ণের বক্ষে আঘাত করলেন। কিন্তু তার অটল বক্ষে প্রতিহত হয়ে সেই পর্বত চূর্ণ হয়ে গেল। তখন কুম্ভকর্ণ একটা শূল হস্তে সুগ্রীবকে বধ করতে ছুটে এল। এক লম্ফে হনুমান এসে সেই শূল ভেঙে ফেললেন। পরক্ষণেই কুম্ভকর্ণের প্রচণ্ড আঘাতে সুগ্রীব মূর্ছিত। আর হনুমান শূলবিদ্ধ হয়ে রক্তবমন করতে লাগলেন। তখন ঋষভ নীল গবাক্ষ ছুটে এল। কুম্ভকর্ণ তাদেব একে একে বাহু মুষ্টি পদাঘাতে দলিত করে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো অগ্রসর হতে লাগল।

লক্ষ্মণ তার সম্মুখে এসে বাধা দিলেন। সপ্তশরে কুম্ভকর্ণের দেহ বিদ্ধ কবে বাণ নিক্ষেপ কবতে লাগলেন। কুম্ভকর্ণের কবচ বিদীর্ণ। তবু সে মেঘাবৃত সূর্যের মতো অবজ্ঞাব সঙ্গে বলল, " সৌমিত্রি, আমি যুদ্ধে যমরাজকেও পরাস্ত কবেছি। তুমি যে নির্ভযে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করেছ, এতেই তোমার বীরত্বেব প্রশংসা কবি। তুমি বালক, কিন্তু তোমার বলবীর্য দেখে আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু আমাব প্রতিযোদ্ধা তুমি নও, বাম। অনুমতি দাও। আমি রামেব কাছে যাব।"

লক্ষ্মণেব বাধা অতিক্রম করে কুম্ভকর্ণ ধরিত্রী কাঁপিয়ে রামেব দিকে অগ্রসব হল।

রাম রৌদ্র অস্ত্রে তার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। কুম্ভকর্ণের মুখ দিয়ে রক্ত আর অগ্নি নির্গত হতে লাগল। রাম বায়ব্য অস্ত্রে তার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করলেন। তখন সে বাম হস্তে একটা বিশাল তালবৃক্ষ উৎপাটন কবে রামের দিকে ধাবিত হল। বাম ঐন্দ্র অস্ত্রে তাব অপর বাহু ও পদদ্বয় ছেদন করলেন। ছিন্ন পদ ছিন্ন বাহু রক্তাক্ত কুম্ভকর্ণ তখন অবলুণ্ঠিত হয়ে বড়বানলেব মতো মুখ ব্যাদান করে চন্দ্রের প্রতি রাহুগ্রাসের মতো রামেব দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এবাব রাম তাঁর সুবর্ণপুঙ্খ সূর্যতুল্য বজ্রবাণ নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তেমনি রামের সেই বজ্রাগ্নিবাণ গিয়ে কুম্ভকর্ণের চঞ্চল কুণ্ডলশোভিত গিরিশৃঙ্গতুল্য বিবৃতদন্ত বিশাল মস্তক ছেদন করল। কুম্ভকর্ণের ছিন্নশির গিয়ে পড়ল লঙ্কার মন্দির তোরণে। মন্দিরের গোপুরম্ সশব্দে ভেঙে পড়ল। আর তার বিশাল দেহ পতিত হল সমুদ্রে।

কুম্ভকর্ণেব পতনে পৃথিবী পর্বত কম্পিত হল। অন্তরিক্ষে দাড়িয়ে দেবতা ঋষি গন্ধর্বগণ হর্ষচিত্তে স্বস্তিমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।...

দুঃসংবাদ শুনে রাবণ শোকে মূর্ছিত। রাজসভায় ক্রন্দনের রোল উঠল। সংজ্ঞালাভ করে রাবণ বিলাপ করতে লাগল, "হা কুম্ভকর্ণ, শত্রুদর্পহারী মহাবল তুমি। ইন্দ্রেব বজ্র যমের দণ্ড যার কাছে পরাভূত সেই বীর তুমি, শেষে রামেব বাণে নিহত হলে? স্বর্গে দুন্দুভি বাজছে। দেবতারা হর্ষান্বিত হয়েছে। বানব সেনারা কাতারে কাতারে লঙ্কায় প্রবেশ করছে। এ লজ্জা

এ অপমান নিয়ে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? রাজ্যে কি প্রয়োজন! সীতাকে নিয়েই বা কি কবব? অজ্ঞান মূঢ়চিত্ত আমি, বিভীষণের হিতবাক্য শুনিনি! ধার্মিক মহাত্মা বিভীষণকে আমি অপমান করে বিতাড়িত করেছি। তারই প্রতিফল আজ এই শোকাহত পরাজয়। আজ মনে পড়ে, বাজা অনরণ্যের অভিশাপ। ইক্ষ্বাকুবংশের রামের হাতে আমাব মৃত্যু। মনে পড়ে, ধর্ষিতা বেদবতীব অভিশাপ। সেই সাধ্বীই জনকনন্দিনী সীতা হয়ে জন্মেছেন। চোখের উপরে দেখতে পাচ্ছি, অপ্সরী রম্ভা আর পুঞ্জিকাস্থলীর ক্রুদ্ধ নয়নের অশ্রু। উমা নন্দীশ্বর আর ব্রহ্মার কোপ। তাঁরা যা বলেছেন তাই আজ ঘটতে চলেছে। ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না — ন মিথ্যা ঋষিভাষিতম্।"

তখন ইন্দ্রজিৎ বলল, "পিতা, আমি বেঁচে থাকতে আপনি শোক করবেন না। আমার পৌরুষেব শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, অদ্য রাম লক্ষ্মণকে আমি বধ করব।"

বত্রিশ

মেঘনাদ বধ

বিভীষণ এক জরুরি বার্তা নিয়ে রামের কাছ ছুটে এলেন। কিন্তু এসেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখেন রাম মূর্ছিত। পাশে হনুমান বজ্রাহত বৃক্ষের মতো নিশ্চল। বানরসেনারা মোহ্যমান। আর লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন করে শোকে দুঃখে উদ্ভ্রান্তের মতো বিলাপ করছেন, "রাঘব, কোথায় ধর্ম? জগতে ধর্ম বলে কিছু নেই। যদি সত্যিই ধর্ম থাকত তাহলে রাবণ নরকে যেত, আর আপনার জীবনে এত দুঃখ হত না। যারা ধার্মিক তারাই তো দেখি যত কষ্ট পায়। কেবল অধার্মিকেরই শ্রীবৃদ্ধি। ধর্ম-অধর্ম নিরর্থক শুধু কথার কথা। অথবা ধর্ম অক্ষম ক্লীব অচেতন। তার কোনো শক্তি নেই। ধর্ম শুধু অর্থ আর পৌরুষের দাস। যার অর্থ আছে, পৌরুষ আছে, জগতে সেই হল ভাগ্যবান বুদ্ধিমান গুণবান। তারই কাছে ভিড় করে যত বন্ধু আর সহায়। জানি না সেদিন কেন আপনার রাজ্যবিসর্জনের বুদ্ধি হল। কেন পিতার বাক্য রক্ষা করতে বনবাসী হলেন? রাক্ষস আপনার পত্নী অপহরণ করল। ইন্দ্রজিৎ আজ আপনাকে চরম দুঃখ দিল। রাঘব, আপনার পৌরুষ আর বীরত্ব নিয়ে উত্তিষ্ঠ হন। দুষ্টের শাস্তি বিধান করতে হবে। সমস্ত লঙ্কা আমরা ধ্বংস ও ভস্মীভূত করে দেব।"

অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্ম নিরর্থকঃ।।
যথাস্তি ন তথা ধর্মস্তেন নাস্তীতি মে মতিঃ।।
যদাধর্মো ভবেদ্ ভূতো রাবনো নরকং ব্রজেৎ।
ভবাংশ্চ ধর্মসংযুক্তো নৈব ব্যসনমাপ্নুযাৎ।।
যস্মাদর্থা বিবর্ধন্তে যেম্বধর্মঃ প্রতিষ্ঠিত।
ক্লিশ্যন্তে ধর্মশীলাশ্চ তস্মাদেতৌ নিরর্থকৌ।।
অথবা দুর্বলঃ ক্লীবো বলং ধর্মোঽনুবর্ততে।
দুর্বলো হৃতমর্যাদো ন সেব্য ইতি মে মতিঃ।।
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান।
যস্যার্থাঃ স মহাভাগো যস্যার্থাঃ গুণাধিকঃ।।
রাজ্যমুৎসৃজতা ধীর যেন বদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা।।
ত্বয়ি প্রব্রজিতে বীর গুরোশ্চ বচনে স্থিতে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা প্রাণৈঃ প্রিয়তরা তব।।

তদস্য বিপুলং বীর দুঃখমিন্দ্রজিতা কৃতম্।
কর্মণা ব্যপনেষ্যামি তস্মাদুত্তিষ্ঠ রাঘব।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮৩/১৪-৪২)

বিস্মিত হয়ে বিভীষণ জিজ্ঞাসা করেন, "কী হয়েছে? কিমেতৎ ইতি?"

লক্ষ্মণ বললেন, "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হনুমান দুঃসংবাদ এনেছেন। ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করেছে।"

শুনে দৃঢ় কণ্ঠে বিভীষণ বললেন, "অসম্ভব। এ হতে পারে না। রাবণের অভিপ্রায় আমি জানি। সে কখনও সীতাকে বধ করবে না। এ নিশ্চয় ইন্দ্রজিৎ তার রাক্ষসী মায়া দিয়ে বানরদের মোহিত করেছিল। ইন্দ্রজিৎ যাকে বধ করেছে সে সীতা নয়, জানবেন, রাক্ষসী প্রহেলিকা দিয়ে গড়া সে এক মায়াসীতা। অতএব আপনারা এই শোক, এই মিথ্যা মনস্তাপ দূর করে দিন। আমি এক জরুরি সংবাদ নিয়ে এসেছি। সেই মতো এখনই আমাদের তৎপর হতে হবে।"

বিভীষণ সংবাদ পেয়েছেন, ইন্দ্রজিৎ আজ নিকুম্ভিলা মন্দিরে হোম যজ্ঞের আয়োজন করেছে। পাছে তার যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাই সে মায়াসীতা বধ করে রামের সেনাশিবিরকে এমন স্তব্ধ করে দিয়েছে।

এই কদিনের যুদ্ধেই রাবণের রাজকোষ প্রায় শূন্য। তার সেনাবল নিঃশেষিত। লঙ্কায় এখন কেবল বালক ও বৃদ্ধ ছাড়া যুদ্ধ করার মতো কোনো বীর নেই।

দুঃখে হতাশায় রাবণ তাই আক্ষেপ করে বলেছে, "সর্বক্ষপিতকোশঞ্চ... লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতম্" (যুদ্ধকাণ্ড, ৬২/১৮)। রাবণ আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব — "রাজশেষা কৃতা লঙ্কা ক্ষীণঃ কোশো বলং হতাম্" (যুদ্ধকাণ্ড, ৬৫/৭)।

তাই রাবণের শেষ অবলম্বন এখন তার পুত্র মেঘনাদ। পরাক্রমে সে রাবণের চেয়ে শক্তিমান্ — "রাবণাদতিরিচ্যতে" (উত্তরকাণ্ড, ১/৩৮)। মেঘনাদ একবার দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করে লঙ্কার কারাগারে বন্দি করে রাখে। তখন ইন্দ্রকে মুক্ত করবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা এসে রাবণকে বলেছিলেন, "তোমার পুত্র বড় বীর্যবান। পরাক্রমে সে তোমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। জগতে সে ইন্দ্রজিৎ বলে খ্যাত হবে।

অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ বীর্যবান্।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি।।

(উত্তরকাণ্ড, ৩০/৫)

দলিত-নীল-অঞ্জরাশির মতো তার অঙ্গের কান্তি। পদ্মপলাশ দুই বিশাল নেত্র। নয়নপ্রান্ত ও ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ। কার্মুকধারী জ্বলন্তপৌরুষ মেঘনাদকে দেখে মনে হয় যেন স্বয়ং কালান্তক যম। পূর্ণিমা নিশীথে উদ্‌বেলিত সমুদ্রের মতো তার উচ্ছ্বাস বিক্রম।

শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো রাক্ষসাধিপতেঃ সুতঃ।
...মহাতেজা সমুদ্র ইব পর্বণি।।

(সুন্দরকাণ্ড, ৪৮/১৭)

পর্যন্তরক্তাক্ষো ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৪৫/১০)

স ভীমকার্মুকশরঃ কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমঃ।
রক্তাসানয়নো ভীমো বভৌ মৃত্যুরিবান্তকঃ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮৬/১৬)

এই মেঘনাদ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পৌরোহিত্যে সাতটি অতি দুর্লভ যজ্ঞ সম্পাদন করে — অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ বহুসুবর্ণক রাজসূয় গোমেধ বৈষ্ণব ও মাহেশ্বর যজ্ঞ। যজ্ঞে সিদ্ধ মেঘনাদকে মহাদেব বরদান করে তাকে অক্ষয় তূণ, দুর্জয় ধনু, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র ও তামসী মায়াবিদ্যা দান করেন।

কামগং স্যন্দনং দিব্যমন্তরিক্ষচরং ধ্রুবম্।
মায়াঞ্চ তমসীং নাম যয়া সম্পাদ্যতে তমঃ।।

(উত্তরকাণ্ড, ২৫/১০)

ইন্দ্রকে মুক্ত করার বিনিময়ে ব্রহ্মাও তাকে বর দান করেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে সে অগ্নিতে হোম আহুতি দিলে অগ্নিদেব তাকে এক অশ্বযোজিত রথ দান করবেন। সেই রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করলে মেঘনাদ সর্বজয়ী হবে। কিন্তু যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকলে সে অবশ্যই যুদ্ধে নিহত হবে। (উত্তরকাণ্ড, ৩০/১৪-১৬)

বিভীষণ বললেন, "মহারাজ, মেঘনাদ নিকুম্ভিলার মন্দিরে সেই ভীষণ যজ্ঞে বসেছে। যেমন করেই হোক তার এই যজ্ঞ পণ্ড করতেই হবে। নইলে আমাদের জয়ের কোনো আশা নেই। অনুমতি করুন, লক্ষ্মণ ও আমি সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গিয়ে মেঘনাদের যজ্ঞ ধ্বংস করে আসি। তাকে বধ করার এই একমাত্র সুযোগ। মেঘনাদ নিহত হলে জানবেন রাবণও নিহত হয়েছে। হতে তস্মিন হতং বিদ্ধি রাবণং।" (যুদ্ধকাণ্ড, ৮৫/১৬)

লঙ্কার পশ্চিম দিকের এলাকার নাম নিকুম্ভিলা। সেখানে এক বিশাল বটগাছের তলায় বিরাট এক মন্দির। রাক্ষস রাবণের আরাধ্যা দেবী ভদ্রকালীর নিত্য পূজা হয় সেই মন্দিরে। শত যূপে পরিব্যাপ্ত সুন্দর সেই দেবালয়। (উত্তরকাণ্ড, ২৫ সর্গ)

রাবণ কি তবে শিবভক্ত কালী উপাসক বামাচারী তান্ত্রিক? তার পরিধানে রক্তবস্ত্র, গলায় রক্তকরবীর মালা, ললাটে রক্ততিলক—"রক্তবাসাঃ পিবন্মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ রক্তমাল্যানুলেপনঃ" (সুন্দরকাণ্ড, ২৭/২৩-২৪) — রাবণের এই তান্ত্রিক বেশ দেখে তো তাই মনে হয়। তার উৎকট কামগ প্রবৃত্তি এবং কদর্য কাম ও ইন্দ্রিয় আসক্তি দেখে তাকে একজন সাধনভ্রষ্ট অভিচারী তান্ত্রিক বলেই তো মনে হয়। তার যত বৈদিক যাগযজ্ঞ, সম্ভবত সেসব হল অথর্ব বেদের নানা মারণ উচাটন ও অভিচার মন্ত্রেরই প্রয়োগ মাত্র।

অথর্ববেদে তন্ত্রবিহিত অনেক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াপদ্ধতি আছে। বেদেরই একটি তন্ত্রশাখা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। তান্ত্রিক পরিভাষায় বিন্ধ্যপর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতকে বলা হয় "অশ্বক্রান্তা দেশ"। 'শক্তিসঙ্গম' তন্ত্রে ভারতবর্ষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে — "অশ্বক্রান্তো রথক্রান্তো বিষ্ণুক্রান্তো বসুন্ধরে"। আবার তন্ত্রের অনেক

দেবদেবীর পূজার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীর উপাসনারও মিল রয়েছে। লঙ্কায তাই আজও পর্যন্ত শুদ্ধ বৈদিক আচারের পরিবর্তে তন্ত্রপ্রভাবিত বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রভাব।

যাই হোক, নিকুম্ভিলার মন্দিরে মেঘনাদ যজ্ঞে বসেছে। তার পরিধানে মৃগচর্ম। কমণ্ডলু শিখা ধ্বজাধারী মেঘনাদকে অতি ভয়ংকর দেখাচ্ছে। তার যজ্ঞ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয সেজন্য অগণিত রাক্ষস সৈন্য মন্দিরের চারিদিকে পাহারা দিচ্ছে।...

এমন সময় হঠাৎ অতর্কিতে লক্ষ্মণ ওই মন্দির আক্রমণ করলেন। দুর্ধর্ষ বানর সেনার হাতে কাতারে কাতারে রাক্ষসেরা প্রাণ হারাতে লাগল। যুদ্ধের তুমুল শব্দে মন্দির প্রাঙ্গন কাঁপতে লাগল।

রাক্ষসসৈন্য বিমর্দিত হচ্ছে দেখে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখে উঠে দাঁড়াল। নীলাঞ্জন মেঘবর্ণদেহ কার্মুকধারী মেঘনাদ উগ্র রোষে মৃত্যুর মতো ভয়ংকর।

তাকে দেখে বিভীষণ বললেন, "ওই যে বাসববিজয়ী মেঘনাদ যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখে উঠে এসেছে। আর বিলম্ব নয়, লক্ষ্মণ, শীঘ্র বাণ নিক্ষেপ করুন। মন্দিরের অদূরে ওই যে ভীমদর্শন অন্ধকার বিরাট এক বটবৃক্ষ দেখতে পাচ্ছেন, সাবধান, মেঘনাদ যেন কিছুতেই ওই বৃক্ষতলে যেতে না পারে। ভূতসিদ্ধ ওই বটবৃক্ষ। ওই বৃক্ষতলে দাঁড়িয়েই মেঘনাদ মারণ উচাটন মন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে শত্রুকে বধ এবং বন্ধন করে। ওই সিদ্ধবটের কাছে যাওয়ার আগেই ওকে বধ করতে হবে।"

নীলজীমূতসঙ্কাশং ন্যগ্রোধং ভীমদর্শনম্।
ইহোপহারং ভূতানাং বলবান রাবণাত্মজঃ।
উপহৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ততে।।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি রাক্ষসঃ।
নিহন্তি সমরে শত্রূন বধ্নাতি চ শরোত্তমৈঃ।।
তমপ্রবিষ্টং ন্যগ্রোধং [illegible]নং রাবণাত্মজম্।
বিধ্বংসয শরৈর্দীপ্তৈঃ সরথং সাশ্বসারথিম্।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭/৩-৬)

বিভীষণকে দেখে ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "কনিষ্ঠ তাত, একি দুর্বুদ্ধি তোমার। তুমি আমাদের বংশেই জন্ম গ্রহণ করে এই বংশেই বড় হয়ে উঠেছ, তুমি আমার পিতার ভ্রাতা, আমার পিতৃব্য, আমি তোমার পুত্রতুল্য। আমার প্রতি তুমি কেন এই শত্রুতা করছ? তুমি আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে শত্রুর হীন দাসত্ব করছ? তোমার কি কুলগৌরব নেই? আত্মমর্যাদা ধর্ম জ্ঞান নেই? তুমি কি জান না, গুণবান শত্রুর চেয়ে গুণহীন স্বজন অনেক শ্রেষ্ঠ? শত্রু যে সে তো চিরকালই শত্রু। তুমি আমাদের আত্মীয় হয়ে শত্রু লক্ষ্মণকে এখানে নিয়ে এসেছ আমাকে বধ করবার জন্য? তুমি নিষ্ঠুর, তুমি দুর্মতি।"

কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস।।
ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌন্দর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ।।
শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীযশ্চ সাধুভিঃ।

যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ।।
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ এব সঃ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭/১১-১৩, ১৫)

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের এই ধিক্কার আজও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আমরা সাধারণ মানুষ, আবেগ ও অভিমান চালিত জীব, ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝতে চাই না, সত্যের জ্বলন্ত নির্দেশ ধরতে পারি না, তাই বিভীষণ চিরকাল আমাদের কাছে হেয় এবং নিন্দিত। আমরা রাগে অভিমানে তাঁকে বলি "ঘরশত্রু বিভীষণ"।

কিন্তু ধর্ম প্রকৃত পক্ষে অন্তরাত্মার এক আলোক রেখার যাত্রাপথ। ধর্ম হল আত্মার নিঃশ্বাস। ধর্ম চলে হৃদয়ের পথ ধরে অন্ধকার থেকে আলোকে, মিথ্যা মোহ অজ্ঞান থেকে বৃহতের সত্যের জ্যোতিতে। আত্মীয় বলে বন্ধু বলে পিতা বা পুত্র বলে ধর্ম কাউকে ক্ষমা করে না। যা অমঙ্গল যা অকল্যাণ যা অধর্ম, পরম আত্মীয় হলেও ধর্ম তাকে ত্যাগ করে। শুধু ত্যাগ নয়, তাকে বিনাশ করে। ধর্ম তাই জ্বলন্ত আগুন।

বিভীষণকে আমরা বুঝতে পারব যদি তাঁকে দেখি রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের সুপ্রিয়ের হৃদয় দিয়ে। সুপ্রিয় তার প্রাণপ্রতিম বন্ধু ক্ষেমংকরের গুপ্ত রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিল রাজাকে জানিয়ে দিয়ে। ক্ষেমংকর হল বন্দি। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

তখন শৃঙ্খলিত ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে ক্রুদ্ধ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "সুপ্রিয়, বন্ধু তুমি?"

সুপ্রিয় উত্তরে বলল, চোখে তার জল,

"বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিঃশ্বাস—
প্রাণ সখে, ধর্ম সে আমার।"

যে ধার্মিক, যে সত্যের পথিক, ধর্মের জন্য সে সব ত্যাগ করবে। কেননা ধর্ম একটা অনড় স্থবির অচলায়তন নয়। ধর্ম চলমান সজীব সত্য। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়াই মানুষের ধর্ম।

তবে একই মানুষের মধ্যে আছে একাধিক ধর্মের বন্ধন। ব্যক্তি হিসেবে মানুষ যে স্তরে দাঁড়িয়ে সেই অনুসারে থাকে তার একটা ব্যক্তিগত ধর্ম। বংশ হিসাবেও থাকে তার একটা কুলধর্ম। জাতি হিসেবে জাতি ধর্ম, বর্ণ ও বৃত্তি অনুসারে তার বর্ণাশ্রম ধর্ম। আবার একটা বিশেষ যুগে বাস করে বলে তার থাকে একটা যুগধর্ম। এই সবকিছুর উপরে রয়েছে মানুষের অন্তরাত্মার এক সনাতন ধর্ম। এই ব্যক্তিধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম, যুগধর্ম প্রত্যেকে পরস্পরকে স্বীকার করবে। নইলে জীবনে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা বা ধর্মসংকট সৃষ্টি হবে। ক্ষুদ্রধর্মগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ধর্মগুলির অনুগত অংশ হিসেবে কাজ করবে। যদি তা না করে, যদি ধর্মবিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, ক্ষুদ্রধর্ম ত্যাগ করে বৃহৎ ধর্ম গ্রহণ করবে। এবং দরকার হলে সব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাতে শরণ নেবে। "সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ" (গীতা, ১৮/৬৬)

এই হচ্ছে ধর্মের সোপান।

মহাভারতে বিদুর বলেছেন. "কুলধর্ম রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে একজন মানুষকে ত্যাগ করবে। গ্রামকে রক্ষার জন্য কুলকে, দেশকে রক্ষাব জন্য গ্রামকে, এবং আত্মার কল্যাণের জন্য সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করবে।"

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৭/১৭)

ধর্ম মানে তাই ত্যাগ। প্রতিনিয়ত যা বর্জনীয় ধর্ম তাকে ত্যাগ করে চলেছে। ধর্ম কোথাও থেমে থাকে না। সে স্রোতের জল। তাই এমন স্বচ্ছ ও নির্মল। ধার্মিকও ওই স্রোতের জলের মতো। বালানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন, "বহতা পানি রমতা সাধু"। শুধু আত্মীয়তা বন্ধুত্ব বা স্নেহের দাবিতে তাকে ধরে রাখা যায় না। ধর্ম শুধু বাঁধা পড়েন সত্যে।

বিভীষণ ধার্মিক, তিনি রাবণেব ক্রূর অধার্মিক প্রকৃতিকে সংশোধন করতে অনেক চেষ্টা করেছেন। প্রতিবাদ করেছেন। অনুনয় করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেছে নিতে হল এক পক্ষ। কোন পক্ষ নেবেন তিনি? ধর্ম, না অধর্ম? সত্য, না মিথ্যা? সদাচার, না ব্যভিচার? ধর্মাত্মা বিভীষণ তাই ধর্মের পক্ষই নিয়েছেন।

ইন্দ্রজিতের ধিক্‌কারের উত্তরে বিভীষণ তাই বললেন, "যদিও আমি রাক্ষসকুলে জন্মেছি, তবু আমার স্বভাবধর্ম সে রকম নয়। মানুষের যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাই আমি আশ্রয় করেছি। যদি তোমার গৌরব থাকে, তাহলে তুমিও এই শত্রুভাব ত্যাগ করো।"

রাক্ষসেন্দ্রসুতাসাধো পারুষ্যং ত্যজ গৌরবাৎ।
কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রাক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্।।
গুণো যঃ প্রথমো নৃনাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭/১৯)

ধর্মেব পথে সে চলতে চায়, তার পক্ষে বিভীষণের মতো এই নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন কর্ম। ভীরুর দুর্বলের জন্য এপথ নয়। ধর্মকে লাভ করতে হলে আগে নিজের ভিতরে সকল দুর্বলতাকে শক্তির খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করতে হবে—"বজ্রং ঘনা দদীমহে" (ঋগ্বেদ ১/৮/৩)। এই শক্তির খড়্গ যে পায়নি, তার কাছে ধর্ম দূরের বস্তু। মানুষের অন্তরের এই ধর্ম ভয়ংকর পথবাহী—"যা যাতং রুদ্রবর্তনী" (ঋগ্বেদ ১/৩/৩)। যাঁরা এই পথ দিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা পথের আঁধার পার হয়েছেন বুকের রক্ত দিয়ে চোখের জলে।

তাই দেখি বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করবার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারছেন না। লক্ষ্মণকে বলছেন, "চোখের জলে আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে — মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি" (যুদ্ধকাণ্ড, ৮৯/১৮)। বিভীষণের হাতের ওই উদ্যত অস্ত্র, আর তাঁর চোখের জল, একই সঙ্গে তাঁর জীবনের দুঃখ ও গৌরব। ধর্মজীবনের শাশ্বত এক জীবন্ত আলেখ্য।...

লক্ষ্মণ তখন ধনুকে টংকার দিলেন।

বিষাক্ত সর্পের মতো তীক্ষ্ণ বাণ ছুটে চলল। শরজালে আচ্ছন্ন গগন। শরাঘাতে জর্জরিত ইন্দ্রজিতের স্বর্ণকবচ ছিন্ন হয়ে গেল। তার অশ্ব ও সারথি নিহত। সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

বিভীষণ বললেন, "লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে। তার চারিদিকে অমঙ্গলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আর বিলম্ব না করে অস্ত্র হানো।"

শুনে ক্রোধে তেজে জ্বলে উঠল ইন্দ্রজিৎ। দুর্মদ বিক্রমে সে লক্ষ্মণ হনুমান ও বিভীষণকে শত শত বাণে বিদ্ধ করতে লাগল।

তখন লক্ষ্মণ ধনুতে ঐন্দ্র অস্ত্র যোজনা করলেন।

মন্ত্রপূত বাণকে প্রণাম করে বললেন, "যদি দশরথের পুত্র রাম ধর্মাত্মা সত্যসন্ধ হন, যদি তিনি পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহলে হে ইন্দ্রবাণ, তুমি রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সংহার করো।"

ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৯০/৬৯)

বিদ্যুতের মতো আকাশ দিয়ে সেই ইন্দ্রবাণ ছুটে চলল।..

আর সহসা উজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিত ইন্দ্রজিতের মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হল। তার নিস্পন্দ দেহ শান্তরশ্মি দিবাকরের মতো, অথবা নির্বাপিত অগ্নির মতো নিথর হয়ে গেল।

শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৯০/৮২)

কবি এখানে মেঘনাদের সৌন্দর্য ও বীরত্বকে এমন এক সম্ভ্রান্ত মহিমা দান করেছেন যা অতুলনীয়। সংক্ষিপ্ত এই একটি চরণে মেঘনাদের মৃত্যুর বর্ণনায় যে গাম্ভীর্য যে শান্ত গরিমা ফুটে উঠেছে তা বিস্ময়কর। পরবর্তীকালের অন্যান্য রাম সাহিত্যে কবিত্বের এই সংযম ও শক্তির একান্ত অভাব দেখা যায়। শান্ত রসের উপরে বীরত্বের মহিমা স্থাপন না করে, সেখানে যত উৎকট বীভৎস রসের অবতারণা করা হয়েছে। ফলে মহাকাব্যের কাহিনির মধ্যে এসেছে একটা লঘু রুচির গ্রাম্য নাটকীয়তা। পাঠকের রসবোধ ও মূল্যবোধকে যা পীড়িত করে মাত্র। কম্বরামায়ণে (যুদ্ধকাণ্ড, ২৭ সর্গ) দেখানো হয়েছে, নিহত ইন্দ্রজিতের রক্তাক্ত ছিন্নশির অঙ্গদ তুলে নিয়ে গিয়ে রাখছেন রামের চরণে। আনন্দরামায়ণে আবার দেখানো হয়েছে, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের ডান হাত কেটে তার গৃহের অন্তঃপুরে নিক্ষেপ করছেন, আর তার বাম হাত কেটে রাবণের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। হনুমান ইন্দ্রজিতের ছিন্নশির নিয়ে গিয়ে রামকে দেখাচ্ছেন। এইসব নিষ্ঠুর বীভৎস দৃশ্য রাম লক্ষ্মণ হনুমান চরিত্রের মহত্ত্বকেই শুধু খর্ব করেছে। 'রামচন্দ্রিকা' ও 'মহানাটক' এর বর্ণনা অনুসারে আমরা আবার দেখি, লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিতের ছিন্নশির গিয়ে পতিত হচ্ছে সন্ধ্যাহ্নিকরত রাবণের কৃতাঞ্জলিতে।

আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন নিষ্ঠুর বীভৎস বর্ণনা বাল্মীকির রামায়ণে নেই। বাল্মীকির কবি প্রতিভা, তাঁর সংযম রুচি, এখানে দিব্য সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে রজতগিরিব ন্যায় উজ্জ্বল অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করে, বাল্মীকির রামায়ণে আমরা দেখি তারই শান্তসংযত কল্যাণময়ী রূপ।

তেত্রিশ

রাবণ বধ

মেঘনাদের মৃত্যুতে শোকার্ত রাবণের বুক হাহাকার করে উঠল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আজ তার কাছে শূন্য মনে হল। ক্রোধে যন্ত্রণায় তার চোখ ফেটে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। অশ্রু নয়, সে যেন দুটি জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে নিঃসৃত বিন্দু বিন্দু তপ্ত তৈলধারা। "দীপাভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সর্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ" (যুদ্ধকাণ্ড, ৯২/২৩)। ক্ষোভে দুঃখে তার মুখ দিয়ে ধূমাগ্নি নির্গত হচ্ছে। ভ্রূকুটি কুটিল ললাটে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঊর্মিরেখা। তার সেই ভয়ংকর দৃষ্টির সামনে ভয়ে কেউ দাঁড়াতে সাহস করছে না। মহাক্রোধে উন্মত্ত রাবণ প্রতিহিংসায় হিংস্র ব্যাঘ্রের মতো প্রদীপ্ত খড়্গ—"খড়্গ মাশু উদ্ধৃত্য বিমলাম্বরবর্চসম্" (যুদ্ধকাণ্ড, ৯২/৩৮)।

— "আমার সকল সর্বনাশের মূল ওই সীতাকে আজ আমি বধ করব।"

তখন মন্ত্রী সুপার্শ্ব ছুটে যায়। সকলে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে।

— "মহারাজ, এ কী করছেন। আপনি ধার্মিক দিক্পাল কুবেরের ভাই। আপনি বেদজ্ঞ ব্রহ্মচর্যব্রতস্নাত ব্রাহ্মণ। আপনি কেন তবে ধর্ম বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীহত্যা করতে যাচ্ছেন? আপনার এই ক্রোধ প্রকাশ করুন যুদ্ধক্ষেত্রে রামের বিরুদ্ধে। আজ কৃষ্ণাচতুর্দশী, আসুন, আগামীকাল অমাবস্যায় আমরা বিজয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।"

> অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
> কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৯২/৬৬)

সুপার্শ্বের কথায় রাবণ নিরস্ত হল।

সভা গৃহে ফিরে এসে হুংকার দিয়ে বলল, "আমি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেছি। ত্রিলোকবিজয়ী আমি রাবণ। ব্রহ্মার বরে আমি সুরাসুরের অবধ্য। ব্রহ্মাদত্ত আমার ধনু ও কবচ ধারণ করে আমি যদি সমরে দাঁড়াই তাহলে পুরন্দরও ভীত হয়। তোমরা শত তূর্যধ্বনি করে আমার সেই দুর্জয় ধনু নিয়ে এসো। প্রলয়সূর্যের মতো শত্রু নাশ করে আজ আমি লঙ্কার সমস্ত শোক মুছিয়ে দেব।"

পুরবাসীদের সকল ক্রন্দন বিলাপ স্তব্ধ করে আবার বেজে উঠল যুদ্ধভেরী। অবশিষ্ট যত রাক্ষসসেনা সজ্জিত হয়ে দাঁড়াল।...

রাবণ যুদ্ধযাত্রা করল।

কৃষ্ণবর্ণ অষ্টতুরঙ্গবাহী তার রথ। স্বর্ণকলস-ঘণ্টাসমাবৃত, রত্নস্তম্ভ সুশোভিত, নানা আয়ুধে

অলংকারে কিঙ্কিণীজালে সমাকীর্ণ, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন রাবণের সেই ভীম রথ। রথের মাথায় উড়ছে নরমুণ্ডলাঞ্ছিত ধ্বজাপতাকা।

গম্ভীর ঘোষে মেদিনী কাঁপিয়ে চলেছে রাবণের রথ। দেখে বানর সেনারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

কাতারে-কাতারে নিহত সৈন্য। ছিন্নভিন্ন শরদগ্ধ যত মৃতের স্তূপ। সমস্ত রণভূমি যেন ক্রুদ্ধ রুদ্রের ক্রীড়াভূমি। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার মতো রামের বীরত্ব সমস্ত রণক্ষেত্রকে আলোড়িত করে তুলল। অঙ্গদের হাতে নিহত হল মহাপার্শ্ব। সুগ্রীব বধ করলেন বিরূপাক্ষ ও মহোদরকে।

যুদ্ধের বিপর্যয় দেখে রাবণ বলল, "সারথি, আমার সকল অমাত্য আজ নিহত হল, আমার নগর প্রাসাদ শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে, আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র রথ ধাবিত করো রামের সম্মুখে। সীতা যার পুষ্প, বানর সেনারা যার শাখা প্রশাখা, সেই রাম-রূপ বৃক্ষকে আজ আমি সমরে উচ্ছিন্ন করব। শত্রু নাশ করে আমার সকল শোক প্রশমিত করব।"

উল্কার মতো ছুটে আসছে ওই রাবণের রথ।

মুক্ত আকাশের প্রেক্ষাপটে ধনুর্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন রাম আর লক্ষ্মণ, চিত্রিত আকাশপটে যেন বিষ্ণু ও বাসব।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা বিষ্ণুণা বাসবং যথা।
আলিখন্তমিবাকাশমবষ্টভ্য মহদ্ধনুঃ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৯৯/১২)

রামের প্রতি রাবণ তার মহাঘোর বাণ নিক্ষেপ করল। নিমেষের মধ্যে একটি ভল্লের আঘাতে রাম তা প্রতিহত করলেন। তখন রাবণ আসুর অস্ত্র হানল। রাম তাঁর পাবক অস্ত্রে তা খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। এবার রাবণের হাতে ঝলসে উঠল রৌদ্র অস্ত্র। ময়দানব নির্মিত সেই ভয়ংকর অস্ত্র থেকে প্রলয়ঝঞ্ঝার মতো নির্গত হতে লাগল বজ্র অশনি চক্র শূল মুষল মুদ্গর। রাম গান্ধর্ব অস্ত্রে তা প্রতিহত করলেন। রাবণ এবার ভীষণ সৌর অস্ত্র যোজনা করল। সেই অস্ত্র বিদীর্ণ হয়ে দীপ্ত নভোমণ্ডলে ধ্বংসকরাল শত শত কালচক্র চতুর্দিকে ধাবিত হল। রাম শরাঘাতে সেই মারণ চক্র ছেদন করলেন।

রাক্ষসের বীরত্ব আর দেবতার দীপ্ত মহিমা — আবর্তে সংবর্তে সে এক সংকুল যুদ্ধ। ত্রিলোককম্পিত এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

এমন সময় লক্ষ্মণ ক্ষিপ্র গতিতে এসে রাবণের ধ্বজা ও ধনু ছিন্ন করে তার সারথিকে নিহত করলেন। বিভীষণও এক লম্ফে এসে চকিতে রাবণের রথের অশ্ব বিনষ্ট করলেন।

রথভ্রষ্ট ছিন্নধনু রাবণ মাটিতে নেমে এসে মহাক্রোধে বিভীষণকে লক্ষ করে এক দারুণ শক্তি নিক্ষেপ করল। বিভীষণের প্রাণ সংশয় দেখে তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণ এসে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। শরাঘাতে রাবণের শক্তি ব্যর্থ করে দিলেন।

রাবণ বিস্মিত হয়ে সরোষে বলল, "তবে রে বলগর্বিত লক্ষ্মণ, বিভীষণকে রক্ষা করেছ, এবার নিজেকে রক্ষা কর।"

সিংহের মতো গর্জন করে রাবণ বাসুকির জিহ্বার মতো এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করল

লক্ষ্মণের বুকে। মহোল্কার মতো বজ্রনাদে সেই শক্তি পতিত হতে লাগল। দেখে রাম উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, "লক্ষ্মণের মঙ্গল হোক।" শক্তি তুমি ব্যর্থ হও। স্বস্ত্যস্তু লক্ষ্মণায়েতি মোঘা ভব হতোদ্যমা।" (যুদ্ধকাণ্ড, ১০০/৩৩)

শক্তিশেল এসে লক্ষ্মণের বুকে বিদ্ধ হল। অচৈতন্য রক্তাপ্লুত দেহে তিনি ভূতলে পতিত হলেন। বানরেরা লক্ষ্মণের বুক থেকে সেই শক্তিশেল উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তখন রাবণের শরবর্ষণ উপেক্ষা করে রাম দুই হাতে সেই শক্তি উৎপাটন করে ভেঙে ফেললেন। শোকাশ্রু সংবরণ করে সুগ্রীব ও হনুমানকে বললেন, "তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে থাকো। এখন বিষাদের সময় নয়। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত। আজ আমি এমন যুদ্ধ করব, যতদিন পৃথিবী থাকবে, দেবগণ ও নিখিল চরাচর এই যুদ্ধের কথা মনে রাখবেন। পৃথিবী আজ হয় রাবণহীন, না হয় রামহীন হবে।"

অদ্য কর্ম করিষ্যামি যল্লোকাঃ সচরাচরাঃ।
সদেবাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
সমাগম্য সদা লোকে যথা যুদ্ধং প্রবর্তিতম।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০০/৫৬)

অস্মিন্ মুহূর্তে ন চিরাৎ সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ।
অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০০/৪৮)

দুর্জয় বিক্রমে রাম বর্ষাধাবার মতো শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর ধনুকের টঙ্কারে অন্তরীক্ষ কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাণাগ্নির বহ্নিবিদ্যুতে রণভূমি দগ্ধ হচ্ছে।

নিপীড়িত রাবণ পরাজিত হয়ে ভয়ে রণস্থল থেকে পলায়ন করল।...

রাম তখন লক্ষ্মণের কাছে ছুটে এলেন।

মূর্ছিত রক্তাপ্লুত লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, "আর আমার যুদ্ধ করে কী হবে? কিসের জয় আমার? বেঁচে থেকেই বা কি করব? লক্ষ্মণ নিহত, আমার জীবনের চাঁদ ডুবে গেছে। ভাই আমার, বনবাসের সঙ্গী আমার, মৃত্যুলোকে আমি তোমার সাথী হব। দেশে দেশে পত্নী মেলে, বন্ধু মেলে, কিন্তু কোথায় পাব আমার সহোদর ভাই! মাতা সুমিত্রাকে আমি কী বলব? তুচ্ছ রাজ্য, মিথ্যা সংসার। আমি পূর্বজন্মে কি পাপ করেছি যে আজ আমাকে লক্ষ্মণের মৃত্যু দেখতে হল। হায় লক্ষ্মণ, আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করে চলে গেলে কেন?"

কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্যং ন বিদ্যতে।
যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমূর্ধনি লক্ষ্মণঃ।।
যথৈব মাং বনং যান্তমনুযাতি মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্।।
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।।

কিং নু রাজ্যেন দুর্ধর্ষ লক্ষ্মণেন বিনা মম।
কথং বক্ষ্যাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্।।
ইহৈব মরণং শ্রেয়ো ন তু বন্ধুবিগর্হণম্।
কিং মায়া দুষ্কৃতং কর্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০১/১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯)

তখন শোকার্ত রামকে আশ্বাস দিয়ে বৈদ্যরাজ সুষেণ বললেন, ''নরশার্দূল, আপনি শোক করবেন না। শান্ত হন। লক্ষ্মীমন্ত লক্ষ্মণ মরেননি। তিনি জীবিত আছেন। দেখুন, হৃদপিণ্ডে স্পন্দন রয়েছে। নিঃশ্বাস পড়ছে। করতল উষ্ণ। নেত্রতারকায় প্রাণের জ্যোতি। প্রসন্ন মুখমণ্ডল অবিকৃত রয়েছে। দেহবর্ণ নিষ্প্রভ হয়নি। কোথাও মৃত্যুর চিহ্ন নেই। মহারাজ, লক্ষ্মণ জীবিত।''

সুষেণ এবার ব্যস্ত হয়ে হনুমানকে বললেন, ''হে সাধো, জাম্ববান যে ওষধিপর্বতের কথা বলেছিলেন তার দক্ষিণ শিখরে বিশল্যকরণী সাবর্ণ্যকরণী সঞ্জীবনীকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার দিব্য মহৌষধি পাওয়া যায়। আপনি শীঘ্র গিয়ে নিয়ে আসুন। ওই ওষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠবেন।''

হনুমান আকাশপথে বায়ুবেগে ওষধিপর্বতে পৌঁছালেন। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট ওষধি চিনতে পারলেন না। বিলম্ব করলে বিপদ হতে পারে ভেবে হনুমান সমগ্র পর্বতের শৃঙ্গ উৎপাটন করে নিয়ে এলেন। তাঁর এই দুঃসাধ্য কার্যে সকলে বিস্মিত হলেন।

সুষেণ তাড়াতাড়ি ওষধি পেষণ করে লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করালেন। অচিরে লক্ষ্মণ বিশল্য ও সুস্থ হয়ে উঠলেন। বানরগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। রাম লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন, ''ভাগ্যক্রমে তোমাকে আজ জীবিত ফিরে পেলাম। নইলে এই যুদ্ধ, সীতা উদ্ধার, আমার জীবন, সব নিষ্ফল হয়ে যেত।''

রামকে এমন কাতর দেখে লক্ষ্মণ বললেন, ''রাঘব, আমার জন্য আপনার এই হতাশ দুর্বলের মতো কথা বলা সাজে না। প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না। আমি দেখতে চাই, আজ সূর্যাস্তের আগেই আপনি রাবণকে বধ করেছেন।''

অহং তু বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ।
যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্মা দিবাকরঃ।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০১/৫৫)

লক্ষ্মণের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহাভারতে অর্জুন কর্তৃক জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা। সংকটকালে রামায়ণ ও মহাভারতের বাণীবেগ এমনি করে এসে সম্মিলিত হয়।

রণস্থলে আবার এসেছে রাবণ।
আহত ভুজঙ্গের মতো তার রথের পতাকা ক্ষিপ্ত আক্রোশে হাওয়ায় উড়ছে।
রাবণ তার আসুর অস্ত্র প্রয়োগ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

রাবণ রথে আরূঢ়, কিন্তু রাম সামান্য পদাতিকের মতো ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন, এই দেখে স্বর্গের দেব গন্ধর্ব কিন্নবগণ ব্যথিত হলেন। তাঁরা বিমর্ষ হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং রামের জন্য তাঁর নিজের রথ ও সারথিকে প্রেরণ করলেন।

প্রভাত সূর্যের মতো অরুণবর্ণ সেই রথ। হরিদ্বর্ণ অশ্ব যোজিত, সুবর্ণচিত্রিত, বৈদুর্যময় হেমজালভূষিত, কাঞ্চনপীড়শোভিত, স্বর্ণময় ধ্বজা কুবর সমন্বিত। ইন্দ্রেব সেই দিব্যরথ নিয়ে এলেন সাবাথি মাতলি। রথের উপর বিজয় পতাকা মন্দাকিনীর শীতল সমীরণে উড্ডীন।

"তমাধূতধ্বজপটং ব্যোম-গঙ্গোর্মিবায়ুভিঃ।"

(রঘুবংশ, ১২/৮৫)

মাতলি বললেন, "অবিন্দম, আপনার জন্য দেবরাজ এই বিজয়রথ পাঠিয়েছেন। তার সঙ্গে দিয়েছেন ইন্দ্রধনু অগ্নিকবচ আদিত্যতুল্য শর, আর বিমলা শক্তি। আপনি রথে আরোহণ করে রাবণকে বধ করুন।"

রাম ইন্দ্রেব রথকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে আরোহণ করলেন।

শুরু হল ঘোর যুদ্ধ।

রাবণের যত দৈব ও গান্ধর্ব অস্ত্র রামের সর্প ও গরুড় অস্ত্রে একে একে নিষ্ফল হয়ে গেল। কিন্তু অকস্মাৎ সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে এল। ম্লান বিবর্ণ সূর্যের চারিদিকে কৃষ্ণমণ্ডল। ধূসর আকাশে ধূমকেতু আর কবন্ধ ছায়া। অন্তরিক্ষে অশুভ গ্রহের গ্রাস। বুধগ্রহ রোহিণীকে আক্রমণ করেছে। মঙ্গল গ্রহের দ্বারা ইক্ষ্বাকুবংশের নক্ষত্র বিশাখা গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। রাবণের আক্রমণে রাম বিচলিত। দেখে দেবগণ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। রাবণকে মনে হচ্ছে যেন অগ্নিবর্ষী মৈনাক পর্বত। সে অষ্টঘণ্টাযুক্ত এক মহাশূল নিক্ষেপ করল। কিন্তু রাম ইন্দ্রদত্ত বিমলা শক্তি দিয়ে সেই শূল খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "রাক্ষসাধম, দুর্মতি, জনস্থানে আমার অসহায় ভার্যাকে চোরের মতো হরণ করেছিলি, এই তো তোর বীরত্ব। আজ তোকে যমালয়ে পাঠাব।"

বিপুল বিক্রমে রাম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। রামের তেজ বল ও ক্ষিপ্রতা দ্বিগুণ হল।

রাবণ ক্রমশ হীনবল নিস্তেজ হয়ে তাব রথেব মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু রণক্লান্ত শত্রুকে রাম কখনও অস্ত্রাঘাত করেন না। তাই তিনি আক্রমণে বিবত হয়ে অস্ত্র সংবরণ করলেন।

মূর্ছিত রাবণকে নিয়ে তার সাবথি তখন রথ ছুটিয়ে রণস্থল থেকে পলায়ন করল।...

কিছুক্ষণ পরে রাবণ সংজ্ঞা লাভ করে ক্রুদ্ধ হয়ে সারথিকে বলল, "ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বুদ্ধি, যুদ্ধস্থল থেকে রথ নিয়ে পালিয়ে এসেছ কেন? আমার মান যশ তেজ বীর্য নষ্ট করে শত্রুব কাছে আমাকে এমন করে অপদস্ত করলে কেন? নিশ্চয় শত্রু তোমাকে উৎকোচ দিয়ে বশ করেছে। অকৃতজ্ঞ অধম, শীঘ্র রথ ফেরাও। আমাকে আবার যুদ্ধে নিয়ে চলো।"

মহারাজ, আমি ভয়ে উৎকোচে কিংবা বিভ্রান্ত হয়ে একাজ করিনি। দেখলাম আপনি রণক্লান্ত। রথের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অশ্বগুলিও অত্যন্ত শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত। তাছাড়া চারিদিকে অশুভ দুর্নিমিত্ত। তাই সারথির কর্তব্য হিসাবে আপনার হিতের জন্য এই অপ্রিয়

কাজ করেছি। কেননা দেশ কাল শুভাশুভ বিচার করে, যুদ্ধের গতি ও শত্রুর দুর্বলতা বুঝে, সারথির জানা উচিত কোথায় কার কাছে কখন রথ ধাবিত করতে হবে। আবার কখনই বা পলায়ন করতে হবে। মহারাজ আমি কোনো অন্যায় করিনি।"

রাবণ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে সারথিকে তার হস্তাভরণ পারিতোষিক দিয়ে আদেশ করল, "চল, যুদ্ধে নিয়ে চল। আজ আমি শত্রু বধ না করে ফিরব না।"

রাবণ কৃতসংকল্প হয়ে যুদ্ধে আসছে। এদিকে রাম সমরে পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত। তাই দেখে ঋষি অগস্ত্য এসে রামকে বললেন, "হে মহাবাহো, শত্রু জয়ের এক অমোঘ মন্ত্র তোমাকে দান করছি। এই আদিত্য হৃদয় মন্ত্র তিনবার জপ করে যুদ্ধ কর। তোমার জয় নিশ্চিত।"

রামচন্দ্র রথ হতে অবতরণ করে আচমন শুদ্ধ হয়ে মন্ত্র জপ করলেন। আদিত্যদেব তাঁকে বরাভয় দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি এবার রাবণ বধে ত্বরান্বিত হও (ত্বরেতি)।"

মনে পড়ে মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্কালেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়েছিলেন এক সর্বজয়ী মন্ত্র— দুর্গাস্তোত্র। "পরাজয়ায় শত্রুণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়" (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ২৩/২)। কেননা মন্ত্রই হল দেবতার শক্তিরূপ। দেবতাদের মন্ত্রময় শরীর। মহাভারতের দুর্গাস্তোত্র আর রামায়ণের আদিত্য-হৃদয় মন্ত্র স্বরূপত একই শক্তি। সকল দেবতার তেজোরাশি সংহত হয়ে আবির্ভূতা হন স্বয়ং দুর্গা। সুতরাং দুর্গা হলেন দেবতাদের হৃদ্‌শক্তি। আবার দেবতারা অদিতির পুত্র। তাঁদের সাধারণ নাম আদিত্য। বিভিন্ন দেবতা একই দেবতার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ — "একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। ঋষি কাত্যায়ন তাঁর 'সর্বানুক্রমণী' গ্রন্থে বলেছেন, "একৈব দেবতা স্তূয়তে আদিত্য ইতি"। সুতরাং মহাভারতের দুর্গাস্তোত্র আর রামায়ণের আদিত্য-হৃদয় মন্ত্র মূলত এক —

> সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।...
> জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্যাশ্বায় নমো নমঃ।।
> নমো নমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমো নমঃ।।
>
> (যুদ্ধকাণ্ড, ১০৫/৭, ১৭)

আবার শুরু হল তুমুল যুদ্ধ।

সমুদ্র দুলছে। আকাশ কাঁপছে। পৃথিবী টলছে। অন্তরিক্ষবায়ু যেন রুদ্ধশ্বাস। উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছেন দেবতারা। গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মহর্ষিগণ রামের জয় প্রার্থনা করছেন।

হঠাৎ লঙ্কার আকাশে সূর্যের আলো রক্তজবার মতো লাল হয়ে গেল। রাবণের চোখে সূর্যরশ্মি তাম্র পীত শ্বেত কৃষ্ণ নানা বর্ণে ঝলসে উঠছে। রাবণ যেখানেই পা রাখছে সেখানেই মেদিনী কম্পিত হয়ে বিদীর্ণ হচ্ছে। অগ্নিশিখার মতো দমকা বাতাস এসে তার দৃষ্টি অন্ধ করে দিচ্ছে। তার রথের অশ্ব শ্রান্ত হয়ে অশ্রু ও স্বেদ মোচন করছে। সারথি বিপন্ন দৃষ্টি নিয়ে অতিকষ্টে রথ চালনা করছে। মনে হয় কে যেন তার হাতদুটি টেনে ধরেছে (গৃহীতা ইব বাহবঃ)।

রাম তীক্ষ্ণ শরে রাবণের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, যতবার মুণ্ডচ্ছেদ করছেন, ততবারই ছিন্নমস্তক রাবণ নূতন মস্তক নিয়ে অট্টহাস্য করছে।

তখন বিভীষণ ছুটে এসে বললেন, "মহারাজ, ব্রহ্মার বরে রাবণের নাভিতে এক অমৃতকুণ্ডল আছে। সেই নাভিকুণ্ডল ছেদন না করলে রাবণ বধ হবে না।"

নাভিদেশেঽমৃতং তস্য কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্।।
তচ্ছোষযানলাস্ত্রেণ তস্য মৃত্যুস্ততো ভবেৎ।

(অধ্যাত্মরামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ১১/৫৩-৫৪)

সারথি মাতলি বললেন, "অরিন্দম, আপনি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে রাবণকে বধ করুন।"

বিসৃজাস্মৈ বধায় ত্বমস্ত্রং পৈতামহং প্রভো।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০৮/২)

রাম তখন বজ্রসার ভয়ংকর ব্রহ্মাস্ত্র তুলে নিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের বেগে রয়েছেন বায়ু, ফলকে অগ্নি ও সূর্য, সর্বাঙ্গে ব্রহ্মা আর গৌরবে ও গুরুত্বে মেরু ও মন্দর।

যস্য বাজেষু পবনঃ ফলে পাবকঃ ভাস্করৌ।
শরীরমাকোশময়ং গৌরবে মেরু-মন্দরৌ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০৮/৬)

বেদমন্ত্র অভিমন্ত্রিত করে রাম এবার সেই মহাবাণ নিক্ষেপ করলেন। তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত পর্বতের মতো রাবণের মৃতদেহ রথ থেকে ভূতলে পতিত হল।

বানরসেনার তুমুল জয়ধ্বনি।

আকাশে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল।

দিব্যগন্ধ সুখস্পর্শ মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হল।

রাবণ নিহত হয়েছে দেখে লঙ্কার অন্তঃপুরে শোক ও হাহাকার উঠল। বিভীষণও ভ্রাতার মৃত্যুতে মুহ্যমান। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে রাম বললেন, "রাবণ বীরের মতো সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তার জন্য শোক করা উচিত নয়। আমাদের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এখন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করো। মরণের পরে আর কোনো শত্রুতা থাকে না। রাবণ যেমন তোমার স্বজন, তেমনি এখন সে আমারও।"

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০৯/২৫)

রাবণকে বধ করে রামের যে মহত্ত্ব, তার চেয়েও মহত্তম হল রামের এই উক্তি, মরণের পরে রাবণ আর তাঁর শত্রু নয়, সে এখন তাঁর মিত্রসম। রামের এই দেবত্ব তাঁর আপন বীরত্বকেও ম্লান করে দিয়েছে।

চৌত্রিশ

লঙ্কাজয়—আত্মজয়

যুদ্ধ শেষ হল।

মৃত্যু ও বিভীষিকার সংঘর্ষ পার হয়ে দীর্ঘদিন পরে আবার জেগে উঠেছে সমুদ্রস্নাত লঙ্কা। কিন্তু এই যুদ্ধ যে কতদিন ধরে চলেছিল বাল্মীকির রামায়ণে তা স্পষ্ট করে বলা নেই। হয়তো কবি বলতে চেয়েছেন, এ যুদ্ধের কোনো শুরু বা শেষ নেই। সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষের জীবনের অন্তরে ও বাহিরে চলেছে চিরন্তন এই সংগ্রাম। বৈদিক ঋষিদের জ্ঞানদৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে, শাশ্বত সত্যের আলোকের দেবত্বের সঙ্গে মিথ্যার বিভেদের অন্ধকারের এক আসুরিক শক্তির দ্বন্দ্ব। জীবনের সেই আধ্যাত্মিক সংঘাতকেই রামায়ণের কবি মানুষের বুদ্ধির নীতির প্রাণের জগতে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন রাম রাবণের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই মাত্রা নিয়ে রামায়ণের গল্পের ভিতর দিয়ে বরাবর সমান্তরালে চলেছে। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থ বলেছেন, "It takes there in the figure of the story a double form of a personal and political struggle... It is the old struggle of Deva and Asura, God and Titan, but represented in the terms of human life." (*The Foundations of Indian Culture*, 1959, pp. 328-29)

তথাপি বাল্মীকির কবিকল্পনা তীব্র বেগে আকাশ বিহার করে চললেও, একই সঙ্গে তা আবার বাস্তব জীবনের মাটিকেও স্পর্শ করে গেছে। তাই মহাকবির গমনপথের সেই চরণরেখার চিহ্ন অনুসরণ করা অসম্ভব নয়।

অদ্ভুতরামায়ণে তিথি নক্ষত্রের একটা হিসাব করে বলা হয়েছে, রাম রাবণের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে। আর শেষ হয়েছে চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে। অর্থাৎ দুই মাস পনেরো দিন ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল।

মনে হয় এই হিসেবের মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল আছে। কেননা সুন্দরকাণ্ডে হনুমান যখন সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় এসে অশোকবনে সীতার সঙ্গে দেখা করেন, তখন সীতা তাঁকে বলেছিলেন, রাবণ এক বৎসর অপেক্ষা করবে বলে কথা দিয়েছে। সেই এক বৎসরের মধ্যে দশ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। আর মাত্র দুই মাস বাকি। কিন্তু সীতা রাবণকে আর ওই দুই মাস সময় দিতে চান না। তিনি হনুমানকে বলেছিলেন, "আমি শপথ করে বলছি, আর এক মাস মাত্র আমি বেঁচে থাকব। এক মাস পরে আর আমি বাঁচব না। তুমি দাশরথিকে বলো, আমাকে যেন তিনি এই সময়ের মধ্যেই উদ্ধার করেন।"

জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।।
ঊর্ধ্বংমাসান্ন জীবেয়ং সত্যেনাহং ব্রবীমি তে।
রাবণেনোপরুদ্ধাং মাং...

(সুন্দরকাণ্ড, ৩৮/৬৪-৬৫)

সুতরাং নিশ্চয় করে বলা যায়, যুদ্ধ এক মাসের কম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়।

তাছাড়া অদ্ভুতরামায়ণের হিসেবে আরও সন্দেহ জাগে এই কারণে যে, সেখানে বলা হয়েছে, লক্ষ্মণের সঙ্গে মেঘনাদের যুদ্ধ চলেছিল ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত — অর্থাৎ ছয় দিন ধরে।

অথচ বাল্মীকি রামায়ণে আমরা দেখি মেঘনাদের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধ চলেছিল মাত্র তিন দিন। মেঘনাদ বধ করে লক্ষ্মণ এসে যখন রামকে প্রণাম করছেন, তখন রাম সস্নেহে তাঁকে আলিঙ্গন করে বলছেন, "লক্ষ্মণ, আজ আমি নিজেকে জয়ী মনে করছি। তোমরা তিন দিন তিন রাত্রি যুদ্ধ করে মেঘনাদকে নিপাতিত করেছ।"

অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্ বিনিপাতিতঃ।
নিরমিত্রঃ কতোহস্মাদ্য নির্যাস্যতি হি রাবণঃ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ৯১/১৬)

অদ্ভুতরামায়ণের হিসাব মতো লক্ষ্মণের শক্তিশেল থেকে বাঁচানোর জন্য হনুমান ওষধিপর্বত থেকে মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে আসেন চৈত্রের শুক্লা নবমীতে। তারপর একদিনের যুদ্ধ বিরতি। একাদশীতে মাতলি ইন্দ্রের রথ নিয়ে এলেন। যুদ্ধ চলল আরও আঠারো দিন ধরে — চৈত্রের শুক্লা দ্বাদশী থেকে কৃষ্ণা চতুর্দশী পর্যন্ত। অর্থাৎ ওই হিসেবে লক্ষ্মণ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার পরেও কুড়ি দিন ধরে যুদ্ধ চলে।

কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে আমরা দেখি, লক্ষ্মণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেই রামকে শপথ বাক্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, "আমি দেখতে চাই, অদ্য সূর্যাস্তের আগেই আপনি রাবণকে বধ করেছেন।"

অহং তু বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ।
যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্মা দিবাকরঃ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১০১/৫৫)

তাহলে লক্ষ্মণ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার পর যুদ্ধ আর কুড়ি দিন নয়, চলেছিল মাত্র একদিন।

যাইহোক, যুদ্ধ শেষ হলেও আসল যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি।

রাবণ বধ হয়েছে। লঙ্কা জয় হয়েছে। রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পন্ন। বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত।

কিন্তু রাম এখনও লঙ্কায় প্রবেশ করেননি। তিনি এখনও রয়েছেন সেই সুবেল পর্বতের সেনা শিবিরে। কী করে বলা যায় যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে? বিজয় উৎসব তো দূরের কথা, বিজয়ী রামের মুখে তাহলে একটুও হাসি নেই কেন? কেন তবে রাম এমন চিন্তিত বিষণ্ণ অন্যমনস্ক? তাঁর বুক থেকে কেবল সন্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে। চোখ দুটি অশ্রুবাষ্পাকুল। তিনি মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্‌বাষ্পপরিপ্লুতঃ
স দীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য জগতীমবলোকয়ন্‌।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/৫-৬)

এই কি বিজয়ী বীরের চেহারা? বাইরের যুদ্ধ শেষ হলেও মনে হয় যেন রামের অন্তরে তখনও চলেছে আর এক ভীষণ যুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে বিমর্ষ বিষাদক্লিষ্ট যুধিষ্ঠির যখন জয়ের গৌরব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে চাইছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, "মহারাজ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলেও এখনও আপনার আর এক যুদ্ধ বাকি। সে যুদ্ধ আপনার অন্তরে। সেই অন্তরের কুরুক্ষেত্রে আপনার পাশে কোনো ভাই বন্ধু মিত্র নেই। কোনো অস্ত্র শস্ত্র হাতিয়ারও কাজে আসবে না। আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে একা নিরস্ত্র নিজের সঙ্গে। আপনার তমোগ্রস্ত ক্লৈব্যকে আত্মশক্তি দিয়ে জয় করতে হবে।"

যচ্চ তে দ্রোণ ভীষ্মাভ্যাং যুদ্ধমাসীদবিন্দম।
মনসৈকেন যোদ্ধব্যং তৎ তে যুদ্ধমুপস্থিতম্‌।।
যত্র নৈব শরৈঃ কার্যং ন ভৃত্যৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তৎ তে যুদ্ধমুপস্থিতম্‌।।

(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, ১২/১২, ১৪)

শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই।

এবার তাঁর যুদ্ধ রাবণের সঙ্গে নয়। এ যুদ্ধ তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের। এ তাঁব মনের সংস্কার, তাঁব মনস্তত্ত্বের অবচেতনার গূঢ়ৈষণার সঙ্গে তাঁব আপন হৃদয় ও বিবেকেব সংঘাত। এখানে তাঁর হাতেব সকল ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ফল। মানুষ রাম আর দেবতা রাম যেন দাঁড়িয়েছেন সম্মুখ দ্বন্দ্বে। একদিকে মানুষী ভাব, আব একদিকে তাঁর দেবভাব। সীতাপতি প্রেমিক রামচন্দ্র, আর রঘুপতি বাজা রামচন্দ্র। এখানে তাঁর দ্বিতীয় কোনো সহায় নেই। না লক্ষ্মণ না হনুমান না সুগ্রীব। এখানে বামের একমাত্র সঙ্গী তাঁব দুঃখ, তাঁব শোক — "শোকমাত্র দ্বিতীয়স্য" (ভবভূতি, উত্তরামচরিতম্‌, ৩/৪)

রাম অন্তবে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। বস্তুত অগ্নিপরীক্ষা সীতাব হয়নি, হয়েছিল আসল রামের। অগ্নিতে সীতার সতীত্ব পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে রামের প্রেম ও পতিত্বের পরীক্ষা করেছেন কবি। সীতা নিষ্কলঙ্ক, সীতা সতি। কিন্তু রাম?

যুদ্ধ জয় কবেছেন, কিন্তু যাঁর জন্য এই যুদ্ধ, সেই সীতার কথা একবারও মুখে আনছেন না। সীতার সামনে দাঁড়াতে তিনি যেন ভয় পাচ্ছেন। দুশ্চিন্তা দ্বিধা সংশয় নিয়ে তিনি কাতর হয়ে আছেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

আমরা অনুমান করতে পারি, এই অবস্থায় যদি শ্রীকৃষ্ণ রামের পাশে থাকতেন, তাহলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি ধমক দিয়ে রামকে বলতেন, "সুখের গৌরবের সময় যে অলীক দুঃখের কথা ভেবে বিমর্ষ হয়, সে ভ্রান্ত। এ আপনার দুঃখভ্রান্তি ছাড়া আর কি বলব? কিমন্যদ্‌ দুঃখবিভ্রমাৎ?" (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব, ১২/৭)

রাম দেবতা, কিন্তু তিনি মানুষ — মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ — ভগবান যখন মানবদেহ ধারণ করেন, তখন তিনি মানুষের সকল অজ্ঞানতা সকল দুঃখ মোহ দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেন। কেবল একক মানুষের দুঃখ নয়, সমগ্র মানবজাতির যাবতীয় দুঃখের ভার তাঁকে বহন করতে হয়। তাঁর এই দুঃখ বরণ, আমাদের দুঃখ তারণ। সাধারণ জীবে ও অবতারে এই এক সূক্ষ্ম পার্থক্য। তাই বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলা যায়, "রাম আমাদেরই মতো অথচ আমরা কেউ তাঁর মতো নই।"

কেননা মানুষের হৃদয় এত গভীর হয় না। তার যত সুখ দুঃখ সামান্য গোষ্পদে জল। মানুষের বুকে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। কিন্তু রামের হল দেবতার হৃদয়। অনুভবে গভীর, তীব্রতায় বিপুল। সেই বুকে জ্বলছে মানুষের দুঃখ।

রাম ভাবছেন সীতার কথা। যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। সীতার প্রেমের কাছে তাঁর জীবন তাঁর অযোধ্যাও যে তুচ্ছ। একথা তিনি কতবার বলেছেন। সেই পুণ্যবতী সীতাকে রাক্ষস হরণ করেছে। তাঁর পবিত্র অঙ্গে লেগেছে কামুক হস্তের কলুষ স্পর্শ। তাঁর প্রেমের পারিজাত হয়তো রাক্ষসের কামাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেছে। রাবণের মতো অমন স্বেচ্ছাচারী লম্পট সীতাকে এতদিন নিজের অধিকারে পেয়েও কি তাঁকে কলুষিত করেনি। এই চিন্তার বিষে রাম জর্জরিত। তাঁর মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরিয়েছে। এই দুঃখ তাঁর মনোবিকলন ঘটিয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে, রাম জানতেন না যে, ব্রহ্মার অভিশাপে রাবণ নিতান্ত অসহায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো নারীকে আর তার ধর্ষণ করার ক্ষমতা নেই। তাই অনিবার্য ভাবেই রাম আশঙ্কা করছেন, তাঁর রঘুকুল অপবিত্র হয়েছে। কুলবধূকে যদি কোনো পরপুরুষ দুষ্ট ইচ্ছা নিয়ে স্পর্শ করে, তাহলে তখনকার সামাজিক নীতি অনুসারে, সেই কুল অপবিত্র হয়। রামের মনেও এই সংস্কার দৃঢ় রয়েছে। এবং তা যে কতখানি, কবি আমাদের অনেক আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন। অরণ্যকাণ্ডে রাক্ষস বিরাধ যখন সীতাকে জোর করে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, তখন রাম বললেন, "পিতার মৃত্যু কিংবা রাজ্য হারানোর চেয়েও মর্মান্তিক এই দুঃখ। আজ পরপুরুষ সীতাকে স্পর্শ করেছে। আমার কাছে এর চেয়ে বড় দুঃখ নেই।"

পরস্পর্শাত্তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে।
পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্যহরণাত্তথা।

(অরণ্যকাণ্ড, ২/২১)

বিরাধকে বধ করেও রামের সেই দুঃখ যায়নি। রাবণকে বধ করেও না। এইখানেই দেবতা রামের মানবিক দুঃখ।

রামের এই দ্বিধাভিন্ন সংশয়াপন্ন বিমর্ষ অবস্থা কিন্তু বিচক্ষণ হনুমানের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি ইতস্তত করে সসংকোচে রামের সামনে এসে বললেন, "যাঁর জন্য আমাদের এই যুদ্ধের উদ্যোগ, যিনি আমাদের সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ, সেই সীতার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত। তিনি আকুল নয়নে আমাকে বলেছেন, আমি আমার স্বামীকে দেখতে ইচ্ছা করি"।

শুনে রাম চিন্তিত হলেন। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে এলো। তিনি মুখ নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে গম্ভীর স্বরে বিভীষণকে বললেন,

"তুমি সীতাকে শিরঃস্নান করিয়ে দিব্য অঙ্গরাগ ও আভরণে ভূষিত করে শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো।"

বিভীষণ দ্রুত প্রস্থান করলেন।...

কিন্তু কেন সীতাকে শিরঃস্নান করিয়ে আনতে হবে? রাম আপন মনের অশুচি চিন্তা নিয়ে সীতাকে দেখছেন। তাই সীতার দেহ তাঁর কাছে অপবিত্র। "শিরঃস্নাতামুপস্থাপয়" — এই একটি ক্ষুদ্রতম বাক্য দিয়ে কবি এখানে রামের মনোবিকারকে নিদারুণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

সীতাকে এতখানি অপমান বোধ করি রাবণও করেনি। দুঃখে অভিমানে আমাদের মন আর্তনাদ করে ওঠে। শিরঃস্নান করে রামের সামনে আসার এই প্রস্তাবের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অপমান আছে, তা সীতাও বুঝতে পেরেছেন। তাই প্রতিবাদ করে তিনি বিভীষণকে বললেন, "না, আমি স্নান না করেই স্বামীকে দেখতে যাব। অস্নাত্বা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর।" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/১১)

বিভীষণ তখন বিনীতভাবে বললেন, "দেবি, আপনার স্বামী যা বলে দিয়েছেন আপনার তাই করা উচিত।"

পতিব্রতা সাধ্বী সীতা তখন স্নান করে মহার্ঘ বসন ভূষণে সজ্জিতা হয়ে শিবিকায় উঠে রামের কাছে গেলেন।...

"শিরঃস্নাতং" শব্দের আগে কবি সুনির্বাচিত আরও দুটি বিশেষণ যোগ করেছেন। কবি প্রতিভার শক্তি ও চাতুর্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। মাত্র দুটি বিশেষণের সন্নিপাতে পরিস্থিতির মধ্যে নিহিত মর্মন্তুদ নাটকীয়তাকে আশ্চর্যভাবে ব্যক্ত করেছেন। বক্তব্যের মধ্যে একটা তীব্র বিষম সংঘাত সৃষ্টি করে বলেছেন, "শ্রুত্বা মৈথিলী পতিদেবতা ভর্তৃভক্ত্যাবৃতা সাধ্বী তথেতি... শিরঃস্নাতং সংযুক্তাং প্রতিকর্মণা" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/১৩-১৪)। পতি দেবতার কথাতে পতিপ্রাণা সাধ্বী সীতাকে শুদ্ধিস্নান করে তবে যেতে হল। এই করুণ বৈপরীত্যের সঙ্গে আবার রামের প্রতি একটু যেন তির্যক বিদ্রূপও ফুটে উঠেছে। দুটি মাত্র বিশেষণের এমন নিপুণ প্রয়োগ, তাই দিয়ে এতখানি নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করা, পৃথিবীর যে কোনো মহাকবির ঈর্ষার বস্তু।

বিশেষ করে সীতার সঙ্গে রামের এই প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্য বর্ণনা (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪ সর্গ), যে ভাষায় যে ভাবে অবতারণা করা হয়েছে, যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে চরিত্রগত নাটকীয় সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অতুলনীয়। এখানে প্রত্যেকের প্রতিটি কথা ইঙ্গিত ভাবও ভাবান্তর লক্ষ্য করার মতো।

রাম নীরবে চিন্তান্বিত হয়ে বসে আছেন (ধ্যানমাস্থিতম্)।

হৃষ্টমনে বিভীষণ (প্রহৃষ্টশ্চ) এসে তাঁকে জানালেন, সীতা এসেছেন।

অনেকদিন রাক্ষসগৃহে বাস করেছেন যে সীতা (রক্ষোগৃহচিরোষিতাম্), তিনি এসেছেন শুনে, রাম একই সঙ্গে ক্রোধে হর্ষে দুঃখে মুহ্যমান হলেন (রোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যঞ্চ রাঘবঃ প্রাপ)। এখানে সমস্ত বিপরীত অনুভূতির এক উগ্র মিশ্রণ ঘটে গেল রামের মনে।

সীতা তখনও কাছে আসেননি। দূরে শিবিকায় বসে আছেন (যান গতাং সীতাং)।

এদিকে রাম বিমর্ষচিত্তে মনে মনে বিচার করছেন (সবিমর্শং বিচারয়ন্)।

কিছুক্ষণ পরে রাম দুঃখিত চিত্তে বিভীষণকে বললেন (বাক্যমহৃষ্টঃ), "বৈদেহীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

তিনিই তো আগে ছুটে যাবেন, তা না করে তীব্র এক বিরূপ নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বসে রইলেন রামের এই নিষ্ঠুর বিসদৃশ আচবণে লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুমান স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরা সব হতবাক্ হয়ে গেছেন।

সীতাকে দর্শন করবার জন্য ততক্ষণে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে গেছে। বিভীষণ জনতার ভিড় হটাতে আদেশ দিলেন। প্রহরীরা কাঁসর বাজিয়ে বেত উঁচিয়ে জনতাকে তাড়না কবতে লাগল।

তাই দেখে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহরীদের নিষেধ করলেন। এবং যে বিভীষণকে তিনি সর্বদা এত মান্য এত সমাদর করে কথা বলেন, তাঁকে পযন্ত রূঢ়ভাবে তিরস্কার করে বললেন, "কেন আমাকে অবজ্ঞা করে এদেব পীড়ণ করছ? এরা সবাই আমার আপন লোক। এদের এইভাবে তাড়না করো না।" বাম ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে যেন সকলকে দগ্ধ করছেন (রামশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব)।

— "বিপদে দুর্দশায় যুদ্ধে কিংবা যজ্ঞে বিবাহে সয়ম্বরে নারী লোকসমক্ষে উপস্থিত হলে কোনো দোষ হয না। সীতাও এখন বিপদে ও কষ্টে পড়েছেন। অতএব সীতা শিবিকা থেকে নেমে এই জনসমক্ষে পদব্রজে আমার কাছে আসুক।" বাম বললেন।

রামের এই ভীষণ বাক্য শ্রবণ করে লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও হনুমান ব্যথিত হলেন— "নিশম্য বাক্যং বামস্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/৩২)। তাঁরা এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছেন, বাম সীতাব প্রতি রীতিমতো অপ্রসন্ন বিমুখ হয়ে পড়েছেন। রামেব কথায় রয়েছে সেই নিদারুণ ইঙ্গিত।

কলত্রনিরপেক্ষৈশ্চ ইঙ্গিতৈয়স্য দারুণৈঃ।
অপ্রীতমিব সীতায়ং তর্কয়ন্তি স্ম রাঘবম্।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/৩৩)

বিভীষণকে অনুসরণ করে জনতার ভিড়ের ভিতর দিয়ে অধোমুখে ধীরে ধীরে সীতা আসছেন। দুঃখে লজ্জায় তিনি যেন নিজেব গাত্রের মধ্যে মিশে যেতে চাইছেন— "লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী স্বেযু গাত্রেষু মৈথিলী" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/৩৪)।

সীতা রামের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।...

স্নেহে প্রেমে আনন্দে বিস্ময়ে অনেকক্ষণ ধরে সীতা রামের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন।...

বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাচ্চ পতিদেবতা।
উদৈক্ষত মুখং ভর্তুঃ সৌম্যং সৌমতরাননা।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/৩৫)

এই মুহূর্তটির জন্যই আমরা এতকাল আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ছিলাম। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের হৃদয় চেয়েছে, কবে এই শুভ মুহূর্তটি আসবে।

পরিস্থিতির মধ্যে যে উদ্‌বেগ ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান ঘটবে এখনই। বাল্মীকির লেখনী এখানে তাই আরও সতর্ক, আরও স্থির। তিনি আমাদেব এনে দাঁড় করিয়েছেন এক রুদ্ধশ্বাস চরম মুহূর্তে।..

কী হবে এখন? কী করবেন, কী বলবেন রাম?

কবি হয়তো একটু অবসর চান তাই এখানেই সর্গটি শেষ করলেন।

সীতা স্থিবনেত্রে রামের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন (স্থিতাং প্রহ্বাং)।...

রামও দেখছেন তাঁর প্রাণপ্রিয়া সীতাকে (হৃদযপ্রিয়াম্)।..

তাঁর মনে লোক অপবাদের ভয় ঢুকেছে। তাঁর হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত। তাঁর বুকখানা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে— "জনবাদভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদযং দ্বিধা" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৫/১১)।

রামের জীবনের দুর্বলতম যন্ত্রণাব মুহূর্ত এখন। শ্রীকৃষ্ণের ভাষায এ তাঁর চরম "দুঃখবিভ্রম"। তাঁব কথা ও আচরণ তাই এমন অস্বাভাবিক, এমন বিসদৃশ। অবচে ব তলে চাপা নিগূঢ যে জটিল যন্ত্রণা সেখানে হঠাৎ স্পর্শ করলে মানুষ অনেক সময় এমন আচমকা পালটে যায। কোনোদিন যা সে বলবে বা করবে বলে ভাবতেও পারেনি, তখন সে তাই বলে, তাই করে। বাম বললেন— "ভদ্রে", — যেন এক অপবিচিতা ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন কবছেন। সীতা আর তাঁর কাছে প্রিয়া নন; বৈদেহী মৈথিলী বা জানকীও নন; সীতা এখন রামের কাছে কেবল 'ভদ্রে'।

"ভদ্রে, আমার বংশের কলঙ্ক ও অপমানেব প্রতিশোধ নিয়েছি। শত্রুকে বিনাশ করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধ তোমার জন্য নয়। শুধু আমার বংশের গ্লানি দূব করবার জন্য। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হযেছে। নেত্ররোগীব সামনে যেমন দীপশিখা, তেমনি আমাব চোখের সামনেও তুমি কষ্টকর। তুমি রাবণেব অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ। সে তোমাকে কলুষ দৃষ্টিতে দেখেছে। অতএব এখন যদি তোমাকে গ্রহণ করি তাহলে আমার মহৎ বংশের কি পবিচয় দেব? তুমি যেদিকে খুশি চলে যাও। তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি মনস্থির করেই বলছি, লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব অথবা রাক্ষস বিভীষণ, যাকে ইচ্ছা করো তাঁর কাছে যাও। কিংবা তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। দিব্যরূপে তুমি মনোরমা, তাই তোমাকে নিজের গৃহে পেয়ে বাবণ নিশ্চয়ই বেশি দিন ধৈর্য ধরতে পারেনি।"

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া।।
তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া।।

রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ।।
যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি।।

তদদ্য ব্যহৃতং ভদ্রে ময়ৈতং কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথা সুখম্।।
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা।।
নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়ত্যচিরং সীতা স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৫/১৭-১৮, ২০-২৪)

এমন নিষ্ঠুর কর্কশ বাক্য যে রাম উচ্চারণ করতে পারেন আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। রামের রুচি ও দৃষ্টি এমন পালটে গেল কেমন করে? "দীপো নেত্রাতুরস্য" এই সুনির্বাচিত উৎপ্রেক্ষা দিয়ে কবি ইঙ্গিত করছেন, সীতা নিষ্কলঙ্ক দীপই আছেন, কেবল রামের দৃষ্টিই হযেছে আতুর। রাম নিজেকে নেত্ররোগী বলে যেন নিজের অবস্থাটাই বলে ফেলেছেন প্রকারান্তরে। উপমা প্রয়োগের এমন নিপুণ কৌশল একমাত্র মহাকবি বাল্মীকিই জানেন। কবি বুঝিয়ে দিলেন, রামের দৃষ্টি আব সুস্থ নেই, নইলে শত্রুকেও যিনি স্নেহ করেন সেই "রিপুণামপি বৎসলম্" (৬/৫০/৫৬) রামচন্দ্র সীতার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হলেন কী করে? যে রাম একদিন সীতাকে বলেছিলেন, "তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি স্বর্গও কামনা করি না — ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০/২৭) — তিনিই আজ সীতাকে এমন দুঃখ দিলেন কী করে? এ যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ। কবি কালিদাস চমৎকার বলেছেন, "একদিন রাম রাজলক্ষ্মীকে হেলায় ত্যাগ করে, তাঁর প্রেমলক্ষ্মী সীতাকে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন। এবাব তাই অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সেই উপেক্ষার প্রতিশোধ নিলেন সীতার উপরে। রাম এবাব সীতাকে ত্যাগ করে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকেই ববণ করলেন।"

উপস্থিতাং পূর্বমপাস্য লক্ষ্মীং বনং ময়া সার্ধমসি প্রপন্নঃ।
তদাস্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোষাৎ সোঢাস্মি নঃ ত্বদ্ভবনে বসন্তী।।

(রঘুবংশ, ১৪/৬৩)

রামকে তখন কালান্তক যমেব মতো দেখাচ্ছিল। সেখানে রামের যত সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা রামকে কিছু বলা তো দূরের কথা, তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস করছিলেন না।

ন হি রামং তদা কশ্চিৎ কালান্তকযমোপমম্।
অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬/২২)

অপমানিতা সীতা তখন শান্ত কণ্ঠে রামকে যে কথা বললেন, তার শুচিতা ও সৌন্দর্য, মহিমা ও মাধুর্য, স্বর্গের পবিত্রতাকেও ম্লান করে দেয়। সতীত্বের চিরমঙ্গল প্রদীপশিখার মতো ভারতবর্ষের হৃদয় মন্দিরে অনন্তকাল ভাস্বর হয়ে আছে।

চোখের জল মুছে সীতা বললেন, 'ইতর লোকে গ্রাম্য ভাষায় যেমন তার স্ত্রীকে বলে থাকে, তুমিও তেমনি আমাকে কঠোর অনুচিত বাক্য বলছ। তুমি যা ভাবছ আমি তা নই। আমার চরিত্রের শপথ করে বলছি, আমাকে বিশ্বাস করো। শারীরিক শক্তিতে অসমর্থ আমি

তাই রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, সে তো আমার ইচ্ছাকৃত নয়, তার জন্য দৈবই দায়ী। সেজন্য আমি কি করতে পারি? আমার অধীনে যে হৃদয় সে তো তোমারই। তাকে তো কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। এতকাল আমরা একসাথে আছি, ভালোবেসেছি, তবু তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না, এই তো আমার চিরমৃত্যু। তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার জন্ম আমার পরিচয় আমার মহৎ চরিত্রের সম্মান দিলে না। আমার ভক্তি আমার ভালোবাসা আমার সতীত্ব সব তুমি ঠেলে ফেলে দিলে? আমাকে একটা হেয় চরিত্রের নারী বলে ভাবলে?''

তারপর লক্ষ্মণকে বললেন, ''সৌমিত্রে, আমি আর এই মিথ্যা অপবাদ নিয়ে বাঁচতে চাই না। চিতা প্রস্তুত কর। আমি অনলে প্রাণ বিসর্জন দেব।''

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।।
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে।।

মদধীনন্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী।।
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্।।

অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্।।
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম শক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।।

চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬/৫-৬, ৯-১০, ১৫-১৬, ১৮)

লক্ষ্মণ তখন ক্রোধভরে রামের দিকে তাকাতে লাগলেন।...

রাম মুখ নীচু করে বসে রইলেন।...

অনিচ্ছুক ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ শুধু সীতার আদেশে আর রামের মৌন সম্মতিতে চিতা প্রস্তুত করলেন। লক্ষ্মণের চরিত্রে বরাবর আমরা লক্ষ করি বিদ্রোহ ও আনুগত্যের এই বিপ্রতীপ সন্নিপাত। মহাকাব্যের মধ্যে যা এনেছে মহানাটকের লক্ষণ। লক্ষ্মণের যেমন জীবন তেমনি তাঁর মৃত্যু নাটকীয়।...

চিতা জ্বলে উঠল।

নতমুখ বিষণ্ণমূর্তি রামকে করজোড়ে প্রদক্ষিণ করে, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে সীতা বললেন, ''আমার হৃদয় যদি রামের প্রতি চিরকাল একনিষ্ঠ থাকে, রাম আমাকে দুষ্টা ভাবলেও

আমি যদি কায়মনোবাক্যে শুদ্ধচরিত্রা হই, তাহলে পাপপুণ্যের সর্বলোকসাক্ষী হে অগ্নি, আমাকে রক্ষা করুন। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, দিন-রাত্রি, সকাল-সন্ধ্যা, স্বর্গ ও পৃথিবী, আমি যদি শুদ্ধ চরিত্রা হই, তাহলে আমাকে রক্ষা করুন।"

এই বলে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সীতা জ্বলন্ত হুতাশনে ঝাঁপ দিলেন।...

সমবেত বানর ও রাক্ষসগণ আর্তস্বরে ক্রন্দন ও হাহাকার করতে লাগল।...

অসহায় সতীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যখন আর কোনো উপায় থাকে না তখন চিরকাল অনিবার্যভাবে যা ঘটে, আজও তাই ঘটল। স্বর্গের সকল দেবতা ইন্দ্র বরুণ ব্রহ্মা মহেশ্বর, একে একে জ্যোতির্মণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে রামকে এসে বললেন, "সাধারণ প্রাকৃত মানুষের মতো আপনি কেন সীতাকে এমন উপেক্ষা করছেন? আপনি ভুলে গেছেন আপনার স্বরূপ, আপনার পরিচয়।"

বস্তুত এই চিতা জ্বলছে রামের বুকেই। রামের মানুষী দুঃখ, তাঁর লৌকিক ভয় ও সংস্কার, ঈর্ষায় ও সন্দেহে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে তাঁর বুকে। নিষ্পাপ সীতা রামের সেই মানসিক দুঃখের আগুনে প্রবেশ করেছেন। এখানে অগ্নির তাই দ্বৈতরূপ।

তখন পিতৃলোক থেকে দশরথ এবং দেবলোক থেকে দেবতাগণ এলেন, তাঁরা এসে রামের অন্তরে দেবভাবের জাগরণ ঘটালেন। রাম অনুভব করলেন, তিনি মানুষ কিন্তু দেবতা। ওই অন্তরাগ্নির দহনে রাম নিজেকে জয় করলেন। এই আত্মজয় তাঁর লঙ্কাজয়ের চেয়েও মহীয়ান।

অগ্নিদেব সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে চিতা থেকে উঠে রামকে বললেন, "রাম এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ করো। বাক্য মন বুদ্ধি বা চক্ষু দ্বারাও ইনি কখনও তোমাকে অতিক্রম করেননি। আমি আদেশ করছি, তুমি জানকীকে গ্রহণ করো। এঁকে আর কোনো কথা বলে কষ্ট দিও না।"

এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে।।
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌটীর্যং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা।।

*

বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতি গৃহ্ণীষ্ব মৈথিলীম্।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে।।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৮/৫-৬, ১০)

অগ্নির ভিতর দিয়ে রামের বিবেকই যেন কথা বলছে। আর এতক্ষণে আমরা প্রথম দেখলাম রামকে অত্যন্ত প্রসন্ন ও হর্ষোৎফুল্ল (প্রতিমনা রামঃ হর্ষব্যকুললোচনঃ)।

রাম বললেন, "আমি জানি সীতা অনন্যহৃদয়া। আমার প্রতি সে একান্ত অনুরাগিণী। সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি রাবণও কখনও তার সতীত্বকে লঙ্ঘন করতে পারেনি। সীতা আপনি সতীত্বের তেজে নিয়ত সুরক্ষিতা। আত্মবান ব্যক্তি যেমন স্বীয় কীর্তিকে ত্যাগ করতে পারে না, তেমনি আমিও ত্রিলোকবিশুদ্ধা সীতাকে পরিত্যাগ করতে পারি না।"

অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।।
ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্ততে বেলামিব মহোদধিঃ।।

বিশুদ্ধা ত্রিষুলোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্তিরাত্মবতা কথা।

(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৮/১৫-১৬, ২০)

কত সহজ বিশ্বাসেই না রাম এই কথাগুলি বললেন। কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন অন্তর্জীবনের কি ঘোর সংগ্রাম, কি নিদারুণ অগ্নিদাহ তাঁকে পার হয়ে আসতে হল। মানুষ রামের উপরে দেবতা রাম জয়ী হলেন। কিন্তু তাঁর এই জয় ক্ষণস্থায়ী। মৃত রাবণের অশরীরী প্রেতের ছায়ার সঙ্গে এবার তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। লঙ্কা তো ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এবার ধ্বংস হয়ে যাবে রামের নিজের সুখ, নিজের শান্তি।

পঁয়ত্রিশ

উত্তরকাণ্ড বিচার

রামায়ণের এই কাহিনির শেষ কোথায়? জীবনে অধিকাংশ সময়েই তো আমরা দেখি, ঘটনার নটে-গাছটি মোড়ালেও কথা তবু ফুরায় না। অনেক কথা অনেক গভীর ব্যথা তখনও বলার বাকি থেকে যায়। মঞ্চে শেষ যবনিকাপাত হলেও মনে হয়, ওই কম্পমান যবনিকার অন্তরালে তখনও চলেছে আর এক গূঢ়তর নাটকের রোমাঞ্চকর কত দৃশ্য। তাৎপর্যে যা দৃশ্যনাটকের চেয়েও গভীর।

বাল্মীকির রামায়ণে আমরা এখন ঠিক তেমনি এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। যুদ্ধকাণ্ড শেষ হয়েছে। নিদারুণ সন্দেহ ও সংশয়ের ভিতর দিয়ে অগ্নিপরীক্ষার পরে রাম সীতাকে গ্রহণ করেছেন। রাম সীতা পুষ্পক বিমানে ফিরে গেছেন অযোধ্যায়। রামের রাজ্যাভিষেক হয়েছে। সেই সঙ্গে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে কবি রামায়ণের গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

অনেকেই তাই মনে করেন, রামায়ণ কথা এখানেই শেষ। ছয়কাণ্ড নিয়েই রামায়ণ সম্পূর্ণ। অবশিষ্ট সপ্তম কাণ্ড অর্থাৎ উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়। পরবর্তীকালের সংযোজন। এর পক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয় তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তা হল ঃ

১। মহর্ষি নারদ রামের যে জীবনকথা শুনিয়েছিলেন, বাল্মীকি সেই কাহিনিকেই কাব্যে রূপ দেন — "স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা" (আদিকাণ্ড, ৩/৯)। কিন্তু নারদের বর্ণনায় উত্তরকাণ্ডের কাহিনির কোনো উল্লেখ নেই। অতএব উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি রচনা করেননি।

২। মহাভারতের রামোপাখ্যানে রামায়ণের যে সংক্ষিপ্ত কাহিনি আছে, অনেকের মতে সেটাই রামায়ণের আদি রূপ, তাতে সীতার বনবাস ইত্যাদি উত্তরকাণ্ডের কোনো কথা নেই। অতএব উত্তরকাণ্ড আদি রামায়ণের অংশ নয়।

বাল্মীকি রামায়ণের গৌড়ীয় পাঠে (আদিকাণ্ড ৩/১) এবং পশ্চিমী পাঠে (আদিকাণ্ড, ৪/১) বলা হয়েছে, "শ্রুত্বা পূর্বং কাব্যবীজং দেবর্ষের্নারদাদৃষি"—নারদের কাছে শ্রুত এই "কাব্যবীজ'ই আদি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা মহাভারতের রামোপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। এবং বাল্মীকির রচনার আগে থেকেই লোকমুখে তা প্রচলিত ছিল। সেই প্রচলিত 'কাব্যবীজং' থেকে বাল্মীকি পরে রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকি যে প্রথমে নারদের মুখে শুনেছিলেন, এ থেকেও প্রমাণ হয়, পূর্বে লোকমুখে এই রামগাথা প্রচলিত ছিল।

৩। বাল্মীকির রামায়ণেও বলা হয়েছে সমগ্র রামায়ণ ছয় কাণ্ডে বর্ণিত। তার সঙ্গে অধিকন্তু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে উত্তরকাণ্ডের কথা—"ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্" (আদিকাণ্ড, ৪/২)। অতএব এই উত্তরকাণ্ড সমগ্র কাব্যশরীরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, স্বতন্ত্র।

৪। উত্তরকাণ্ডের ভাষা বিন্যাস ও গঠনরীতিও একটু যেন স্বতন্ত্র ও অবিন্যস্ত। বাল্মীকির রচনায় আমরা যে সরলতা ও ধ্বনিমাধুর্য পাই তা যেন এখানে কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত।

৫। যুদ্ধকাণ্ডের পরে রামায়ণের গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত গ্রন্থের শেষেই গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। অতএব ধবে নেওয়া যেতে পারে, যুদ্ধকাণ্ডের পরেই রামায়ণ শেষ হয়েছে। উত্তরকাণ্ড পরবর্তীকালের বাড়তি সংযোজন।

৬। উত্তরকাণ্ডের প্রধান উপজীব্য সীতাত্যাগের কথা প্রাচীন পুরাণাদিতে নেই, যেমন, হরিবংশ (১/৪১), বায়ুপুরাণ (৮৮ অধ্যায়), বিষ্ণুপুরাণ (৪/৪) এবং নৃসিংহপুরাণ (৪৩-৫২ অধ্যায়) প্রভৃতিতে রামের জীবনকথা আছে, কিন্তু সীতাত্যাগের কথা নেই। অতএব উত্তরকাণ্ড মূল রামায়ণের অংশ নয়।

৭। অনেকের ধারণা, উত্তরকাণ্ডের রাম বড় নিষ্ঠুর। তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নীতি ও সমাজে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি অকাতরে একের পর এক নিষ্ঠুর কাজ করে গেলেন, যেমন, সীতা ত্যাগ, লক্ষ্মণ বর্জন, শম্বুক হত্যা ইত্যাদি।

অতটা না হলেও প্রায় একই রকম অভিযোগ তুলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, "কিন্তু উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে; কাচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিল মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রবলেম। ...সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকাব সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। এই বাহবার জোবে ওই জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণেব সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।" ...(ববীন্দ্ররচনাবলী, ১৪ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫১৪-১৫)

সাতকাণ্ড রামায়ণ নিয়ে উপরের এই যে সাত কাহন আপত্তি এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও বিচার বিবেচনা চলছে। তাই নিশ্চিত কবে বলা যায় না, এগুলি সিদ্ধান্ত, না প্রশ্ন! তবে এই সব যুক্তি নিয়ে বিশেষভাবে অনুধাবন করতে গিয়ে, সাধারণ পাঠকেব মনেও কিছু প্রশ্ন জাগে। তা উত্তর না হলেও বলা যেতে পারে প্রতিপ্রশ্ন।

রামের জীবনের একটা সম্পূর্ণ অয়ন বা বৃত্তান্ত থাকলে তবেই তো তাকে রামায়ণ বলতে পারি? কিন্তু ষষ্ঠকাণ্ডে যদি রামায়ণ শেষ হয়, তাহলে রাম তো তখন কেবল উত্তর যৌবনে পা দিয়েছেন, সবে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তাঁর জীবন ও কর্মের শুভ আরম্ভ মাত্র। বামের এই অসম্পূর্ণ জীবনের অর্ধবৃত্তকে 'রামায়ণ' তো বলা যায়ই না, এমনকী আখ্যানও নয়, বড়জোর উপাখ্যান বলা চলে। তাই সংগতভাবেই মহাভারতের বনপর্বে রামের কাহিনি যেটুকু আছে, তাকে রামায়ণ বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'রামোপাখ্যান'।

ষষ্ঠকাণ্ডে রাম সবেমাত্র সিংহাসনে বসেছেন, রাজা হিসেবে তাঁর রাজত্বের কোনো পরিচয় তখনও মেলেনি। এখানেই রামাযণ শেষ হলে 'রাম রাজ্য' কথাটা শুধু কথার কথাই হয়ে থাকে।

তাছাড়া অলংকার শাস্ত্রের দাবি হল, মহাকাব্যের ধীরোদাত্ত নায়কের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বর্ণনা করতে হবে। কিন্তু ষষ্ঠকাণ্ডে রামায়ণ শেষ হলে আলংকারিকের সংজ্ঞা অনুসারে রামায়ণকে আর মহাকাব্য বলা চলে না। তা হয়ে পড়ে খণ্ডকাব্য মাত্র।

একথা ঠিক যে ঋষি নারদ রামের যে জীবনকথা শুনিয়েছিলেন, তাতে উত্তরকাণ্ডের বর্ণিত বিষয় সীতা ত্যাগ, লক্ষ্মণ বর্জন, অস্ত্র ও সৈন্য বিসর্জন এবং রামের মহাপ্রস্থান, ইত্যাদি কোনো কথাই ছিল না। থাকবার কথাও নয়। কেননা রাম তখন সবেমাত্র লঙ্কা জয় করে অযোধ্যায় ফিরে এসে সিংহাসনে বসেছেন। ঘটনার সেই বর্তমান কাল পর্যন্তই নারদ বলেছেন। তাই উপসংহার নারদের উক্তি — "রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্" (আদিকাণ্ড, ১/৮৯)। এর পরে যা ঘটবে তা ভবিষ্যতের কথা। নারদ শুধু ঘটনার বর্তমান ইতিহাসটুকুই বলেছেন। কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। তবে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছেন, বলেছেন, রাম শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন — "অশ্বমেধশতৈরিষ্টা" (আদিকাণ্ড, ১/৯৪)। রামের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ করা তো উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত উত্তরজীবনের কথা।

আমরা দেখি নারদের কথার ঠিক পরের সর্গেই স্বয়ং ব্রহ্মা এসে বাল্মীকিকে বলেছেন, "তুমি নারদের মুখে যা শুনেছ তাই এবার রচনা করো। রাম লক্ষ্মণ ও রাক্ষসদের সম্বন্ধে যা জেনেছ কিংবা জাননি, যে কথা ব্যক্ত কিংবা এখনও অব্যক্ত, সীতার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, আর যা বলা হয়নি, সেই সব তুমি প্রকাশ করো। আমি বলছি, যা তুমি এখনও জানো না তা জানতে পারবে। যা তোমার অবিদিত তাও আর তোমার অবিদিত থাকবে না। তুমি সকল রহস্যই জানতে পারবে। তুমি রামের জীবনের পুণ্যকথা নিয়ে শ্লোকবদ্ধ পদে কাব্য রচনা করো। তার একটি বাক্যও মিথ্যা হবে না।"

রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্‌বৃত্তং প্রকাশ্যং যদি বা রহঃ।।
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।।

(আদিকাণ্ড, ২/৩৪-৩৫)

ব্রহ্মার এই কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো : "যা তোমার বিদিত কিংবা অবিদিত" (অবিদিতং সর্বং বিদিতং), "যা জেনেছ কিংবা জাননি, যা প্রকাশিত কিংবা অপ্রকাশিত" (যদ্বৃত্তং প্রকাশ্যং যদি বা রহঃ), "তা সব তুমি জানতে পারবে" (সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি)।

এখানে পরিষ্কার করেই বুঝানো হয়েছে, নারদ যা বলেছেন তাঁর মধ্যে অনেক কিছু প্রচ্ছন্ন ও অনুক্ত রয়েছে। অনেক কিছু না বলা থেকে গেছে। তাই যখন ব্রহ্মা আশীর্বাদ করে অন্তর্ধান করলেন, তখন বাল্মীকি রামের জীবন কথা তন্ময় হয়ে ধ্যান করতে লাগলেন। তাঁর মানসপটে সমস্ত ঘটনা যোগবলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রতিটি চরিত্রের যাবতীয় অনুপুঙ্খ, তাঁদের কথাবার্তা, হাবভাব, হাস্যপরিহাস, গতিপ্রকৃতি, ব্যবহার ও আচরণ সব সুস্পষ্ট রূপে তিনি জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করলেন। বাল্মীকি দিব্যচক্ষে কি দেখলেন তা ছবির মতো করে দেখানো হয়েছে। তাতে নারদের বর্ণিত ঘটনা যেমন জীবন্ত রূপে প্রতিভাত, তেমনি আরও অনেক কথা আছে যা নারদ বলেননি। বিশেষ করে শেষ দুইটি শ্লোকে। তাতে উত্তরকাণ্ডের সারাংশ নির্দেশ করে বলা হয়েছে, রাজ্যাভিষেকের পরে রামের গৌরব ও অভ্যুদয়, স্বরাষ্ট্রপ্রজানুরঞ্জন, সমস্ত অস্ত্র ও সৈন্য বিসর্জন এবং সীতা ত্যাগের কথা। রামের সেই ভবিষ্যৎ অনাগত জীবন নিয়ে উত্তরকাণ্ড রচনার কথা।

রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্য বিসর্জনম্।
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্।।
অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।।

(আদিকাণ্ড, ৩/৩৮-৩৯)

সুতরাং রামায়ণের এই "উত্তরে কাব্যে" নারদ কর্তৃক উক্ত না হলেও এসব তারই অবশ্যম্ভাবী অনুবর্তী।

তাই কাহিনিব এই অনিবার্য সূত্র ধরেই উত্তরকাণ্ডে সীতার পাতাল প্রবেশের পরেই, ব্রহ্মা আবার এসে রামকে বলছেন, "তুমি জন্ম থেকেই যেসব সুখ-দুঃখ সহ্য করেছ, ভবিষ্যতে যা সহ্য করতে হবে, সেসবই বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন। তুমিই এই আদিকাব্যের আশ্রয় এবং নায়ক। এ কাব্যের শেষ অংশই উত্তরকাণ্ড।"

জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখ-দুঃখোপসেবনম্।
ভবিষ্যদুত্তরং চেহ সর্বং বাল্মীকিনা কৃতম্।।
আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠতম্।

*

উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।

(উত্তরকাণ্ড, ৯৮/১৭-১৮, ২১)

বাল্মীকির রামায়ণ রচনার আগে থেকেই লোকমুখে সংক্ষিপ্ত আকারে রামগাথা প্রচলিত ছিল। কেননা রামের মহিমা ও যশগৌরব কেবল কোশল দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে বাল্মীকির রচনার পর রামের প্রভাব খ্যাতি ক্রমে আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভারতে — মহাভারত রচনার স্থানেও।

মহাভারতের বনপর্বে দ্রোণপর্বে ও শান্তিপর্বে সংক্ষিপ্ত রামচরিত পাওয়া যায়, তা হয়তো প্রচলিত লোকগাথা এবং বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করেই রচিত। কেননা কবি বাল্মীকির ব্যক্তিত্ব ও তাঁর রচিত কাব্য মহাভারতের কালে বিশেষ পরিচিত ছিল। রামায়ণের প্রচলিত লোকগাথা সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের 'খিল' অংশ অর্থাৎ হরিবংশে—

গাথা অপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
রামে নিবদ্ধতত্ত্বার্থা মাহাত্ম্যং তস্য ধীমতঃ।।

(হরিবংশ, প্রথম পর্ব, ৪১/১৪৯)

এই 'পুরাণবিদো জনাঃ' অর্থাৎ চারণ কবি ও কথকদের কথা বৌদ্ধগ্রন্থ 'দশরথ জাতক'-এ উল্লেখ করা হয়েছে "পৌরাণিক পণ্ডিতা" বলে।

কিন্তু মহাভারতের রামোপাখ্যানে সীতাত্যাগ ইত্যাদি উত্তরকাণ্ডের কোনো কাহিনিব উল্লেখ নেই বলে তা যে আদি রামায়ণে ছিল না, এমনকী বাল্মীকির রামায়ণেও থাকতে পারে না, এই অনুমানের মধ্যে যুক্তির চেয়ে গায়ের জোরই বেশি। প্রথমত মহাভারতে যা বলা হয়েছে তা আখ্যান নয়, উপাখ্যান মাত্র, এবং কি পরিস্থিতিতে কে কার কাছে কীভাবে এই উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন তাও ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

বনপর্বে জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদীকে অপহরণের পরে মনের দুঃখে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আমার মতো এমন দুঃখী এমন হতভাগ্য ত্রিভুবনে কেউ নেই, কেউ ছিল না। জ্ঞাতিরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, আমাদের বনবাসী করে চরম দুঃখ দিয়েছে। তার উপরে আবার আমার পত্নী ধর্মজ্ঞা ধর্মচারিণী দ্রৌপদী, যিনি অযোনিসম্ভবা যজ্ঞাগ্নিসমুদ্ভবা, তাঁকে দুষ্ট পুরুষ পাপস্পর্শ করেছে। কেন এমন হল? দ্রৌপদীর শুদ্ধ চরিত্রের উপরে এই মিথ্যা কলঙ্ক লাগল কেন?" (মহাভারত, বনপর্ব, ২৭৩/৫-৭)

মার্কণ্ডেয় মুনি তখন যুধিষ্ঠিবকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, "ভারতর্ষভ! তোমার চেয়েও অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র — প্রাপ্তমপ্রতিমং দুঃখং রামেণ।"

এই বলে মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে রামের উপাখ্যান শোনালেন। বললেন, রামের বনবাস, রাক্ষস রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ : শেষে রাম কেমন করে রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আবার বাজা হলেন, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সেই আশা ও সান্ত্বনার কথা। মার্কণ্ডেয় মুনি তো এখানে বিষণ্ণ মর্মাহিত যুধিষ্ঠিরকে আশায় উৎসাহে উদ্দীপ্ত করতে চান, তাই রামের জীবনের দুঃখজয়ের বীরত্বব্যঞ্জক গৌরবের কথাই তো তিনি বলেন। রামের শেষ জীবনের মর্মন্তুদ দুঃখ ও বিয়োগের কথা বলে তাঁকে আরও পীড়িত করতে যাবেন কেন? তাই মার্কণ্ডেয় মুনির বর্ণনায় যদি রামের উত্তর জীবনের বিষাদময় পরিণতির কথা না থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু মহাভারতের অন্যত্র আছে বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কথা, যেমন, শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, বনবাসের পরে রাম অযোধ্যায় ফিরে এসে দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন—

স চতুর্দশবর্ষাণি বনে প্রেষ্য মহাতপা।
দশাশ্বমেধাং জারূথ্যানাজহার নিরর্গলান্।।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৯/৫৩)

উত্তরকাণ্ডের শম্বুক বধের কথাও আছে -

শ্রূয়তে শম্বুকে শূদ্রে হতে ব্রাহ্মণদারকঃ।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৪৯/৬২)

সুতরাং মার্কণ্ডেয় মুনির কথিত কাহিনি ছাড়াও রামের জীবনের আরও কথা আছে। তাছাড়া উত্তরকাণ্ডের যে মূল প্রতিপাদ্য, সমাজে চাতুর্বর্ণ্য রক্ষা এবং রাজার ধর্ম প্রজানুরঞ্জন (যার অনিবার্য কারণে হল সীতা ত্যাগ এবং শম্বুক হত্যা), সেই রাজধর্ম ও চাতুর্বর্ণ্যের কথা তো — সারা মহাভারত জুড়েই ঘোষিত হয়েছে।

কিন্তু 'ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম" বলে রামায়ণের মূল ছয় কাণ্ড থেকে উত্তরকাণ্ডকে আলাদা করে উল্লেখ করা হল কেন? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, মূল কাব্য থেকে তার কোথাও একটা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য আছে?

পার্থক্য তো অবশ্যই আছে।

বামায়ণকে যেমন মহাকাব্য বলা হয়, তেমনি আবার বলা হয় ইতিহাস। যা ঘটে তা

ইতিহাস, আর যা ভবিষ্যতে ঘটবে, ত্রিকালদর্শী ঋষি যোগবলে যা প্রত্যক্ষ করেন, তা আর এক রকমের ইতিহাস। তাকে বলে সত্যকল্প কল্পশুদ্ধি বা কাব্য। এই অর্থেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদেব বলা হয় কবি। বাল্মীকি নারদের মুখে যা শুনেছিলেন তা হল ইতিহাস, আর যে সত্য তিনি আপন ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা হল অনাগত ইতিহাস বা কাব্য। রামায়ণে ইতিহাস ও কাব্য অনুষ্টুপের দুই চরণের মতো পরস্পর অর্থযুক্ত হয়ে পাশাপাশি সমান্তরালে চলেছে। তারা এক হয়েও পৃথক।

উত্তরকাণ্ডের বিন্যাস শিথিল, শব্দের ও ছন্দের সেই সহজ মধুর ঝংকারটি যেন ততটা নেই। ভাবের পারম্পর্য না রেখে তাড়াতাড়ি বিভিন্ন বিষয়ের অনেক কথা একসঙ্গে বলে ফেলার একটা ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। আবার ইতিপূর্বে সংক্ষেপে যা বলা হয়েছে তাই আবার বিশদ বিস্তার করে বলার চেষ্টা। ফলে বারবার বিষয়ের পুনরুক্তি ঘটেছে। অনেক সময় ঘটনার ধারাবাহিকতা বা chronology-ও রক্ষা করা হয়নি। সম্ভবত এই সব লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, এটা একটা "জোড়াতাড়া খণ্ড"।

বস্তুত মহাভারতের খিল হরিবংশ যা, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডও তাই। গ্রন্থের সমগ্র বিষয়ের অনুপপত্তি প্রতিপাদন। বৈদিক সাহিত্যের এটা একটা বিশিষ্ট রীতি। কাহিনির ঘটনার চরিত্রের বংশাবলীর পরিচয়ে যেসব ছিন্ন সূত্র, অনুক্ত বা অনুপস্থিত যেসব প্রাসঙ্গিকতা— যাকে বলে 'missing link' — তারই যথাসম্ভব প্রতিপাদন এবং পূর্বাপর সংগতিসাধন। অনিবার্যভাবেই সেখানে নানা প্রসঙ্গের অনেক পরিপূরক কথা এসে পড়ে, তাই বর্ণনা বিন্যাস কিছুটা বিস্রস্ত ও শিথিল হতে বাধ্য। এবং ঘটনার ধারাবাহিকতাও সব সময় বজায় থাকে না।

মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যাতে সম্পূর্ণ করতে না পারে তার জন্য বিভীষণ কেন এত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন? যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে কেন রামের আর কোনো জয়ের আশা নেই? এ সম্বন্ধে যুদ্ধকাণ্ডে অল্প দু-একটি কথা বলা হলেও সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বিশদ করে পূর্বাপর ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে উত্তরকাণ্ডে। মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দি করে লঙ্কায় নিয়ে আসে, কিন্তু কেন দেবরাজ ইন্দ্র নিতান্ত এক রাক্ষসের হাতে পরাজিত হলেন? কী তার কারণ? সেই আখ্যান যুদ্ধকাণ্ডে নেই, আছে উত্তরকাণ্ডে। আবার ব্রহ্মার অভিশাপে রাবণ পরনারী ধর্ষণে অক্ষম। কিন্তু কী কী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাবণ এমন করে অভিশপ্ত? তার বৃত্তান্ত আছে একমাত্র উত্তরকাণ্ডে। তাছাড়া হনুমানের জীবনের পূর্ববৃত্তান্ত, বালী সুগ্রীবের উৎপত্তি, দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস, রাক্ষসদের উৎপত্তি ও তাদের বংশাবলীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, ইত্যাদি নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় উত্তরকাণ্ডে সবিস্তারে বলে রামায়ণের সমগ্র কাহিনিকে সুসংহত করার প্রয়াস হয়েছে।

উত্তরকাণ্ড না থাকলে রামায়ণ কথা যে শুধু অসম্পূর্ণ হত তাই নয়, রামায়ণের পরিণতি ও তার আবেদনও এত গভীর ও মর্মস্পর্শী হত না। বুদ্ধদেব বসু তাই যথার্থই বলেছেন, "উত্তরকাণ্ড না থাকলে রামায়ণ এত বড় কাব্যই তো হত না। লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা লক্ষ্মীমেয়ের মতো রামের কোলে বসে পুষ্পকে চড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্না করে বাকি জীবন সুখে কাটালেন — এই যদি রামায়ণের শেষ হত, তাহলে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর

হতে পারত? বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না লিখে থাকেন, তবে সেইটুকু বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হন, বাল্মীকি-প্রতিম নিশ্চয়ই। বস্তুত রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র উদাম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হল, ছাড়তে হল স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের অন্তঃসার। যে রাজ্য দিয়ে অতবড় কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল, সে রাজ্য কি পাণ্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? সব পেয়েও সব ছেড়ে গেলেন তাঁরা, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের মহানির্জনে। যুদ্ধে যখনই জয় হল, রামও তখনই সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।... 'কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে নয়।' রামের যুদ্ধ, পাণ্ডবের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছে তো এই জন্যই। তা না হলে লোভীর সঙ্গে লোভীর যে সব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাস চিরকাল ধরে ঘটে আসছে, তার সঙ্গে এসবের প্রভেদ থাকত না। লোভীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরে সে নিজেও লোভী বলে আধুনিক যুদ্ধে বীভৎসতা, শুধু হত্যার বীভৎসতা; কিন্তু পাণ্ডবের যুদ্ধে, রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে — আর তাই তার শেষফল চিত্তশুদ্ধি।'' ('প্রবন্ধ সংকলন', ১৯৬৬, পৃ. ১৫৩-৫৪)

উত্তরকাণ্ডের ভিতর দিয়েই রামায়ণের সামগ্রিক আবেদন এবং জীবনের অন্তরতম সত্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। সীতা ত্যাগ, লক্ষ্মণ বর্জন এবং পরিশেষে রামের মহাপ্রস্থানের ভিতর দিয়ে রামায়ণ মহাকাব্য হিসেবে মহিমার এক পরম উত্তুঙ্গতা লাভ করেছে। উত্তরকাণ্ড রামায়ণকে মহাভারতের মতোই উদাত্ত গম্ভীর ও বিশাল করে ধরেছে।

কিন্তু সাধারণত গ্রন্থের শেষেই গ্রন্থমাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়, ষষ্ঠকাণ্ডের শেষে কবিও গ্রন্থমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, তবে কি রামায়ণ এখানেই শেষ নয়?

বলা যেতে পারে এখানেই শেষ, আবার শেষ নয়। কাব্যের প্রথম সর্গে ঋষি নারদ বাল্মীকিকে কাহিনির যে পর্যন্ত শুনিয়েছিলেন, বস্তুত এখানেই তার শেষ অর্থাৎ ইতিহাস হিসেবে রামায়ণের শেষ। তাই গ্রন্থ-মাহাত্ম্য কীর্তন করে কবি এখানে ঋষি নারদ ও রামচন্দ্রকে প্রণাম জানিয়েছেন।

এর পরে কবি যা বর্ণনা করবেন তা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত ভবিষ্যতের কথা। রামের সামনে তাঁরই ভবিষ্যৎ জীবনের গান গেয়ে শোনানো হবে, গান করবে দুটি সরল কিশোর, রামের আত্মজ লব ও কুশ, রামের ভবিষ্যৎ বংশধর, রামের ভবিষ্যৎ পুরুষের কণ্ঠে তাঁরই জীবনের কথা, বড় তাৎপর্যপূর্ণ এই উপস্থাপনা। বর্তমানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যৎ, যুদ্ধকাণ্ডের মুখে উত্তরকাণ্ড, রামায়ণের একদিকে শেষ আর একদিকে শুরু।

তাছাড়া গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণনা থাকলেই যে মনে করতে হবে গ্রন্থ শেষ হয়েছে এমন কোনো কথা নেই। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আখ্যান বা পর্বের পরেও মাহাত্ম্য বর্ণনা হয়ে থাকে। এটাই প্রাচীন সাহিত্যের রীতি। মহাভারতে দেখি, প্রায়ই এক একটি উপাখ্যান শেষ হয়েছে, আর সেখানে তার মাহাত্ম্য কীর্তন হয়েছে। তাহলে তো ধরতে হয় পদে-পদেই মহাভারত শেষ হয়েছে।

অনেকে আপত্তি করে যুক্তি দেখান যে, কিছু প্রাচীন পুরাণে রামের জীবন কথা আছে, কিন্তু সেখানে সীতা ত্যাগের কোনো প্রসঙ্গ নেই, যেমন, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, বায়ুপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ।

কিন্তু ওইসব পুরাণে যেমন নেই, তেমনি আবার বহু পুরাণে তা আছে। যেমন, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎ গাথা, প্রাচীন সংগ্রহ গাথা, অধ্যাত্মরামায়ণ, আনন্দরামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ইত্যাদি। রাম কথার এই সব লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সীতাত্যাগের প্রসঙ্গ এনেছেন। মূলে কোনো ভাবে নিশ্চয়ই সীতাত্যাগের কথা ছিল, যা অবলম্বন করে পরবর্তী সাহিত্যে তা বিস্তার লাভ করেছে।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৪২-৫২ সর্গ) রাম পরিহাস ছলে ভদ্র নামে তাঁর এক সভাসদের কাছে সীতা প্রসঙ্গে প্রজাদের লোক অপবাদের কথা শুনলেন। কালিদাস তাঁর রঘুবংশে (১৪ সর্গে) বলেছেন, প্রজাদের এই কুৎসা রটনার সংবাদ দিল যে ভদ্র সে রামের সভাসদ নয়, রামের গুপ্তচর। ভবভূতি তাঁর উত্তররামচরিতম্ (১ম অঙ্ক) এ বলেছেন, ওই গুপ্তচরের নাম ভদ্র নয়, দুর্মুখ। অধ্যাত্মরামায়ণ (৭/৪/৪৭) এবং আনন্দরামায়ণ (৫/৩/২১) এ একই লোক-অপবাদেব কথা আছে, তবে গুপ্তচরের নাম সেখানে বিজয়। কবি বিমলসূরী তাঁর 'উত্তমচরিয়ম্' (৯২-৯৪ পর্ব)-এ সীতা ত্যাগ প্রসঙ্গে জনতার সেই নির্বোধ রটনাকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন, তারা পাপমোহিতমতি, পরদোষগ্রহণরত, স্বভাবকুটিল, শঠশীল।

গুণাঢ্য কৃত 'বৃহৎ কথা' এবং সোমদেব ভট্ট প্রণীত 'কথাসরিৎসাগর' (৯/১/৬৬)-এ এইরকম আছে যে, একদিন রাম ছদ্মবেশে রাজ্য পরিভ্রমণ করছেন, তখন দেখেন ধোবী নামে এক গৃহস্বামী তার স্ত্রীকে হাত ধরে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিচ্ছে। স্ত্রী বলছেন, আমি বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, তাতেই স্বামী আমাকে ত্যাগ করছেন। কিন্তু সীতা দীর্ঘদিন পরপুরুষের গৃহে বাস করলেও রাম তাঁকে ত্যাগ করেননি। মনে হচ্ছে আমার স্বামী রামের চেয়েও বেশি নীতিপরায়ণ। শুনে রামের মনে দারুণ দুঃখ হল। এই লোক-অপবাদের জন্য রাম শেষে সীতাকে ত্যাগ করলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ (৯/১১), পদ্মপুরাণ (৪/৫৫), জৈমিনীয় 'অশ্বমেধ' (২৬ অধ্যায়), তিব্বতী রামায়ণ এবং তামিল রামায়ণেও ওই একই ধোবী বৃত্তান্ত সামান্য কিছু রকম-ফের করে বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া প্রাচীন 'সংগহ্ গাথা' (উপদেশপাদ/১৪) এবং আনন্দরামায়ণ (জন্মকাণ্ড. ৩য় সর্গ) ইত্যাদিতে ষড়যন্ত্র করে রাবণের একটি চিত্র সীতার কাছে রেখে দিয়ে, তাই দেখিয়ে রামের মনে সন্দেহ সৃষ্টি কয়ার গল্প আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে (৭/৪৪-৫৫) এই চিত্র ষড়যন্ত্রের কথা এবং ধোবী বৃত্তান্ত দুইই আছে।...

আব একটা গুরুতর আপত্তি উত্তরকাণ্ডের রাম নাকি নিষ্ঠুর। তৎকালীন সমাজের ন্যায় নীতির প্রবক্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে রাম তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিকতা হারিয়েছেন। সামাজিক সমস্যার সমাধান রামচরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসেছে।

কিন্তু উত্তরকাণ্ডের রাম যদি নিষ্ঠুর হন তাহলে যুদ্ধকাণ্ডেব শেষে রাম কি? সকলের সমক্ষে নির্মম ভাষায় কদর্যভাবে সীতাকে যে অপমান তিনি করলেন, যে কটূক্তি যে হৃদয়হীন ব্যবহার তিনি করতে পারলেন, তাতে তো আমরা নিজেদের চোখ কানকেই বিশ্বাস করতে

পারিনি। তাঁর সেই নিষ্ঠুর আচরণে যত বিস্মিতই হই না কেন, তবুও তো তাঁকে আমরা বাল্মীকির রাম বলেই মানি। এসব সত্ত্বেও আমরা বলি, রাম নিষ্ঠুর নন, তাহলে তাঁর চোখে এমন আকুল অশ্রু কেন? বুকে এমন সন্তপ্ত নিঃশ্বাস কেন? মুখখানি শুষ্কপদ্মের মতো এমন ম্লান কেন? সীতার জন্য আমাদের অন্তরে যেমন ব্যথা বাজে, তেমনি রামের জন্যও আমাদের এত কষ্ট হয় কেন? আসলে নিষ্ঠুর রাম নন, নিষ্ঠুর তাঁর অন্তরের সংঘাত! তাঁর পরিস্থিতি, তাঁর ভাগ্য।

মহাকবির দৃষ্টিতে কোনো পক্ষপাত থাকে না। সাধু হোক আর পাপী হোক, ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, প্রত্যেকটি চরিত্র সমান যত্নে সমান অভিনিবেশে তিনি প্রকাশ করেন। চরিত্র হিসেবে সে যা, সে যা করে, বা সে যা করতে চায়, তাকে সঠিক জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্য বা কাব্য। যুধিষ্ঠির হোক আর দুর্যোধন হোক, রাম হোক আর রাবণ হোক, চরিত্র হিসেবে যথাযথ এবং জীবন্ত করে প্রকাশ করাই মহাকবির ধর্ম। তাঁর লক্ষ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি, রূপ সৃষ্টি, জীবন সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকর্মে তিনি ঈশ্বরের মতোই উচিত অনুচিত মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি সমান নিরপেক্ষ। চরিত্রের স্বভাব অনুসারে কেউ সাধু হতে পারে, আবার কেউ অসাধুও হতে পারে, সদয় হতে পারে, নিষ্ঠুরও হতে পারে, তবে তার হওয়াটা যেন স্বাভাবিক ও অনিবার্য হয়।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, "চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবি করবই। অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক, তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে।.. কোন বিশেষ চরিত্রের মানুষ মুসলমানের ঘরে থেকে প্রত্যাহৃত স্ত্রীকে আপন স্বভাব অনুসারে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, গল্পের বইয়ে তার নেওয়াটা বা না নেওয়াটা সত্য হওয়া চাই, কোন প্রবলেমের দিক থেকে নয়।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫১৫)

এখানেও সেই প্রশ্ন, রাম সীতার প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছেন বলে কাব্যের দিক থেকে কিছু নয়, কিন্তু দেখতে হবে এই হওয়াটা রামের চরিত্রের দিক থেকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য কিনা।

পরপুরুষের স্পর্শে সীতা কলুষিত হয়েছেন, রামের মনে এই তীব্র জ্বালা ও দুঃখ তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। এখানে উচিত অনুচিতের কথা আসে না। মনের এই দৃঢ়মূল সংস্কারের কথা রাম অত্যন্ত স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন। একবার অরণ্যকাণ্ডে, আর একবার যুদ্ধকাণ্ডে। বলেছেন, "এ দুঃখ আমার পিতার মৃত্যু ও রাজ্য হারানোর চেয়েও মর্মান্তিক। এ আমার চরম দুঃখ। ন দুঃখতরমস্তি মে।" (অরণ্যকাণ্ড, ২/২১) এরপরে অনেকদিন রাক্ষসগৃহে বাস করেছেন যে সীতা (রক্ষোগৃহচিরোষিতাম্) তাঁর চরিত্রের প্রতি সন্দেহও ব্যক্ত করেছেন — "প্রাপ্তচরিত্রসন্দেহা" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১০/১৭)। তাঁর নিজের মন থেকে যদি-বা পরে এই সন্দেহ দূর হয়ে গিয়ে থাকে, কিন্তু প্রজাদের মন থেকে তা যায়নি। বরং ক্ষ্যাপা কুকুরের বিষের মতো তা রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি রাজা, প্রজাদের বিচারক। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রজারাই অলক্ষ্যে তাঁর বিচারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রজারা যেমন তাঁর বিচারকে উপেক্ষা করতে পারে না, তেমনি রামও পারেন না প্রজাদের মৌন অভিযোগকে উপেক্ষা করতে। একদিকে জীবনের সুখ, অপর দিকে রাজার কর্তব্য, একদিকে চিরবিশুদ্ধা জানকী, অপর দিকে অযোধ্যার

রাজা ও রাজবংশের কর্তব্য ও কীর্তি, মাঝখানে মৌন অভিযোগ নিয়ে তর্জনী তুলে দাঁড়িয়েছে প্রজাবৃন্দ। রাম এখানে বিচারক নন, তিনিই বিচারপ্রার্থী। রাম সীতাকে দণ্ড দেননি, তিনিই দণ্ডিত হয়েছেন। উত্তরকাণ্ডের রামের জীবনের ভিতর দিয়ে কবি এই বার্তাই কি আমাদের দেননি?

তাছাড়া রাজ্য হিসেবে বামের কর্তব্য ও দায়িত্ব হল তৎকালীন নীতি ধর্ম ও ন্যায় অনুসারে সমাজে চাতুর্বর্ণ্য রক্ষা করে সুশৃঙ্খল এক জীবন ব্যবস্থা দৃঢ় কবা। যা কিনা প্রাচীন ভারতের, এমনকী গ্রীক ও রোমান সভ্যতার যুগেও এক উচ্চ আদর্শ বলে গণ্য। এক্ষেত্রে আধুনিক রোমাণ্টিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং তারই আনুষঙ্গিক যে ভাবপ্রবণ নীতিবোধ, তাই দিয়ে রামের জীবনকে বিচার করা সঙ্গত হবে না। রাম সমাজের সার্বিক আদর্শের কাছে তাঁর নিজের ও সীতার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়েছেন। উত্তরকাণ্ডের এই রাম যদি বাল্মীকির রাম না হন, এই রামকে যদি আমরা সরিয়ে নিই, তাহলে সমগ্র রামায়ণের নায়কের স্থানই শূন্য হয়ে পড়ে না কি?

ছত্রিশ

সীতা ত্যাগ

প্রতিহারি জরুবি বার্তা নিয়ে এল, "মহাবাজ, আপনাদেব ডেকেছেন"।

ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তখনই ছুটে গেলেন। রামের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান। দেখেন রাম বিষণ্ণ মলিন মুখে মাথা নিচু করে বসে আছেন। যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র অথবা অস্তগামী সূর্যেব মতো ম্লান মুখে তাঁর শোকেব ছায়া। শুষ্কপদ্মের মতো শ্রীহীন। দুই চোখে তাঁর অশ্রুর ধারা।

মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভযা পরিবর্জিতম্।
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে।

(উত্তরকাণ্ড, ৪৪/১৫-১৬)

তাঁরা বিস্মিত অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন।..

রামও অশ্রুপূর্ণ নয়নে করুণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কথা বলতে পারছেন না।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করে রাম তাঁদের হাত ধরে বললেন, "বোসো। তোমাদের সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। তোমরাই আমার জীবন, আমার সর্বস্ব। এ রাজ্য তোমাদের। আমি পালন করি মাত্র। তোমরা বুদ্ধিমান। তাই আমি যা বলব মন দিয়ে শোনো।"

তাঁকে এমন বিষণ্ণ ও গম্ভীর দেখে ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন একসঙ্গে বিচলিত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। উৎকণ্ঠায় ও উদ্‌বেগে নীরবে চেয়ে থাকেন শুধু। তাঁদের মুখে কোনো কথা সরে না।

বাষ্পাকুল কণ্ঠে রাম বললেন, "সীতাকে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে নিন্দা ও অপবাদ রটেছে। প্রজারা আমাকেও ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। তাদের সেই নিন্দা আর ঘৃণা আমার মর্ম বিদীর্ণ করছে। মহান ইক্ষ্বাকুবংশে আমার জন্ম, আর জনকের পবিত্র কুলে জন্মেছেন সীতা। তাই রাবণ বধের পরে আমার মনে সংশয় হয়েছিল, সীতাকে পুনর্বার গ্রহণ করা উচিত হবে কিনা। যদিও আমার অন্তরাত্মা জানে সীতা শুদ্ধচরিত্রা। তারপর দেবতা ও ঋষিগণ এবং স্বয়ং অগ্নি এসে বললেন যে সীতার কোনো পাপ নেই। তাই আমি সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন প্রজাদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে এই ঘোর অপবাদ ও নিন্দা আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট

দিচ্ছে। মানুষের জীবনে অখ্যাতি ও অপযশ হল নরকবাস। আজ আমি সেই নরকে নিমজ্জিত। এর চেয়ে গভীর দুঃখ আমার নেই।"

রামের কণ্ঠস্বর ব্যথায় আবেগে গাঢ় হয়ে আসে। আর তাঁর সম্মুখে বসে তিন ভাই বিমূঢ় স্তব্ধ নির্বাক।

— "যদি তোমরা আমার সম্মান রাখতে চাও, যদি আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্য থাকে, তাহলে আমি যা আদেশ করব তা নীরবে পালন করবে। কোনো প্রতিবাদ করবে না। কোনো তর্কবিচার করবে না। আমার চরণ ও প্রাণের দিব্য দিয়ে বলছি, আমাকে নিবৃত্ত করার জন্য যদি কোনো অনুনয় বিনয় করো, যদি আমার কথায় বাধা দাও, তাহলে আমি শপথ করে বলছি, — আমার মনে যে শুধু কষ্ট হবে তাই নয়, তোমাদের সেই আচরণকে শত্রুতা বলে মনে করব।"

রাম এবার লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সৌমিত্র, তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রের সাথে রথে করে সীতাকে নিয়ে যাবে। গঙ্গার পরপারে তমসানদীর তীরে বাল্মীকির যে পবিত্র আশ্রম আছে, সেখানে কোনো নির্জন স্থানে সীতাকে ত্যাগ করে আসবে।" বলতে বলতে রামের চোখ দুটি জলে ভরে এল। ব্যথিত গজরাজের মতো শোকে দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সন্তপ্ত হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল।

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ বিহিতেক্ষণঃ।।
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ।।

(উত্তরকাণ্ড, ৪৫/২৪-২৫)

রামের অন্তরের সেই নিগূঢ় ব্যথার কোনো প্রকাশ নেই, গভীর সমুদ্রতলের মতো তা নিথর। কবি ভবভূতি রামের অন্তরের এই দুঃখকে ব্যক্ত করে বলেছেন, যেন বদ্ধ পাত্রের মধ্যে ফুটন্ত অগ্নিপাক—

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথং।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ।।

(উত্তররামচরিতম্, ৩/১)

নিথর বেদনার সেই নির্বাক মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলা যায় না। হৃদয়ের মর্মমূল কেঁপে ওঠে — "তমবলোক্য কম্পিতমিব সবন্ধনং হৃদয়ম্" (উত্তররামচরিতম্, ৩/২)।

তাই ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নও কোনো কথা বলতে পারলেন না।...

পরদিন প্রভাতে রথ প্রস্তুত।

বিষণ্ণ লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

পরমানন্দে সীতা বহুমূল্য বসন ও বিবিধ রত্নরাজি নিয়ে রথে উঠতে উঠতে বললেন, "আমি গঙ্গাতীরে ঋষিদের আশ্রম দর্শন করতে চাই বলে মহারাজকে বলেছিলাম। তাই তিনি রথ পাঠিয়েছেন। লক্ষ্মণ, এইসব রত্ন ও বসন আমি ঋষিপত্নীদের উপহার দেব।"

লক্ষ্মণ কোনো কথা বললেন না।

সীতা রথে আরোহণ করলেন।

রথ চলতে লাগল।..

যেতে যেতে সীতা এক সময় বললেন, লক্ষ্মণ, আমার কেমন অস্থির লাগছে। শরীর কাঁপছে। পৃথিবী শূন্য মনে হচ্ছে। কি এক অজানা আশঙ্কায় মন উতলা হয়ে পড়ছে। কেমন যেন অমঙ্গল দেখছি। আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে। সকলে কুশলে আছেন তো?" এই বলে সীতা বারবার করজোড়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করতে লাগলেন।...

লক্ষ্মণ শুকনো মুখে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। আর নির্বাক পাথর মূর্তির মতো বসে রথ চালনা করছেন সুমন্ত্র।

রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ প্রান্তর পেরিয়ে রথ চলেছে। চারিদিকে খা খা শূন্যতা। দূরের আকাশে দু-একটা নিঃসঙ্গ চিল উড়ছে। কেবল পথের ধূলায় রথের চাকার শব্দ আর ধাবমান অশ্বক্ষুরধ্বনি।

পথে গোমতী নদীর তীরে এক ঋষির আশ্রমে তাঁবা রাত্রিবাস করলেন। পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা করে দ্বিপ্রহর বেলায় তাঁরা গঙ্গার তীরে এসে উপস্থিত হলেন।

সীতা বললেন, "লক্ষ্মণ, আমার কতদিনের সাধ, গঙ্গাতীরের ঋষিদের আশ্রম দেখব, আমরা এখন সেখানে এসে গেছি। তুমি আমাকে গঙ্গা পার করে ঋষিদের পুণ্য আশ্রমে নিয়ে চলো। আমি তাঁদের পূজা দেব, অর্ঘ্য দেব, তারপর এক রাত্রি আশ্রমে বাস করে রাজপুরীতে ফিরে যাব।"

শুনে লক্ষ্মণ হঠাৎ আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন। তখন সীতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "লক্ষ্মণ, ওকি, এমন করে কাঁদছ কেন?" তিনি সরল মনে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাই সস্নেহে লক্ষ্মণকে আশ্বস্ত করতে .চেষ্টা করেন।

তাঁরা গঙ্গা পার হলেন।...

তীরে এসে লক্ষ্মণ ক্রন্দনরত কণ্ঠে হাতজোড় করে বললেন, "দেবি, রাম পরম জ্ঞানী, কিন্তু তিনি আজ আমাকে এক ভীষণ লোকনিন্দিত নিষ্ঠুর কাজে নিয়োগ করেছেন। দুঃখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। এর চেয়ে আজ আমার মৃত্যু হলে ভাল ছিল। দেবি, আমার অপরাধ নেবেন না।"

লক্ষ্মণ উদ্‌বেল কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

ব্যথিত বিস্ময়ে সীতা জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মণ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে, তুমি আমাকে স্পষ্ট করে বলো, আমার আদেশ।"

নতমুখে চোখের জলে লক্ষ্মণ বললেন, "দেবি, আপনার সম্বন্ধে প্রজাদের মধ্যে অপবাদ রটেছে। সে কথা আপনাকে আমি বলতে পারব না। রাম ক্রোধে দুঃখে আপন হৃদয়ে তা গোপনে সহ্য করছেন। মহারাজ নিজে আমাকে বলেছেন যে আপনি নির্দোষ। তবু কেবল প্রজাদের অপবাদের ভয়ে তিনি আপনাকে ত্যাগ করেছেন। আমি আপনাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের প্রান্তদেশে রেখে যাব। মহাযশা বাল্মীকি আমাদের পিতা দশরথের সখা, আপনি সেই

মহাত্মার চরণছায়ায় বাস করুন। পাতিব্রত্য অবলম্বন করে ধ্যানে পুণ্যে আপনার এই আশ্রমবাস পরম কল্যাণকর হবে।"

শুনে সীতা শোকে দুঃখে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ক্ষণকাল পরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "লক্ষ্মণ, বিধাতা আমাকে দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমার জীবনে সকল দুঃখরাশি মূর্তি ধরে আসে। আমি পূর্বজন্মে কি পাপ করেছি? কোন অভাগীর স্বামীবিচ্ছেদ ঘটিয়েছি? যাব জন্য আজ আমি সতীসাধ্বী হয়েও রাজা আমাকে ত্যাগ করলেন? পূর্বে বনবাসে রাম সঙ্গে ছিলেন, তাই সকল দুঃখ অক্লেশে সহ্য করেছি। কিন্তু এবার একাকিনী এই নির্জন আশ্রমে আমি কেমন করে থাকব? আশ্রমের মুনিগণ যখন জিজ্ঞাসা করবেন, রাম তোমাকে কেন ত্যাগ করেছেন? তুমি কি অসৎ কাজ করেছ? তখন আমি তাঁদের কি জবাব দেব? আমার গর্ভে রাজবংশের সন্তান রয়েছে, নইলে আজই জাহ্নবীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিতাম। সৌমিত্র, তুমি রাজার আজ্ঞা পালন করো, আমাকে ত্যাগ করে যাও। সকলকে আমার প্রণাম জানিও। আর ধর্মনিষ্ঠ রাজাকে আমার কথা জানিয়ে বলো, সীতা শুদ্ধচরিত্রা, সীতা আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী, আপনার প্রেম ও মঙ্গলব্রতচারিণী। কেবল লোক-অপবাদের ভয়ে আমাকে ত্যাগ করেছেন। তাই যাতে আপনার কোনো নিন্দা অপবাদ স্পর্শ না করে তা দেখা আমারও কর্তব্য। আপনি আমার পরম গতি। নিজের জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ হয় শুধু আপনার জন্য। প্রজাদের কাছে আপনার যে অপবাদ হয়েছে, তা যেন দূর হয়।"

সীতার এই মর্মন্তুদ কথাগুলিতে নির্জন আশ্রমের অরণ্য বাতাস কেঁপে উঠল। আকাশে যেন সজল ছায়া ঘনিয়ে এল। হু হু করে গঙ্গার শীতল হাওয়া বয়ে গেল দিক্‌শূন্য হাহাকারের মতো।

সীতা অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু পাছে এই নিয়ে প্রজাদের মধ্যে আবার নতুন করে কোনো অপবাদ সৃষ্টি হয়, এই ভয়ে সীতা এবার দুঃখে লজ্জায় আর্তনাদ করে বললেন, "লক্ষ্মণ, তুমি দেখে যাও আমার ঋতুকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। নিরীক্ষ্য মাদ্য গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্তিনীম্।" (উত্তরকাণ্ড, ৪৮/১৯) ভবিষ্যৎ অপবাদের আশঙ্কায় সীতা সকল লজ্জা ভুলে লক্ষ্মণকে সাক্ষী মানতে চাইছেন, বলছেন, তুমি আমার শরীরের গর্ভলক্ষণ দেখে যাও।

দুঃখের শোকের মর্মমূল ছিন্ন করে এমন তীব্র নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করা, দীর্ঘ করুণ সংলাপের মধ্যে এমন হঠাৎ মোচড় দিয়ে পাঠকের হৃদয়কে ব্যথার আঘাতে খান খান করা, কবিত্বের এই বিরল উৎকর্ষ এমনকী বাল্মীকির কাব্যেও দ্বিতীয়টি নেই।

পরিস্থিতির এই আকস্মিকতায় হতচকিত লক্ষ্মণ দুঃখে ভয়ে শিউরে ওঠেন, "দেবি আপনি কী বলছেন? ওই চরণযুগল ছাড়া কোনোদিন আপনার রূপ আমি দেখিনি। রাম এখানে নেই। এই বিজন বনে কেমন করে আপনার অঙ্গের দিকে আমি তাকাব?"

দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে।।
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে।

(উত্তরকাণ্ড, ৪৮/২১-২২)

অসহায় লক্ষ্মণ সীতাকে প্রণাম করে চোখের জলে প্রস্থান করলেন।

লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হলেন।

ক্লিষ্ট বিষাদে অবসন্নের মতো রথে উঠলেন।

তাকিয়ে দেখেন ওপারে যশস্বিনী সীতা ঋষির আশ্রম কাননে অনাথার ন্যায় রোদন করছেন। একটু পরে শান্ত চরণে তপোধন বাল্মীকি এলেন তাঁর কাছে। ঋষি আশীর্বাদ করে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

— "সুমন্ত্র, ওই দেখ, সীতা মহর্ষির অনুগমন করে আশ্রমে প্রবেশ করছেন। সীতাকে ত্যাগ করে রামের যে কী দুঃখ তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। মনে হয় এসব দৈব, দৈবকে খণ্ডন করা অসাধ্য। আচ্ছা সুমন্ত্র, বলতে পার, যতসব অনর্থবাদী পৌরজনের কথা শুনে রাম এই যে যশনাশক কর্ম করলেন এতে কোন ধর্ম সাধিত হল?"

কো নু ধর্মাশ্রয়ঃ কর্মণ্যস্মিন্ যশোহরে।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ।।

(উত্তরকাণ্ড, ৫০/৮)

সুমন্ত্র বললেন, "লক্ষ্মণ, তুমি সীতার জন্য দুঃখ করো না। সীতার এই নির্বাসন ভবিতব্য। অনেকদিন আগেই তোমার পিতার কাছে ঋষি দুর্বাসা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এই গোপনীয় বিষয় মহারাজ দশরথ তোমাদের বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। রাম সারাজীবন ধরে কঠোর দুঃখ ভোগ করবেন। তিনি কখনও সুখী হবেন না। কালের অমোঘ বিধানে রাম সীতাকে ত্যাগ করবেন। ভরত শত্রুঘ্ন এবং তোমাকেও তিনি ত্যাগ করবেন। এসব কথা তোমাকে আমার বলা উচিত নয়, তবু তোমার আগ্রহ দেখে বলছি। কিন্তু ভরত শত্রুঘ্নকে একথা বোলো না। একবার মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়েছেন। সেখানে দুর্বাসাও উপস্থিত। মহারাজ দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, আমাদের বংশের ভবিষ্যৎ কি বলুন। দুর্বাসা বললেন, মহারাজ, আমি এক পুরাবৃত্ত বলছি শুনুন। একবার দৈত্যরা দেবতাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ঋষিপত্নী দৈত্যদের অভয় দেন। বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীকে বধ করেন। পত্নীকে নিহত দেখে ভৃগু বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, আমার পত্নী অবধ্যা, তবু তুমি তাকে ক্রোধের বশে নিহত করেছ। আমি অভিশাপ দিলাম, তোমাকেও মনুষ্যজন্ম নিতে হবে এবং বহুবর্ষ স্ত্রীবিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করতে হবে। মহারাজ, বিষ্ণুই আপনার পুত্র রামরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন। সীতার গর্ভে তাঁর দুই পুত্র হবে।"

সুমন্ত্র বলে চলেন।

কেশিনী নদীর ধার দিয়ে মন্থর গতিতে রথ চলেছে।

অপরাহ্ন হয়ে এল।

পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা।

শ্রান্ত লক্ষ্মণ বললেন, "সুমন্ত্র, সন্ধ্যা হয়ে গেল। আজ আমরা এই কেশিনী নদীর তীরেই রাত্রি যাপন করব।"...

নদীর স্রোতের মতোই জীবনের এক অনিবার্য গতি আছে। কালের ধারার মতো তা দুর্নিবার। মহাকাব্যের মধ্যে কবি মহাকালের সেই অমোঘ গতিধারাকেই নির্দেশ করে দেন। তাকেই বলে দৈব নিয়তি বিবেক — deus cxmachina।

এর ব্যতিক্রম হয় না। খণ্ডন করা যায় না। যা হবার তা হবেই। জীবনের এই অলঙ্ঘনীয় পরিণামকে কাব্যে দেখানো হয় এক বিশেষ আঙ্গিকে, তাকে বলে অভিশাপ। এইসব অভিশাপ অথবা ভবিষ্যৎবাণী যেন মহাকালের কণ্ঠ। আমরা অবোধ মন নিয়ে ভাবি, এমনটি না হয়ে তো অন্য রকমও হতে পারত? রাম সীতাকে ত্যাগ না করলে কি এমন ধর্ম অশুদ্ধ হত? যখন তিনি নিজেই মনে প্রাণে জানেন যে সীতা নিষ্পাপ? মূর্খ জনতার কথার বিষে তিনি নিজের বিবেককে বলি দিলেন কেন? আর কি কোনো উপায় ছিল না?

সত্যিই রামের কোনো উপায় ছিল না। থাকলে বাল্মীকি রামকে এতখানি দুঃখ দিয়ে আমাদের এমন করে ব্যথা দিতেন না। রামায়ণকে এমন ব্যথার দান হিসেবে চোখের জলে আমাদের গ্রহণ করতে হত না। সীতার চেয়ে রামের দুঃখ বেশি। আবার রামের চেয়েও বেশি দুঃখ আমাদের। আমরা যারা রাম সীতাকে ভালোবাসি।

রাম যদি সীতাকে ত্যাগ না করতেন তাহলে কি হত? সকল প্রজার মৌন ঘৃণা ও ধিক্কারের উপরে দুর্নাম মাথায় নিয়ে রাম বসে থাকতেন, নিন্দিত রানিকে নিয়ে কুখ্যাত রাজা। জনরব আরও মুখর হয়ে সীতার কলঙ্ককে আরও গ্লানিকর করে তুলত। তাতে না থাকত সীতার মর্যাদা, না রামের।

সীতাকে বনবাস না দিয়ে যদি রাম তাঁকে পিতৃগৃহে জনকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, তাহলেও অযোধ্যার দুর্নামের পাঁক মিথিলায় গিয়ে ছড়িয়ে পড়ত। সীতার কলঙ্ক তাতে মোচন হত না।

আবার রাম যদি সিংহাসন ত্যাগ করে সীতাকে নিয়ে বনবাসী হতেন তাহলে বর্তমানকালেব পাঠক আমরা আদর্শ প্রেমিক হিসেবে রামকে অনেক বাহবা দিতাম বটে, কিন্তু তখনকার দিনের সমাজ ও জনতা রামের দিকে অবজ্ঞার আঙুল তুলে বলত, "ওই যে চলেছে রাজধর্মত্যাগী বনবাসী স্ত্রৈণ রাজা!"

অতএব কোনো অবস্থাতেই সীতার বা রামের সম্মান রক্ষা হত না। পরন্তু লোকের চোখে হতমান হয়ে পড়ত ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব ও মহিমা। যা রাম প্রাণ থাকতেও হতে দিতে পারেন না।

তাই অনেক চিন্তা করে রাম যে ব্যবস্থা করলেন এর চেয়ে ভাল আর কিছু করার ছিল না। সীতাকে নিজের কাছে রাখলেন না, তাঁর পিতৃগৃহেও পাঠালেন না, রামের সবচেয়ে আপন ও বিশ্বস্ত লক্ষ্মণকে দিয়ে রেখে এলেন মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে। বাল্মীকি একে দেবকল্প মহর্ষি, তাতে তিনি রাজা দশরথের সখা, তাঁর পুণ্য আশ্রমে বাস করাব চেয়ে সীতার পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় আর নেই। সীতাকে রাম নির্বাসন দেননি। বাল্মীকির আশ্রমে প্রত্যর্পণ করেছিলেন মাত্র, কেবল জনমত প্রশমনের জন্য। সীতাকে রেখে দিলেন এমন এক পুণ্যস্থানে যেখানে সংসারের কোনো আবিল বাতাস পৌঁছায় না। অপবাদপরায়ণ সাধারণ জনতার প্রগলভ জিহ্বা যেখানে কোনো কুৎসা রটনার অবকাশ পাবে না।

আর এদিকে রাম নিজে তাঁর আপন দুঃখের বিধ নিঃশব্দে পান করলেন। বিষে যেমন বিষক্ষয়, তেমনি দুঃখেই দুঃখের নির্বাপণ — "দুঃখিতৈর্দুখনির্বাপণানি" (উত্তররামচরিতম্, ৩/২৯)।

রামের সেই দুঃখকাতর করুণ মূর্তিখানি কবি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণের রথ যখন চলে গেল তখন থেকে চারদিন রাম কারওর সঙ্গে দেখা করেননি। নির্জনে একাকী কেবল অশ্রুবর্ষণ করেছেন। বীরের এই অশ্রুপাতে সীতার পবিত্রতাকে আরও উজ্জ্বল করে ধরেছে। লক্ষ্মণ ফিরে এসে দেখেন রাম দীনচিত্তে বিরলে বসে আছেন সাশ্রুনয়নে — "রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং..." (উত্তরকাণ্ড, ৫২/৬)

প্রজাদের ইচ্ছাকে মেনে নিলেও রাম কিন্তু প্রজাদের অপবাদকে স্বীকার করেননি। সীতার অপবাদের বিরুদ্ধে প্রজাদের সামনে প্রকাশ্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন রাম। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, সীতা যেমন তাঁর পত্নী ও সহধর্মিনী ছিলেন তেমনি আজও আছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সময় একটা সমস্যা দেখা দিল। পত্নী ছাড়া যজ্ঞ হয় না। রাম তাহলে কী করবেন? সীতার সোনার প্রতিমা গড়ে যজ্ঞস্থলে পত্নীর আসনে সেই প্রতিমা রেখে রাম যজ্ঞ করলেন। এই আচরণের ভিতর দিয়ে রাম যেন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, সীতাকে তিনি ত্যাগ করেননি। কালিদাস যথার্থই বলেছেন, রাম সীতাকে গৃহের বাহিরে রাখলেও মনের বাহিরে রাখেননি — "গৃহান্নিরস্তা ন তেন মনস্তঃ" (রঘুবংশ, ১৪/৮৪) ভবভূতিও বলেছেন, সীতার জীবনে যত দুঃখই থাক, তাঁর বুকে স্বামীকর্তৃক পরিত্যাগের যে লজ্জা ও অপমান শেলের মতো বিঁধে ছিল, রাম তা উৎখাত করে দিলেন — "উৎখাতমিদানীং মে পরিত্যাগলজ্জশল্যমার্যপুত্রেণ" (উত্তররামচরিতম্, ৩/৪৬)।

সীতার জীবনে এ এক পরম আনন্দের সান্ত্বনার কথা। তিনি বুঝতে পেরে তাই তিনি মনে মনে বলেছিলেন, "আর্যপুত্র, তুমি আমার সেই আগের মতোই আছো। আর্যপুত্র, ইদানীমসি ত্বম্।" (ভবভূতি, উত্তররামচরিতম্, ৩/৪০)

মূঢ় জনতার অপবাদ কলুষ থেকে আড়ালে রাখার জন্যই রাম সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে এসেছিলেন। বিশেষ করে তিনি এও জানতেন সীতা অন্তঃসত্ত্বা, তাঁর ভাবী সন্তানের নিষ্পাপ শিরে যাতে কোন কলঙ্ক বর্ষিত না হয় সেকথাও ভেবেছিলেন। এবং বর্ষণমুখর শ্রাবণ মাসের রাত্রে যখন সীতার সন্তান প্রসব হয়, তখন শত্রুঘ্ন যে একা হঠাৎ বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন (উত্তরকাণ্ড, ৬৬ সর্গ) এবং নবজাতকদের দর্শন করে, সীতাকে সম্ভাষণ ও প্রণাম করে তিনি আনন্দিত মনে পরদিন সকালেই যে চলে গেলেন এটা নেহাৎ আকস্মিক কাকতালীয় বলে মনে হয় না। এর মধ্যে একটা পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা হয়তো ছিল। লবণাসুর বধ করে বারো বছর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে শত্রুঘ্ন আবার এলেন বাল্মীকির আশ্রমে। রামের দুই পুত্র লব কুশের রামায়ণ গান শুনলেন। শত্রুঘ্নের চোখে ঘুম এল না। সারারাত জেগে অনেক কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর রাত ভোর হয়ে গেল — "নিদ্রা নাভ্যাগমৎ তদা চিন্তয়ানমনেকার্থং..." (উত্তরকাণ্ড, ৭২/১)। স্বল্পবাক কবির এই ইঙ্গিত বড় লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের এই আসা যাওয়া সংবাদ নেওয়া সমস্তই রইল গোপন। পাছে এই নিয়ে প্রজাদের মধ্যে নতুন করে কোনো ঘোঁট পাকিয়ে ওঠে। একটু ভাবলেই প্রতীয়মান হয় যে, সীতার নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা, তাঁর তত্ত্বাবধান ও সংবাদাদি নেওয়ার একটা সযত্ন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রামের পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কি করার ছিল? সীতাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্য রাম আরও বেশি দুঃখ নিজের বুকে তুলে নিলেন। তাতে সীতার দুঃখ মোচন না হলেও তাঁর দুঃখকে দিয়েছে এক দুর্লভ মহিমা ও মর্যাদা।

সাঁইত্রিশ

শম্বুক বধ

এক শান্ত প্রভাতে রাম সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর পাশে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট গুরুদেব বশিষ্ঠ। মন্ত্রী অমাত্য পরিবেষ্টিত গম্ভীর রাজসভা। প্রজারা রাজ্যের কুশল নিবেদন করছেন।...

এমন সময় হঠাৎ সভার মধ্যে এক আর্ত চিৎকার।

সবাই বিস্মিত বিচলিত। রামের গম্ভীর দৃষ্টিতেও উদ্‌বেগের ছায়া।

সকলকে সচকিত করে এক ব্রাহ্মণ তাঁর মৃত পুত্রকে বুকে নিয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে সভায় প্রবেশ করছেন।

—"মহারাজ, আমি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, কখনও প্রাণী হিংসা করিনি, কোনো পাপ করিনি, তবে কেন আমার এই বালকপুত্রের মৃত্যু হল? এই রাজ্যে অথবা অন্য কোনো রাজ্যে ইতিপূর্বে কখনও কারও অকাল মৃত্যু হয়নি। তোমার রাজত্বে আজ এমন হল কেন? নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ কোনো পাপ আছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজার পাপে প্রজার কষ্ট। রাজা দুরাচারী হলে প্রজার জীবনে অকালমৃত্যু ঘটে। তোমার রাজত্বে অনাচার প্রবেশ করেছে। রাজা, তুমি অধর্ম অনাচার থেকে প্রজাকে রক্ষা করতে পারছ না। ধর্ম রক্ষায় ব্যর্থ রাজা, তুমিই আমার বালকপুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তুমি আমার পুত্রকে জীবিত করে দাও, নতুবা শপথ করছি, আমি ও আমার পত্নী এই রাজসভায় প্রাণত্যাগ করব। ব্রহ্মহত্যার ভাগী হয়ে তুমি সুখে রাজত্ব করো। ব্রহ্মহত্যাং ততো রাম সমুপেত্য সুখী ভব।" (উত্তরকাণ্ড, ৭৩/ ১-১২)

ব্রাহ্মণের শোকার্ত বিলাপ শুনে রাম তৎক্ষণাৎ কাতর চিত্তে উঠে দাঁড়ালেন। বশিষ্ঠ বামদেব এবং মন্ত্রীগণকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করলেন। রামের আহ্বানে সেখানে উপস্থিত হলেন ঋষি মার্কণ্ডেয় মৌদগল্য কশ্যপ কাত্যায়ন জাবালি এবং নারদ।

দেবসঙ্কাশ এইসব ঋষি পুরোহিত ও মন্ত্রীগণের কাছে ব্রাহ্মণের অবস্থা বর্ণনা করে রাম পরামর্শ চাইলেন।

নারদ বললেন, "মহারাজ, যুগের পর যুগ ধর্মের ক্ষয় হয়ে আসছে। যোগ্যতা ও অধিকারভেদ লঙ্ঘন করার জন্য সমাজ ক্রমে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেই তপস্যা করতেন। ব্রাহ্মণের তপোবল প্রভাবে তখন সমাজে অজ্ঞানতা ছিল না, অকালমৃত্যু ছিল না। সত্যযুগের মানুষ ছিল ত্রিকালদর্শী ও জ্ঞানী। কিন্তু ক্রমে ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণের সেই তপোবল ক্ষীণ হয়ে এল। তার ফলে সমাজে অধর্ম এক পা এগিয়ে এল। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ও তপস্যা করতে লাগল। ব্রাহ্মণে আর ক্ষত্রিয়ে আর কোনো বিশিষ্টতা

রইল না। তখন চাতুর্বর্ণ্য স্থাপিত হল। দ্বাপর যুগে এসে অধর্ম আরও এক পা এগিয়ে এল। বৈশ্যরাও তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু এর পরেও ধর্মের এই ক্ষয় চলতে থাকবে। কলিযুগে অধর্ম আরও এক পা এগিয়ে আসবে। তখন শূদ্রও ঘোর তপস্যা করতে আরম্ভ করবে। মহারাজ, আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ কলিযুগের অনুবর্তী হয়ে আপনার রাজ্যে হয়তো কোনো অনধিকারী শূদ্র তপস্যা করছে। সেই পাপেই এই ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু হয়েছে। আপনি রাজ্যের সর্বত্র ভালো করে অনুসন্ধান করে দেখুন।" (উত্তবকাণ্ড, ৭৪/১০-৩০)

নারদের কথা শুনে রাম বললেন, "লক্ষ্মণ, তুমি ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করো। আর ব্রাহ্মণ বালকের মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা করো যাতে তা বিকৃত না হয়। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নগব রক্ষার ভার রইল তোমাব ও ভরতের উপর।"

এই বলে রাম পুষ্পক বিমানে করে রাজ্যের সকল দিক্ পরিদর্শন করতে লাগলেন। পূর্বে উত্তরে পশ্চিমে কোথাও অনাচার দুষ্কৃত দেখতে পেলেন না। তখন রাম দক্ষিণ দিকে এলেন। দেখেন শৈবল পর্বতের উত্তরে এক মনোরম স্নিগ্ধ সরোবর। সেই সরোবরের তীরে এক উগ্র তপস্বী অধোমুখে লম্বমান হয়ে কঠোর তপস্যা করছেন।

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমাঁল্লম্বমানমধোমুখম্।।

(উত্তরকাণ্ড, ৭৫/১৪)

রাম অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সুব্রত, আপনি ধন্য। আমি দাশরথি রামচন্দ্র, কৌতূহলবশে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কেন এই দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধন করছেন? আপনার এই উগ্র তপস্যার অভীষ্ট কি? আপনি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, না শূদ্র? সত্য বলুন।"

সেই হেঁটমুণ্ড অধোমুখী ঘোর তপস্বী তখন উত্তরে বলল, "আমার এই উগ্র তপস্যার উদ্দেশ্য, আমি সশরীরে দেবত্ব লাভ করতে চাই। আমি দেবলোক জয় করে দেবতা হতে চাই। আপনাকে মিথ্যা বলব না, আমি জাতিতে শূদ্র. আমার নাম শম্বুক।"

দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ।
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোক জিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ।।

(উত্তরকাণ্ড, ৭৬/২-৩)

শম্বুকেব কথা শেষ না হতেই রাম তৎক্ষণাৎ তাঁর খড়্গ কোষমুক্ত করে ওই শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ করলেন।

স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল।

এবং দেবতার বরে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র জীবিত হয়ে উঠল।...

কিন্তু নিরীহ তপস্বীর রক্তে রঞ্জিত রামের হাতের ওই খড়্গের দিকে তাকিয়ে আমাদের আধুনিক মনে প্রশ্ন জাগে, রাম এ কি করলেন? কি অপরাধ করেছিল শম্বুক, যে তাকে অমন নির্মমভাবে হত্যা করা হল? সে তো কারও কোনো ক্ষতি করেনি? সে তো তপস্যা করছিল? তপস্যা করা কি অপরাধ? তপস্যাই তো মানুষের ধর্ম? শূদ্র বলে কি সে মানুষ নয়? ব্রাহ্মণের যদি তপস্যার অধিকার থাকে, তাহলে শূদ্রেরই বা থাকবে না কেন? আর নারদের কথাই যদি

মেনে নিই, তাহলেও মানুষে মানুষে এই বর্ণের ভেদ তো কৃত্রিম। ত্রেতাযুগে মনুর সৃষ্টি। সত্যযুগে তো চাতুর্বর্ণ্য ছিল না? তখনও তো মানুষ ছিল? ব্রাহ্মণগণ সমাজে তাঁদের স্বাধিকার ও প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যই কি চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেননি? সমাজে কেন একজনের অধিকার থাকবে, আর একজনের অধিকার থাকবে না? আর সেই অধিকার অর্জন করতে গেলে সে কেন শাস্তি পাবে? তাও প্রাণদণ্ডের মতো এমন নির্মম শাস্তি? রামের রাজত্বে ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই তো প্রজা। প্রজাবৎসল রাম কেন তবে রাজার সমদৃষ্টি হারিয়ে শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার রক্ষার জন্য এমন করে শূদ্রকে হত্যা করলেন? তিনি রাজা, না হত্যাকারী?

বস্তুত তপস্যা মানুষের ধর্ম। শূদ্রও মানুষ। শূদ্রেরও তপস্যার অধিকার আছে। একথা রামচন্দ্র মানেন। কেবল মানেন না, শ্রদ্ধা করেন। তাই অরণ্যকাণ্ডে শূদ্রা তপস্বী শবরীকে তিনি সম্মান জানিয়েছিলেন। শবরীর আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁকে সমাদর করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে তপোধনে, সকল বিঘ্ন নিবারিত করে তোমার তপস্যা বর্ধিত হয়েছে। তুমি জিতক্রোধ সংযতচিত্ত নিষ্ঠাপরায়ণ। সর্বদা প্রসন্ন তোমার চিত্ত। তোমার গুরুশুশ্রূষা সফল হয়েছে।"

কচ্চিত্তে নির্জিতা বিঘ্নাঃ কচ্চিত্তে বর্ধতে তপঃ।
কচ্চিত্তে নিয়তঃ কোপ আহারশ্চ তপোধনে।।
কচ্চিত্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্চিত্তে মনসঃ সুখম্।
কচ্চিত্তে গুরুশুশ্রূষা সফলা চারুভাষিণি।।

(উত্তরকাণ্ড, ৭৪/৮-৯)

সুতরাং প্রশ্ন শূদ্রকে নিয়ে নয়, তার তপস্যা নিয়েও নয়, প্রশ্ন হল কেমন সেই তপস্যা? সব তপস্যা সকলে করতে পারে না, ব্রাহ্মণেও পারে না, তপস্যায় অধিকারীভেদ আছে। অনধিকারী যদি উচ্চতর তপস্যা করে তাহলে তার এবং সকলের পক্ষে তা সমান বিপজ্জনক। শম্বুক যে তপস্যা করছিল, সে তপস্যার অধিকার শূদ্রের তো দূরের কথা, ব্রাহ্মণেরও নেই।

যে তপস্যার অধিকার সাধারণভাবে সকলেব তা হল আত্মশুদ্ধি, সত্তার ও চেতনার উজ্জীবন ও ঊর্ধ্বায়ন। আন্তর ও বাহ্যিক একটা আচারনিষ্ঠা। একটা একাগ্রতা ও শুদ্ধিপরায়ণতা। এ অধিকার সকলেরই আছে। শূদ্রেরও আছে। এর ফলে সমষ্টিগতভাবে সমাজজীবন ক্রমে পরিশীলিত ও পবিত্র হয়ে ওঠে। শবরীর প্রতি রামের প্রীতিসম্ভাষণে এই আদর্শই প্রতিফলিত। একটা ঊর্ধ্বতর গভীরতর চেতনার কর্মগত অভিব্যক্তি। রামচন্দ্র এই আদর্শকে কেবল সমর্থনই করেন না, তাকে পোষণ ও বর্ধন করেন। সেটাই তাঁর রাজধর্ম।

কিন্তু শম্বুকের তপস্যা ছিল একটা উৎকট আসুরিক তপস্যা। নিম্নচেতনার শোধন ও শুদ্ধি নয়, সত্তার ঊর্ধ্বায়নের প্রয়াস নয়, শম্বুক চেয়েছিল তাব আচারবর্জিত অশুদ্ধ আধারে, তার নিম্নতর প্রাকৃত তামস সত্তার ভিতরে দেবত্বকে টেনে নামিয়ে আনতে। শুধু নামিয়ে আনা নয়, সশরীরে স্বর্গ জয় করে দেবতা হতে চেয়েছিল সে। আধ্যাত্মিক সমস্ত মূল্যবোধ ও মাত্রাকে সম্পূর্ণ উলটে দিয়ে, হেয়কে শ্রেয়ের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এ তার নিম্নপ্রকৃতির আত্মভুক কাম ও অহংকারের এক স্ফীতকায় দানবীয় ভোগ। একে তপস্যা বললে তপস্যাকেই অমর্যাদা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বড় চমৎকার করে বলেছেন, "আধুনিক মনের সংস্কার অনুসারে শূদ্র তপস্বী শম্বুককে শ্রীরাম যে বধ করিয়াছিলেন তাহা রামচরিত্রের অনপনেয় কলঙ্ক (বালীবধ ও সীতার বনবাস হইল আর দুইটি কলঙ্ক)। কিন্তু রামচন্দ্র এখানে একটি ধর্মকে, নীতিকে, ব্যবস্থাকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করিতেছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। শূদ্র যদি দ্বিজের অনুকরণে সাধনা বা তপস্যা আরম্ভ করে তাহাব ফল ভালো হয় না। যোগপথের প্রথম বিধানই এই যে প্রথমে প্রয়োজন শুদ্ধি, আধারকে সাত্ত্বিক করিয়া তোলা। অশুদ্ধ আধারে তপোবলের, যোগশক্তির প্রকাশ বা প্রভাব নিম্নতব প্রকৃতিকেই বলীয়ান করিয়া তোলে — অহংকারের সেবায় তাহার প্রয়োগ হয় — রাবণের নিজের তপস্যার ফল যাহা হইয়াছিল। দেবত্বের পদে ও চেতনায় আত্মদানের ফলে নিজে উন্নীত না হইযা, দেববৃন্দকে সে নিজের সেবাকল্পে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রের তপস্যাব স্বরূপ এই আসুরিক তপস্যা — তাহা তাহার নিজের পক্ষে, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেব ব্রতই ছিল পাশব, রাক্ষস, তমোরাজসিক মানবপ্রকৃতির উপবে (বালী ও রাবণ যাহার প্রতীক) একটা সাত্ত্বিক চেতনায় মানবসমাজকে গড়িয়া তোলা, তাঁহার সকল ক্রিয়াব মানদণ্ড এইখানে। তিনি আপনার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যেমন দৃষ্টিপাত কবেন নাই, তেমনি পরের সম্বন্ধেও কোন ব্যক্তিগত কারুণ্য কর্তব্য হইতে তাঁহাকে বিচলিত করে নাই।" ('রচনাবলী', ৫ম খণ্ড, ১৯৭৯, পৃ. ৩৫)।

যদিও এই স্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচাবের যুগে আমরা আজকাল বড় জোরের সঙ্গে কথা বলে থাকি, সব মানুষ সমান। সকলেব মধ্যেই এক ভগবান বিরাজ করেন। আত্মায় আত্মায় কোনো ভেদ নেই। সাধুও ভগবান, পাষণ্ডও ভগবান। সবই এক, এক সত্তা। অতএব ব্রাহ্মণে শূদ্রে এই যে বর্ণভেদ তা কৃত্রিম। এই কৃত্রিম ভেদরেখা টেনে ব্রাহ্মণ তার নিজের স্বার্থ ও অধিকারকে রক্ষা করতে চেয়েছে। এইসব কথা কিছুটা সত্য, অল্প সত্য, কিন্তু সব সত্য নয়। এবং অর্ধসত্য বলে এ মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক।

সব মানুষ যে সমান এটা পারমার্থিক সত্য। কিন্তু ব্যবহারিক সত্য অন্যরকমের। পারমার্থিক একত্বই ব্যবহারিক জগতে নানা ভেদ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এক যেমন সত্য তেমনি নানাত্ব বহুত্বও সমান সত্য। সকল নদীর উৎস একই জল, এবং তারা একই সাগরে গিয়ে মেশে, কিন্তু প্রত্যেকটি নদীর খাত, গতিভঙ্গি, তার জলের দোষগুণ, তার দুই তীরের দেশ ও মানুষ; সব পৃথক পৃথক। তেমনি সব মানুষ এক হলেও ব্যষ্টিগত ও গোষ্ঠিগত ভাবে তাদের গুণ ও কর্ম অনুসারে, স্বভাবের ও প্রকৃতির ধারা অনুসারে তারা সব পৃথক পৃথক।

মানুষের এই একত্ব ও নানাত্বকে সমাজজীবনে একটি সত্যের ভিতরে সমন্বিত ও বিধৃত করছে হিন্দুধর্ম, তার নাম চাতুর্বর্ণ্য। এই বর্ণভেদ কৃত্রিমও নয়, মানুষের সৃষ্টও নয়, এ হল সত্য, মানুষের জীবনের মতোই সত্য। সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, তা স্বতঃসিদ্ধ। সত্যকে বড়জোর আমরা আবিষ্কার করতে পাবি, তার সমন্বিত বিধানকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারি বা অনুসরণ করতে পাবি। চাতুর্বর্ণ্যও তেমনি কেউ সৃষ্টি করেনি, মনু তাকে সমাজজীবনে প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র। একে আমরা অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু যা সত্য তাকে অস্বীকার করলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না। কেবল আমাদের জীবনই ক্ষুণ্ণ হয় মাত্র। মানুষ ও সমাজ যদি থাকে, তাহলে তার বর্ণভেদও আছে। সব দেশে সব কালেহ আছে।

তাকে যে নামই দিই না কেন। যদিও তার ক্রিয়া আজ আরও জটিল ও সূক্ষ্ম হয়েছে, এই যা পার্থক্য। মানুষে মানুষে স্বভাবগত গুণগত বর্ণভেদ আছে এবং থাকবে-- তাকে এক সামঞ্জস্যের মধ্যে পবস্পর পরিপূরক করে ধরাই হল সুস্থ সমাজের আদর্শ।

ভারতবর্ষ তাই সমাজকে দেখেছে ধর্মের এক জীবন্ত দেহ, এক জাগ্রত অবয়ব, এক দিব্যপুরুষ রূপে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন তাদের নিজস্ব ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমস্ত দেহকেই সেবা করে, তেমনি সমাজের চাতুর্বর্ণ্য — ব্রাহ্মণ মুখ, ক্ষত্রিয় তার বাহু, বৈশ্য হল উরু আর শূদ্র তার চরণ।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।

(ঋগ্বেদ, ১০/৯০/১২)

ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যেব সম্পদ আব শূদ্রের সেবা — এই জ্ঞান, শক্তি, সম্পদ ও সেবা নিয়েই সমাজের চাতুর্বর্ণ্য। ব্রাহ্মণ তাঁর জ্ঞান ও তপস্যা দিয়ে সমাজকে পবিত্র শুদ্ধ ও উন্নত করে ধরছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সত্যদৃষ্টি সকলকে পথ দেখাচ্ছে। ক্ষত্রিয় তাঁর শক্তি দিয়ে সমাজকে সকল অশুভ ও বিপদ থেকে রক্ষা করে তাকে নির্ভয় করে তুলছেন। বৈশ্য তাঁর সম্পদেব উৎপাদন ও সুষম বন্টনেব মধ্য দিয়ে সমাজেব সার্বিক পুষ্টি ও কল্যাণ বিধান করছেন। আর শূদ্র শারীরিক সেবা দিয়ে সমাজকে পবিমার্জিত করে তুলছেন। এই পারস্পরিক সেবায় শুশ্রূষায় সমাজ সজীব থাকে। সুস্থ থাকে। অতএব এই সেবাই সিদ্ধি। ব্রাহ্মণ না থাকলে ধর্ম নেই, ক্ষত্রিয় না থাকলে ধর্মের রক্ষক নেই, বৈশ্য না থাকলে ধর্মের ঋদ্ধি ও পুষ্টি নেই, আর শূদ্র না থাকলে ধর্মেব সিদ্ধি নেই। শূদ্র তাই শ্রীভগবানের চরণ। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছে সেবাতেই শ্রীভগবান তুষ্ট হন—

পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হবিঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/৬/৩২)

সমাজ এই চাতুর্বর্ণ্য বা চার অঙ্গ নিয়েই সম্পূর্ণ ও সমর্থ। এদের পরস্পরের মর্যাদা রক্ষা কবা, কর্তব্য ও সীমা নির্ধারণ কবা অবশ্য প্রয়োজন। তা লঙঘন কবলে সমাজ বিন্যাস শিথিল হয়ে পড়ে। জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার আসে। তাই পারস্পরিক অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে রক্ষা কবা প্রয়োজন। তা যদি না হয়, অনধিকারীর কাছে জ্ঞান, অসমর্থের হাতে শক্তি, অযোগ্যের হাতে সম্পদ আর অশিষ্টের হাতে যদি সেবা ন্যস্ত হয়, তাহলে সে যে কি ভয়ানক হতে পাবে তা--আজ আমবা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। তাই কবি কালিদাস বলেছেন, অনধিকারীর তপস্যা প্রজার অমঙ্গলই নিয়ে আসে—"তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্" (রঘুবংশ, ১৫/৫১)।

আবার অবলেহিত জ্ঞান, স্বৈরাচারী শক্তি, কৃপণ ও স্বার্থপর সম্পদ এবং উদ্ধত দুর্বিনীত সেবা যে কী বিভীষিকাময় তাও আজ আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। সেইজন্য ভারতবর্ষে রাজার প্রধান কর্তব্যই ছিল সমাজে চাতুর্বর্ণ্য রক্ষা করা। জীবন ও ধর্মকে সমস্ত রকম ব্যভিচার থেকে মুক্ত করা। রামচন্দ্র তাই করেছেন।

আটত্রিশ

কালের আহ্বান—মহাপ্রস্থান

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে বলা হয়েছে, তিনি এক ধর্মময় মহাদ্রুম, অপর চার পাণ্ডব সেই বৃক্ষের শাখা স্কন্ধ, ফল ও পুষ্প; আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই মহাবৃক্ষের মূল — "মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ" (মহাভারত, আদিপর্ব, ১/১১১)। তেমনি রামায়ণে বলে, ধর্মের সারভূত যে মহাদ্রুম তার মূল হলেন রামচন্দ্র, আর জগতের সকল মানুষ সেই জ্যোতির্ময় বৃক্ষের পত্র ও শাখা, ফল ও পুষ্প —

মূলং হ্যেষং মনুষ্যাণাং ধর্মসারো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৩/১৫)

রামচন্দ্র এক শান্ত গম্ভীর বনস্পতি। বিশেষ করে সীতার বনবাসের পর রামকে মনে হয় আরও শান্ত আরও নির্জন। সীতাব শোকে তাঁর অন্তর দীর্ণ হয়ে গেলেও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন অটল হয়ে। যেমন দীর্ঘ বনস্পতি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তার শাখাকন্দবে প্রসুপ্ত অগ্নিজ্বালা নিয়ে।

অন্তঃ প্রসৃপ্তদহনো জরান্নিব বনস্পতিঃ।

(উত্তররামচরিতম্, ৪/২)

দুঃখ যেন তীক্ষ্ণ করাতের ধারের মতো অহর্নিশি তাঁর মর্মকে কেটে চলেছে — "নিকৃন্তন্মর্মাণি ক্রকচ ইব মন্যুর্বিরমিতি" (উত্তরবামচরিতম্, ৪/৩)।

তবু সে দুঃখ তাঁর বাইরে প্রকাশ করার উপায় নেই। নিরুদ্ধ অশ্রু নিয়ে বুকখানিকে তাঁর পাষাণ করে ধরতে হবে। কেননা রামের চোখে জল দেখে লক্ষ্মণ বলেছিলেন, "আপনি যদি এমন করে দুঃখিত মনে থাকেন, তাহলে যেজন্য আপনি মৈথিলীকে ত্যাগ করেছেন প্রজাদের সেই অপবাদই আবার নতুন করে নগরে সোচ্চার হয়ে উঠবে।"

নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব।।

(উত্তরকাণ্ড, ৫২/১৪)

তাই রাম যত দুঃখই পান, তিনি অশ্রুবর্ষণ করতে পারেন না। দুঃখই তাঁর সাধনা, তাঁর রাজযজ্ঞ। বিশাল কর্মের ও বহুবিধ যজ্ঞের মধ্যে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে চান। কর্মের বিপুল আরাবে অন্তরের কঠিন নৈঃশব্দ্যকে চাপা দিতে চান।

রাম বললেন, "আমি রাজসূয় যজ্ঞ করব। ধর্মের অক্ষয় সেতু হল রাজসূয় যজ্ঞ। অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ধর্মসেতুঃ।"

কিন্তু বুদ্ধিমান ভরত তাঁকে নিষেধ করে বললেন, "মহারাজ, ধর্ম আপনাতে চিরপ্রতিষ্ঠিত। সমস্ত রাজারা আপনাকে পিতার ন্যায় আশ্রয় করে আছে। তবে কেন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন? তাতে বৃথা লোকক্ষয় আর প্রাণনাশ হবে।"

রাম বললেন, "ভরত, তুমি ঠিক বলেছ।"

লক্ষ্মণ বললেন, "মহারাজ, আপনি বরং অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন।"

রাম বললেন. "উত্তম, তবে তাই হোক। তোমরা যজ্ঞের আয়োজন করো। মহর্ষি বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি কশ্যপ এবং অপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করে কার্য স্থির করো।"

বিপুল গৌরবে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। নিমন্ত্রণ বার্তা নিয়ে দিকে দিকে রাজদূত ছুটে গেল। সুগ্রীব ও বিভীষণকে আমন্ত্রণ কবা হল। দেশ বিদেশের সকল রাজা প্রজা ঋষি ব্রাহ্মণ ও ধার্মিক নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। গোমতী নদীর তীরে নৈমিষারণ্যে বিরাট যজ্ঞশালা নির্মিত হল। সহস্র শকটে ভারে ভারে আসতে লাগল যজ্ঞের উপকরণ সামগ্রী, তিল তন্ডুল ঘৃত দধি গন্ধদ্রব্য। বাশি বাশি স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য। এল গায়ক নট ও নর্তকের দল। পাচক ভৃত্য ও সেবকশ্রেণি। বিভীষণ ঋষিদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন। সুগ্রীব ভার নিলেন ব্রাহ্মণদের ভোজন পরিবেশনে। অতি সুলক্ষণযুক্ত একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব যজ্ঞপূত করে ছেড়ে দেওয়া হল ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে। পুরোহিতগণের সঙ্গে স্বয়ং লক্ষ্মণ সেই অশ্বকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। সীতার সোনার প্রতিমা নির্মাণ করে ভরত চললেন যজ্ঞশালায়। রামের পাশে পত্নীর আসনে ওই সোনার প্রতিমা বসিয়ে দীক্ষিত করা হবে। রাম বললেন, "সীতার ওই স্বর্ণ প্রতিমাই আমার পত্নীরূপে যজ্ঞে দীক্ষিত করা হোক — কাঞ্চনীং মম পত্নীং চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি" (উত্তরকাণ্ড. ৯১/২৫)।

বহুবিধ উপহার ও অর্ঘ্য নিয়ে রাজারা আসছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁদের আপ্যায়ন কবছেন। বেদমন্ত্রে ও সুগন্ধি যজ্ঞধূমে চাবিদিক আমোদিত। আকাশে বাতাসে সুমঙ্গল পবিত্রতার স্পর্শ। দানে পুণ্যে যশোগানে চতুর্দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। যেসব দীর্ঘজীবী মুনি এসেছিলেন তাঁরা সবাই বলতে লাগলেন, এমন বিপুল যজ্ঞ এমন ভূরিদান তাঁরা জীবনে কখনও দেখেননি। এক বৎসব ধরে চলতে লাগল এই মহাযজ্ঞ। নৈমিষারণ্যেব বিরাট যজ্ঞশালা ঘিরে অতিথি রাজন্যদের সুসজ্জিত ভবন, ব্রাহ্মণদের বাট, ঋষিদের কুটির, গায়ক ও বাদকদের নাটমঞ্চ আর সর্বসাধারণের জন্য বিরাট বিরাট নাটমন্দির।

মহর্ষি বাল্মীকিও তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এই যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছেন। ঋষিদের কুটিরে তিনি অবস্থান করছেন। একদিন তিনি কুশ ও লবকে ডেকে বললেন, "তোমরা প্রভাতে স্নান আহ্নিক করে নিত্য রামায়ণ গান করে সকলকে শোনাও। রাজভবনে ব্রাহ্মণগৃহে রামের ভবনদ্বারে এবং ঋত্বিকগণের কাছে তোমরা রামায়ণ গান করবে। প্রতিদিন বিংশতি সর্গ গান করবে। কারও কাছে কোনো দান দক্ষিণা গ্রহণ করবে না। আমরা আশ্রমবাসী, বনের ফলমূল আহার করে বেঁচে থাকি। আমাদের ধনের কি প্রয়োজন? রাম ডাকলে কাছে যেও। তাঁকে গান শুনিও। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলো, আমরা বাল্মীকির শিষ্য। রাম ধর্মত সকলের পিতা, তাঁকে কখনও অসম্মান করবে না।"

পরদিন সবাই বিস্মিত হয়ে দেখেন, দুটি কিশোর বালক কিন্নর কণ্ঠে গান করছে। বীণাতন্ত্রিত স্বরে দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিত লয়ে অপূর্ব সেই গান।

সকলের কৌতূহল হল। যজ্ঞের বিরামকালে ঋষি রাজা ও সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমক্ষে তাদের ডেকে গান করতে বলা হল। সুন্দর দুই বালকের দিকে সকলে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে আছেন (পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ)। কি আশ্চর্য সরলতা, কি দিব্য সৌন্দর্য! ওদের সর্বাঙ্গে যেন আশ্রম অরণ্যের গন্ধ। ইন্দ্রনীল মণির মতো দেহের বর্ণ। তরুণ পারাবতের স্কন্ধের মতো গাঢ় নীল। বৃষের মতো সুগঠিত বপু। প্রসন্ন সিংহশাবকের মতো স্থির দৃষ্টি। কণ্ঠস্বরে যেন উৎসবের মৃদঙ্গধ্বনি।

অরণ্যগর্ভরূপালাপৈর্যূয়ং তোষিতা বয়ং চ।...
কঠোরপারাবতকণ্ঠমেচকং বপুর্বৃষস্কন্ধ সুবন্ধুরাংসকম্।
প্রসন্নসিংহস্তিমিতং চ বীক্ষিতং ধ্বনিশ্চ
মঙ্গল্যমৃদঙ্গমাংগলঃ।।

(উত্তররামচরিতম্, ৪/২৭, ৬/২৫)

ঋষিগণ বিস্মিত হয়ে বলাবলি করেন, জটাবল্কলধারী এই দুই কিশোর বালক অবিকল রামের মতো। রামের প্রতিবিম্ব যেন এরা।

উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্‌বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ।।

(উত্তরকাণ্ড, ৯৪/১৩)

বিংশতি সর্গ গান শেষ করে দুই বালক সকলকে প্রণাম করল।

শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

রাম সন্তুষ্ট হয়ে ভরতকে বললেন, "এই দুই গায়ক বালককে অষ্টাদশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করো। এরা আর যা অভিলাষ করে তাও দাও।"

ভরত স্বর্ণমুদ্রার বিপুল ডালি নিয়ে বালকদের দি ে গেলেন। কিন্তু তারা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বলল, "এসব আমাদের কি প্রয়োজন? এইসব সোনাদানা নিয়ে আমরা কি করব? কিমনেনেতি? সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে?" (উত্তরকাণ্ড, ৯৪/২০-২১)

বালকের মুখে এই নিস্পৃহ ত্যাগের কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। এমনকী রামচন্দ্রও!

রাম জিজ্ঞাসা করেন, "এই গান কে রচনা করেছেন? এই কাব্য কত বড়?"

— "ভগবান বাল্মীকি এই গানের রচয়িতা। আপনার সমস্ত জীবনকথা নিয়ে এই গান। চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে, একশত উপাখ্যানে, পাঁচশত সর্গে এবং ছয় কাণ্ডে এই কাব্য রচিত। বাল্মীকি এর উত্তরকাণ্ডও রচনা করেছেন। আমরা ভগবান বাল্মীকির শিষ্য। তিনি আপনার এই যজ্ঞে উপস্থিত আছেন।" লব কুশ বলে।

প্রতিদিন রাম সমবেত মুনিঋষিদের সঙ্গে বসে রামায়ণ গান শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এই দুই বালক আর কেউ নয়, এরা তাঁরই সন্তান। পিতৃহৃদয়ের অবরুদ্ধ স্নেহ বুঝি আজ ওই মঙ্গলগানের সঙ্গে মিশে বড় করুণ বড় উদ্‌বেল হয়ে উঠল।

আগামীকাল রামের যজ্ঞ সমাপ্ত হবে। রাম তাঁর বিশ্বস্ত ও শুদ্ধস্বভাব কয়জন দূতকে

ডেকে আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা ভগবান বাল্মীকির কাছে যাও। তাঁকে গিয়ে বলো, কাল প্রভাতে তাঁর অনুমতি নিয়ে সীতা যদি এই যজ্ঞ পরিষদে সকলের সমক্ষে তাঁর শুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় দিতে সম্মত হন, যদি আমার কলঙ্ক দূর করার জন্য তিনি শপথ গ্রহণ করেন, এ বিষয়ে বাল্মীকির কি অভিমত, সীতারই বা কি ইচ্ছা, শীঘ্র জেনে এসে আমাকে বলো।"

রামের মনের কথা বুঝে বাল্মীকি রাজদূতের কাছে উত্তর পাঠালেন, "বেশ রাম যা বলেছেন তাই হবে। পতিই নারীর দেবতা। রামের যা ইচ্ছা সীতা তাই করবেন। যথা বদতি রাঘবঃ তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়াঃ।"

শুনে রাম আশান্বিত ও আনন্দিত হলেন। সকল প্রজা ও মুনিঋষিদের ডেকে বললেন, "আগামীকাল প্রভাতে আপনারা সকলে সীতার শপথ শুনবেন। যদি আর কোনো পরীক্ষা আবশ্যক মনে করেন তাহলে তাও প্রত্যক্ষ করবেন।"

সকলে রামকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন।

রজনী প্রভাত হল।

আজ রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তি।

কিন্তু আর এক মহত্তর যজ্ঞের বুঝি সূচনা হতে চলল। রামের আত্মযজ্ঞ।

প্রদীপ্ত হোমশিখার মতো নিস্পন্দ বসে আছেন বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি কশ্যপ বিশ্বামিত্র। মহাতেজা দীর্ঘতমা দুর্বাসা পুলস্ত্য শক্তি ভার্গব মার্কণ্ডেয়। গৌতম কাত্যায়ন নারদ ও অগস্ত্য। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তপস্যার সব মহিমান্বিত শিখরমালা। আর রয়েছে অযোধ্যার অগণিত প্রজা ও পৌরজন। কিষ্কিন্ধার বানর ও লঙ্কার রাক্ষসকুল। নানা দেশ থেকে আগত বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। কৌতূহলী প্রতীক্ষায় সবাই পাষাণের মতো নিশ্চল।...

সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞসভায় আসছেন বাল্মীকি। গৈরিকবসনা তপস্বিনী সীতা মনে মনে রাম নাম ধ্যান করতে করতে, সাশ্রুনয়নে নীরবে নতমুখে হাতজোড় করে, ধীরে ধীরে বাল্মীকির অনুসরণ করে সভায় আসছেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী স্বয়ং বেদ-বিদ্যার মতো। সীতাকে দেখে জনতা দুঃখে সমবেদনায় আকুল হয়ে উঠল। তারা পুণ্যবতী সীতার জয়ধ্বনি করতে লাগল।

> তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
> কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্।।
> তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
> বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ।।
> ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভৌ।
> দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্।।

(উত্তরকাণ্ড, ৯৬/১১-১৩)

বাল্মীকি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "এই সেই পতিব্রতা ধর্মচারিণী সীতা। কেবল মাত্র লোক অপবাদের ভয়ে তাঁকে আমার আশ্রমে ত্যাগ করা হয়েছিল। হে মহাব্রত রাম, অনুমতি দাও,

সীতা শপথ করে তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। সীতার যমজ দুই সন্তান তোমারই পুত্র। আমি প্রচেতার দশম পুত্র, জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। আমি শপথ করে বলছি, সীতা যদি অসতী হন, তাহলে আমার সারা জীবনের সমস্ত তপস্যা যেন নিষ্ফল হয়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে জানি, আমার দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখেছি (দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ), সীতা নিষ্পাপ। তাই তাঁকে আমার আশ্রমে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু হে রাম, লোক অপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত হয়েছিল (কলুষীকৃতচেতসা), তাই তোমার প্রিয়তমা পত্নীকে শুদ্ধা জেনেও তুমি তাঁকে ত্যাগ করেছ — ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা।" (উত্তরকাণ্ড, ৯৬/২৪)

রাম তখন উঠে ববর্ণিনী সীতার দিকে তাকালেন (দৃষ্ট্বা তাং বরবর্ণিনীম্)। রামের সেই গভীর প্রগাঢ় দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল কবি আমাদের বলেননি। তিনি শুধু আমাদের হৃদয়ের কাছে একটু ইঙ্গিত করেছেন। বুঝে নিতে বলেছেন রামের সেই অনুনয়পূর্ণ গভীর দৃষ্টির মধ্যে ছিল কতখানি প্রেম দুঃখ ও ব্যথা।

রাম বললেন, হে মহাভাগ, আপনি ধর্মজ্ঞ। আমি নিজেও বিশ্বাস করি, আপনি যা বললেন সব সত্য। পূর্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে বৈদেহী শপথ করেছিলেন। সেই জন্যই তাঁকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু লোক অপবাদ বড় প্রবল, তাই তিনি নিষ্পাপ জেনেও আমি তাঁকে ত্যাগ করেছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জানি কুশ ও লব আমার সন্তান। কিন্তু সীতা যে নিষ্পাপ এই সত্য জনগণের চিত্তে প্রত্যয় হোক। তবেই আমার আনন্দ। আমি সকলের সম্মতিক্রমে সীতাকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই।"

প্রত্যয়ো মে নরশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে।।

(উত্তরকাণ্ড, ৯৭/১০)

তখন দিব্যগন্ধ নিয়ে পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হল। সেই মঙ্গলবায়ুর স্পর্শে সবাই বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল, বুঝি সত্যযুগ এসে গেছে। সকলে ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে সীতার দিকে তাকিয়ে রইলেন।...

গৈরিকবসনা তপস্বিনী সীতা তখন অধোমুখে আনত দৃষ্টিতে কৃতাঞ্জলি হয়ে ধীর নম্র কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "যদি আমি রাঘব ভিন্ন অন্য কাউকে মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি, তাহলে হে ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও, আমাকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামের অর্চনা করে থাকি, তাহলে হে ধরিত্রী তুমি দ্বিধা হও, আমাকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও। রাম ছাড়া আর কাউকেই জানি না, এই কথা যদি সত্য বলে থাকি, তাহলে হে ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও, আমাকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও।"

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।

যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।

(উত্তরকাণ্ড, ৯৭/১৪-১৬)

সীতার শপথবাক্য শেষ না হতেই সহসা ভূতল থেকে এক অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হল। দিব্যরত্নভূষিত অমিতবিক্রম নাথগণ সেই সিংহাসন মস্তকে ধারণ করে রয়েছেন। দেবী ধরিত্রী সীতার দুই মৃণালবাহু ধরে স্বাগত সম্ভাষণ করে সিংহাসনে বসালেন।

আকাশ থেকে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।...

যজ্ঞসভার সকলে বিস্ময়ে হতবাক্।

সীতা পাতাল প্রবেশ করছেন।

যাওয়ার সময় সতৃষ্ণ নয়নে জন্মের মতো একবার রামকে দেখে নিলেন। সীতার সেই বিদায় দৃষ্টিতে কোনো অভিযোগ কোনো অপমান ছিল না। ছিল এক গভীর প্রেমের শান্ত মঙ্গল আরতি।

সীতার পাতাল প্রবেশ দেখে সকলে বিহ্বল ও আবিষ্ট হয়ে পড়ল। দুঃখ নয়, আনন্দ নয়, এক আত্মহারা ধ্যানে তারা কেবল রাম সীতাকে দেখতে লাগল।

রাম যজ্ঞের দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়ে ক্রোধে শোকে আকুল হয়ে বললেন, "হে পৃথিবী, তুমিই আমার প্রকৃত শ্বশ্রূমাতা, সীতা তোমারই কন্যা, তুমি সীতাকে ফিরিয়ে দাও। নইলে বসুধাতল ভেদ করে আমি সীতাকে উদ্ধার করে আনব, একদিন যেমন লঙ্কা জয় করে উদ্ধার করে এনেছিলাম। হে পৃথিবী, সীতাকে ফিরিয়ে দাও, নইলে তুমি বিদীর্ণ হয়ে আমার পথ করে দাও, আমি সীতার কাছে যাব। নতুবা এই সপর্বত-বনকানন মহীতল আমি ধ্বংস করে দেব।"

তখন স্বযং ব্রহ্মা এসে রামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "হে মহাবাহো, আশ্বস্ত হও। স্মরণ করো, তুমি বিষ্ণুর অবতার। তোমার জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনি এখনও অসম্পূর্ণ; বাল্মীকি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে উত্তর কাব্য রচনা করেছেন। তুমি ঋষিগণের সঙ্গে নিবিষ্ট মনে তা শ্রবণ করো।...

অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষ দিনে সীতার পাতাল প্রবেশ। এ যেন যজ্ঞের মধ্যে আর এক যজ্ঞ। বেদে পুরুষ যজ্ঞের কথা আছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে হল প্রকৃতি যজ্ঞ— মহাশক্তির আত্মাহুতি। একদিন জনকের যজ্ঞভূমি থেকে যাঁর আবির্ভাব, আজ রামের যজ্ঞভূমিতেই তাঁর বিলয়। ভূমিলক্ষ্মী সীতা স্বয়ং বসুমতী। পার্থিব প্রকৃতির মৃন্ময়ীরূপে স্বয়ং চিন্ময়ী মহাশক্তির আবির্ভাব। মানুষের নিরেট তমসার জড়চেতনার মধ্যে পরাচৈতন্যের শক্তিসঞ্চার।...

রামের কাছে সমস্ত জগৎ আজ শূন্য হয়ে গেছে (মেনে শূন্যমিদং জগৎ)। তাঁর মস্তকের রাজমুকুট যেন আজ ভারি হয়ে উঠেছে। চারিদিকে একটা শেষ বিদায়ের সুর। মহাকাব্যের শেষে ধীরে ধীরে নেমে আসছে দিবা অবসানের ধূসর বিষণ্ণতা। সূর্যাস্তের অস্তরাগে আমাদের অন্তরও বিষাদরক্তিম। বেশি কথার আর সময় নেই। আকাশ থেকে আনত হয়ে আসছে মহাকালের সুগম্ভীর নীরবতা। পাতা ঝরার মতো নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে জীবন। মাত্র তিনটি কথায় কবি আমাদের জানিয়ে দিলেন কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর মৃত্যু সংবাদ— "রামমাতা কালধর্মমুপাগমৎ অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ"...

রামের অন্তর শূন্য। এবার শূন্য হল রামের রাজ অন্তঃপুর। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর সকল কর্তব্য যেন সাঙ্গ করে ফেলতে চান। মাথার মুকুট নামিয়ে রাখতে যে সময় লাগে, রামের হাতে যেন সে সময়টুকুও আর নেই। মহাকালের আহ্বান তিনি শুনতে পেয়েছেন। তাই ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে গান্ধার রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। অঙ্গদীয় ও মল্লভূমির সিংহাসন দিলেন লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে।

ইতিমধ্যে মহাকাল এলেন ছদ্মবেশে রামের কাছে। শোনালেন কালের বার্তা। ব্রহ্মাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রামের ব্রত সম্পূর্ণ হয়েছে, অতএব. .

রাম সেকথা আগেই জানতেন।

সুতরাং আর সময় নেই।

রাম মহাকালকে বললেন, "আমি মনে মনে তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। তোমার আগমনে ও ব্রহ্মার বাক্যে আমি প্রীত হয়েছি। আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই ফিরে যাব — গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ।" (উত্তরকাণ্ড, ১০৪/১৮)

মহাকাল ফিরে গেলেন।

কিন্তু যাওয়ার সময় ঘটনাচক্রে ঘটে গেল আর এক বিপত্তি।

মহাকাল রামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের নিভৃতে আলাপের সময় কেউ যেন উপস্থিত না হয়। হলে তাকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে।

লক্ষ্মণকে দ্বার রক্ষার ভার দিলেন রাম।

লক্ষ্মণ দ্বারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। এমন সময় সহসা উপস্থিত হলেন উগ্রতপা দুর্বাসা। তিনি অবিলম্বে রামের সাক্ষাৎ চান।

লক্ষ্মণ মিনতি করেন, "মহর্ষি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

"না, আমি এখনই রামের কাছে যেতে চাই। তাকে আমার আগমন সংবাদ দাও। বিলম্ব করলে আমার অভিশাপে রঘুবংশ ভস্ম হয়ে যাবে।"

নিরুপায় লক্ষ্মণ তখন ঋষির অভিশাপ থেকে রঘুবংশকে রক্ষা করবার জন্য নিজের মৃত্যুদণ্ড জেনেও রামকে গিয়ে সংবাদ দিলেন। লক্ষ্মণকে দেখে রাম স্তম্ভিত, বজ্রাহত। মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে লক্ষ্মণকে?

অবশেষে বশিষ্ঠের উপদেশ প্রাণদণ্ড না দিয়ে নির্বাসন দিলেন তাঁকে। ভাগ্যের পরিহাসে রাম যেন নিজের হাতে নিজের হৃদয়কেই ছিন্ন করলেন।

লক্ষ্মণ সরযূর তীরে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

কালের নির্মম কুঠারে ছিন্ন হল রামের শেষ বন্ধন।

মহাকবি এবার তাঁর বীণায় তুলেছেন মূলতানের শেষ করুণ রাগিণী।

রাম পুরোহিত মন্ত্রী ও মহাজনদের ডেকে বললেন, "ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসন দিয়ে আজই আমি বিদায় নেব। লক্ষ্মণ যে পথে গেছে আমিও আজ সেই পথে যাব — অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন গতাং গতিম্।" (উত্তরকাণ্ড, ১০৭/৩)

রামের প্রস্তাবে ভরত দুঃখে হতচৈতন্য হলেন। শোকার্ত হয়ে বললেন, "আমি রাজ্য চাই না। আপনাকে ছেড়ে স্বর্গও কামনা করি না। কুশকে কোশল আর লবকে উত্তর কোশলের সিংহাসনে অভিষিক্ত করুন।"

রাম বিলম্ব না করে কুশ ও লবকে দক্ষিণ ও উত্তর কোশলের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

সংবাদ পেয়ে শত্রুঘ্নও তাঁর দুই পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতীকে মথুরা ও বৈদিশপুরীর রাজত্ব দিয়ে রামের অনুগামী হলেন।

হনুমান ও বিভীষণ রামের অনুগমন করতে মনস্থ করেছেন দেখে রাম সস্নেহে তাঁদের নিরস্ত করে বললেন, "বিভীষণ, তুমি আমার প্রিয় সখা, যতকাল চন্দ্র সূর্য থাকবে, যতকাল আমার চরিত কথা প্রচলিত থাকবে, ততকাল তুমি জীবিত থাকবে, তোমার রাজত্ব অক্ষয় হবে। তুমি আমার অনুগমন করো না। জানবে এ তোমার বন্ধুর আদেশ।"

তারপর হনুমানকে বললেন, "তুমি চিরজীবী হবে। যতকাল আমার কথা জগতে প্রচলিত থাকবে ততকাল তুমি আনন্দিত মনে ভূমণ্ডলে বিচরণ করবে।"

জাম্ববান মৈন্দ ও দ্বিবিদকেও আশীর্বাদ করলে, তাঁরা কলিযুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন।

প্রভাত হল।

বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রের প্রজ্বলন্ত অগ্নি নিয়ে অগ্রে অগ্রে চলেছেন। তাঁদের সঙ্গে চলেছে বাজপেয যজ্ঞের পবিত্র ছত্র।

রাম দুই হস্তে যজ্ঞবর্হি ধারণ করে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একাগ্র মনে গৃহ থেকে যাত্রা করলেন। অস্তাচলগামী সূর্যের মতো তাঁর শান্ত দীপ্য মহিমা।

তাঁর বামে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, দক্ষিণে মহীদেবী মহেশ্বরী, অগ্রে চলেছেন সংহাররূপিণী মহাশক্তি। রামের পশ্চাতে চলেছেন ব্রাহ্মণ বেশে চতুর্বেদ, সর্ববক্ষিণী গায়ত্রী ও বষট্‌কার মন্ত্র। তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে মূর্তিমান যত অস্ত্র ও আয়ুধ। সবার শেষে অযোধ্যার রামভক্ত যত প্রজা, নরনারী, বৃদ্ধ, শিশু, পক্ষী স্থাবর জঙ্গম। অযোধ্যার সমস্ত প্রাণ আজ রামের অনুগামী। সেই মহাপ্রস্থানের পথে কারও মনে কোনো শোক দুঃখ বা দীনতা নেই। সকলেই প্রফুল্ল ও আনন্দিত।

> ন তত্র কশ্চিদ্ দীনো বা ব্রীড়িতো বাপি দুঃখিতঃ।
> হৃষ্টং সমুদিতং সর্বং বভূব পরমাদ্ভুতম্।।

(উত্তরকাণ্ড, ১০৯/১৭)

মানুষের জীবনকাব্য শেষ হয় মিলনে অথবা বিচ্ছেদে। কিন্তু রামায়ণ শেষ হয়েছে সকল মিলন-বিচ্ছেদের ঊর্ধ্বে এক পরম প্রশান্তিতে — পরিপূর্ণ ব্রহ্মালয়ে। সকল সুখ-দুঃখ ছাপিয়ে, জীবন-মৃত্যুব অতীত এক দিব্য উত্তরণ — শান্ত গম্ভীর নির্মল। হাসি কান্না নিয়ে এই মর্ত্যের সংসার যার তলায় নশ্বর ছায়ার মতো ভাসে।

রাম চলেছেন মহাযাত্রায়।

সমস্ত বন্ধন আবরণ ছিন্ন করে।

বাক্যের চিন্তার যত ছিন্নাভ্র কুহেলী কাটিয়ে।

মর্ত্যমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে।

জ্যোতির্ময় সিদ্ধকাম অচঞ্চল এক শান্তির প্রসারে।

তাঁরা এলেন সরযূর তীরে গোপ্রতার ঘাটে।

সরযূর জলে তখন অশান্ত ঘূর্ণি। অযোধ্যার উদ্‌বেলিত হৃদয়ের প্রতীক যেন আজ সরযূ।

নির্মল গগনতলে দিব্য জ্যোতির্ময় উদ্ভাস — "তেজোবৃতং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্" (উত্তরকাণ্ড, ১১০/৫)। শত শত তূর্যনিনাদে প্রকম্পিত দশদিক্। সকল দেবতা যেন তারায় তারায় অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছেন। তাঁদের পদধ্বনিতে বণিত আকাশ। সেই আলোকিত নভোমণ্ডলে রাম তাঁর অনুজগণের সঙ্গে সশরীরে বিষ্ণুতেজে প্রবিষ্ট হলেন। অগ্নি ইন্দ্র বায়ু রামের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তিকে পূজা করলেন। করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যত দিব্য ঋষি গন্ধর্ব অপ্সরা নাগ যক্ষ রক্ষ। তাঁদের অন্তরে ধ্বনিত এক প্রার্থনা, "ভগবান বিষ্ণু তোমার শক্তির জয় হোক—বলং বিষ্ণো প্রবর্ধতাম্।" (উত্তরকাণ্ড, ১১১/২৫)

পৃথিবীর হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন এক জ্যোতির গভীরে মন্দ্রিত হতে লাগল সেই ধ্যানমন্ত্র।...

* * * * *

পরিশিষ্ট
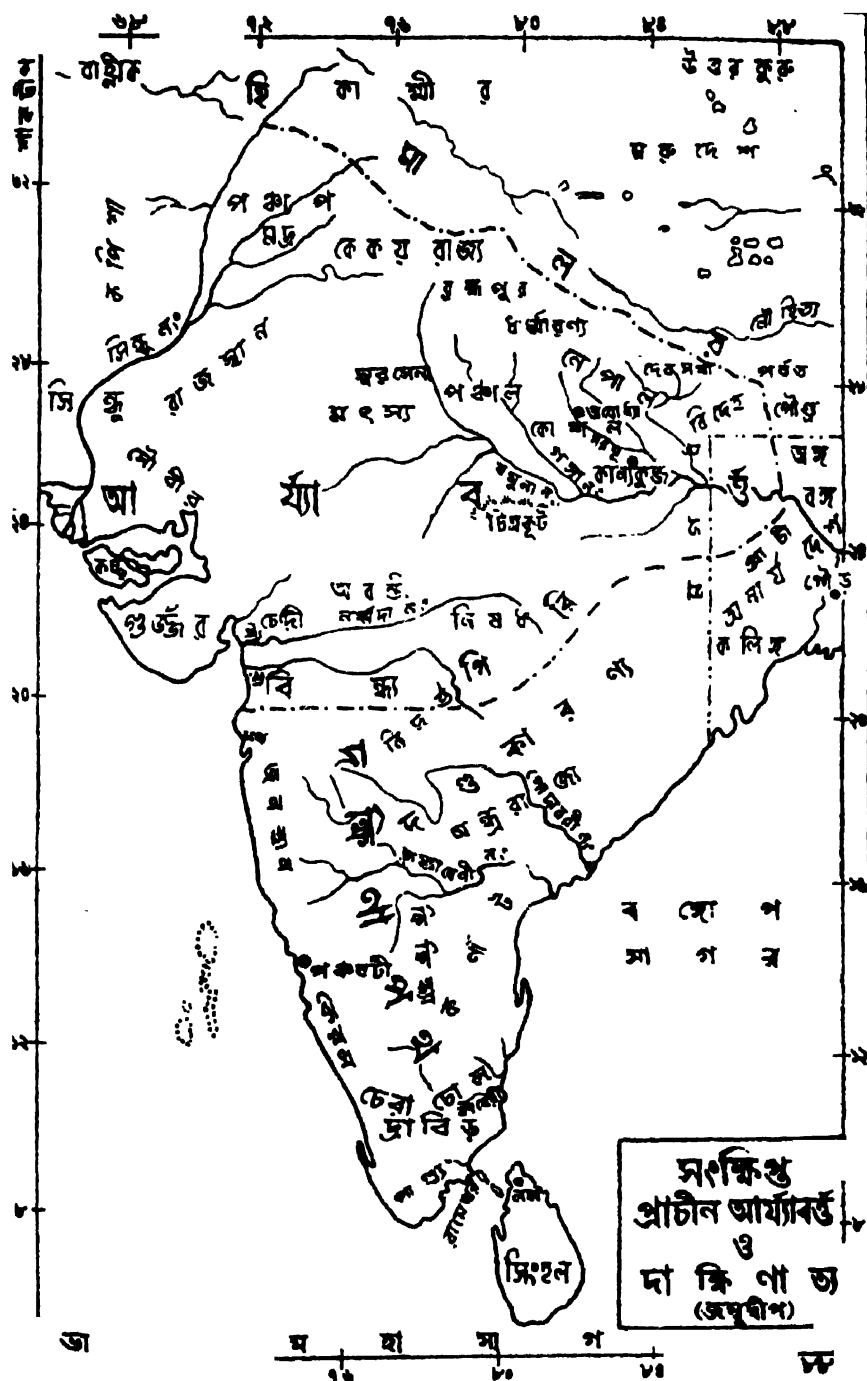
রামায়ণের পাত্র-পাত্রীর নাম ও ভৌগোলিক স্থান পরিচয়

অগস্ত্য	বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মিত্র ও বরুণ দেবতার তেজে যজ্ঞকুণ্ড থেকে এঁর উৎপত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে অগস্ত্যকে পুলস্ত্যের পুত্র বলা হয়েছে। বিন্ধ্য পর্বতের গুরু। দক্ষিণ ভারতে সনাতন ধর্ম ও আর্যসংস্কৃতি প্রচার করেন। দৈত্য বাতাপীকে বধ করেন, সমুদ্র শোষণ করে কালকেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করেন। অগস্ত্যের অপর নাম কুম্ভযোনী, মৈত্রাবরুণি, ঘটোদ্ভব, উর্বশীয়, বিন্ধ্যকূট; সমুদ্র পান করেছিলেন বলে নাম পীতাব্ধি, বাতাপীকে বধ করেছিলেন বলে নাম বাতাপিদ্বিট। খর্বাকৃতি ছিলেন বলে নাম মান। অগস্ত্য ঋষির আদেশে রাম পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করেন।
অঙ্গদ	কিষ্কিন্ধ্যার রাজ বানররাজ বালীর পুত্র। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামও অঙ্গদ।
অজ	অযোধ্যার রাজা। রঘুর পুত্র, দশরথের পিতা।
অতিকায়	রাবণের পুত্র। যুদ্ধে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হয়।
অত্রি	বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি। পত্নীর নাম অনসূয়া। চিত্রকূটে অত্রির আশ্রম ছিল।
অন্ধমুনি	সিন্ধুর পিতা। দশরথের শব্দভেদী বাণে ভুলবশত অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু নিহত হন। পুত্রশোকে মুনি প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে দশরথকে অভিশাপ দেন, যেন তাঁরও পুত্রশোকে মৃত্যু হয়।
অযোধ্যা	কোশল রাজ্যের রাজধানী। সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকু অযোধ্যা নগরী স্থাপন করেন। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের ফয়জাবাদ শহর থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত। রামচন্দ্রের জন্মস্থান।
অংশুমান	সূর্যবংশীয় সগর রাজার পৌত্র।
অশ্বপতি	কেকয় দেশের পরাক্রান্ত রাজা। কৈকেয়ীর পিতা। ভরতের মাতামহ। অশ্বপতির পুত্রের নাম যুধাজিৎ।
অশোকবন	লঙ্কায় রাবণের প্রমোদকানন। রাবণ সীতাকে হরণ করে অশোকবনে বন্দি করে রাখে।
অহল্যা	ব্রহ্মার মানসকন্যা। ঋষি গৌতমের পত্নী। শতানন্দের জননী। 'হল্য' শব্দের অর্থ অসৌন্দর্য, কুশ্রীতা, কোনো হল্য ছিল না যাঁর অর্থাৎ অদ্বিতীয়া সুন্দরী বলে

ব্রহ্মা কন্যার নাম রাখেন অহল্যা। গৌতম মুনির অভিশাপে অহল্যা পাষাণী হয়ে যান। রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে তাঁর শাপমুক্তি ঘটে। অহল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার একজন।

অক্ষ : রাবণের কনিষ্ঠ পুত্র। হনুমানের হাতে নিহত হয়।

আদিত্য হৃদয় : ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক রামচন্দ্রকে প্রদত্ত বিজয়ী মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করেন।

ইন্দ্র : ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা। মাতা আদিতি, পিতা কশ্যপ। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। প্রাচীন ইলাবৃতবর্ষকে স্বর্গ বলা হত, ইন্দ্র স্বর্গের অধিপতি। ইন্দ্রের পুত্রের নাম জয়ন্ত। রথের নাম বিসান, সারথি মাতলি। রাবণ বধের সময় ইন্দ্র রামচন্দ্রকে তাঁর রথ অশ্ব অস্ত্র ও সারথি দান করেন।

ইন্দ্রজিৎ : রাবণের জ্যেষ্ঠপুত্র। অদ্বিতীয় বীর। যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করে বলে ব্রহ্মা তার নাম দেন ইন্দ্রজিৎ। যুদ্ধে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন।

ইক্ষ্বাকু : মনুর পুত্র। সূর্যবংশের ও অযোধ্যানগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এঁর নাম থেকেই সূর্যবংশের নাম ইক্ষ্বাকুবংশ।

ঊর্মিলা : মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। লক্ষ্মণের ভার্যা। ঊর্মিলার গর্ভে লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর জন্ম হয়।

ঋষ্যমূক : ঋষ্য অর্থ মৃগ, মূক অর্থ নীরব। যে পর্বতে হরিণেরা নির্ভয়ে বিচরণ করে কিষ্কিন্ধ্যার সেই পর্বতের নাম ঋষ্যমূক। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে পূর্বঘাট ও নীলগিরি পর্বতশ্রেণির মধ্যস্থিত পর্বত। পম্পা সরোবর ও কাবেরী নদী এই পর্বত থেকে উৎপন্ন। এখানে মতঙ্গমুনির আশ্রম। বালী কর্তৃক মুনির আশ্রম অপবিত্র হলে মুনি বালীকে অভিশাপ দেন, সে যেন কখনও এই পর্বত এলাকায় না আসে, এলে তার মৃত্যু হবে। মুনির অভিশাপের ভয়ে বালী কখনও ঋষ্যমূক পর্বতে আসেনি। তাই বালীর ভয়ে সুগ্রীব এই পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাম লক্ষ্মণ এই পর্বতে এসেই প্রথমে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং বালীকে বধ করেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ : বিভাণ্ডক মুনির পুত্র। অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের জামাতা। লোমপাদের পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ হয়। শান্তা হলেন দশরথের কন্যা, দশরথ তাঁর বন্ধু রাজা লোমপাদকে স্বীয় কন্যা শান্তাকে দত্তক হিসেবে দান করেন। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পৌরোহিত্য করেন এবং তাঁর যজ্ঞপ্রভাবেই দশরথের চার পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের জন্ম হয়।

কবন্ধ : দনু নামে দণ্ডকারণ্যের এক ভয়ানক রাক্ষস। সীতা হরণের পরে রাম লক্ষ্মণ যখন অরণ্যে সীতাকে অন্বেষণ করছেন তখন কবন্ধ তাঁদের আক্রমণ করে। রামের হাতে কবন্ধের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সে রামকে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সীতা উদ্ধারের পরামর্শ দেয়।

কপিল : সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা ঋষি। প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। মাতার নাম দেবহূতি। গঙ্গাসাগরে তাঁর আশ্রম। অশ্বমেধের অশ্বচোর বলে তাঁকে অপমান করলে

মুনির ক্রোধাগ্নিতে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্ম হয়ে যায়। পরে ভগীরথ তপস্যা করে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আবাহন করে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। গঙ্গার পাবনী স্পর্শে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে।

কিষ্কিন্ধা বানররাজ বালীব রাজধানী কিষ্কিন্ধা। বর্তমানে মহীশূরের উত্তরে বেলারি জেলায় অবস্থিত। হায়দ্রাবাদ ও বেরারের অন্তর্গত অনেগুণ্ডি গ্রামকে প্রাচীন কিষ্কিন্ধা বলে চিহ্নিত করেন। এই অনেগুণ্ডি গ্রাম বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশে।
শ্রীসতীশচন্দ্র দে তাঁর 'রামায়ণের প্রকৃত কথা' গ্রন্থে (পৃ. ১৫) এবং নবীনচন্দ্র দাশ তাঁর Notes on the Geography of the *Valmiki Ramayana*, (1896, p.1) স্থির করেছেন অনেগুণ্ডি গ্রামই প্রাচীন কিষ্কিন্ধা, "According to Griffith and other authorities *Kiskindha* may be identified with the greater portion of the Deccan, with *Vidarba* (Berar) and Dandaka on the North, *Janasthan* along the upper Godavari on North-West, and the seas on East, West and South. They included the modern Mysore and were traversed by the *Sajhya*, *Dardura* and *Maloya* ranges (Western Ghats) in the West and South and the Mahendra hills in the East." (Ibid, p. 50-51)

কুম্ভ কুম্ভকর্ণের পুত্র। রাবণের অন্যতম সেনাপতি।

কুম্ভকর্ণ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা।

কুম্ভীনসী রাক্ষস সুমালী এবং গান্ধর্বী কেতুমতীর কন্যা। রাবণের মাতা কৈকসীর ভগ্নী। মধুদৈত্যের পত্নী। লবণাসুরের মাতা।

কুশ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কুশাবতী রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশেব স্থাপিত রাজ্য ও রাজধানী।

কুরুক্ষেত্র কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের রণভূমি। থানেশ্বরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। বৈদিক মতে দেবতাদের যজ্ঞস্থান। ধর্মক্ষেত্র নামে পরিচিত।

কেকয় কৈকেয়ীর পিতা রাজা অশ্বপতির রাজ্য। বর্তমান আফগানিস্থান।

কৈকসী সুমালীর কন্যা। রাবণের মাতা। বিশ্রবা মুনির পত্নী।

কৈকেয়ী দশরথের তৃতীয় পত্নী। ভরতের মাতা। কেকয়রাজ অশ্বপতির কন্যা।

কোশল দশরথের রাজ্য। কাশীর উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশের সন্নিহিত সমস্ত স্থান। কোশল রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত। অযোধ্যার উত্তরে উত্তর-কোশল। রাজধানী অযোধ্যার নাম দক্ষিণ কোশল।

কৌশল্যা কোশল রাজার কন্যা। রামচন্দ্রের জননী। দশরথের প্রধানা মহিষী।

কৌশিকী কূশী নদী। বর্তমান ত্রিহুতের পূর্বাংশ।

খর রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা, জনস্থানে অবস্থিত রাবণের সেনাবাহিনীর সেনাপতি। সুমালীর অপর এক কন্যা রাকাব সঙ্গে বিশ্রবা মুনির বিবাহ হয়। রাকার গর্ভে খর ও দূষণের জন্ম হয়।

গজপুষ্পীমালা : একপ্রকার পুষ্পিত লতা। বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের গলায় অভিজ্ঞান স্বরূপ পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সুগ্রীবকে বালীর থেকে আলাদা করে রামচন্দ্র চিনতে পারেন।

গরুড় : কশ্যপ-বিনতার পুত্র। পক্ষিরাজ এবং বিষ্ণুর বাহন। রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করেন।

গুহ : নিষাদ রাজ। রামচন্দ্রের মিত্র ও পরম ভক্ত।

গিরিব্রজ : কেকয় রাজ্যের প্রধান নগর। বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমে (মতান্তরে কাশ্মীরে)।

গৌতম : মহাতেজা ঋষি। ব্রহ্মার কন্যা অহল্যার সঙ্গে বিবাহ হয়। ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেন। গৌতম ইন্দ্র ও অহল্যাকে অভিশাপ দেন। গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণী হয়ে যান। রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে অহল্যা শাপমুক্ত হন।

চন্দ্রকেতু : লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র।

চ্যবন : মহর্ষি ভৃগু ও পুলমার পুত্র। রাজা শর্যাতির কন্যা সুকন্যার সঙ্গে চ্যবনের বিবাহ হয়।

চিত্রকূট : রামচন্দ্র বনবাস যাত্রা করে ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশে প্রথ:. চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করেন। চিত্রকূট পর্বতেই প্রথম রামের সঙ্গে ভরতের মিলন হয়। বর্তমানে প্রয়াগ থেকে দশ ক্রোশ দূরে উত্তরপ্রদেশের বান্দার জেলায় অবস্থিত চিত্রকূট।

জটায়ু : পক্ষিরাজ গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সূর্য-সারথি অরুণের পুত্র। রাজা দশরথের পরম বন্ধু। সীতা হরণের সময় রাবণকে বাধা ˊ ˋ : জটায়ু প্রাণপণ যুদ্ধ করে প্রাণ হারান।

জনক : মিথিলার ধার্মিক রাজা। সীতার পালিত পিতা। জনক কুলগত উপাধি, হ্রস্বরোমার পুত্র জনকের প্রকৃত নাম সীরধ্বজ।

জনস্থান : গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী রাক্ষস অধ্যুষিত বিজন অরণ্য। এখানে অগস্ত্যমুনির আশ্রম।

জাম্ববান্ : সুগ্রীবের মন্ত্রী। লঙ্কার যুদ্ধে রামচন্দ্র জাম্ববান্‌কে মন্ত্রীত্বে গ্রহণ করেন।

তক্ষ : ভরতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গান্ধার দেশ জয় করে ভরত রাজত্ব স্থাপন করেন এবং পুত্র তক্ষের নাম অনুসারে নাম রাখেন তক্ষশীলা।

তক্ষশীলা : ভরতের পুত্র তক্ষের রাজধানী। বর্তমানে পেশোয়ারে পাকিস্তা. .র অন্তর্গত।

তারা : সুষেণের কন্যা, অঙ্গদের জননী, বালীর পত্নী। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা।

তাড়কা : যক্ষ সুকেতুর সুন্দরী কন্যা, জম্ভের পুত্র সুন্দের সঙ্গে বিবাহ হয়। পুত্রের নাম মারীচ। অগস্ত্যের অভিশাপে রাক্ষসী রূপে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করেন।

ত্রিকূট	ত্রিকূট পর্বতের উপরে লঙ্কা নগরী স্থাপিত।
ত্রিজট	পিঙ্গলবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বনবাস যাত্রার আগে রামচন্দ্র তাঁকে বহু গোধন দান করেন।
ত্রিজটা	রাবণের অন্তঃপুরের দাসী। অশোকবনে সীতাকে পরম স্নেহে রক্ষা করতেন।
ত্রিশঙ্কু	সূর্যবংশীয় রাজা। গুরু বশিষ্ঠের কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যজ্ঞ করে সশরীরে স্বর্গে যাবেন। বশিষ্ঠ তাঁকে নিষেধ করেন। বশিষ্ঠপুত্র শক্ত্রির অভিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর হয়ে যজ্ঞ করে তাঁকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। ত্রিশঙ্কু স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পতিত হতে থাকেন। তখন আপন যোগবলে বিশ্বামিত্র অন্তরিক্ষে তাঁকে অধোশিরা নক্ষত্ররূপে স্থাপন করেন।
ত্রিশিরা	রাবণের পুত্র ও সেনাপতি।
দণ্ডকারণ্য	পূর্বে দণ্ড বা দণ্ডক নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। শুক্রাচার্যের অভিশাপে তার রাজত্ব দুর্গম অরণ্যে পরিণত হয়। রাম বনবাসের চতুর্দশ বৎসর এই দণ্ডকারণ্যে বাস করেন। নর্মদা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী স্থান। যমুনার দক্ষিণস্থ অরণ্য প্রদেশকেও দণ্ডকারণ্য বলা হয়।
দশরথ	অযোধ্যার রাজা। রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের পিতা।
দিলীপ	সূর্যবংশীয রাজা। রঘুর পিতা।
দুন্দুভি	ময়দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বালীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়।
দুর্বাসা	অত্রিমুনির পুত্র। মাতার নাম অনসূয়া। মহাতেজা কোপন স্বভাব দুর্বাসার সঙ্গে ঔর্বমুনির কন্যা কন্দলীর বিবাহ হয়।
দূষণ	রাবণের সেনাপতি ও বৈমাত্র ভাই। রামের হাতে নিহত হয়।
দেবান্তক	রাবণের সেনাপতি।
নন্দীগ্রাম	রামের বনবাসকালে ভরতের রাজধানী। অযোধ্যা থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।
নন্দীশ্বর	মহাদেবের অনুচর। বামন আকৃতি, কৃষ্ণ পিঙ্গল বর্ণ, বানরমুখ। রাবণ এঁকে দেখে উপহাস করলে নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, "আমার আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোকে সবংশে নিহত করবে।"
নল	বিশ্বকর্মার বরপুত্র। কিষ্কিন্ধার স্থপতি ও সেনাপতি। রাম কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণের জন্য সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করেন।
নিকুম্ভ	কুম্ভকর্ণের পুত্র। রাবণের অন্যতম সেনাপতি।
নিকুম্ভিলা	লঙ্কার পশ্চিম দিকে এক বিশাল বটগাছের তলায় রাবণের আরাধ্যা ভদ্রকালীর এক বিরাট মন্দির। এখানে যজ্ঞরত অবস্থায় মেঘনাদ লক্ষ্মণের হাতে যুদ্ধে নিহত হয়।
নীল	অগ্নির বরপুত্র। বালী ও সুগ্রীবের সেনাপতি।

নৈমিষারণ্য : গোমতী নদীর নিকটে পবিত্র তীর্থ। গৌরমুখ মুনি এখানে নিমেষের মধ্যে অসুর সৈন্য ভস্ম করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য। এই পবিত্র তীর্থে দশরথ ও রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এখানে সৌতি ঋষিদের কাছে বেদব্যাস রচিত মহাভারত পাঠ করেন। উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলায় অবস্থিত। বর্তমান নাম নিমসার।

পঞ্চবটী : গোদাবরী নদীর উৎসস্থলে রমণীয় অরণ্য। এখানে রামচন্দ্র আশ্রম নির্মাণ করে বনবাসকাল যাপন করেন। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী পবিত্র এই পঞ্চবৃক্ষ শোভিত অরণ্য, তাই নাম পঞ্চবটী। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা কর্তন করেছিলেন বলে বর্তমান নাম নাসিক।

পম্পা : নদী ও সরোবর। এর পশ্চিম তীরে মতঙ্গমুনির আশ্রম। নিকটে ঋষ্যমূক পর্বত। এখানে শবরী তপস্যা করেন এবং রামচন্দ্রের দর্শন করে মুক্তিলাভ করেন।
মহীশূরের পর্বতশ্রেণি থেকে উৎসৃত তুঙ্গ ও ভদ্রা দুইটি নদী একত্রে মিলিত হয়ে তুঙ্গভদ্রা নামে খ্যাত। পম্পা সরোবর তুঙ্গভদ্রার স্রোতধারার একটা অংশ, কালক্রমে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিরাট সরোবরে পরিণত হয়। বেলারী জেলার হস্পেট শহরের নয় মাইল উত্তর পূর্বে নদী পার হওয়ার একটা ঘাট আছে, এই পারঘাটের দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে পম্পা সরোবর অবস্থিত বলে পণ্ডিত পদ্মনাভ ঘোষাল এবং আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

পরশুরাম : বিষ্ণুর অবতার। জমদগ্নির পুত্র। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কল্পে ইনি ভারতবর্ষে একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন অভিযান করেন।

প্রহস্ত : রাবণের মাতুল, মন্ত্রী ও সেনাপতি।

পুষ্কল : ভরতের কনিষ্ঠ পুত্র।

পুষ্কলাবতী : ভরতের কনিষ্ঠ পুত্র পুষ্কলের রাজধানী। বর্তমানের পুরুষপুর বা পেশোয়ার।

পুষ্পক বিমান : কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে এক অপূর্বশোভন আকাশচারী দিব্য বিমান দান করেন। এই বিমান ইচ্ছামাত্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এই বিমান তৈরি করেন। কুবেরকে পরাজিত করে রাবণ তাঁর পুষ্পক বিমান অপহরণ করে। রাবণ বধ করে রামচন্দ্র এই পুষ্পক বিমান গ্রহণ করেন। অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেকের পরে রামচন্দ্র এই বিমানকে পুনরায় কুবেরের কাছে ফিরে যেতে আজ্ঞা করেন।

বৎস দেশ : প্রয়াগের নিকট যমুনার উত্তর তীরে।

বরুণ : বৈদিক দেবতা। ইনি অন্যতম লোকপাল এবং জলের অধিশ্বর।

বশিষ্ঠ : মিত্রাবরুণের পুত্র। ইনি দশজন প্রজাপতির অন্যতম। হরিবংশ মতে ইনি ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্রের অন্যতম। সপ্তর্ষির এক ঋষি। সূর্যবংশের গুরু পুরোহিত এবং মন্ত্রী।

বিদেহ : মিথিলা।

বিভাণ্ডক : কশ্যপের পুত্র, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পিতা।

বিভীষণ : রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পরম ধার্মিক।

বিদ্যুজ্জিহ্ব : মায়াবী রাক্ষস শিল্পী। রামচন্দ্রের মায়ামুণ্ড নির্মাণ করে সীতাকে দেখিয়েছিল।

বিশল্যকরণী : ক্ষত নিরাময়কারী একপ্রকার ওষধি।

বিশ্বকর্মা : দেবতাদের শিল্পী।

বিশ্বামিত্র : রাজা গাধির পুত্র, কান্যকুব্জের রাজা। ক্ষত্রিয় হয়ে কঠোর তপস্যা করে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। রামচন্দ্রকে যাবতীয় ব্রহ্মাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা দান করেন।

ভগীরথ : সগর রাজার প্রপৌত্র। তপস্যা বলে স্বর্গের গঙ্গাকে মর্ত্যে আবাহন করে আনেন।

ভরদ্বাজ : বৃহস্পতি ঋষির পুত্র, প্রয়াগে এর আশ্রম ছিল।

মধু : দৈত্য। মধুবনের (বর্তমান মথুরার) অধিপতি।

মধুপুরী : মধু দৈত্যের রাজধানী। বর্তমান মথুরা।

মন্থরা : কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী।

মন্দোদরী : ময়দানবের কন্যা, রাবণের প্রধান মহিষী, মেঘনাদের জননী। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা।

মহেন্দ্রপর্বত : দক্ষিণ সমুদ্র তীরে অবস্থিত। হনুমান এই পর্বত থেকে লম্ফ প্রদান করে লঙ্কায় গমন করেন। বর্তমানের পূর্বঘাট পর্বতমালা।

মাগধী নদী : বর্তমান শোণ নদী।

মারীচ : তাড়কার পুত্র। অগস্ত্যের অভিশাপে রাক্ষসে পরিণত হয়।

মিথিলা : বিদেহরাজ জনকের রাজধানী। বর্তমান দ্বারভাঙ্গা।

মৃতসঞ্জীবনী : মৃতের শরীরে প্রাণসঞ্চারকারী দিব্য ওষধি।

রঘু : সূর্যবংশীয় দিগ্বিজয়ী রাজা।

রত্নাকর : চ্যবনমুনির পুত্র। রাম নামে সিদ্ধিলাভ করে মহর্ষি বাল্মীকি হন।

রাবণ : বিশ্রবামুনির পুত্র। মাতার নাম নিকষা। লঙ্কার রাজা।

রাম : বিষ্ণুর অবতার। রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রুমা : বানররাজ সুগ্রীবের পত্নী।

লব : রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্মীকি একগুচ্ছ কুশের অধোভাগ দিয়ে স্পর্শ করে জন্মলগ্নে নাম রাখেন লব।

লবণ : মধু দৈত্যের পুত্র। শত্রুঘ্নের হাতে নিহত হয়।

লক্ষ্মণ : দশরথ-সুমিত্রার পুত্র।

লোমপাদ : অঙ্গ দেশের রাজা। দশরথের বন্ধু। বর্তমানের ভাগলপুর মুঙ্গের প্রভৃতি অঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল।

শবরী : শূদ্রা তপস্বিনী, ব্যাধ কন্যা। মতঙ্গমুনির শিষ্যা, রামনামে সিদ্ধা।

শান্তা : দশরথের কন্যা। দশরথ স্বীয় কন্যা শান্তাকে তাঁর বন্ধু অঙ্গ দেশের রাজা লোমপাদকে দত্তক হিসেবে দান করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পত্নী।

শত্রুঘাতী : শত্রুঘ্নের কনিষ্ঠ পুত্র।

শত্রুঘ্ন : দশরথ-সুমিত্রার কনিষ্ঠ পুত্র। লক্ষ্মণের সহোদর।

শার্দুল : রাবণের গুপ্তচর।

শুক : রাবণের মন্ত্রী ও গুপ্তচর।

শ্রুতকীর্তি : শত্রুঘ্নের পত্নী।

শূর্পনখা : রাবণের ভগ্নী।

সগর : সূর্যবংশীয় রাজা।

সম্পাতি : জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সরযূ : কৈলাসের ব্রহ্মকল্পিত মানসসরোবর থেকে উৎপন্ন বলে এই নদীর নাম সরযূ। সরযূর তীরে অযোধ্যা নগরী স্থাপিত। বর্তমানে নাম গোগরা বা ঘর্ঘরা। বিহারে ছাপরার দক্ষিণে গঙ্গায় পতিত হয়েছে।

সরমা : বিভীষণের পত্নী। গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা।

সারণ : রাবণের মন্ত্রী ও গুপ্তচর।

সিন্ধু : অন্ধমুনির পুত্র। ভুলক্রমে দশরথের শব্দভেদী বাণে নিহত হন।

সুগ্রীব : কিষ্কিন্ধার রাজা। বালীর ভ্রাতা।

সুবাহু : রাবণের সেনাপতি। রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়। শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামও সুবাহু।

সুমন্ত্র : রাজা দশরথের মন্ত্রী, অর্থসচিব এবং সারথি।

সুমালী : রাবণের মাতামহ। রাক্ষস সুকেশের পুত্র। মাতা গন্ধর্বকন্যা কেতুমতী।

সুমিত্রা : দশরথের পত্নী। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী।

সুষেণ : বালীর শ্বশুর। তারার পিতা। অঙ্গদের মাতামহ। সুগ্রীবের মন্ত্রী ও সেনাপতি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

হনুমান : বায়ুর পুত্র, মাতার নাম অঞ্জনা। জ্ঞান ভক্তি ও বিদ্যার প্রতিমূর্তি, নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত আদর্শ, তেজ বীরত্ব ধৈর্য সারল্য সামর্থ্য পৌরুষ বিনয় ইত্যাদি যাবতীয় গুণের আধার। পরম প্রাজ্ঞ ও ভবিষ্যৎদর্শী। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে চার যুগে অমর বলে খ্যাত।

শব্দ-সূচি

মহাভারতের কথা

অমলেশ ভট্টাচার্য

—এই বই সম্পর্কে বিশিষ্টজনেদের মতামত—

দেশের জ্ঞানী-গুণী-বিদ্বৎসমাজ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত। মূল মহাভারতের বিস্তৃত গভীর ও সামগ্রিক পরিচয়।

"মূলের ভাবধারাকে অকুণ্ঠিত মর্যাদায় রক্ষা করা হয়েছে। হরিদ্বারের গঙ্গার মতোই এর সাবলীল গতি স্রোত ও স্বচ্ছতা। সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানি অক্ষয় নাম রেখে যাবে।"

ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী

'বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ দুর্লভ। বাংলার ঘরে ঘরে গ্রন্থখানির প্রচার হওয়া আবশ্যক। এই একখানি গ্রন্থেই লেখক অমর হইয়া থাকিবেন।"

ড. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

"গ্রন্থখানি যদি ভারতের ঘরে-ঘরে নিত্য পাঠ্য হয় তাহলে আজিকার দুর্দশাগ্রস্ত জাতি বাঁচিয়া যাইবে।"

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

"পড়তে বসার আগে ধারণা করতে পারিনি এমন সুন্দর এমন আকর্ষণীয় এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একখানি অমূল্য গ্রন্থ। মহাভারতের বিচিত্র জটিল অসংখ্য চরিত্রের প্রাঞ্জল ভাষ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

আশাপূর্ণা দেবী

"এই অমূল্য গ্রন্থখানি বাংলাভাষার গৌরব। এমন অখণ্ড দৃষ্টিতে মহাভারত কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া জানি না।"

ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

"এই লেখনীতে ফুলচন্দন বর্ষিত হোক।"

পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

"গ্রন্থকার এক মহৎ জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। তিনি এক অসাধ্য সাধন করেছেন।"

ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

..."লেখকের অনন্য প্রকাশভঙ্গি, অতলান্ত ধ্যানকেন্দ্রিক চিত্ত। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি ও ভক্ত, তাছাড়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তো বটেই। চিন্তার বিশালতা ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য ও দর্শনের সমন্বয়। অপরূপ পর্যবেক্ষণ ভঙ্গি। মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। মহাভারতের এর চেয়ে ভাবগভীর অথচ জীবন-ছোঁয়া ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? সকল বেদনা মন্থন করা অমৃতই গ্রন্থখানিকে অমৃতসমান করেছে।"...

—যুগান্তর

..."প্রত্যেকটি চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব লেখক এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যাতে চরিত্রের মর্মকথাটি অতি সহজেই ধরা পড়ে। শিল্পীজনোচিত সৌন্দর্যবোধ ও বেদনাবোধ তার সঙ্গে আধুনিক মানসিকতা গ্রন্থটিকে ভারী উপভোগ্য করে তুলেছে। মহাভারতের সামগ্রিক পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। চরিত্র বিশ্লেষণেই মুনশিয়ানা। শ্রীকৃষ্ণের সঠিক চিত্রটি তিনি অঙ্কন করেছেন। গীতাকে ভারী সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। সব সূক্ষ্ম চিন্তাই ধরা দিয়েছে কথা ও কাহিনির অন্তরে অন্তরালে।"...

—দেশ